হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

৩

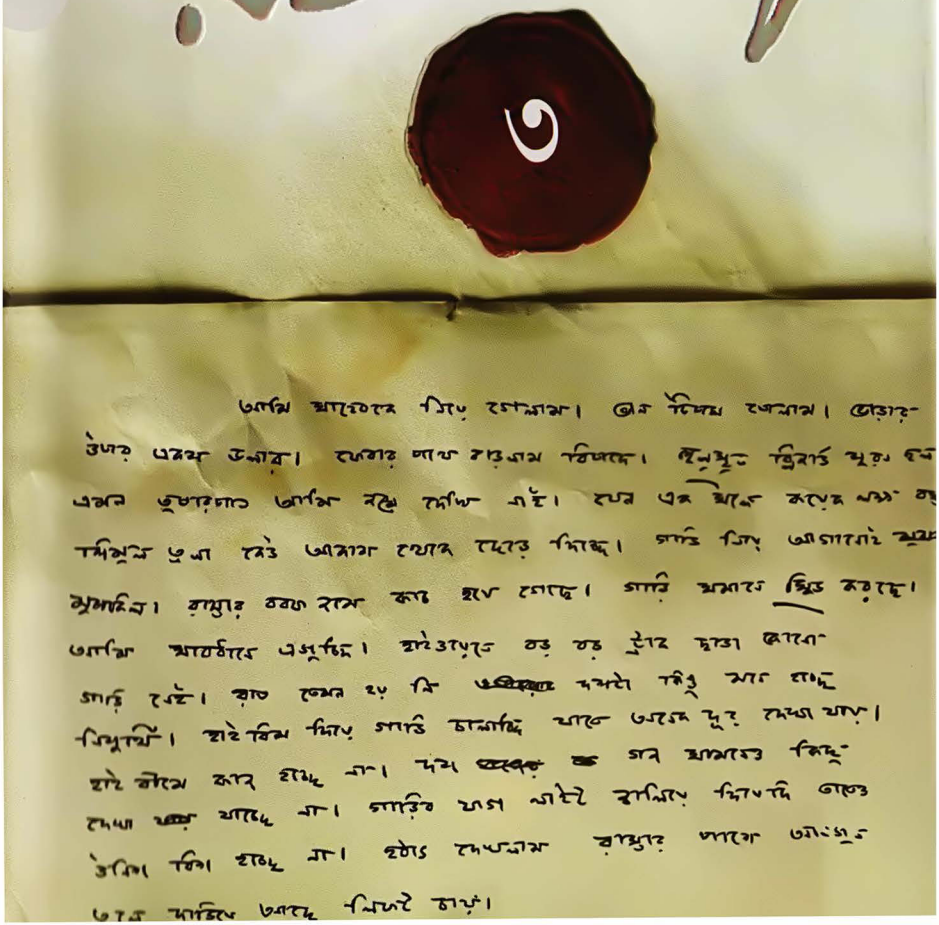

হুমায়ূন আহমেদ রচনাবলী

৬

সমকাল

আলোকচিত্র :: বিশ্বজিৎ সরকার

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

৩

সালেহ চৌধুরী
সম্পাদিত

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০১০

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৭০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
www.muktadhara.com

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন বুকস এন্ড ক্রাফটস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরন্টো

Humayun Ahmed Rachanabali Vol. 3 | edited by Saleh Choudhury
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price Tk. 700.00 only
ISBN 984 868 587 1

ভূমিকা

সৃষ্টিশীলতার বিচিত্র পথে তাঁর চলা। এই চলনের ধরন নিয়ে একটা দৃশ্য কল্পনা করা যায়—যাদুকর এগিয়ে চলেছেন তাঁর সহজ পদচারণায়, আর তাঁর প্রতিটি পদপাতেই ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র ফুলের হাসি। হাঁ, এমনি যাদুকরি মুগ্ধতা ছড়িয়ে হুমায়ূন আহমেদের এগিয়ে চলা। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর অবদান বিপুল অভিনন্দনে ধন্য। আর এভাবেই গড়ে উঠছে হুমায়ূন-সাহিত্যের বিশাল সম্ভার। কেবল বাংলাদেশের সীমায়ই নয়, বিদেশেও তার রচনাবলী আগ্রহ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে, সমাদৃত হচ্ছে অনূদিত হয়ে।

এ নিবন্ধের শুরুতে 'যাদুকর' এসেছে উপমা হিসেবে। আদতে হুমায়ূন আহমেদ একজন দক্ষ যাদুকরও বটে। ছাত্রাবস্থায় সৌখিন যাদুকর হিসেবে টেলিভিশনে যাদু দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। হুমায়ূন কিন্তু ওখানেই থেমে থাকেননি। পরে অর্জিত দক্ষতার বলে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক যাদুকর সংস্থার সদস্যপদ। এখন আর প্রকাশ্যে খেলা না দেখালেও মাঝে মধ্যে বন্ধুবান্ধব সমাবেশে, বিশেষ করে ছোটদের আগ্রহে, যাদুর পশরা তুলে ধরতে তাঁর ক্লান্তি নাই।

ব্যতিক্রমী এ দিকটির উল্লেখ উদ্দেশ্যহীন নয়। এতে যে দিকটি স্পষ্ট হচ্ছে তা এই যে, আধাখেঁচড়া কাজে তিনি অভ্যস্ত নন। যা কিছু করেন, জেনে বুঝে দরকারমতো প্রস্তুতি নিয়েই করে থাকেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটক প্রতিটি রচনার পেছনেই রয়েছে এ নিষ্ঠার পরিচয়। এতেই নিহিত আছে তাঁর সাফল্যের গূঢ় রহস্য।

আশৈশব হুমায়ূন আহমেদ মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলের অধিবাসী। সঙ্গতভাবেই এই পরিচিত জীবন জুড়ে আছে তার রচনাবলীর সিংহভাগ। তাই বলে বরেণ্য এই লেখকের পূর্ণ মনোযোগ মধ্যবিত্ত জীবনেই আবদ্ধ নয়। নিম্ন আর উচ্চ কোটীর জীবনেও আলো ফেলতে শুরু করেছেন তিনি। রচনাবলীর এই খণ্ডে (৩য়) গ্রন্থিত 'ফেরা' উপন্যাসেই হুমায়ূন প্রথমবারের মতো গ্রামে ফেরেন। গ্রাম-জীবনের আনন্দ-মেলার মাঝে দুঃখ-দৈন্য, সংঘাত আর ওঠা-পড়াকে অবলম্বন করে মানবিকতার জয়গাথা এই *ফেরা*। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক এবং মননশীল সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *ফেরা*কে হুমায়ূন আহমেদের তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সেরা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

হালকাভাবে যখন দেখি, হুমায়ূন আহমেদের রচনার বিনোদন দিকটিই বড় হয়ে চোখে পড়ে। তলিয়ে দেখলে সামনে আসে তার নান্দনিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার

চিত্র। এ দিকটির প্রতি সামান্য ইঙ্গিত হিসেবে *শীত ও অন্যান্য গল্প*-এর 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পটির প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

গল্পের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে পুত্রহারা পিতা জলিল সাহেব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সই আর প্রমাণাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধস্পৃহায় নয়। যে যুদ্ধে গিয়েছিল সে তো মরতেই পারে। তার দাবি, অন্যায়ভাবে যে লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার বিচার হতে হবে। একদিন না একদিন এ বিচার হবেই, এ তার স্থির বিশ্বাস।

জলিল সাহেবের মৃত্যুর পরও তার নাতনি এ দস্তাবেজ আগলে চলছে এই বিশ্বাসে যে, একদিন না একদিন এগুলোর প্রয়োজন পড়বে।

আজ গোটাজাতি যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে মুখর, তখন ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে দুই যুগেরও আগে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক, প্রচ্ছন্ন সামরিক আর স্বৈরশাসনের আওতায় আমরা মুক্তিযুদ্ধ আর যুদ্ধাপরাধের স্মৃতি ভুলতে বসেছিলাম, তেমন এক পরিবেশে হুমায়ূন যেন বিবেকের ভূমিকা নিয়ে এ গল্পটি লিখেছিলেন।

উপাখ্যানমালা : হিমু

কথাসাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে নির্ভর করে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর ওপর। এদিক থেকেও হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়। অজস্র অবিস্মরণীয় চরিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এসব চরিত্র গবেষক-বিশ্লেষকদের মনোযোগ দাবি করে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে হিমু বা হিমালয় জনপ্রিয়তায় সবচেয়ে এগিয়ে। রচনাবলীর এই খণ্ডে হিমু উপাখ্যানমালার প্রথম বই 'ময়ূরাক্ষী' গ্রন্থিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে হিমুর ওপর কিছু আলোকপাত প্রাসঙ্গিক বোধ করছি।

আলোচনায় যাওয়ার আগে আরেকটা কথা বলে রাখছি। 'ময়ূরাক্ষী' লেখার সময় হুমায়ূন একদিন বললেন, 'একটা ছোট বই লিখছি। বইটি অবশ্যই ভালো লাগবে।' এমনই প্রত্যয় নিয়ে হিমু-সৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ে যে কোনো ভুল ছিল না হিমুর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ।

মিসির আলির বিপরীত চরিত্র হিসেবেই হিমুর আবির্ভাব। মিসির আলী তার অর্জিত জ্ঞান আর বোধ দিয়ে জগতকে বিচার করেন। এর আলোকে রহস্যের উন্মোচন করায়ই তিনি আগ্রহী। এক কথায় মিসির আলির কর্মকাণ্ড যুক্তি আর বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে হিমু এক আবেগস্বর্বস্ব তরুণ। নিয়মের সীমা ছাড়িয়ে তার বেহিসেবি চলাফেরা।

অনেকে এই দ্বৈততাকে হুমায়ূন আহমেদের দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ মনে করেন। এমন দাবি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়ার নয়। মানুষের জীবন তো একরৈখিক না। হুমায়ূনকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বিজ্ঞানের ছাত্র হুমায়ূন আহমেদ একদিকে যেমন কঠোর যুক্তিবাদী, অন্যদিকে তেমনি প্রচণ্ডভাবে আবেগপ্রবণ মানুষও। সৃষ্ট চরিত্রের ওপর যার প্রভাব পড়া অসম্ভব কিছু না।

হিমু লালিত হয়েছে অনেকটা উন্মার্গ পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে। সচ্ছল জীবন ছেড়ে আসা এই পিতা পুত্রের মনে যাতে আসক্তি না জন্মায় সেজন্যে পাখি উপহার দিয়ে আগ্রহ সৃষ্টির পরেপরেই পাখিটাকে গলাটিপে মেরে ফেলে। হয়তো মাতৃস্নেহের বাঁধন মুক্ত করার লক্ষ্যেই হিমুর মাকেও সে হত্যা করেছিল। এভাবে মহাপুরুষ বানানোর প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে বেড়ে ওঠা হিমুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পিতার রেখে যাওয়া নির্দেশনাবলী দ্বারা। হিমু তাই বাঁধনহারা, বেপরোয়া। স্নেহ-প্রীতিতে আকৃষ্ট হলেও কোথাও আটকা পড়তে একান্ত অনীহ।

পরবর্তী বইগুলোর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিমু চলাফেরা করে খালি পায়ে; পোশাক—পকেট ছাড়া হলুদ পাঞ্জাবি। আলটপকা ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ায় দক্ষ বোহেমিয়ান হিমু অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারেও অসীম ক্ষমতা রাখে। আর এসব মিলিয়েই হিমু হয়ে উঠেছে পাঠকচিত্তহারী।

এখানে বলে রাখা দরকার, দীর্ঘ উপাখ্যানমালার সর্বত্র এ বর্ণনা অনুসৃত হয়নি। ব্যতিক্রম বা কিছু কিছু বিচ্যুতিও আছে। যেমন, ময়ূরাক্ষীতে যাকে দেখি 'বড় ফুফু' হিসেবে তাকে অনেক সময়ই পাওয়া যায় মেজো বা মাজেদা খালা রূপে। তার স্বামীও ফুফা থেকে খালু হয়ে যান। আবার খালি পায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত হিমুর পায়ে স্যান্ডেল কিংবা যে পাঞ্জাবিতে পকেট থাকার কথা নয়, তার পকেট থেকেও টাকা কিংবা সিগারেট বেরিয়ে আসে।

এই ফুফু বা খালা একটি চমৎকার মায়াবতী চরিত্র। হিমুর বর্ণনায় তার 'মায়ের গোষ্ঠী' পিশাচশ্রেণীর। মাজেদাকে তাই ফুফুরূপেই মানানসই মনে হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এসব বিচ্যুতি পাঠকের রসগ্রহণে কিংবা তার মজে যাওয়ায় কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না। হুমায়ূন আহমেদের কথকতার যাদুকরি শক্তির জয় এখানেই।

হিমুর কাণ্ডকারখানায় ইচ্ছেপূরণের প্রতিফলন ঘটে। চরিত্রটির জনপ্রিয়তার এ-ও একটা কারণ হতে পারে। যুক্তিছাড়া উদ্ভট আচরণের মাধ্যমে হিমু এমনসব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে, যা পাঠকের মনে আনন্দের পরশ বুলায়। যা কেউ পারে না বা পারছে না তা ঘটাতে দেখলে কার না ভালো লাগে!

হিমুর বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ বইগুলো নেহাত কিশোর আর সদ্য-কৈশোর ছাড়ানোদের আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যেই জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ। আদতে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। হিমু উপাখ্যান ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই সমান প্রিয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৯১ সালে *দরজার ওপাশে* প্রকাশ হতেই জেলা-জজেরা নড়েচড়ে বসেন। হিমুর 'পিশাচশ্রেণীর' মামার একটা সংলাপকে উপলক্ষ করে উচ্চ আদালতে আদালত অবমাননার মামলা ঠুকে দেন। জজ সাহেবরাও যে হিমুকে পাশে ঠেলে রাখতে পারেন না, এ তারই প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এদেশে আদলত অবমাননার অভিযোগ উঠলে 'নিঃশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা'য় ঝামেলা চুকিয়ে ফেলাই প্রচলিত রীতি। হুমায়ূন ওপথ না মাড়িয়ে বিচার মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেন। ওঁর পক্ষ নেন প্রখ্যাত আইনজীবী কামাল হোসেন, ভাষাসৈনিক গাজীউল হক (প্রয়াত) প্রমুখ। প্রথম দিনের শুনানির পরই অজ্ঞাত কারণে এ মামলা ধামাচাপা পড়ে যায়। জজ সাহেবদের সমিতিকেও আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি।

যাক গে, যে কথা বলার জন্যে এ প্রসঙ্গের অবতারণা, মুখে স্বীকার করি আর না-ই করি হিমু আমাদের সকল শ্রেণীর পাঠকের মন জয় করেছে। আর এ জন্যেই অমর একুশে বইমেলাতেই হিমু উপাখ্যানের বিক্রি ষাট-সত্তর হাজার ছাড়িয়ে যায়। প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও হিমু খুবই জনপ্রিয়। এমনকি সুদূর রাশিয়ায়ও গঠিত হয়েছে 'হিমু ক্লাব'। ওদের তো পাঞ্জাবি নাই, সদস্যেরা তাই হলুদ টাই পরে। খবরটা অবশ্যই মজার।

হিমু কিন্তু এখন আর নেহাত ভালো লাগা না-লাগায়ই সীমাবদ্ধ নেই। চরিত্রটি বিবর্তিত হতে শুরু করেছে। হিমু হয়ে উঠছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজ-বাস্তবতার অসঙ্গতি কিংবা অস্বচ্ছতাকে স্পষ্ট করারও হাতিয়ার। হিমু উপাখ্যানমালার পরবর্তী বইগুলো এর প্রমাণ।

হিমু তার নিজের ধারায় এগিয়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে থামে তা আজ পাঠকমনের প্রবল কৌতূহলের বিষয়।

রচনাবলী সম্পর্কে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। হুমায়ূন আহমেদের বইগুলো বহুল প্রচলিত। পুরনো প্রতিটি বইই বহু সংস্করণ বা মুদ্রণ পাড়ি দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অসতর্কতার ফলে বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঠাঁই করে নিয়েছে এসব প্রকাশনায়। রচনাবলী পরিপূর্ণভাবে মুদ্রণ ত্রুটিমুক্ত এমন দাবি করব না। তবে এটুকু দাবি করা যায় যে, এতে বড় ধরনের ভুলত্রুটি শুধরে গ্রন্থিত বইগুলোকে প্রামাণ্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হতে পেরেছি, পাঠকরাই তা বিচার করবেন।

'অন্যপ্রকাশ' ব্যয়বহুল এই রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে নিঃসন্দেহে একটা বড় কাজে হাত দিয়েছে। তাদের উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি। একই সঙ্গে বলে রাখা দরকার মনে করি, রচনাবলী সম্পাদনায় আবদুল্লাহ্ নাসেরের সহযোগিতা আমার শ্রম অনেকটাই লাঘব করেছে। গ্রন্থপঞ্জি তৈরিতে সাহায্য করেছেন মোমিন রহমান। এঁদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ।

সালেহ চৌধুরী

সূচি

উপন্যাস
একা একা ১৩
প্রথম প্রহর ৭৩
আমার আছে জল ১৩১
১৯৭১ ১৮৯
ফেরা ২৪৯

ছোটগল্প
শীত ও অন্যান্য গল্প ৩২৭

সায়েন্স ফিকশন
ইরিনা ৩৯৯

উপাখ্যানমালা : হিমু
ময়ূরাক্ষী ৪৮৭

নাটক
মহাপুরুষ ৫৫৭

পরিশিষ্ট ৬০৯

উপন্যাস

একা একা

রাতদুপুরে দুম দুম করে দরজায় কিল পড়তে লাগল। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আগুন-টাগুন লেগেছে কিংবা চোর এসেছে। চোর হবার সম্ভাবনাই বেশি। খুব চুরি হচ্ছে চারদিকে।

আমরা দুজনের কেউই ঘুমাইনি। ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাবু ভাই তার শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। সিগারেট হাতে থাকলে সে কোনো কথাবার্তা বলে না। কাজেই আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কে ?

দরজা খোল।

বড় চাচার গলা। ধরা যেতে পারে সাংঘাতিক কিছু হয়নি। এ বাড়িতে বড় চাচার কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজকর্ম কিছু করেন না। সেজন্যেই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ করে বাড়ি মাথায় তোলেন। একবার রাত তিনটায় এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে পাহারাদার পুলিশ আমাদের গেটের কাছে বাঁশি বাজাতে লাগল। আমি এবং বাবু ভাই দু'জনে ছুটে গিয়ে দেখি ছোট চাচির পোষা বিড়াল তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানার উপর বমি করছে। বড় চাচার সে-কী চিৎকার! যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু হয়েছে।

আজ রাতেও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু হবে। হয়তো চাচির বিড়াল তাঁর ঘরে গিয়ে কুকীর্তি করে এসেছে। আর এই নিয়ে ঘুমুবার সময়টায় তিনি লাফঝাঁপ শুরু করেছেন।

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, কী হয়েছে চাচা ?

দরজা খুলতে বললাম—কানে যায় না ?

ব্যাপারটা কী ?

চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব, লাটসাহেব কোথাকার! দরজা খোল।

বাবু ভাই সিগারেট ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, রাতদুপুরে কী শুরু করেছেন ?

কী শুরু করেছি মানে ? একটা মানুষ মারা যাচ্ছে।

কে মারা যাচ্ছে ?

বড় চাচা তার উত্তর না দিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি কষালেন দরজায়।

বাবু ভাই উঠে দরজা খুলল। ঠান্ডা গলায় বলল, কে মারা যাচ্ছে ?

বড় চাচা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না। নিচে যা।

হয়েছেটা কী বলবেন তো ?

বাবার অবস্থা বেশি ভালো না।

স্ট্রোক হয়েছে নাকি ?

হতে পারে। অবস্থা খুব সিরিয়াস। খুবই সিরিয়াস!

বড় চাচাকে দেখে মনে হলো না তিনি খুব বিচলিত। বরঞ্চ এই উপলক্ষে হৈচৈ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁকে বেশ খুশি খুশিই মনে হলো। অনেকদিন পর একটা দায়িত্ব পেয়েছেন।

সবাইকে খবর দেওয়া দরকার। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই এখন। উফ কী ঝামেলা!

তিনি ঝড়ের মতো নিচে নেমে গেলেন। তাঁর গলা অবশ্যি শোনা যেতে লাগল, ড্রাইভার কোথায় ? ড্রাইভার ? কাজের সময় সব কোথায় যায় ? পেয়েছে কী ?

বারান্দার লাইট জ্বলল। চটি ফটফট করে কে যেন নামল। ছোট চাচা ? এ বাড়িতে ছোট চাচাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চটি পরেন এবং শব্দ করে হাঁটেন। নিশ্চয়ই তিনি।

বাবু ভাই আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। চিন্তিত স্বরে বলল, তুই চট করে দেখে আয় সত্যি সত্যি অবস্থা খারাপ কি না। আমার মনে হয় বাবা খামাখা চেঁচাচ্ছে।

নিচে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি অবস্থা খারাপ।

দাদার ঘরে অনেক লোকজন। ছোট চাচা, বড় চাচা, শাহানা, আমাদের ভাড়াটে রমিজ সাহেব। কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। তাঁর খাটটি সরিয়ে সিলিং ফ্যানের ঠিক নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। রাখা হয়েছে আধাশোয়া করে। তিনি হাত দুটি ছড়িয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে ছটফট করছেন। পৃথিবীতে এত অক্সিজেন কিন্তু তার বৃদ্ধ ফুসফুসটাকে তিনি আর ভরাতে পারছেন না। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শাহানা একটি হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু সে ক্রমাগত পাখা নেড়ে যাচ্ছে। তার মুখ হয়েছে পাংশুবর্ণ। লম্বাটে মুখ আরও লম্বা দেখাচ্ছে।

দাদা কী একটা বলতে চেষ্টা করলেন। শ্লেষ্মাজড়িত স্বর, কিছুই বোঝা গেল না।

বড় চাচি চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি চোখ বড় করে বললেন, কী বলছেন রে ?

কী জানি কী ?

শাহানা, তুই কিছু বুঝতে পারলি ?

জি-না মামি।

দাদা এবার স্পষ্ট বলে উঠলেন, মিনু, ও মিনু।

মিনু আমাদের সবচেয়ে বড় ফুপু। ন' বছর বয়সে গলায় কী একটা ঘা (খুব সম্ভব ক্যান্সার) হয়ে মারা গিয়েছিল। অল্পবয়সে মৃত্যু হবে বলেই হয়তো রাজকন্যার মতো রূপ নিয়ে এসেছিল। আমাদের বসার ঘরে এই ফুফুর একটি বাঁধানো ছবি আছে।

দাদা আবার বিড়বিড় করে কী বললেন। তাঁর বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগল।

শাহানা আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, বড় ভয় লাগছে।

ভয়ের কী আছে?

একটা মানুষ মরে যাচ্ছে—এটা ভয়ের না, কী বলছিস তুই?

দাদা ছটফট করতে লাগলেন।

একজন মানুষ শ্বাস নেওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর আমরা এত সহজে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। আমার দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জাই লাগল।

দাদা তাহলে সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছেন। ইদানীং তাঁর সাথে আমার খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হতো না। ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ডাকতেন, কে যায়, বাবু? বাবু না? তাহলে কে, টগর? এ্যাই টগর, এ্যাই। আমি না-শোনার ভান করে দ্রুত বেরিয়ে যেতাম। কী কথা বলব তাঁর সাথে!

দাদার নিজের কোনো কথা নেই বলার। আমারও নেই।

একজন বুড়ো মানুষ যার স্মৃতিশক্তি নেই, গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁর কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকা যায় না।

কিন্তু মানুষ শুধু কথা বলতে চায়। সর্বক্ষণ চায় কেউ-না-কেউ থাকুক তার পাশে। কে থাকবে এত সময় তাঁর কাছে? দাদা তা বুঝেন না। তাঁর ধারণা পৃথিবীর সবারই তার মতো অখণ্ড অবসর। কাজেই তিনি কান খাড়া করে দরজার পাশে সারা দিন এবং প্রায় সারা রাত বসে থাকেন। কারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেলেই ডাকেন, কে যায়? কে এটা, কথা বলে না যে, কে?

বাধ্য হয়ে কোনো কোনো দিন যেতে হয় তাঁর ঘরে। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, কে তুই? বাবু?

জি-না, আমি টগর।

তোর পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

কখন পরীক্ষা কী পরীক্ষা কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা তাঁর পরীক্ষা দিয়ে শুরু হয়।

আমি ঝামেলা কমাবার জন্যে বলি, ভালোই।

ডিভিশন থাকবে?

জি থাকবে।

অংক ভালো হয়েছে? অংকটাই আসল। ডিভিশন হয় অংক আর ইংরেজিতে। ইংরেজি কেমন হয়েছে?

ভালোই হয়েছে?

'আমি আসিতে আসিতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল'—এর ইংরেজি কী হবে বল দেখি ?

দাদার সঙ্গে কথা বলার এই যন্ত্রণা। আমি এমএসসি করছি বোটানিতে, কিন্তু তাঁর কাছে বসলেই একটা ইংরেজি ট্রানস্লেশান করতে হবে। মাসখানেক আগে একবার বাবু ভাইকে ডেকে এনে পাটিগণিতের অংক করতে দিলেন। সে অংক আবার পদ্যে লেখা—'অর্ধেক পঙ্কে তার, তেহাই সলিলে/ নবম ভাগের ভাগ শৈবালের জলে...' ইত্যাদি।

বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, দাদা, আমি পাশটাশ করে ইন্ডেন্টিংয়ের অফিস খুলেছি, এখন বসে বসে পাটিগণিত করব নাকি ?

তুই আবার পাশ করলি কবে ?

এমএ পাশ করলাম দুই বছর আগে।

বলিস কী ? কোন ক্লাস পেয়েছিস ?

আপনাকে নিয়ে তো মহামুসিবত দেখি।

দাদাকে নিয়ে মুসিবত শুরু হয়েছে অনেকদিন থেকেই। বছর তিন ধরে হঠাৎ করে তাঁর মাথায় গণ্ডগোল হতে শুরু করে। ব্যাপারটা সাময়িক। দিন দশেক থাকে আবার সেরে যায়, আবার হয়। মস্তিষ্ক বিকৃতির সময়টা বাড়িসুদ্ধ লোককে তিনি অস্থির করে রাখেন। এই সময় তিনি কিছুই খান না। ভাত মাখাবার সময় তিনি নাকি দেখতে পান একটা কালো রঙের বিড়াল থাবা দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাত মাখছে। কাজেই তিনি ভাত খেতে পারেন না। একজনকে তখন প্লেট উঁচু করে রাখতে হয়, যাতে বিড়ালে ভাত ছুঁতে না পারে। অন্য একজনকে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দিতে হয়। তুলে দেওয়া ভাতও বেশিক্ষণ খেতে পারেন না। দু'এক নলা মুখে তুলেই চেঁচাতে থাকেন—বিড়াল গা বেয়ে উঠছে, গা বেয়ে উঠছে। চেঁচাতে চেঁচাতে একসময় বমি করে ফেলেন। কী কষ্ট, কী কষ্ট!

অসুখের আগেও যে তাঁর সময় খুব ভালো যাচ্ছিল তা নয়। দিনের বেশির ভাগ সময় বসে থাকতেন বারান্দায়। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে সমস্ত দিন একা একা পড়ে থাকা নিশ্চয়ই কষ্টকর ব্যাপার। ঠিক এই বয়সে এই অবস্থায় একজন মানুষ কী ভাবে কে জানে! বসার ভঙ্গিটা অবশ্য অপেক্ষা করার ভঙ্গি। যেন কোনো একটা কিছুর জন্যে অপেক্ষা। সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যু। বারান্দার অন্ধকার কোনায় এককালের একজন প্রবল প্রতাপের মানুষ আধোজাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। চিত্রটি অস্বস্তিকর।

এখন রাত এগারোটা পঁচিশ। দাদার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ জগতের জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হতে বেশি দেরি নেই। তার বাঁ-চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। জীবনের সর্বশেষ যাত্রাটি সুসহ করা হলো না কেন কে জানে ?

আকবরের মা প্রকাণ্ড একটা গামলা ভর্তি ফুটন্ত পানি এনে হাজির করল। বড় চাচি অবাক হয়ে বললেন, গরম পানি কী জন্যে ?

আমি কী জানি ? আমারে আনতে কইছে, আনছি।

শাহানা, গরম পানির কথা কে বলেছে ?

আমি জানি না মামি।

কী যে এদের কাণ্ড। এই আকবরের মা, পানি নিয়ে যাও তো। কে বলেছে তোমাকে পানির কথা ?

বড় মিয়া কইছেন।

যাও নিয়ে যাও।

আকবরের মা পানি নিয়ে যেতে গিয়ে ইচ্ছে করেই অর্ধেক পানি ফেলে ঘর ভাসিয়ে দিল। আমি দাদার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বারান্দার একপ্রান্তে ক্রোধমূর্তিতে বড় চাচাকে দেখা গেল। তাঁর সামনে কালাম। কালামের মুখ পাংশুবর্ণ।

আজকে তোর চামড়া খুলে ফেলব। মানুষ মারা যাচ্ছে বাড়িতে আর তোর আত্মাকে না ঘুমালে শরীর খারাপ করবে ? লাট সাহেব আর কী।

আমাকে দেখে বড় চাচার কাজের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। কালামের গালে সপাও একটা চড় কষিয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মেঘস্বরে বললেন, তোকে তো বললাম সবাইকে খবর দিতে, দিয়েছিস ?

জি-না, দেই নাই। দেব।

একটা কথা কতবার বলা লাগে ?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি কখন ? নিজের চোখে অবস্থাটা দেখছিস না ?

চাচা, ডাক্তার আনতে কেউ গিয়েছে ?

রমিজ সাহেব গিয়েছেন। রমিজ এলে তুই গাড়ি নিয়ে যাবি। বাবুকে সঙ্গে নিস। সেই মাতবরটা কোথায় ?

উপরে আছে।

যা ডেকে নিয়ে আয়। অন্য বাড়ির লোকজন ছোটাছুটি করছে, আর নিজেদের কারও খোঁজ নেই। আফসোস!

অন্য বাড়ির—অর্থাৎ রমিজ সাহেব। লম্বা কালো মোটাসোটা একটা মানুষ যাদের দেখলেই মনে হয় এদের জন্ম হয়েছে অভাব-অনটনে থাকবার জন্যে। তিনি আমাদের ভাড়াটে। একতলার চারটা কামরা নিয়ে আজ সাত বছর ধরে আছেন। এই সাত বছর কোনো ভাড়া বাড়ানো হয়নি। কিন্তু তবু রমিজ সাহেব তাঁর নামমাত্র ভাড়াও নিয়মিত দিতে পারেন না। হাত কচলে চোখমুখে দীন একটা ভাব ফুটিয়ে আমার বাবাকে গিয়ে বলেন, রহমান সাহেব, একটা বড় বিপদে পড়েছি—আমার ছোট শালির এক ছেলে...

রমিজ সাহেবের বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার কারণগুলি সাধারণত বিচিত্র হয়ে থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য কারও থাকে না। বাবাকে এক সময় বিরক্ত হয়ে বলতে হয়, থাক থাক, একটু রেগুলার হবার চেষ্টা করবেন, বুঝলেন ?

জি স্যার। আর দেরি হবে না।

রেগুলার হবার কোনোরকম চেষ্টা অবশ্যি দেখা যায় না। তিনি নিজের অংশের একটা ঘর সাবলেট দিয়ে ফেলেন গোঁফওয়ালা বেঁটে একটা লোককে। আমাদের অবশ্য বলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিপদে পড়েছে, তাই দিন দশেক থাকবে। সেই লোক মাস দুয়েক থাকার পর আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বড় চাচা খুব রাগলেন। গলার রগ ফুলিয়ে বললেন, সব কটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও, ফাজলামি পেয়েছে। বেঁটে লোকটা খুব হম্বিতম্বি শুরু করল, বললেই হয়! দেশে আইন-আদালত নাই ? এভিকশন কি মুখের কথা ? এতে বড় চাচা আরও বেশি রেগে গেলেন এবং হুকুম দিলেন বাড়ির সব জিনিসপত্র বাইরে বের করে দিতে। আমাদের বাড়ির চাকর-বাকর অনেকদিন পর একটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটাবার উপক্রম দেখে উৎসাহের সঙ্গে আলনা, ট্রাঙ্ক, চেয়ার-টেবিল বাইরে এনে ফেলতে লাগল। আমি হইচই শুনে বারান্দায় এসে দেখি রমিজ সাহেবের স্ত্রী রক্তশূন্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। এই সময় বাবু ভাই এল কোত্থেকে এবং সে খুব অবাক হয়ে গেল। ঠান্ডা গলায় বলল, এইসব কী ?

আকবরের মা একগাল হেসে বলল, বড় ভাই, এরারে বাড়ি থাইক্যা বাইর কইরা দিতেছি।

রমিজ সাহেবের বড় মেয়েটা শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল। বাবু ভাই গম্ভীর মুখে বললেন, জিনিসপত্র সব ঘরে নিয়ে ঢুকাও। এইসব কী ?

বড় চাচা কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বাবু ভাই তার আগেই এগিয়ে এসে কালামের গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। কালাম হৃষ্টচিত্তে একটা মিটসেফ ঠেলাঠেলি করে আনছিল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বাবু ভাই যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে নিজের ঘরে চলে এলেন।

সেদিন আমি বেশ কিছু জিনিস প্রথমবারের মতন লক্ষ করলাম। যেমন—রমিজ সাহেবের চার মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। রমিজ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর চেহারা মোটামুটি ধরনের কিন্তু তাদের চারটি মেয়েই দেখতে চমৎকার। সবচেয়ে বড়টির (যার নাম নীলু) এমন মায়াকাড়া চেহারা। সবক'টি বোনের মধ্যে একটা অন্যরকম স্নিগ্ধভাব আছে। তাছাড়া বাচ্চাগুলি এমনিতেও শান্ত। চিৎকার চেঁচামেচি কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ল না।

এর কিছুদিন পরই রমিজ সাহেব হাসিমুখে এক প্যাকেট লাড্ডু হাতে দোতলায় এলেন। বড় মেয়েটি তাঁর পেছনে। ব্যাপার কী ? বড় মেয়ে যার নাম নীলু সে ক্লাস

পাটে বৃত্তি পেয়েছে। রমিজ সাহেব সবক'টি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললেন, ঘরের কাজকর্ম করে সময়ই পায় না। সময় পেলে স্যার আরও ভালো হতো।

বাবা অবাক হয়েই বললেন, কত টাকার বৃত্তি ?

মাসে চল্লিশ টাকা স্যার। আর বই কিনা বাবদ দুইশ টাকা।

বাহ্, বেশ তো।

মেয়েটার জন্যে দোয়া করবেন স্যার।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

দোতলা থেকে তারা রওনা হলো তিনতলায়। এই সময় দেখা হলো আমার সঙ্গে।

এই যে ভাই সাহেব, আমার এই মেয়েটা...

শুনেছি, বাবাকে বলছিলেন। আমি বারান্দায় ছিলাম। খুব ভালো খবর।

নীলু, কদমবুসি কর টগর সাহেবকে।

আমি আঁতকে উঠলাম, আরে না না।

না না কী ? মুরুব্বির দোয়া ছাড়া কিছু হয় নাকি ? এ্যাঁ ?

রমিজ সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। আজ আর তিনি দীন ভাড়াটে নন। আজ একজন অহঙ্কারী বাবা। আমি বললাম, তোমার নাম কী ?

নীলু।

রমিজ সাহেব গর্জে উঠলেন, ভালো নাম বল।

নীলাঞ্জনা।

বাহ্, সুন্দর নাম।

রমিজ সাহেব হৃষ্টচিত্তে বললেন, ওর মা'র রাখা নাম। আমি নাম দিয়েছিলাম জোবেদা খানম, সেটা তার মায়ের পছন্দ হলো না। নামটা নাকি পুরনো। আরে ভাই আমি নিজেও তো পুরনো। হা-হা-হা!

বাবা মেয়েটির জন্যে একটা পার্কার কলম কিনে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কলমের প্রসঙ্গ রমিজ সাহেব সময়ে অসময়ে কতবার যে তোলেন তার ঠিক নেই। যেমন দিন সাতেক পর রমিজ সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে দেখা হলো। তিনি এক গাল হেসে বললেন, কাণ্ড শুনেছেন নাকি ভাই ?

কী কাণ্ড ?

পার্কার কলমটা যে দিয়েছেন আপনারা, নীলু স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। ক্লাশ ছুটি হওয়ার পর আর পায় না। মেয়ে তো কাঁদতে কাঁদতে বাসায় আসছে। আমি দিলাম এক চড়। মেজাজ কি ঠিক থাকে, বলেন আপনি ? শেষে তার ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল। দেখেন অবস্থা। হা-হা-হা!

নীলুর সঙ্গে আমার খানিকটা খাতিরও হলো অন্য একটি কারণে। একদিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। একা নয়, সঙ্গে আরও কয়েকটি মেয়ে। স্কুল ড্রেস পরা থাকলে যা হয়—সবক'টাকে অবিকল এক রকম লাগে। তবুও এর মধ্যে নীলুকে চিনতে পারলাম।

এ্যাই নীলু!

নীলু হকচকিয়ে এগিয়ে এল।

যাচ্ছ কোথায়? এ লাইনে তো মিরপুরের বাস যায়।

কল্যাণপুর যাচ্ছি। আমাদের এক বন্ধুর আজ গায়েহলুদ, আমাদের যেতে বলেছে।

ঐ ওরাও যাচ্ছে তোমার সাথে?

জি।

উঠে পড় গাড়িতে। পৌঁছে দেই। যে ভিড়, এখন আর বাসে উঠতে পারবে না।

নীলু ইতস্তত করতে লাগল। যেন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় মস্ত অপরাধ হয়েছে। অন্য মেয়েগুলি অবশ্যি খুব হৈচৈ করে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারা খুব খুশি।

সারা দিন থাকবে তোমরা?

নীলু জবাব দিল না। কালোমতো একটি মেয়ে হাসিমুখে বলল, আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সবাই বাসায় বলে এসেছি। শুধু নীলু বলে আসেনি।

কেন নীলু, বলে আসনি কেন?

নীলু তারও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। কালো মেয়েটি বলল, নীলু তার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছে। দু'দিন ধরে ওদের মধ্যে কথা বন্ধ।

তাই বুঝি?

সবক'টি মেয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। ব্যাকভিউ মিররে দেখলাম নীলুর চোখে জল এসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর নীলুদের বাসায় সত্যি সত্যি দারুণ অবস্থা। রমিজ সাহেব কাঁদো কাঁদো হয়ে বাবু ভাইকে গিয়ে বললেন, ভাইসাব শুনেছেন, আমার মেয়েটা কিডন্যাপ হয়েছে।

কী বলছেন এইসব?

জি ভাইসাব, সত্যি কথাই বলছি।

রমিজ সাহেব ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, এসে পড়বে, হয়তো বন্ধুর বাড়িটাড়ি গিয়েছে।

আমার মেয়ে না বলে কোথাও যাবে না টগর সাহেব।

নীলু সে-রাতে বাড়ি এসে পৌঁছে রাত পৌনে আটটায়। ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে মুরুব্বি কিসিমের এক ভদ্রলোক এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের নিচতলায় প্রলয়ের মতো হয়ে গেল। রমিজ সাহেব কেঁদে গিয়ে পড়লেন আমার বড় চাচার কাছে। বড় চাচা একটা কাজ পেয়ে লাফঝাঁপ দিতে শুরু করলেন— এই থানায় টেলিফোন করছেন, ঐ করছেন হাসপাতালে। একবার শুনলাম অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে কাকে যেন বলছেন, আরে ভাই, বলতে গেলে বাসার সামনে থেকে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। এই দেশে বাস করা অসম্ভব।

আমি সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলাম গাড়ি এসে ঢুকেছে। ডাক্তার চলে এসেছে। কোনজন এসেছে কে জানে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তার থাকেন যাকে দেখেই যক্ষ্মা রোগী বলে ভ্রম হয়। দাদার জন্যে তিনি হচ্ছেন ফুলটাইম ডাক্তার। তাঁর নাম প্রদ্যুৎ বাবু বা এই ধরনের কিছু। এঁর বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি এলোপ্যাথির পাশাপাশি টোটকা ওষুধ দেন। বাবু ভাইয়ের একবার টনসিল ফুলে বিশ্রী অবস্থা হলো। কিছুই গিলতে পারেন না। একশ' দুই জ্বর গায়ে। প্রদ্যুৎ বাবু এসেই গম্ভীর মুখে বললেন, বানর লাঠি গাছের ফল পিষে গলায় প্রলেপ দিতে। এটাই নাকি মহৌষধ।

বাবু ভাই দারুণ রেগে গেলেন। চিঁচিঁ করে বললেন, শালা মালাউন, কবিরাজি শুরু করেছে।

প্রদ্যুৎ বাবু (কিংবা পীযূষ বাবু) কিন্তু সত্যি সত্যি বানরলাঠি গাছের ফল জোগাড় করে পুলটিশ লাগিয়ে ছাড়লেন। অসুখ আরাম হলো। যদিও বাবু ভাইয়ের ধারণা এমনিতেই সারত। শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের মেকানিজমেই সেরেছে।

যাই হোক, প্রদ্যুৎ বাবুর আমাদের বাড়িতে মোটামুটি একটা সম্মানের আসন আছে। তিনি বাড়ি এলেই তাঁর জন্যে দুধ ছাড়া চা হয়, সন্দেশ আনানো হয় এবং বাবা নিজে নেমে এসে কথাবার্তা বলেন।

এই যে ডাক্তার, যাওয়ার আগে আমার প্রেসারটা দেখে যাবে।

বিনা ফিতে প্রেসার দেখা ছেড়ে দিয়েছি রহমান সাহেব। মেডিকেল এথিকসের ব্যাপার আছে। হা-হা-হা!

আজ দেখলাম প্রদ্যুৎ বাবু ছাড়াও অন্য একজন ডাক্তার নামলেন। সেই ভদ্রলোকের চোখেমুখে সীমাহীন বিরক্তি, যার মানে তিনি একজন বড় ডাক্তার। পিজির কিংবা মেডিকেলের প্রফেসর বা এসোসিয়েট প্রফেসর। ভদ্রলোকের বিরক্তি দেখি ক্রমেই বাড়ছে। গাড়ি থেকে নেমেই হাতঘড়ি দেখলেন। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেখি ভদ্রলোক যে কতক্ষণ থাকেন তার মাঝে মোট ক'বার হাতঘড়ি দেখেন। কিন্তু এখন

এসব এক্সপেরিমেন্টের ভালো সময় নয়। গাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের খোঁজে যেতে হবে। যে দুই ফুপু ঢাকায় আছেন তাঁদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র নীলু ডাকল, টগর ভাই।

এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। আচমকা কথা বলে চমকে দেয়।

দাদার অবস্থা কি বেশি খারাপ ?

মনে হয়। রাতের মধ্যেই কাম সাফ হবার সম্ভাবনা।

টগর ভাই, আপনি সবসময় এইভাবে কথা বলেন কেন ?

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীলু হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। মেয়েটা চোখের সামনে বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় হচ্ছে এবং সুন্দর হচ্ছে। মেয়েরা লতানো লাউগাছের চারার মতো। এই দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একরত্তি একটা চারা, কয়েকটা দিন অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ চোখে পড়লেই দেখা যাবে নিজেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সতেজ বলবান একটি জীবন।

আচ্ছা তুই এখন কী পড়িস যেন ?

[নীলুকে আমি 'তুই' বলি। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হয়। আমার সঙ্গে কথা বলার একটা গোপন আগ্রহ এর আছে।]

সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। বখশি বাজার কলেজে।

সেকেন্ড ইয়ারে আবার কবে উঠলি ?

নীলু সে কথার জবাব না দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, আমাকে তুই তুই করে বলেন কেন ?

সেদিনকার পুচকে মেয়ে, তোকে আবার আপনি আপনি বলতে হবে নাকি ?

আমি দোতলায় চলে গেলাম। বাবু ভাইয়ের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বারান্দায় আলো নেই। তার ঘরও অন্ধকার। আমি ঘরে ঢুকে সুইচ টিপলাম, আলো জ্বলল না। বাবু ভাইয়ের গলা শোনা গেল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড় টগর।

কী ব্যাপার ? লাইট ফিউজ নাকি ?

উঁহুঁ, বাল্ব খুলে ফেলেছি। ঘর অন্ধকার দেখলে কেউ আর খোঁজ করবে না। মনে করবে কাজেকর্মেই আছি।

বারান্দাটাও খুলে ফেলেছ নাকি ?

হুঁ। ঝামেলা ভালো লাগে না। রাতদুপুরে এর বাড়ি যাও, ওর বাড়ি যাও। বাল্ব খুলে জমাট অন্ধকার করে দিলাম।

বাবু ভাই সিগারেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, মরবার সময় হয়েছে মরবে, এত হৈচৈ কী জন্যে ?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবু ভাই বলল, শুয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম।

কী সব কথা ?

যেমন ধর, মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে জানে একদিন তাকে মরতে হবে। অন্য কোনো প্রাণী তা জানে না।

বুঝলে কী করে অন্য প্রাণীরা জানে না ? কথা বলেছ তাদের সাথে ?

কথা না বলেও বোঝা যায়। অন্য কোনো প্রাণী মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নেয় না। মানুষ নেয়।

আমিও সিগারেট ধরালাম। বাবু ভাই বলল, বুড়োর অবস্থা কী ?

ভালো না।

মৃত্যু ব্যাপারটা কুৎসিত। একসেপ্ট করা যায় না।

যাবে না কী জন্যে ? কুৎসিত জিনিস কি আমরা একসেপ্ট করি না ?

সবসময় করি না।

মৃত্যু স্বীকার করে নেই কিন্তু একসেপ্ট করি না।

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো—বাবু ভাই এক ফাঁকে তার ট্রাঙ্ক খুলে ঐটি বের করে দু-এক ঢোক খেয়েছে। বাবু ভাইয়ের এই অভ্যেসটি নতুন। যেভাবে তা প্রথম শুরু হয়েছিল তাতে আমার ধারণা হয়েছিল অভ্যেসটি স্থায়ী হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে স্থায়ী হয়েছে। আমি মৃদুস্বরে বললাম, তুমি কিছু খেয়েছ নাকি ?

হুঁ। বেশি না। আধাগ্লাসও হবে না। মৃত্যুর মতো একটি কুৎসিত ব্যাপার একসেপ্ট করতে হলে নার্ভগুলিকে আংশিক অকেজো করে দিতে হয়। তুই এক ঢোক খাবি নাকি ? ভালো জিনিস, ব্ল্যাক টাওয়ার। খা। জার্মান জিনিস। চমৎকার।

এখন না।

বাবু ভাই বিছানা থেকে নেমে ট্রাঙ্ক খুলল। আমি বললাম, আরও খাচ্ছ নাকি ?

জাস্ট এ লিটল।

একটা কেলেঙ্কারি করবে শেষে।

তুই পাগল হয়েছিস ? কেউ টের পাবে না।

বড় চাচার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। এবাড়ির কারও পায়ের শব্দ আমি চিনি না, কিন্তু বড় চাচার পায়ের শব্দ চিনি। তিনি কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন বলে মনে হয়। থপথপ করে বানর হাঁটার মতো শব্দ হয়।

বড় চাচা বারান্দার মাঝামাঝি গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, লাইট কোথায় গেল ? আর বাল্বটা ফিউজ হলো কখন ? এই এই। টগর টগর।

বড় চাচা আমাদের ঘরেও একবার উঁকি দিলেন। তারপর আবার বানরের মতো থপথপ শব্দ করে তেতলায় উঠে গেলেন। নেমে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বাল্ব নিয়ে

এসেছেন বোধহয়। কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় একশ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল। বড় চাচা আবার থপথপ শব্দ করে নিচে নেমে যেতেই বাবু ভাই বাল্বটা খুলে নিয়ে এল।

ব্ল্যাক টাওয়ার আমিও খানিকটা চেখে দেখলাম। জিনিসটা মন্দ না। কেমন যেন পচা নারকেলের পানির মতো। রাত বাজে দুটা দশ। বাবু ভাই মৃদুস্বরে বলল, বুড়া তাহলে মরেই যাচ্ছে ?

তা বোধহয় যাচ্ছে।

দুঃখের ব্যাপার। বুড়োর সাথে আমার খাতির ছিল।

তোমার একার না, সবারই খাতির ছিল।

হুঁ। খুব মাই ডিয়ার টাইপ ছিলেন।

কথাটা ঠিক না। দাদা মাই ডিয়ার টাইপ নন। তিনি একজন কঠিন প্রকৃতির মানুষ। তবে বাবু ভাইয়ের সঙ্গে তার খাতির ছিল। সুস্থ থাকাকালীন রোজ একবার করে খোঁজ করতেন—বাবু আছে ? বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বলতেন, বুড়োর যন্ত্রণায় শান্তিতে থাকা মুশকিল। তা সম্রাট শাহজাহান আমার কাছে কী চায়।

দাদাকে আড়ালে আমরা সম্রাট শাহজাহান এবং শাহানাকে জাহানারা ডাকি। দাদাও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির ভগ্ন ছবি হয়ে সারা দুপুর জাহানারার সঙ্গে গুজগুজ করেন। অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।

বাবু ভাই বোতলের আরও খানিকটা গলায় ঢালল। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, বাবু ভাই।

হুঁ।

তোমার কি মনে হয় মৃত্যুর পর কিছু আছে ?

খুব সম্ভব আছে। থাকারই কথা।

বাবু ভাই ঢকঢক করে গ্লাসে আরও খানিকটা ঢালল।

বাবু ভাই, আর খেয়ো না। তুমি বেশি খাচ্ছ।

বেশি কোথায় দেখলি ?

শেষে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

কিছুই করব না।

বড় চাচার গলার শব্দ শোনা গেল, আরে এই বাল্বটা কোথায় গেল ? ব্যাপার কী ?

বাবু ভাই খিকখিক করে হাসতে লাগল।

কে হাসে, এই কে হাসে ? বাবু, বাবু ? এই টগর।

আমার মনে হলো, বড় চাচা খানিকটা ভয় পেয়েছেন। গলার স্বর কেমন কাঁপা কাঁপা।

কে হাসছিল ? এই এই। কালাম। এই কালাম।

বড় চাচা দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। তিনি সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছেন।

মগবাজারের ফুপু এলেন সবার আগে। নিজের গাড়ি আনলেন না। তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হলো। তাঁর গাড়ির কার্বুরেটরে নাকি কী একটা প্রবলেম হয়েছে। আমাদের বাড়িতে আসতে হলেই তার গাড়ির কার্বুরেটরে প্রবলেম হয় কিংবা ব্রেক সু লুজ থাকে। বাবু ভাইয়ের ধারণা সমস্ত ঢাকা শহরে মগবাজারের ফুপুর চেয়ে কৃপণ এবং ধূর্ত মহিলা এখনো জন্মায়নি এবং ভবিষ্যতেও জন্মানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। তার বাড়িতে বেড়াতে গেলে তিনি চমৎকার জাপানি কফি কাপে চা দেন। উদ্দেশ্য একটিই— কাপগুলি ছোট। চায়ের সঙ্গে কখনো কিছু থাকে না। আমরা কেউ দুপুরের দিকে তার বাসায় গেলে তিনি বিরক্ত স্বরে বলেন, খবর দিয়ে আসতে পারিস না ? ভাত চড়িয়ে ফেলেছে।

ভাত খাব না।

দুপুরে আবার ভাত খাবি নাকি ? বস খানিকক্ষণ, আবার ভাত চড়াবে। কতক্ষণ আর লাগবে। রাইস কুকার আছে।

না ফুপু, বসতে পারব না।

শুধু মুখে যাবি ? সময় হাতে নিয়ে আসতে পারিস না ? সবসময় তাড়া, সবসময় তাড়া। কী এমন রাজকার্য তোদের ?

মগবাজারের ফুপুকে আমরা কেউ সহ্য করতে পারি না। বাবু ভাই প্রায় খোলাখুলি এমনসব অপমানজনক কথাবার্তা বলে যে অন্যকেউ হলে বড় রকমের ঝামেলা বেঁধে যেত। মগবাজারের ফুপু অসম্ভব ধূর্ত বলেই কোনো কথা গায়ে মাখেন না এবং এমন ভাব করেন যে কিছু বুঝতে পারেননি।

গত বছর শীতের সময় তিনি হঠাৎ এসে বললেন, ফরিদের (তার ছেলে) গ্র্যাজুয়েশন হবে সামারে, তাকে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অ্যাটেন্ড করতে যেতে হবে। বাবু ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, বলেন কী ফুপু, ফরিদ ভাই তো দেশে তিন ধাক্কায়ও আইএ পাস করতে পারল না। ঐখানে গিয়ে একেবারে এমএ পাস করে ফেলল ?

দেশে কি পড়াশোনা হয় ? বিদেশে পড়াশোনার একটা অ্যাটমোসফিয়ার আছে। টিচাররা যত্ন নেয়।

এখানের ছেলেমেয়ে যেগুলি পাস করে সেগুলি কীভাবে করে ?

কী জানি কীভাবে করে ? নকল ছাড়া তো আমি কিছু জানি না।

ফুপু হাই তুলেন। কথা বন্ধ করতে চান। বাবু ভাইও ছাড়বার পাত্র না। সে পেঁচাবেই।

ফরিদ ভাই তো মন্দ দেখায় নাই। এইখানে ছিল আইএ ফেল, বিলেতে গিয়ে দুই বছরে একেবারে এমএ।

ফুপু গম্ভীর হয়ে বললেন, ও দেশে তো আর আমাদের মতো নিয়ম না যে, দুই বছর পড়তে হবে আইএ, দুই বছর পড়তে হবে বিএ। ওদের দেশে অন্য ব্যবস্থা।

ফরিদ ভাই দেশে আসবে ?

আসবে। একটা মেয়েটেয়ে দেখ দেখি। ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে নাকি সুন্দর মেয়ে আছে ?

মগবাজারের ফুপুর সঙ্গে কথা শুরু হলে তা একসময় না একসময় সুন্দর মেয়েতে এসে থেমে যাবে। গত চার বছর ধরে তিনি সুন্দর মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোনোটিই তার পছন্দ হচ্ছে না। হয় নাকটা প্রয়োজনের তুলনায় ছোট কিংবা ঠোঁট একটু মোটা। সবকিছুই যখন ঠিক থাকে তখন দেখা যায় মেয়েটা বেঁটে। বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়ে প্রসঙ্গে ফুপুর সার্ভে হচ্ছে—এদেশে সুন্দরী মেয়ে নেই। যেক'টি আছে তারা হয় বেঁটে, নয় শ্বেতীরোগগ্রস্তা।

আমার মনে হচ্ছে বাবু ভাইয়ের অল্পমাত্রায় নেশা হয়েছে। সে গুন গুন করে গাইছে—

Pretty girls are every-where
and if you call me I will be there...

কিংস্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান। যে বাড়িতে একজন বৃদ্ধ মানুষ মারা যাচ্ছে সে বাড়ির ছেলে ঘর অন্ধকার করে চুক চুক ব্ল্যাক টাওয়ার খাচ্ছে এবং কিংস্টোন ট্রায়োর প্রেমের গান গাইছে—ব্যাপারটা দারুণ রিপালসিভ। তারচেয়ে বড় কথা বড় ফুপু এসে পৌঁছেছেন। তিনি ব্যাপারটা ধরতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে। মানুষকে অপদস্থ করার মধ্যে তিনি একধরনের আনন্দ পান।

ক্লাস সেভেনে আমি যখন ফেল করলাম তখনকার কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার আশপাশে যখনই অপরিচিত কেউ থাকত, বড় ফুপু কথাবার্তা পড়াশোনার দিকে টেনে এনে একসময় বলতেন—এই দেখেন না, টগরটা ক্লাস সেভেন পাস করতে পারল না। অংকে পেয়েছে বারো। চিন্তা করেন অবস্থাটা। ক্লাস সেভেনের অংকে যোগ-বিয়োগ ছাড়া কিছু আছে ?

আমি ফুপুকে সামলাবার জন্যে, যাতে হুট করে বাবু ভাইয়ের সামনে না পড়ে যান, নিচে নিয়ে গেলাম। ফুপু আমাকে বারান্দার অন্ধকার কোণের দিকে নিয়ে গেলেন।

বাবার শরীর হঠাৎ করে এত খারাপ হলো কী জন্যে ? পরশু দেখে গেলাম ভালো মানুষ।

বয়স হয়েছে।

বয়স-টয়স কিছু না। এ বাড়িতে বাবার যত্ন হয় না। এই বাড়িতে চাকর-বাকরের যে যত্ন হয় বাবার সে যত্নটাও হয় না।

হবে না কেন ?

কেন সেটা আমি বলব কী করে ? তোরা থাকিস তোরা বুঝবি।

ফুপু, যত্ন ঠিকই হয়। শাহানা নিজে ভাত খাইয়ে দেয়।

কেন, শাহানা খাওয়াবে কেন ? শাহানা কে ? মেয়ের ঘরের নাতনি। লতায়পাতায় সম্পর্ক। ভাবিরা কেন খাওয়ায় না ? আমি সবই বুঝি। কিছু বলি না। যখন বলব ঠিকই বলব। কাউকে ছাড়ব না। তোরা আমাকে ভেবেছিস কী ?

ফুপু, আপনি দাদাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন না কেন ? মেয়ের কাছে যত্ন ভালো হবে।

তাই রাখব। এই যাত্রা রক্ষা হলে নিজের কাছে নিয়ে যাব।

সেটাই ভালো হবে।

ভালো হোক মন্দ হোক তাই করব। এই বাড়িতে বাবার কোনো যত্ন হয় ? বড় ভাবিকে দেখলাম চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্চর্য! একটা মানুষ মারা যাচ্ছে—এর মধ্যে মানুষ ঘুমায় কী করে ?

ফুপু, আপনি গিয়ে দাদার পাশে বসেন।

এখন আর বসাবসি! রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আর ছোট ভাবিইবা কোথায় ? নাক ডাকাচ্ছে বোধহয়।

ছোট চাচি তো চিটাগাং গেছেন।

কবে গেল ?

গতকাল। টেলিফোন করা হয়েছে, এসে পড়বেন।

দেখ কাণ্ড, এত বড় একজন রোগী আর বাড়ির বউ ফট করে চিটাগাং চলে গেল।

কাল দাদার শরীর ভালোই ছিল, হাঁটাহাঁটিও করেছেন।

চিটাগাং কী জন্যে গিয়েছে জানিস কিছু ?

উনার ভাইয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে, মেয়ে দেখতে গিয়েছেন।

ফুপু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ফরিদের জন্যে একটা মেয়ে দেখলাম আজ সকালে। হাইকোর্টের জাস্টিসের মেয়ে।

কেমন দেখলেন ?

মন্দ না।

নওয়াব ফ্যামিলির একটা দেখেছিলেন, সেটার কী হলো ? খাজা ওয়াসিউদ্দিন না গিয়াসউদ্দিনের নাতনি।

ফুপু তার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বললেন, এইখানে একটা মেয়ে দেখলাম হলুদ রঙের শাড়ি পরা। বাবার ঘরে বসে আছে। মেয়েটা কে ?

নীলু।

নীলু কে ?

আমাদের ভাড়াটের মেয়ে। আগেও তো দেখেছেন।

কই, মনে পড়ছে না তো। মেয়েটা দেখতে মন্দ না।

হুঁ।

পড়াশোনা কী করে ?

খুব ভালো ছাত্রী। চারটা লেটার পেয়েছে মেট্রিকে।

তাই নাকি ? কোন কলেজে আছে ?

বখশিবাজার কলেজে পড়ে।

ডাক তো দেখি মেয়েটাকে—কথা বলি।

কী কথা বলবে ? তুমি বরং দাদার ঘরে গিয়ে বসো।

তুই গিয়ে বল না—ফুপু ডাকছে।

এখানে আসতে বলব ?

হুঁ। চেয়ার দিয়ে যা, বসি এখানে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা আছে।

চেয়ারে বসতে বসতে বসতে ফুপু বললেন, প্রেম ফ্রেম করে না তো আবার ?

জানি না করে কি না।

করে নির্ঘাৎ, গরিবের মেয়েগুলি হাড়বজ্জাত হয়।

ফুপুকে দেখে মনে হলো বাবার প্রসঙ্গ আর কিছুই তার মনে নেই।

নীলুকে পাওয়া গেল না। রমিজ সাহেব শুধু বসে আছেন, সারা রাতই সম্ভবত বসে থাকবেন। আমাকে বললেন, একটু মনে হচ্ছে বেটার।

আমার চোখে বেটার মনে হলো না। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। বেশ বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। প্রদ্যুৎ বাবু বললেন, অক্সিজেন দিতে হবে। একটা অক্সিজেন ইউনিটের ব্যবস্থা করা দরকার। নাকি হাসপাতালে নিতে চান ?

বড় চাচা আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ উত্তরটা শুনতে চান আমার মুখ থেকে। তার নিজের কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি চুপ করে রইলাম।

বড় চাচা বললেন, তোর বাবাকে বরং জিজ্ঞেস করে আসি, কী বলিস ?

জিজ্ঞেস করে আসেন। ছোট চাচা কোথায় ?

এইখানেই তো ছিল।

বড় চাচা উঠে গেলেন। আমি দেখলাম শাহানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শাহানার একটা অভ্যাস—সে পুরুষদের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে পারে। আমি তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, নীলু কোথায় ?

চা আনতে গেছে।

চা হচ্ছে নাকি ?

হুঁ। সবাই রাত জাগবে, চা ছাড়া হবে কীভাবে ?

চা হলে ভালোই হয়।

শাহানা শুকনো গলায় বলল, নীলুকে খোঁজ করছিস কেন ?

আমি খোঁজ করছি না। ফুপু ডাকছেন।

কেন ?

আমি কী করে বলব ?

আমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। শাহানা এল আমার পিছু পিছু।

সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই শাহানা বলল, আস্তে হাঁট, আমি দোতলায় যাব। একা একা ভয় লাগে।

তোমার তো ভয়টয় নাই বলেই জানতাম।

শাহানা মৃদুস্বরে বলল, ছোট মামা বলছিলেন বারান্দার বাতি নাকি বারবার নিভে যাচ্ছে।

তাই কি ?

হুঁ। তাছাড়া ছোট মামা সিঁড়ির কাছে কালো কী একটা দেখেছেন।

কী ? ভূত ?

হতে পারে। মানুষের মৃত্যুর সময় অনেক অশরীরী জিনিস ভিড় করে।

আমি শব্দ করে হাসলাম।

বারান্দা অন্ধকার। আলো থেকে আসবার জন্যেই হয়তো কিছুই চোখে পড়ছে না। শাহানা বলল, বড় ভয় লাগছে। তার কথা শেষ হবার আগেই কাছে কোথাও একটা শব্দ হলো। শাহানা ঝাপ্টে ধরল আমাকে। তার গায়ে একটি হালকা মিষ্টি গন্ধ যা শুধু মেয়েদের গায়েই থাকে।

আমি চাপা গলায় বললাম, বাতাসে দরজা নড়ছে, ভূতটুত কিছু না।

শাহানা সংবিৎ পেয়ে ঝট করে সরে গেল। হুড়মুড় করে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের চৌকাঠটি উঁচু, প্রচণ্ড একটি হোঁচট খেল সেখানে। আকবরের মা ছুটে এল রান্নাঘর থেকে, কী হইছে ? কী হইছে গো ?

শাহানা এরকম করল কেন কে জানে ? আমি অচেনা অজানা কেউ না। ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে কিছুই যায় আসে না।

মেয়েরা প্রায় সময়ই মনগড়া অনেক ব্যাপারে কষ্ট পেয়ে অদ্ভুত আচরণ করে। শাহানা সে-রকম মেয়ে নয়। সে খুব শক্ত ধরনের মেয়ে।

আমার ফুপু (মেজ) যখন মারা যান তখন শাহানার বয়স মাত্র সাত। মেজ ফুপা সে বছরই আবার বিয়ে করেন। বাবার বিয়ে মেয়েদের দেখতে নেই, কাজেই শাহানা সাময়িকভাবে মামা বাড়ি থাকতে এসে স্থায়ী হয়ে যায়। মা মরা একটি মেয়েকে আদর সোহাগ দেখাবার জন্যে এ বাড়ির সবাই ব্যস্ত ছিল।

ছোটবেলায় শাহানার যত্ন দেখে আমি এবং বাবু ভাই দারুণ ঈর্ষা বোধ করতাম।

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ সম্ভবত কষ্ট পাবার জন্যেই জন্মায়। টাকাপয়সার কষ্ট নয়, মানসিক কষ্ট। শাহানা সেইরকম একটি মেয়ে। তার বিয়ে হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। ছেলে মেডিকেল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। জামিল হাসান। দারুণ ফুর্তিবাজ ছেলে। রাতদিন কোনো না কোনো বদ মতলব তার মাথায় ঘুরছে। একবার একটা মানুষের খুলি কালো সুতায় ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। বড় চাচা কী একটা কাজে ঘরে ঢুকে ভিরমি খেলেন, মুখ দিয়ে ফেনা

মুক্তিযুদ্ধের সেই মাসগুলি জামিল ভাইকে নিয়ে চমৎকার কাটছিল, কিন্তু একদিন জামিল ভাই আর আসে না। কী একটা বই আনতে টিকাটুলি গিয়েছিল, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবে এরকম কথা—কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া গেল না। একটি লোক দিনেদুপুরে হারিয়ে গেল।

জামিল ভাইয়ের জন্যে দীর্ঘ ন'বছর অপেক্ষা করলাম আমরা। ন'বছর পর আবার শাহানার বিয়ে দেওয়া হলো। এবারের ছেলেটি গম্ভীর প্রকৃতির। নিচুস্বরে কথা বলে। বইপত্রের পোকা। দাদার ছেলেটাকে অত্যন্ত পছন্দ হলো। কিন্তু ছেলেটির হয়তো পছন্দ হলো না শাহানাকে কিংবা অন্যকিছু। সে চলে গেল সুইডেনে, সেখান থেকে নেদারল্যান্ডে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ চিঠি আসত তার। যোগাযোগ বলতে এই পর্যন্ত। সেও আজ প্রায় চার বছর হতে চলল। শাহানা অত্যন্ত শক্ত ধাঁচের মেয়ে। সে কেঁদে বুক ভাসাল না। কিছুই করল না। এমনভাবে থাকতে লাগল যেন এটাই স্বাভাবিক। আজ এরকম করল কেন ? ভয় পেয়ে যদি আমাকে ঝাপ্টে ধরে তাতে এতটা বিচলিত হবার কী আছে ? আমি বারান্দার অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবু ভাইয়ের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বাবু ভাই ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছে। ঘরে মিষ্টি গন্ধ। অন্ধকারে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। আমি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে ডাকলাম।

বাবু ভাই!

হুঁ।

সবটা শেষ করে ফেলেছ নাকি ?

হুঁ।

কী সর্বনাশ!

সর্বনাশের কী আছে ?

তুমি আজ একটা কেলেঙ্কারি করবে বাবু ভাই।

কেলেঙ্কারির কিছু নাই। তুই বস, তোর সাথে কথা আছে।

আমি বসলাম। বাবু ভাই শান্তস্বরে বলল, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার ?

মিনিট দশেক আগে এই ঘরে একজন কেউ এসেছিল। সামনের চেয়ারটায় বসেছিল।

কে সে ?

চিনি না। বুড়োমতো লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

অন্ধকারে তুমি খোঁচা খোঁচা দেখলে কীভাবে ?

কীভাবে দেখলাম জানি না, তবে দেখলাম।

কতক্ষণ ছিল সে লোক ?

খুব অল্প সময়।

আমি সিগারেট ধরিয়ে হালকা স্বরে বললাম, তোমার নেশা হয়েছে। আর খেয়ো না।

নেশাটেশা হয়নি। এ লোকটাকে দেখার পরই বোতল শেষ করেছি। এর আগে যা খেয়েছি তাতে একটা চড়ুই পাখিরও কিছু হয় না।

মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ ?

না, ভয় পাইনি।

লোকটা কি চোখের সামনে মিলিয়ে গেল ?

বাবু ভাই কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, চা খাবে নাকি ? চা হচ্ছে।

খেতে পারি।

বাল্বটা লাগিয়ে ফেলব বাবু ভাই ?

বাল্ব লাগাবি কেন ?

তুমি যেমন ভূতটুত দেখা শুরু করেছ।

বাবু ভাই হেসে উঠল।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে যেতে আমার নিজের একটু গা ছমছম করতে লাগল। মানুষের অদিমতম সঙ্গী ভয়, সুযোগ পেলেই কোনো এক অন্ধকার গুহা থেকে উঠে আসে। আমাদের সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে দেয়। বারান্দায় পা রাখতেই বড় চাচা চেঁচিয়ে উঠলেন, কে কে ?

চাচা, আমি।

বারান্দার বাতি গেল কোথায় ? একটু আগে বাল্ব দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

একটা বাল্ব এনে লাগা তো।

লাগাচ্ছি।

বড় চাচা সিঁড়ি দিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নেমে গেলেন। বড় চাচা ভয় পাচ্ছেন। কিসের ভয়?

রান্নাঘরে নীলুকে পাওয়া গেল। বিরাট এক কেতলি চা বানিয়ে চিনি ঢালছে।

নীলু।

জি।

মগবাজারের ফুপু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। একতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন, মোটা মতো।

জি, আমি চিনি।

সে চায়ের কেতলি হাতে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, আকবরের মা'র কাছে দাও না, নিয়ে যাবে।

আকবরের মা নিচে গেছে। আমি নিতে পারব।

বারান্দা খুব অন্ধকার, তাছাড়া ভূত দেখা গেছে। বাবু ভাই একটা ভূত দেখেছে, বুড়োমতো একটা লোক—খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

নীলু কিছু বলল না। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম তার চোখ ভেজা।

কী হয়েছে রে?

কিছু হয় নাই।

চোখে পানি। কেউ কিছু বলেছে নাকি?

জি-না। কে আবার কী বলবে?

হঠাৎ আমার মনে হলো মগবাজারের ফুপুর যদি নীলুকে পছন্দ হয় তাহলে মন্দ হয় না। ফরিদ ভাই ছেলেটি ভালো। নীলু সুখীই হবে। তাছাড়া সুখী হবার প্রধান উপকরণ হচ্ছে টাকাপয়সা যা ফুপুদের প্রচুর আছে।

নীলু বলল, ফুপু আমাকে কী জন্যে ডাকছেন জানেন?

জানি। তাঁর ছেলের জন্যে মেয়ে দেখছেন। সুন্দরী মেয়ে হলেই তিনি কথাবার্তা বলে দেখেন চলবে কি না।

নীলু শান্তস্বরে বলল, আমার মতো গরিব মেয়েদের আপনার ফুপু দেখবেন ঠিকই কিন্তু বিয়ে দেওয়ার সময় বিয়ে দেবেন তাদের মতো একটা বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে।

আমি বেশ অবাক হলাম। কলেজে উঠে মেয়েটি কথা বলতে শিখেছে।

নীলু চায়ের কেতলি হাতে নিচে নেমে গেল।

দাদার ঘরে ঢুকেই একটা হালকা অথচ তীক্ষ্ণ গন্ধ পাওয়া গেল। মৃত্যুর গন্ধ। আমার ভুল হবার কথা নয়। মা যে-রাতে মারা যান সে-রাতে আমি মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিলাম। তিনি তখন দিব্যি ভালো মানুষ। অসুখ সেরে গেছে। দুপুরবেলা বারান্দায় খানিকক্ষণ বসেও ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা খবরের কাগজ পড়তে চাইলেন। খুঁজেপেতে ভেতরের দুটি পাতা পাওয়া গেল। আমি দেখলাম তিনি মন দিয়ে সিনেমার পাতা দেখছেন। যে রোগী সিনেমার পাতা পড়ে তার রোগ সেরে গেছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি বিচলিত বোধ করতে লাগলাম। কেমন যেন অন্যরকম একটা গন্ধ ঘরে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ।

মা বললেন, পাবদা মাছ খেতে ইচ্ছে করছে। টগর, তুই দেখিস তো পাবদা মাছ পাওয়া যায় কি না।

আমি তার জবাব না দিয়ে বললাম, একটা গন্ধ পাচ্ছ মা ?

কী রকম গন্ধ ?

অন্যরকম, অচেনা।

অডিকোলন দিয়েছি কপালে, তার গন্ধ বোধহয়।

অডিকোলনের মিষ্টি গন্ধের সাথে তার মিল আছে, কিন্তু অডিকোলন নয়। এ অন্য জিনিস। একটা অচেনা গন্ধ।

দাদাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেমন যেন কুৎসিত। যেন কিছু একটা তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। কী সেটা ? আত্মা ?

তিনি আবার আগের মতো টেনে শ্বাস নিচ্ছেন। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর তাকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোনো কিছু চিনতে পারছেন না। যেন নিতান্ত অপরিচিত একটি জায়গায় হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। নিদারুণ একটি ভয়। কিসের জন্যে এই ভয় ? কাকে ভয় ?

ডাক্তার প্রদ্যুৎ বাবু চেয়ারের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ভঙ্গিটা কুৎসিত। ছোট শিশুদের মতো হাঁ করে ঘুম। জিভটা আবার ক্ষণে ক্ষণে নড়ছে। রমিজ সাহেবকে দেখলাম না। তিনি সম্ভবত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন। বাবা নেমে এসেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের প্রতীক হিসেবে হাতে একটা পত্রিকা ধরে ঢুকেছেন। রোগীর কারণে নয়, বাবার উপস্থিতির জন্যেই সবাই কথা বলছে নিচু গলায়। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবা বললেন, তোমার ছোট ফুপু এখনো আসছেন না কেন খোঁজ নাও। [বাবা কখনো কাউকে 'তুই' বলেন না এবং যে-কোনো কথা এমনভাবে বলেন যেন মনে হয় এটিই শেষ।]

আমাদের টেলিফোন ঠিক নেই।

আমি নিচে নামার আগেই ড. ওয়াদুদকে টেলিফোন করে এসেছি। টেলিফোন ঠিক নেই কথাটা ভুল। না জেনে কিছু বলবে না।

বাবা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন যেন কিছুই হয়নি। আমি পা টিপে চলে গেলাম তেতলায়। টেলিফোন বাবার শোবার ঘরে থাকে।

হ্যালো, ছোট ফুপু।

কে টগর ?

জি।

বাবার অবস্থা এখন কেমন ?

ভালো না। তুমি আসছ না কেন ?

আমি তো সেই কখন থেকে কাপড় টাপড় পরে বসে আছি। দু'বার টেলিফোন করলাম, রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না।

আমরা সবাই নিচে, সেজন্যেই কেউ ধরে না। কাপড় পরে বসে আছ, আসছ না কেন ?

তোমার ফুপার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে একজন কোরআনে হাফেজকে আনতে গেছে। বাবাকে তওবা করাবে, দোয়াটোয়া পড়বে।

তওবা কী জন্যে ?

মরবার আগে তওবা করতে হয় না ?

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মরবার আগে যদি তওবা করতে হয় তাহলে সেটা মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার মতো। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্যে সেটা নিশ্চয়ই একটা ভয়ানক ব্যাপার। জেনে ফেলা যে—আর আশা নেই, এবার যাত্রা শুরু করতে হবে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। যে মারা যাচ্ছে তার কাছ থেকে শেষ আশার মিটিমিটি প্রদীপটি কেড়ে নেওয়া খুব অমানবিক কাজ। তাকে দেখাতে হবে—আমরা যুদ্ধ করে বাঁচি। মৃত্যু নামক হিংস্র পশুর সঙ্গে পশুর মতোই লড়ছি। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী।

কে যেন সিঁড়ি বেয়ে আসছে।

বড় ফুপু এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ বিরক্তিতে কুঁচকানো। গাল ঘামে চকচক করছে।

একটামাত্র ফোন, সেটা আবার তেতলায়। এই বাড়ির লোকদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর কোনোকালেই হবে না।

কাকে ফোন করবেন ?

বড় ফুপু তার জবাব না দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। কেউ সম্ভবত ধরছে না। তার মুখ আরও কুঁচকাতে লাগল।

এত বড় বাড়ি, টেলিফোন দুটো রাখা উচিত।

কেউ ধরছে না ফুপু ?

নাহ্।

মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তিনটা বাজে।

আমি বলে এসেছি জেগে বসে থাকতে। নবাবজাদা গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

ফুপু আবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই ইশারায় বললেন অপেক্ষা করতে।

আমি চেয়ার টেনে বসলাম। লাইন পাওয়া গেল না। ফুপুর মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বললাম, আমাকে কিছু বলবেন ?

হুঁ। ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বললাম।

কোন মেয়ে ?

নীলু। মেয়েটিকে তো ভালোই মনে হলো।

আপনার পছন্দ হয়েছে ? পাস করেছে পরীক্ষা ?

হাইট অবশ্যি কম, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মতো হবে। কী বলিস ?

হতে পারে। মেপে দেখিনি কখনো।

দুই ইঞ্চি হিল পরলে ধরা যাবে না।

হুঁ।

অবশ্যি মেয়েটার আঙুলগুলি একটু মোটা। ওয়ার্কিং ক্লাসের মেয়েদের মতো।

তাই নাকি, আমি লক্ষ করিনি।

বড় ফুপু বললেন, সব মিলিয়ে তো পাওয়া যায় না। এই মেয়েটির একটা অবশ্যই ভালো দিক আছে, ছোট ফ্যামিলির মেয়ে, মাথা নিচু করে থাকবে সবসময়। শব্দটাও করবে না। কী বলিস, ঠিক না ?

অন্যরকমও হতে পারে। হয়তো ফোঁস করে উঠবে।

হুঁ।

গরিব আত্মীয়স্বজনরা রাতদিন ভিড় করবে। স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে পাকা কাঁঠাল হাতে আপনার ড্রইংরুমে এসে বসে থাকবে। পান খেয়ে অ্যাশট্রেতে পিক ফেলবে। নাক ঝাড়বে।

বড় ফুপু দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, মেয়েটির বাবা কী করে ?

জানি না কী করে।

সে-কী! তোদের ভাড়াটে, আর তোরা জানিস না কী করে ?

ভাড়াটে ফাড়াটে বোধহয় না। দাদা থাকতে দিয়েছিলেন, চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাসে মাসে কিছু দিত।

বাড়ি কোথায় ?

কে জানে কোথায়!

বাড়ি কোথায় সেটাও জানিস না ?

উঁহুঁ।

আমি মেয়েটিকে আমার মগবাজারের বাসায় যেতে বলেছি। বেড়াবার জন্যে।

আপনার তাহলে ভালোই পছন্দ হয়েছে।

বাড়ি কোথায় সেটা না জেনে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলা ঠিক হয়নি।

একটি মেয়ে ভালো কি মন্দ তার সাথে তার বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার সাথে বাজে তর্ক করিস না। বাজে তর্ক জীবনে অনেক শুনেছি। তোর কাছ থেকে না শুনলেও চলবে।

বড় ফুপু টেলিফোন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার বোধহয় লাইন পাওয়া গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি শুনলাম বড় ফুপু চেঁচাচ্ছেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি ? ফাজলামির জায়গা পাস না। ছোটলোক কোথাকার। এক চড় দিয়ে...

চা আনতে গিয়ে কোথায় উধাও হলি ?

চায়ের কথা আমার মনেই ছিল না। রাত জেগে শরীর খারাপ লাগছে। এসেছিলাম অন্ধকারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব ভেবে। বাবু ভাই নিজেও দেখলাম শুয়ে আছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর। বাবু ভাই ক্লান্ত স্বরে বলল, একটু যেন জ্বর জ্বর লাগছে রে।

বাবু ভাই, তুমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিচে যাও।

নাহ।

না কেন ?

কেউ মারা যাচ্ছে এটা দেখতে ভালো লাগে না। অনেকবার দেখেছি।

আমি চুপ করে রইলাম। বাবু ভাই নিচু গলায় বলল, মুখে আমরা অসংখ্যবার বলি মরতে তো হবেই কিন্তু সত্যি সত্যি মৃত্যু যখন আসে তখন মন-টন ভেঙে যায়।

বাবু ভাই চাদর গায়ে উঠে বসল। ঠান্ডা গলায় বলল, আমাদের হাতে একবার বেলুচ রেজিমেন্টের এক নন-কমিশন্ড অফিসার ধরা পড়ে গেল। হাবিলদার মেজর। ব্যাটাকে আমরা এগারো মাইল হাঁটিয়ে মেথিকান্দা নিয়ে আসলাম। ব্যাটার মনে কোনো ডর-ভয় নাই। সিগারেট দেই, ভুস ভুস করে টানে। চা দিয়েছি, শেষ করে আরেক কাপ চাইল। ব্যাটার সাহসের তারিফ করি মনে মনে।

নাম কী ছিল ?

নাম মনে নেই। নাম দিয়ে দরকার কী ?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

নাম বাহাদুর খাঁ। ঝিলামের এক গাঁয়ে বাড়ি। দুই ছেলে ছিল—একজন মটর মেকানিক, অন্যজন নেভিতে।

ও।

এইসব আমি মনে করতে চাই না। নামধাম দিয়ে কী হয় ?

আমি সিগারেট ধরালাম। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। ক্ষুধার সময় সিগারেট ভালো লাগে না। বমি বমি লাগে।

বাবু ভাই বলল, মেথিকান্দা পৌঁছেই শুনি নতুন করে মিলিটারি রিইনফোর্সমেন্ট আসছে। আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে। ঠিক করা হলো বাহাদুর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না।

মেরে ফেলা হবে ?

হুঁ।

তারপর ?

ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর এত বড় একটা সাহসী মানুষ ছরছর করে পেচ্ছাপ করে ফেলল, কথা জড়িয়ে গেল। উল্টাপাল্টা কথা বলতে লাগল।

তারপর ?

এর আবার তারপর কী ?

বাবু ভাই হঠাৎ রেগে গেল। তার সম্ভবত নেশা হয়েছে।

আমাদের অভ্যেসই হচ্ছে একটা তারপর খোঁজা। মৃত্যুর আবার তারপর কী ?

আমি জবাব দিলাম না।

বাবু ভাই সিগারেটে টান দিয়ে খকখক করে খুব কাশতে লাগল। কাশি থামলে কড়া গলায় বলল, আমি মরবার সময় একজন সাহসী মানুষের মতো মরব।

লাভ কী তাতে ?

লাভ-লোকসান জানি না। সব কিছুতেই লাভ-লোকসান খোঁজা মানুষের আরেকটি অভ্যাস। বাজে অভ্যাস।

তুমি শুধু শুধু রাগছ বাবু ভাই।

শুধু শুধু রাগছি ?

হুঁ।

টগর দেখ, তোকে আমি একটি কথা বলে রাখি—মরবার সময় আমি একজন সত্যিকার সাহসী মানুষের মতো মরব। আরও একজন বড় ডাক্তার আন—এই বলে হৈচৈ শুরু করব না।

ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম।

দরজার পাশে খুট করে শব্দ হলো। বাবু ভাই অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে ? কে ?

আমি, আমি শাহানা। অন্ধকারে কী করছ ?

কিছু করছি না। তুমি কী চাও ?

ভেতরে আসব ?

না।

শাহানা চাপাস্বরে বলল, ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন ?

তাতে কারও তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শাহানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নানার জ্ঞান হয়েছে, তোমাকে খুঁজছে।

ঠিক আছে, যাব।

শাহানা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে গেলে ভালো হয়।

শাহানা নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বাবু ভাই অস্পষ্ট স্বরে বলল, বেশ তেজি মেয়ে। ঠিক না ?

হুঁ। একজন মেয়েমানুষের মধ্যে এরকম তেজ দেখা যায় না।

হুঁ।

বাবু ভাই বিছানা থেকে নামল। ক্লান্তস্বরে বলল, শরীর খারাপ লাগছে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করব।

যা করবার তাড়াতাড়ি করো, দাদা তোমাকে ডাকছে।

তোকে আরেকটা কথা বলতে চাই। বেশ জরুরি।

পরে বলবে।

কথাটা শাহানা প্রসঙ্গে।

দাঁড়িয়ে থাকলেই বাবু ভাই কথা বলবে। আমি নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম।

শাহানা প্রসঙ্গে বাবু ভাইয়ের কী বলার থাকতে পারে তা ঠিক বোঝা গেল না। শাহানা এই জাতীয় মেয়ে যাদের প্রসঙ্গে কারও কিছু বলার থাকে না। এদের চোখের দৃষ্টি হয় শীতল, হৃদয়ও থাকে শীতল। এরা শান্ত ভঙ্গিতে সংসারের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের বুড়ো সম্রাট শাহজাহানের কাছে সারা দুপুর বসে থাকে জাহানারা সেজে। যখনই প্রয়োজন মনে করে তখনি গলার স্বর অস্বাভাবিক শীতল করে আমাকে উপদেশ দিতে আসে। যেমন দিন সাতেক আগে হঠাৎ আমাকে এসে বলল, গতকাল নীলুর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল তোমার ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কেন ?

দেখলাম নীলু খুব হাসছে।

জোক বলছিলাম একটা। মজার গল্প।

কী জোক ?

তার দরকারটা কী ?

দরকার আছে। একটা কাঁচা বয়সের মেয়ে। ওর সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি করা ঠিক না।

অসুবিধাটা কোথায় ?

অল্পবয়েসী মেয়েরা অতি সহজেই উইকনেস গ্রো করিয়ে ফেলে এবং পরে কষ্ট পায়। গরিব দুঃখী মানুষের মেয়ে, এদের নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক না।

তাই বুঝি ?

হুঁ।

শাহানা আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে চলে গেল।

রাগে গা জ্বলতে লাগল আমার।

ছোট ফুপু চলে এসেছেন। সঙ্গে অল্প বয়স্ক মৌলবি একজন। লোকটির মাথায় বেতের একটা টুপি। অত্যন্ত ফরসা একটা পাঞ্জাবি আছে গায়ে। (এই জাতীয় লোকদের গায়ে সাধারণত এত ফরসা জামাকাপড় থাকে না।) পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের বদলে পরিষ্কার একজোড়া চটি জুতা। লোকটি বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট নাড়ছে। দেখে বোঝা যায় কিছু একটা পড়ছে মনে মনে। আমাকে দেখে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম। ভালো আছেন ?

আমি জবাব না দিয়ে দাদার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ঘরভর্তি মানুষ। দাদা আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, কে ? বাবু ?

জি-না, আমি টগর।

ও তুই। বাবু কই ?

আসছে।

বড় চাচা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, লাট সাহেবের হয়েছেটা কী, এতক্ষণ লাগে ?

দাদা শান্তস্বরে বললেন, চিৎকার করিস না। আসুক ধীরে সুস্থে। তাড়া নেই কোনো।

ছোট চাচা বললেন, আমার শখ ছিল বাবুর একটা বিয়ে দিয়ে দেই।

বড় ফুপু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বাবু এখন বিয়ে করবে কী ? রোজগারপাতি কোথায় ?

দাদা বিরক্ত চোখে তাকালেন।

বড় ফুপু বললেন, ফরিদের বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর বিয়েটা নিজে দাঁড়িয়ে দিয়ে যান। আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হলেই কথাবার্তা ফাইনাল করব। জাস্টিস বি করিম সাহেবের ছোট মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে...

দাদা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাবু কোথায় ?

তাঁর ফরসা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, নিঃশ্বাস নিতে বোধহয় কষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে আবার।

দাদা বললেন, তোমরা কেউ একটা গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দাও।

ছোট ফুপু দৌড়ে রুমাল ভিজিয়ে আনলেন।

প্রদ্যোৎ বাবু বললেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ?

হুঁ।

অক্সিজেনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলেই আরাম হবে।

ডাক্তার, শান্তিতে মরতে দাও। ঝামেলা করবে না।

ছোট ফুপু বললেন, এইসব কথা কেন বলছেন বাবা ?

মা, সময় শেষ হয়ে এসেছে।

ছোট ফুপু চোখ মুছতে লাগলেন। বাবু ভাই এলেন সেই সময়। দাদা হাত ইশারা করলেন। বসতে বললেন তাঁর কাছে। ক্লান্তস্বরে বললেন, সবাই আছে এইখানে ?

বড় চাচি বললেন, জি আছে।

দাদা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। ছোটন কোথায় ?

ছোটন হচ্ছে আমার ছোট চাচি, দাদার খুব প্রিয়পাত্রী।

বড় ফুপু বললেন, ছোটন গেছে চিটাগাং। কী যে এদের কাণ্ড। এমন অসুখ-বিসুখের মধ্যে কেউ বাইরে যায় ?

ছোট চাচা বললেন, সে কাল আসবে।

দাদা বললেন, কাল পর্যন্ত আমার সময় নাই। তোমরা কেউ গিয়ে আলমারি খোলো।

বড় ফুপু বললেন, বাইরের লোকজন না থাকাই ভালো। এই মেয়ে, নীলু না তোমার নাম ? তুমি যাও।

দাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। তিনি কিছুই বললেন না। প্রদ্যুৎ বাবুও উঠে দাঁড়ালেন—আমি বারান্দায় গিয়ে বসছি।

আলমারি খোলা গেল না। বড় চাচা এদিক-সেদিক নানাভাবে চাবি ঘোরালেন। দরজা ঝাঁকালেন। কিছুতেই কিছু হলো না।

দাদা ক্লান্তস্বরে বললেন, তুই কোনোদিনই কিছু পারলি না। চাবিটা রহমানের কাছে দে।

বড় চাচা চাবি দিলেন না। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলমারির দরজার গায়ে, যেন এটা খোলার উপর তাঁর বাঁচামরা নির্ভর করছে। দেখতে দেখতে তার কপাল

বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। বড় ফুপু অধৈর্য হয়ে বললেন, দেখি চাবিটা আমার কাছে।

বড় চাচা দিলেন না। চোখ ছোট করে তাকালেন। যেন কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছেন না।

বাবু ভাই বললেন, ফুপু, বাবাকে খুলতে দিন।

বড় ফুপু ফোঁস করে উঠলেন, সে এটা খুলবে কীভাবে ? তার সে বুদ্ধি থাকলে তো কাজই হতো।

একটা সামান্য ব্যাপারে আবহাওয়া বদলে গেল। বড় চাচা এমন করতে লাগলেন যেন স্টিলের আলমারি খুলতেই হবে। আমি লক্ষ করলাম তাঁর হাত কাঁপছে। ফুপু বিরক্তির একটা শব্দ করলেন। বড় চাচার চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো হয়ে গেল। জীবনে তিনি অসংখ্যবার পরাজিত হয়েছেন। কখনো কিছুমাত্র বিচলিত হননি। আজ তাঁর এরকম হচ্ছে কেন কে জানে ?

তুলনামূলকভাবে দাদা অনেক স্বাভাবিক। তিনি যেন কৌতূহলী হয়ে বড় চাচার কাণ্ড লক্ষ করছেন। বড় চাচা একসময় ছুটে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দাদা লম্বা একটি নিঃশ্বাস ফেলে মিনুকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। মনে হলো তিনি যেন স্পষ্ট দেখছেন—মিনু ছোট ছোট পা ফেলে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। দাদা অবাক বিস্ময়ে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে দেখছেন। তিনি একবার বললেন, কেমন আছ আম্মা বেটি ?

বলার পর পরই দাদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন মেয়েটি চমৎকার কোনো উত্তর দিয়েছে। আমার একটু ভয় করতে লাগল। বাবু ভাই বললেন, ডাক্তার সাহেবকে ডাকা দরকার।

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা হাঁপাতে শুরু করলেন। অদ্ভুত একটা শিস দেওয়ার মতো শব্দ হতে লাগল। প্রদ্যুৎ বাবু দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরে গাড়ির শব্দ হলো। অক্সিজেন ইউনিট নিয়ে ওরা বোধহয় এসে পড়েছে। আমি বাবু ভাইয়ের পেছনে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। মৌলবি লোকটি তখনো চেয়ারে ঠিক আগের মতো বসে আছে। দোয়া-টোয়া পড়ছে হয়তো। তার ঠোঁট কাঁপছে দ্রুত ভঙ্গিতে। বাবু ভাই কড়া গলায় বলল, কে আপনি ?

লোকটি হকচকিয়ে গেল। বাবু ভাই দ্বিতীয়বার বলল, কে আপনি ?

প্রশ্নের উগ্র ধরন দেখেই হয়তো লোকটি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, উনি একজন কোরআনে হাফেজ।

কোরআনে হাফেজ ? গোটা কোরআন শরীফটা মুখস্থ করেছেন ?

জি জনাব।

কী উদ্দেশ্যে করেছেন ?

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে করি নাই।

বাবু ভাই বিরক্তির স্বরে বললেন, একসময় এটার দরকার ছিল। মুখস্থ করে মনে রাখতে হতো, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। কোরআন শরীফ পাওয়া যায়। বুঝলেন ?

জি, বুঝলাম। তবে জনাব, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে। আমি একজনকে চিনতাম। সে একটা গোটা কবিতার বই মুখস্থ করেছিল।

বাবু ভাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। লোকটি মৃদুস্বরে বলল, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে।

আপনি ঠিক বলেছেন। কিছু মনে করবেন না।

জি-না, কিছু মনে করি নাই।

আপনার নাম কী ?

মোহাম্মদ ইসমাইল।

ইসমাইল সাহেব, আপনাকে চা দিয়েছে ?

আমি চা খাই না।

আপনি কি আমার দাদার জন্যে দোয়া করছেন ?

জি জনাব করছি, আপনারাও করেন।

ইসমাইল সাহেব বসে পড়লেন। অপূর্ব সুরেলা গলায় কোরআন পড়তে শুরু করলেন। যার এত সুন্দর গলা তিনি কেন এতক্ষণ মনে মনে পড়ছিলেন ? বাবু ভাই অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। শাহানাও ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। সে মাথায় কাপড় দিয়েছে। সে দেখলাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বাবু ভাইয়ের দিকে। যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করছে।

ঘরের ভেতর থেকে দাদার গলা শোনা গেল। অন্যরকম আওয়াজ। শুনলেই মনে হয় তাঁর বুকের উপর পাথরের মতো ভারি কিছু একটা চেপে বসেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা সরানো যাচ্ছে না।

ছোট ফুপু কাঁদতে শুরু করেছেন। এই প্রথম বোধহয় এ বাড়ির কেউ কাঁদল। কান্না খুব ছোঁয়াচে। এক্ষুনি অন্য সবাই একে একে কাঁদতে শুরু করবে। আমাদের এ বাড়িতে কোনো শিশু নেই। কেউ এখানে কাঁদে না। দীর্ঘদিন পর এ বাড়ির মানুষেরা চোখ মুছবে।

ছোট ফুপু পাংশুমুখে বাইরে এসে বললেন, টগর, একটা জায়নামাজ দে তো, নিরিবিলিতে একটা খতম পড়ব।

আমি বললাম, ফুপা আসবেন না ?

আসবে হয়তো। খবর পেয়েছে।

কোথায় বসে দোয়া পড়তে চান ? তিনতলায় যাবেন ? কেউ নেই কিন্তু তিনতলায়।

তাতে কী হয়েছে ?

ভয়টয় পেতে পারেন।

ভয় পাব কী জন্যে ? কী সব কথাবার্তা বলিস!

ছোট ফুপু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমাদের এই বংশের সবাই অল্পতে বিরক্ত হয়। অল্পতে রেগে ওঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছোট ফুপু বললেন, বাবা আজ রাতেই মারা যাবেন।

কেমন করে বলছেন ?

ঘরে ঢুকেই আমার মনে হলো। ঘরে মৃত্যু বসে আছে।

আমি চুপ করে রইলাম। ছোট ফুপু বললেন, কবিরের এই দোঁহাটা পড়েছিস।

কোনটা ?

জন্মের সময় শিশুটি কাঁদে, তার আশেপাশের সবাই আনন্দে হাসে। আর মৃত্যুর সময় যে মারা যাচ্ছে সে হাসে, অন্য সবাই কাঁদে।

কথাটা ঠিক নয় ফুপু।

ঠিক না ? ঠিক না কেন ?

যে মারা যাচ্ছে সে আরও বেশি কাঁদে। কেউ মরতে চায় না।

ছোট ফুপু উত্তর দিলেন না। তবে তিনি বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। চোখ তীক্ষ্ণ।

তেতলায় গিয়ে ফুপুর ভাবান্তর হলো। আমার মনে হলো তিনি একটুখানি ভয় পেলেন। আমাকে বললেন, উপরটা দেখি খুব চুপচাপ। কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জি, সবাই নিচে।

তুই বারান্দায় একটু বসে থাক, দোয়াটা পড়তে আমার বেশি সময় লাগবে না।

ঠিক আছে বসছি।

বারান্দায় এসে বসামাত্র ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশে যে মেঘ করেছে লক্ষই করিনি। দমকা বাতাস দিতে লাগল। পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবার পর সিগারেট ধরানো গেল। বসে থেকে শুনলাম ছোট ফুপু উঁচু গলায় কী একটা দোয়া পড়ছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই ছোট ফুপু ধর্মটর্ম নিয়ে অস্বাভাবিক ঝুঁকেছেন। দু'বার গিয়েছেন আজমীর শরীফ। মগবাজারের কোনো এক পীর সাহেবের কাছে মুরিদ হয়েছেন। ঘোমটা ছাড়া কোথাও বের হন না। ধর্মে এই অস্বাভাবিক মতির পেছনের কারণ হচ্ছে আমাদের ছোট ফুপা।

একদিন খবরের কাগজে একটা বেশ রগরগে খবর ছাপা হলো। তের বৎসরের বালিকা পরিচারিকা ধর্ষণের দায়ে গৃহস্বামী গ্রেফতার। প্রথম পৃষ্ঠায় পুরা দুই কলাম জুড়ে খবর। অর্ধেক পড়বার পর আঁতকে উঠতে হলো—গৃহস্বামী আমাদের ছোট ফুপা। কোনো পরিচিত ব্যক্তির সম্পর্কে এই ধরনের খবর ছাপা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। কী সর্বনাশ!

ছোট ফুপু দশটার দিকে এসে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র। ফুপু নাকি সে-রাতে সন্ধ্যা থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ছোট ফুপু এত চোখের জল ফেলতে লাগলেন যে আমরা প্রায় বিশ্বাস করে ফেললাম ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দাদা গম্ভীর স্বরে বললেন, এ হারামজাদাটা যেন আমি জীবিত থাকা অবস্থায় এ বাড়ি না আসে। ছোট ফুপু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না ?

দাদা বললেন, তুইও আসবি না এ বাড়িতে।

ফুপার কিছুই হলো না। হবার কথাও নয়। ফুপাদের এত টাকাপয়সা যে এইসব ছোটখাটো জিনিস তাদের স্পর্শ করতে পারে না। ঝামেলা হয় গরিবদের। বড়লোকদের ঝামেলা কী ?

ফুপার সঙ্গে দেখা হলে দারুণ একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে এই ভেবে আমি এবং বাবু ভাই ধানমণ্ডি এলাকা দিয়ে যাওয়া আসাই বন্ধ করে দিলাম। এর পরপরই খবর পেলাম ছোট ফুপু নাকি মগবাজারের কোন এক পীরের কাছে যাওয়া আসা করছেন।

তেতলা থেকে নিচে নেমেই বাবু ভাইয়ের দেখা পেলাম। তিনি ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে নিচুস্বরে কী যেন বলছেন। ইসমাইল সাহেবের মুখটি হাসিহাসি। কোনো রসিকতা হচ্ছে কি ? আমি কৌতূহলী হয়ে বাবু ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতেই ছোট চাচা পাংশুমুখে বাইরে এসে বললেন, ড. ওয়াদুদকে একবার নিয়ে আসা দরকার। বাবু, তুই গাড়ি নিয়ে যা। উনি বলেছেন অবস্থা খারাপ হলে ডাকতে। বাসা চিনিস তো ?

চিনি।

ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ডেকে তোল। ঘুমের কারও আর মা-বাপ নাই দেখি। টগরকে সঙ্গে নিয়ে যা।

বাবু ভাই ড্রাইভারকে ডাকল না। নিজেই গাড়ি বের করল। ভারী গলায় বলল, কটা বাজে দেখ তো ?

একটা পঁয়ত্রিশ।

বাবু ভাই সাধারণত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় কিন্তু জনশূন্য রাস্তাতেও তাঁর গাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। যেন কোনো তাড়া নেই। একসময় পৌঁছলেই

হলো। বাবু ভাই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, তোকে একটা কথা বলছি। শাহানা প্রসঙ্গে...।

পরেও বলতে পার।

না, আজই বলা দরকার। আজকের রাতটা একটা বিশেষ রাত। সবার মন দুর্বল। আমার নিজেরও দুর্বল। আজ রাতে বলা না হলে কোনোদিনই বলা হবে না।

ঠিক আছে, বলো।

বাবু ভাই গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরাল। দুটান দিয়ে সেটি জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে নিচু গলায় বলল, বছর দুই আগে একদিন দুপুরবেলা শাহানা আমার ঘরে এসেছিল। তুই তখন ময়মনসিংহ। শাহানা এসেছিল ইংলিশ-ব্যাঙ্গলি ডিকশনারি নিতে।

তারপর ?

আমি শাহানাকে বললাম দরজাটা বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসতে। সে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ...আমি উঠে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম। শাহানা চিৎকার করল না, হুটোপুটি করল না, কিছুই করল না। তার চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়তে লাগল।

আমি বললাম, আর কিছু না, এই পর্যন্ত ?

আর কিছু নাই—এই পর্যন্তই।

বাবু ভাই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, শাহানাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি ঠিক করেছি শাহানাকে এই কথাটি বলব।

আজই বলবে ?

হুঁ। আজই বলব।

আজ না বলে দিন দশেক পর বলো।

দিন দশেক পরে বললে কী হবে ?

শাহানার হাসবেন্ড লোকটি আগামী সপ্তাহে ফিরে আসছে।

কে বলেছে ?

আমি নীলুর কাছে শুনেছি। শাহানা নীলুর সঙ্গে অনেক গোপন কথাটথা বলে।

বাবু ভাই দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, এ লোকটি আসুক বা না আসুক আমার কিছুই যায় আসে না, আমি আজ রাতেই বলব।

ঠিক আছে বলবে। রেগে যাচ্ছ কেন ?

বাবু ভাই অকারণে হর্ন টিপতে লাগল।

আমি বললাম, তোমার এই ঘটনার কথা আর কেউ জানে ?

জানি না। সম্ভবত দাদা জানে। শাহানা হয়তো তাঁকে বলেছে।

সে-কী!

হ্যাঁ। সে দাদাকে বলেছে।

তুমি বুঝলে কী করে ?

আমি কচি খোকা না।

বাবু ভাই হু-হু করে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

ড. ওয়াদুদকে নিয়ে ফিরলাম রাত আড়াইটার দিকে। এসে দেখি দাদাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মুখের শিরাগুলি নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। রমিজ সাহেব দাদার বিছানার পাশে তজবি হাতে বসে আছেন। এই ভড়ং-এর কী মানে ? দোয়াদরুদ যদি পড়তেই হয় তাহলে মনে মনে পড়লেই হয়। লোক দেখানো একটা তজবির দরকার কী ? আমি তাকিয়ে দেখলাম রমিজ সাহেব তার মুখ দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট করে রেখেছেন। দাদা মারা গেলে সবচেয়ে উঁচু গলায় যে তিনি কাঁদবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকটি নির্বোধ। এরকম একটি নির্বোধ লোকের বাচ্চাগুলি এরকম বুদ্ধিমান হয়েছে কীভাবে কে জানে ? সবকটি বাচ্চার এমন বুদ্ধি। বিশেষ করে ক্লাস সেভেনে পড়ে যে মেয়েটি—বিলু। সবসময় একটা-না-একটা মজার কথা বলে। হাসি চেপে রাখা মুশকিল। মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করা দূরে থাকুক, রসিকতা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। কিন্তু বিলু খুব রসিক।

কয়েকদিন আগে সে বারান্দায় বসে কী যেন বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই বলল, বলুন তো পাঁচ থেকে এক বাদ গেলে কখন ছয় হয় ? আমি উত্তরের জন্যে আকাশ পাতাল হাতড়াচ্ছি—সে গম্ভীর হয়ে বলল, পারলেন না তো ? যখন ভুল হয় তখন হয় ছয়।

আমার প্রায়ই মনে হয় একটি নির্বোধ অপদার্থ বাবার জন্যে সবক'টি মেয়ে এখন কষ্ট পাচ্ছে, ভবিষ্যতেও পাবে।

রমিজ সাহেব আমাকে দেখে হাসিমুখে (তাঁর মুখ সবসময়ই হাসি হাসি। নির্বোধ লোকদের মুখ সবসময় হাসি হাসি থাকে।) এগিয়ে এল।

ভাই সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল।

বলুন শুনি।

চলেন একটু বাইরে যাই।

বাইরে যাওয়ার দরকার কী ? এখানে বলুন।

রমিজ সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। ধার চাইবার ভঙ্গি। কিন্তু রমিজ সাহেব আমাকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ আনলেন।

কথাটা নীলুর প্রসঙ্গে।

নীলুর প্রসঙ্গে কী কথা।

নীলুর একটা ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসছে। ছেলে টেক্সেশান অফিসার। ময়মনসিংহে নিজেদের বাড়ি আছে।

ভালোই তো, বিয়ে দিন।

দিতেই চাই। কিন্তু নীলু রাজি না। এখন যদি ভাই আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন...

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি বলব কী জন্যে ? আমি কে ?

রমিজ সাহেব আমতা আমতা করতে লাগলেন, না ইয়ে মানে...

আশ্চর্য, মেয়ে রাজি হচ্ছে না সেটা আমাকে বলছেন কী জন্যে ?

রমিজ সাহেবের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। তবু তিনি দেঁতো হাসি হাসতে লাগলেন। গা জ্বলে যাওয়ার মতো অবস্থা। আমি গলার স্বর এক ধাপ উঁচু করে বললাম, শুনেন রমিজ সাহেব, সব কিছুর একটা সময় অসময় আছে। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে এই সময় আপনি আজগুবি কথাবার্তা শুরু করলেন। আশ্চর্য!

রমিজ সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। দুর্বল লোকের উপর কঠিন হতে ভালো লাগে। তার উপর এই লোকটিকে আমি পছন্দ করি না। কড়া ধরনের কথা বলার সুযোগ পেয়ে অঘুমজনিত ক্লান্তি আমার অনেকখানি কমে গেল। রমিজ সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আচ্ছা ভাইসাব, যাই তাহলে।

যান।

রমিজ সাহেব গেটের কাছে চলে গেলেন। সেখানে আগুনের একটা ফুলকি জ্বলে উঠতে দেখা গেল। বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা ধরিয়েছেন। এতটা কড়া না হলেও চলত বোধহয়। কিন্তু লোকটিকে আমি সহ্য করতে পারি না। একদিন দুপুরে তাকে দেখলাম মিরপুর রোডের কাছে এক রেস্টুরেন্টে বসে খুব তরিবত করে মোরগপোলাও খাচ্ছে। ছুটির দিন। সকালেও তাকে বাসায় দেখে এসেছি। আমি এগিয়ে গেলাম।

কী ব্যাপার রমিজ সাহেব, বাইরে খাচ্ছেন যে ?

রমিজ সাহেব আমতা আমতা করে যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, তাঁর গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে। ক্ষিধে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা খেতে হয়। বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে তাই...।

গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেমে পোলাও-টোলাও চালাচ্ছেন ?

রমিজ সাহেব তার উত্তর দিলেন না।

আরও একদিন তাঁর সঙ্গে এরকম দেখা। রিকশা করে যাচ্ছি, দেখি এলিফেন্ট রোডের এক কাবাব ঘরের সামনের খোলা জায়গায় চেয়ারে পা তুলে বসা। তাঁর সামনে দুতিন ধরনের কাবাব। আমি রিকশা থেকেই চেঁচালাম, এই যে রমিজ

সাহেব। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিনই নীলু এল টাকার জন্যে। এটা তার প্রথম আসা নয়, আগেও অনেকবার এসেছে। ধার চাইতে আসার লজ্জায় তার ফরসা মুখ লালাভ। চোখ দেখেই মনে হয় আসার আগে ঘরে বসে খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। চোখ ফোলা ফোলা। আমি লজ্জা কমাবার জন্যেই বললাম, তোর যন্ত্রণায় তো সঙ্গে টাকাপয়সা রাখাই মুছিবত। কত টাকা দরকার ? (এই সময় আমি তুই করেই বলি।)

দুইশ যদি না থাকে একশ।

দেখি পারা যায় কি না। পড়াশুনা হচ্ছে ঠিকমতো ?

জি।

গুড। এখন যা রান্নাঘর থেকে দুধ ছাড়া হালকা লিকারে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণে ভেবে দেখি টাকা দেওয়া যায় কি না।

নীলু যেন পালিয়ে বাঁচে। চা নিয়ে এসে অনেকখানি সহজ হয়। এবং চায়ে চুমুক দিয়ে আমি প্রতিবারের মতোই গম্ভীর হয়ে ভাবি রমিজ সাহেব কি ইচ্ছা করেই মেয়েকে আমার কাছে পাঠান ? তার কি একবারও মনে হয় না যে আমি নীলুকে অনায়াসেই বলতে পারি, টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দে তো নীলু।

আমি কোনো মহাপুরুষ না। পৃথিবীর কোনো পুরুষই মহাপুরুষ নয়। মহাপুরুষদের পাওয়া যায় ধর্মগ্রন্থে।

যে লোক ভোর হতেই মেয়েকে টাকার জন্যে পাঠায় সে কী করে আগের রাতে পায়ের উপর পা তুলে চপ কাটলেট খায় ?

আমি নীলুকে বললাম, তোর বাবাকে প্রায়ই দেখি বাইরে হেভি খানাপিনা করে।

নীলু নম্র গলায় বলল, প্রায়ই না, মাঝে মাঝে।

ঘরের খাওয়া রোচে না বুঝি ?

নীলু অনেক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাবার ভালো খাওয়া খুব পছন্দ। ঘরে তো আর এইসব করা সম্ভব না। তাই কখনো কখনো...

তাই বলে বক রাক্ষসের মতো একা একা খাবে ?

নীলু চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, আমাদের এইসব খেতে ইচ্ছেও করে না। একবার বটি কাবাব না কী যেন এনেছিলেন, একগাদা লবণ। মুখে দেওয়া যায় না।

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, তোদের চার কন্যাকে আমি একদিন ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

কবে নিবেন ?

আগে থেকে দিন-তারিখ বলতে হবে নাকি ? ভাগ।

আমাদের যেতে দিবে না।

সেটা দেখা যাবে।

সবাইকে নিয়ে অবশ্য যাওয়া হলো না। নীলুকে নিয়ে গেলাম। সেটাও হঠাৎ করে। হাতিরপুলের কাছে নীলুর সঙ্গে দেখা। সে একগাদা বই বুকের কাছে ধরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে হাঁটছে। আমি রিকশা থামিয়ে গলা বের করলাম, এই নীলু, যাস কই ?

বাসায় যাই, আর কোথায় যাব ? এই দিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে।

উঠে আয়।

আপনি বাসায় যাচ্ছেন ?

সেটা দেখা যাবে, তুই উঠ তো।

নীলু উঠে এল।

রোজ এই রোদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাস ?

রোজ না। যেদিন আমাদের গাড়িটা নষ্ট থাকে কিংবা ড্রাইভার আসে না সেদিন যাই।

নীলু শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

কলেজে গিয়ে খুব কথা শিখেছিস দেখি। আয় তোকে একটা ক্লাস ওয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই।

এখন ?

হুঁ।

আজ তো যাওয়া যাবে না।

আজ কী অসুবিধা ?

আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন। আম্মার স্যান্ডেল নিয়ে এসেছি। এগুলি পরে কেউ কোথাও যায় ? আমাকে মনে করবে আপনার কোনো চাকরানি।

ঠিক আছে, আয় স্যান্ডেল কিনে দেই।

নীলু শাড়ির আঁচল দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ক্লান্তস্বরে বলল, আপনাদের খুব মজা—না ? যখন যা ইচ্ছা হয় কিনতে পারেন।

তা পারি।

টাকা খরচ করতেও আপনি ওস্তাদ।

তাও ঠিক।

হঠাৎ এই নতুন স্যান্ডেল নিয়ে গিয়ে বাসায় কী বলব ? আপনি দিয়েছেন এই কথা বলব ?

বলতে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা আছে, আপনি বুঝবেন না।

নীলু আবার কপালের ঘাম মুছল।

স্যান্ডেল কিনতে হবে না, যেটা আছে সেটা পরেই যাব।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তোদের মেয়েদের মনের মধ্যে শুধু প্যাঁচ।

মেয়েদের মনের সব কথা আপনি জানেন, তাই না ?

তা জানি।

জানাই তো উচিত—এত মেয়ে বন্ধু আপনার। সেদিন দেখলাম রিকশা করে একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছেন।

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

দূর থেকে দেখলাম, ছোট চাচার সঙ্গে মগবাজারের ফুপুর কী নিয়ে যেন লেগে গেছে। বড় ফুপু উত্তেজিত হয়ে কী সব বলছেন।

ছোট চাচা তেমন সাড়াশব্দ করছেন না।

ছোট চাচার স্বভাব—গলার স্বর উঁচু করে কিছু বলতে পারেন না। সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। যেন কোনো মহাঅপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাদের গেঞ্জির মিলের দায়িত্ব কিছুদিন ছিল তাঁর উপর। লোকসান টোকসান দিয়ে এমন অবস্থা করলেন যে শেষপর্যন্ত মিল বিক্রি করে দিতে হলো। এখন কী যেন একটা ব্যবসা করেন। এবং মনে হয় ভালোই টাকাপয়সা আয় করেন। ছোট চাচার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বৎসর। কোনো ছেলেপুলে হয়নি। ছোট চাচি যথেষ্ট সুন্দরী তবু সারাক্ষণ সাজসজ্জা করেন। তাঁকে যখনই দেখা যাবে তখনি মনে হবে এই বুঝি কোনো পার্টিতে যাচ্ছেন। কিংবা কোনো বউভাতের অনুষ্ঠান থেকে এলেন। বাবু ভাইয়ের ধারণা—ছোট চাচির জন্যেই চাচা এতটা মিনমিনে হয়েছে। কথাটা পুরাপুরি অসত্য নয়।

চাচা এ বাড়িতে থাকেন ছায়ার মতো। ছোট চাচি থাকেন হৈচৈ করে। সর্বক্ষণই তাঁর কাছে গেস্ট আসছে। একবার শোনা গেল কোনো এক গ্রুপ থিয়েটারের হয়ে তিনি নাকি নাটক করবেন। তাঁর ভূমিকা হচ্ছে মোড়লের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর। ছোট চাচি নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে এনে মুখস্থ করলেন। নাটক অবশ্যি হয়নি। দাদা ভেটো দিয়ে সব ভেস্তে দিলেন।

মগবাজারের ফুপু ছোট চাচার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো গোপন আলাপ করছিলেন। কারণ আমাকে দেখেই কথাবার্তা থেমে গেল। আমি বললাম, কী নিয়ে আলাপ করছিলেন আপনারা ?

ছোট চাচা মিহিস্বরে বললেন, তেমন কিছু না।

বড় ফুপু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, মা'র গয়না নিয়ে আলাপ করছিলাম, এমন গোপন কিছু না।

কী গয়না ?

মা'র প্রায় দেড়শ ভরি গয়না আছে। সব বাবা স্টিলের আলমারিতে তুলে রেখেছেন।

তাতে কী হয়েছে ?

গয়নাগুলি সব আছে কি না আলমারি খুলে দেখা দরকার। গয়নাগুলিতে আমাদের দাবি আছে। স্মৃতিচিহ্ন।

আমি চুপ করে রইলাম।

বড় ফুপু থেমে থেমে বললেন, গয়নার পুরো হিসাব থাকা দরকার।

ছোট চাচা বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আমি একটু বাবার ওখানে গিয়ে বসি—বলেই প্রায় পালিয়ে গেলেন। বড় ফুপু থমথমে স্বরে বললেন, এটা এমন মেনা বিড়াল যে এর মাথায় কাঁঠাল ভাঙলেও বুঝতে পারবে না।

কে ভাঙবে কাঁঠাল ?

তোর বাবা। আর কে ? আমি কি কিছু বুঝতে পারি না ? ঠিকই পারি।

আমি চুপ করে গেলাম।

বড় ফুপু বললেন, খোঁজ নিয়েছিলি ?

কী খোঁজ নেব ?

মেয়েটার বাড়ি কোথায় ? বাবা কী করে ?

ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারেন।

আমি পারলে আর তোকে জিজ্ঞেস করি কেন ?

মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে ?

হুঁ। শাহানা বলল, খুব নাকি লক্ষ্মী মেয়ে।

তা লক্ষ্মী বলতে পারেন।

আর শোন, ওদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দরকার।

আজ রাতেই দরকার ?

অসুবিধা কী ?

শাহানাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

না, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। মেয়েকে দিয়ে কোনো মেয়ের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে নেই। ঠিক খবর পাওয়া যায় না।

ঠিক আছে।

আর মেয়েটির একটা ছবি দরকার। ফরিদকে পাঠাব।

এইসব আমাকে বলছেন কেন ?

কাকে বলব তাহলে ?

শাহানাকে বলেন কিংবা বড় চাচিকে বলেন।

বিয়ে শাদির ব্যাপারে শাহানাকে জড়াতে চাই না। মেয়েটা অলুক্ষুণে। আর তোর বড় চাচির কথা আমাকে কিছু বলিস না। ওর মাথায় কিছু আছে নাকি ? মেয়েমানুষের এত কম বুদ্ধি থাকে তা বড় ভাবিকে দেখেই প্রথমে জেনেছি, বুঝলি ?

গেট খোলার শব্দে তাকিয়ে দেখি ছোট ফুপা এসে ঢুকছেন। গাড়ি গেটের বাইরে রাখা। ছোট ফুপা কখনো গাড়ি ভেতরে ঢোকান না। ঢুকালে নাকি বের করতে সময় লাগে।

ছোট ফুপা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, বাবার অবস্থা কী ?

বেশি ভালো না।

ক্লিনিকে ট্রান্সফার করা দরকার। পিজির ডাক্তার আমিনের সঙ্গে কথা বলেছি। কেবিনের অসুবিধা হবে না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার জামাল সাহেবের কথা বলতেই মন্ত্রের মতো কাজ হলো। দেশের যে কী অবস্থা। রেফারেন্স ছাড়া কাজ হয় না। আপা, আপনি কেমন আছেন ?

ভালো। তুমি কেমন ?

আর আমি। আমার কথা কে জিজ্ঞেস করে বলেন ? একটা পার্টির সঙ্গে কথা বলার জন্যে কোরিয়া গিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার কী যে কষ্ট আপা!

তাই বুঝি ?

আর বলেন কেন। খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়ে জাপান ভালো। রাইস এবং চিকেন কারি পাওয়া যায়। এক্সেলেন্ট টেস্ট।

ছোট ফুপার কথাবার্তায় আমার গা জ্বালা করতে লাগল। এই লোকটি একটি মরণাপন্ন রোগী দেখতে এসে কোরিয়া জাপান করছে। আমি বললাম, ছোটফুপা, আমি দোতলায় আছি। দরকার হলে ডাকবেন।

এই দাঁড়াও, আমিও যাব।

আপনি দাদাকে দেখে আসেন।

চট করে দেখে আসছি। তুমি দাঁড়াও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোট ফুপা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন।

চোখ কপালে তুলে বললেন, অবস্থা তো বেশ খারাপ।

খারাপ তো বটেই।

রাত কাটবে না। কী বলো ?

না কাটারই কথা।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডাক্তারদের সার্কেলে আমার ভালো যোগাযোগ আছে। একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা দরকার।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, বাবাকে বলেন। বলে নিয়ে যান।

ছোট ফুপা চুপ করে গেলেন।

সিঁড়ির মাথায় বাবু ভাই দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দা অন্ধকার বলে তার মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। ছোট ফুপা বললেন, বাবু নাকি ? সব অন্ধকার করে রেখেছ কেন ?

বাবু ভাই জবাব দিল না।

ফুপা বললেন, চল তোমাদের ঘরে গিয়ে বসি।

আমাদের ঘরে বাতি নেই।

বাতি লাগবে না, তোমরা আছ তো ?

বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি থাকব না, টগরকে বলে দেখেন।

আরে তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরে ঢুকেই ফুপা চাপা গলায় বললেন, কিসের গন্ধ ? গন্ধ পাচ্ছ না ?

আমরা জবাব দিলাম না। বাবু ভাই বললেন, কী বলতে চাচ্ছিলেন যেন ?

আমার শ্বশুর সাহেব সম্পর্কে। শুনলাম তাঁর গ্রামের বাড়ি এবং বিশ বিঘা জমি নাকি স্কুল আর কলেজ ফান্ডে দিয়ে যাচ্ছেন।

জানি না, দিতে পারেন।

কী আশ্চর্য, তাঁকে গ্রামের লোকে দালাল বলে, আর তাদের জন্যে এটা করার মানে ?

দালালি করেছিলেন, কাজেই দালাল বলে। সেইজন্যে দান-খয়রাত করবেন না ?

আরে তুমি বুঝতে পারছ না, দানটা অপাত্রে হচ্ছে না ?

অপাত্রে হবে কেন ? গ্রামের গরিব মানুষেরা পাবে।

দান-খয়রাত যোগ্যপাত্রে হওয়া উচিত। ওরা কী বলবে জানো ? ওরা বলবে নাম কামাবার জন্যে করেছে। বলবে এবং 'শালা দালাল!' বলে গালি দিবে।

দিক না। দাদা তো আর শুনবে না। সে তো ভেগেই যাচ্ছে।

ফুপা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে এরকম অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলো তোমরা, আশ্চর্য!

শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার না। যেটা সত্যি সেটা বললাম।

মদের গন্ধ পাচ্ছি, মদ খাচ্ছিলে নাকি ?

জি, তা খাচ্ছিলাম।

আমি তাদের দুজনকে সেখানে রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি দুজনে এবার লেগে যাবে। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। খোলা ছাদে বসে একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিছু ভালো লাগছে না।

আমাদের এ বাড়ির ছাদটি শুধু যে সুন্দর তাই নয়, অপূর্ব। এর পেছনের সমস্ত কৃতিত্বই শাহানার। ফুলের টব এনে ফুল ফুটিয়ে এমন করেছে যে ছাদে না ওঠা পর্যন্ত কেউ ভাবতেও পারবে না কত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সমস্ত ছাদকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাগের নাম 'গোলাপকুঞ্জ'। গোলাপকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বসার জন্যে গদিওয়ালা মোড়া। বৃষ্টির আগে তা ভেতরে নিয়ে আসা হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

আমি ছাদে পা দিয়েই দেখলাম গোলাপকুঞ্জের একটি মোড়াতে বাবা বসে আছেন। তাঁকে দেখেই চট করে নিচে নেমে যাওয়া যায় না। আবার ছাদে ঘোরাঘুরিও করা যায় না। আমি হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় করি।

বাবা বললেন, টগর, নিচের কোনো খবর আছে ?

জি-না।

আসো এদিকে।

বাবা পাইপ ধরালেন। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে এসে বসো, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

আমি এগিয়ে এলাম। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মা মারা যাওয়ার পর আমি খানিকটা লোনলি হয়ে পড়েছি। এই বয়সেই মানুষের সবচেয়ে বেশি কোম্প্যানি প্রয়োজন।

জি, তা ঠিক।

বসো তুমি এখানে।

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসলাম।

তোমার রেজাল্ট হচ্ছে কবে ?

ঠিক জানি না।

বাবা গম্ভীর হয়ে পাইপ টানতে লাগলেন। দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় পাই। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা মুশকিল। বাবা হঠাৎ নরম স্বরে বললেন, তোমরা আমাকে এড়িয়ে চল। কী কারণ বলো তো ?

আমি কুল কুল করে ঘামতে লাগলাম।

তোমার দাদার অবস্থা কেমন দেখলে ?

বেশি ভালো না।

তাঁর কাছে কে আছেন ?

বড় চাচা আর ছোট চাচা এই দুজনকে দেখে এসেছি।

বাবা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গতকাল খবর পেয়েছি তোমার ছোট চাচা চিটাগাং-এ একটা বাড়ি করেছেন। আমি কিছুই জানতাম না। লুকানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি কথা বললাম না। বাবা যখন কারও সঙ্গে কথা বলেন তখন কথা বলবার ব্যাপারটা তিনিই সারেন। অন্যদের শুধু শোনার দায়িত্ব।

তোমাদের দাদা মারা যাওয়ার পর বড় ধরনের ঝামেলা হবে। তোমার ফুপুরা খুব হৈচৈ করবে। বাবা ওদের সম্পত্তি বা টাকাপয়সা কিছুই দিয়ে যাননি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। মাস তিনেক আগে উইল করা হয়েছে। তোমার দাদার এ বিষয়ে লজিক খুব পরিষ্কার। তোমার ফুপুদের বিয়ের সময় বাড়ি দেওয়া হয়েছে। ক্যাশ টাকাও দেওয়া হয়েছে। জানো নিশ্চয়ই ?

জি জানি।

অবশ্যি এসব কিছুই তাদের মনে থাকবে না। দুজনেই হৈচৈ করবে। দুজনেই বলবে ইচ্ছে করে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কেইস টেইস হওয়াও বিচিত্র না।

আমি উসখুস করতে লাগলাম। চট করে উঠে যাওয়া যাচ্ছে না। আবার বসেও থাকা যাচ্ছে না। এসব শুনতে ভালো লাগছে না।

আপনি কি চা-টা কিছু খাবেন ?

নাহ্।

ঠান্ডা বাতাস বইছে। শীত শীত লাগছে। আমি বললাম, নিচে যাই, দেখি কী হচ্ছে।

বসো একটু।

আমি বসে রইলাম। বসেই রইলাম। বাবা ক্লান্তস্বরে বললেন, কয়েকদিন আগে তোমার মাকে স্বপ্নে দেখলাম। খুব কান্নাকাটি করছিল। তুমি তাকে স্বপ্নে দেখ ?

জি-না।

স্বপ্নটা কেন যে দেখলাম। স্বপ্নের কোনো মানে থাকে কি না কে জানে ?

স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই।

বোধহয় তাই।

আজকাল আমি তোমার মায়ের কথা প্রায়ই ভাবি।

আমি চুপ করে রইলাম। একবার ভাবলাম বলি, ভাবেন নাকি ?

বললাম না। অনেক কিছু যা বাবাকে বলতে ইচ্ছে করে, তা শেষ পর্যন্ত বলা হয় না। বাবাও বোধকরি অনেক কিছু বলতে চান, শেষ পর্যন্ত বলেন না।

তোমার দাদা তোমার মাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

জানি।

সবটা জানো না। তোমার যখন জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তখন তোমার দাদা অন্য মানুষ।

ও।

তোমার মা'র বিয়ে হয় তের বছর বয়সে। আমার সঙ্গে নানা কারণে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। সে ছিল ঘরোয়া ধরনের মেয়ে। মেয়েলিপনা ছাড়া তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না।

বাবা কথা বন্ধ করে খুকখুক করে খানিকক্ষণ কাশলেন।

তোমার মাকে আমি পছন্দ করিনি। সে রাতদিন কাঁদত। তোমার দাদা তাকে আদর দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। সে যে কী অসম্ভব আদর, চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। তোমার মা একবার কমলা খেতে চেয়েছিল। বাবা এক গরুর গাড়ি বোঝাই করে কমলা এনেছিলেন। সেই থেকে তোমার মা'র নাম হয়ে গেল 'কমলা বউ'।

বাবার গলা কি কিঞ্চিৎ ভারী হয়েছে ? খুব সম্ভব না। বাবা ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

তোমার মাকে আমি ভালোবাসতে শুরু করেছি তাঁর মৃত্যুর পর। ওটা খুব কষ্টের ব্যাপার।

আমি উসখুস করতে লাগলাম। আমার চলে যেতে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবার সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যেস আমার নেই। আমাদের কারোই নেই। আবার উঠে যাওয়ার সাহসও হয় না। বিশ্রী অবস্থা।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয় নতুন করে জীবন শুরু করার একটা সুযোগ থাকা উচিত। এমন একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে সবাই একটা করে সুযোগ পাবে।

তা হলেও দেখবেন সবাই আবার ভুল করবে।

আমি করব না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ হয়তো আসছে, এত রাতে ছাদে আসবে কে ? শাহানা নাকি ? শাহানা মাঝে মাঝে অসময়ে ছাদে এসে তার ফুল গাছের সঙ্গে কথা বলে। এই মেয়েটির মনে ভয়-টয় কিছুই নেই।

শাহানা এসে ঢুকল চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

মামা, আপনার জন্যে একটু কফি এনেছি।

বুঝলি কী করে আমি এখানে ?

খুঁজে খুঁজে এসেছি।

বাবা হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে কফি নিলেন।

এই বাড়ির একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে বাবার সহজ সম্পর্ক আছে।

একমাত্র শাহানার সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার মুখের কঠিন দাগগুলি কোমল হয়ে আসে। শাহানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নিচে আসো টগর, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

মামা, আপনার চিনি লাগবে না তো ?

নাহ্।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শাহানা বলল, খুব একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে।

কী ?

নীলুদের বাসায় আজ রান্না হয়নি।

রান্না হয়নি মানে ?

হয়নি মানে হয়নি। রান্না করার মতো কিছু ছিল না। ঘরে টাকাপয়সাও ছিল না।

বলো কী ?

নীলুর বাবার আজ মাসখানেক ধরে চাকরি নেই।

শুনলে কার কাছ থেকে ?

নীলুর কাছ থেকেই শুনলাম। নীলু খুব কান্নাকাটি করছে।

সিঁড়ির উপর আমরা বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা মৃদুস্বরে বলল, পৃথিবীতে অনেক রকম কষ্টের ব্যাপার হয়। আমার নিজেরও অনেক দুঃখকষ্ট আছে, কিন্তু—

সারা দিন কিছু খায়নি ?

তা জানি না, তবে ভাত সম্ভবত খায়নি।

সারা দিন ভাত খায়নি এরকম লোকের সংখ্যা এদেশে অনেক। কিন্তু পরিচিত কেউ না খেয়ে আছে এটা গ্রহণ করা যায় না। প্রচণ্ড রাগ লাগে। বিকাল বেলায় দেখেছি বাচ্চাগুলি বাগানে ছুটাছুটি করছে। সবচেয়ে ছোটটি আমাকে দেখে ডাকল— এ্যাই, এ্যাই। আমি ফিরে তাকাতেই কদম গাছের আড়ালে গিয়ে লুকাল। এটি তার মজার খেলা। আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, ধরে ফেলব। বাচ্চা দুটি দৌড়ে পালাতে গিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখি একজনের হাঁটুর কাছটায় ছিলে গেছে, কিন্তু কাঁদল না। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে উৎসাহী গলায় বলল, বাঘ বাঘ খেলবে ? আর এই বাচ্চারা ভাত খায়নি ? আমি দীর্ঘসময় চুপচাপ শাহানার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা বলল, আমার যা খারাপ লাগছে। আজ নিশ্চয় প্রথম নয়, আগেও হয়তো হয়েছে। আমি বললাম, রমিজ সাহেব লোকটির প্রকাশ্যে শাস্তি হওয়া দরকার।

রমিজ সাহেব কী করল ?

আমি তার জবাব দিলাম না।

শাহানা মৃদুস্বরে বলল, তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই।

বলো।

নীলুর বিয়ের কথা হচ্ছে। তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নীলুকে রাজি করাও। ওর জন্যে ভালোই হবে। ছেলে খারাপ না।

আমি রাজি করাবার কে ?

তুমি ভালো করেই জানো তুমি কে!

শাহানা গা-জ্বালা-ধরানো শীতল হাসি হাসল। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি বলব। নীলু কোথায় ?

এখনই বলতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।

ঝামেলা চুকিয়ে ফেলি।

আর যদি সাহস থাকে তাহলে—

তাহলে কী ?

ওকে ডেকে এমন একটা কথা বলো যা শুনবার জন্যে মেয়েদের মন তৃষিত হয়ে থাকে।

তৃষিত হয়ে থাকে ?

হুঁ, বাংলাটা অবশ্যি একটু কঠিন বলে ফেললাম।

শাহানা হাসল। আমি নিচে এলাম। বাবু ভাই সিঁড়ির কাছে উগ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেট হাতে সে কখনো প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে না।

ব্যাপার কী বাবু ভাই ?

কিছু না।

ছোট ফুপা কোথায় ?

জানি না।

তার সঙ্গে সিরিয়াস একটা ফাইট দিলে মনে হয়।

বাবু ভাই জবাব দিল না। আমি বললাম, চল দাদার অবস্থাটা দেখে আসি।

দেখার কী আছে ?

দেখার কিছু নেই ?

বাবু ভাই উত্তর না দিয়ে হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। সে মনে হচ্ছে অত্যন্ত বিরক্ত। তার বিরক্তির আসল কারণ টের পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পর, যখন দেখলাম বড় চাচাকে। বড় চাচার চেহারা ভূতে পাওয়া মানুষের মতো। দিশাহারা চাউনি। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছেন না, জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আমার হাত ধরে একটা অন্ধকার কোনার দিকে নিয়ে গেলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, টগর, বাবু নাকি উপরে বসে মদ খাচ্ছে ?

বলেছে কে আপনাকে ?

তোর ছোট ফুপা বললেন। মদ খেয়ে নাকি মাতলামি করছে ?

বড় চাচা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। আমি নিজেকে সামলে সহজভাবে বললাম, ছোট ফুপা কি সবাইকে এইসব বলে বেড়াচ্ছেন ?

তুই আগে বল এটা সত্যি কি না ?

সত্যি না চাচা।

তুই আমার গা ছুঁয়ে বল।

গা ছুঁয়ে বলার কী আছে, যত সব মেয়েলি ব্যাপার।

হোক মেয়েলি ব্যাপার। তুই আমার হাত ধরে বল।

আমি বড় চাচার হাত ধরে শান্তস্বরে বললাম, বিশ্বাস করুন চাচা, কথাটা ঠিক না। মিথ্যা বলব কেন?

বড় চাচা চোখ লাল করে বললেন, তুই নিজে মিথ্যা বলছিস।

কী যে বলেন। মিথ্যা বলব কেন?

বড় চাচা গম্ভীর স্বরে বললেন, বাবা ওকে যতটা ভালোবাসেন কাউকে তার সিকি ভাগও বাসেন না। সে কি না এরকম একটা সময় মদ খাচ্ছে? হারামজাদা কোথাকার! টগর, তুই বাবুকে গিয়ে বল সে যেন এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

কী যে আপনি বলেন চাচা।

যা তুই এক্ষুনি গিয়ে বল।

এক্ষুনি বলতে হবে কেন? ঝামেলার মধ্যে নতুন ঝামেলা।

সে যদি বাড়ি ছেড়ে না যায়, আমি যাব।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বলছি।

বলবি সে যেন এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে যায়।

ঠিক আছে।

এবং কোনোদিন যেন এবাড়িতে তার ছায়া না দেখি।

বলব।

মদ খাওয়ার ব্যাপারটা দেখলাম বেশ একটা আলোড়ন তৈরি করেছে।

মোটামুটি সবাই জানে। চাচা বিদেয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় ফুপুর সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর ভারী শরীর নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, বাবু নাকি মাতলামি করছে?

মাতলামি করবে কেন?

বেহেড মদ খেয়েছে, তাই মাতলামি করছে।

বলেছে কে আপনাকে?

তুই এত জেরা করার বদভ্যাস কোত্থেকে পেলি?

আমি চুপ করে গেলাম। বড় ফুপু আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন, বংশের সম্মানটার কথা কেউ ভাবল না, আশ্চর্য। এত বড় পীর বংশ। এত নামডাক।

দারুণ একটা মিথ্যা কথা এটা। ইদানীং লক্ষ করছি বড় ফুপু বংশমর্যাদা বাড়াবার চেষ্টায় নেমেছেন। অপরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুরু করছেন পীর বংশ। খুব খানদানি ফ্যামিলি।

আমাদের গোষ্ঠীতে পীর ফকির কেউ নেই। দাদার বাবা ছিলেন চাষা। জমিজমা তেমন ছিল না। কাজেই শেষের দিকে পানের ব্যবসা শুরু করেন। সেতাবগঞ্জ থেকে পানের ঝাঁকা মাথায় করে এনে নীলগঞ্জ বাজারে বিক্রি করতেন। এতে তেমন কিছু ভালো-মন্দ না হওয়ায় ডিমের কারবার করতে চেষ্টা করেন। চাষা সমাজ থেকে নির্বাসিত হন ডিম বেচার কারণে। তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ে আটকে যায়। ডিম বেচা ব্যাপারির সঙ্গে সম্বন্ধ করা যায় না। খুবই দুর্দিন গেছে বেচারার।

এইসব তথ্য দাদার কাছ থেকে পাওয়া। হতদরিদ্র মানুষ যখন দারুণ বড়লোক হয়ে যায় তখন তারা অভাবের গল্প করতে ভালোবাসে। দাদা যখন সুস্থ থাকেন এবং কথা বলার মতো কাউকে পান তখন শুরু করেন পুরনো দিনের গল্প। কবে পরপর দুদিন পেয়ারা খেয়ে ছিলেন। কবে বেতন না দেওয়ার জন্যে স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং তার বাবা গিয়ে হেডমাস্টার সাহেবের পা ধরে বসেছিলেন একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে। হেডমাস্টার সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন—মেট্রিক পাস করে হবে-টা কী ? ছেলেকে কাজে লাগান, সংসারে সাহায্য হোক। দাদার মেট্রিক পাস করা হলো না। তিনিও ডিমের ব্যবসা শুরু করলেন। তার চল্লিশ বছর পর নীলগঞ্জে একটি হাইস্কুল এবং একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ দিলেন। দুটিই অবৈতনিক। স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। এখনো করেন।

অভাব এবং অহঙ্কারের গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে না। শুধু আমার একার না, কারোই ভালো লাগে না। কাজেই বেশির ভাগ গল্প শুনতে হতো শাহানাকে এবং সে মেয়েলি ভঙ্গিতে 'আহা উহু' করত—বলেন কী নানাভাই, এরকম অবস্থা ছিল ? কী সর্বনাশ! থাক থাক, আর বলবেন না, কষ্ট লাগে।

দাদা তাতে উৎসাহ পেয়ে আরও সব ভয়াবহ কষ্টের বর্ণনা শুরু করতেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

পৃথিবীতে বৃদ্ধদের মতো বিরক্তির আর কিছুই নেই। বৃদ্ধরা অসুন্দর বুদ্ধিহীনা নারীর চেয়েও বিরক্তিকর। বাবু ভাইয়ের মতে পঞ্চাশের পর এদের সবাইকে কোনো একটি দ্বীপে চালান করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করা উচিত। যেখানে সব বুড়ো বুড়ি মিলে একসঙ্গে বকবক করবে। ছ'মাসে একবার জাহাজ গিয়ে তাদের খাবারদাবার দিয়ে আসবে।

আমাদের বংশ দীর্ঘজীবী বংশ। দাদার ডিমবেচা বাবা মারা গিয়েছিলেন প্রায় একশ বছর বয়সে। শেষ সময়ে চোখে দেখতেন না, কানে শুনতেন না, চলৎশক্তি ছিল না। দিনরাত নিজের মলমূত্রের মধ্যে বসে থেকে পশুর মতো গোঁ গোঁ করতেন। সবই শোনা কথা। মা'দের কাছ থেকে শুনেছি। দাদার এই অতি বৃদ্ধ বাবাকে দেখবার কেউ ছিল না। তিনি গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকতেন। সেখানে তখনো সেই প্রকাণ্ড দালান (যা পরে 'নীলমহল' নামে খ্যাত হয়) তৈরি হয়নি। দাদা সবে টাকাপয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছেন। বন্যার মতো সম্পদ আসা শুরু হয়নি।

মানুষের মল এবং মূত্রের মধ্যে জীবনদায়িনী কিছু হয়তো আছে। দাদার বাবা, মলমূত্র মেখে প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু বার্ধক্যজনিত কারণে হয়নি। হয়েছিল ইঁদুরের কামড়ে। শোনা যায় ইঁদুর কামড়ে তাঁর নাভির কাছ থেকে মাংস তুলে নিয়েছিল। সেই কামড় বিষিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলের সীমাহীন ক্ষমতার কিছুই তিনি চোখে দেখে যেতে পারেননি।

তাঁর মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যেই নীলমহল তৈরির কাজ শুরু হয়। সে নাকি এক রাজকীয় ব্যাপার। গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল—ডিম বেচা খবির মিয়ার ছেলে সোনার মাইট পেয়েছে। রাজা-বাদশাদের সঞ্চিত গোপন স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ সাতটা ঘড়া। সবাই বলত এইসব পাপের অর্থ কি আর ভোগে লাগবে ? লাগবে না। তাদের কথা আংশিক ফলে গেল। দাদা বা তাঁর বংশধররা কেউ সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকল না। দাদার দশা হলো বাবুই পাখির মতো। বাবুই পাখি বহু কষ্টে বহু মমতায় চমৎকার একটি বাসা বানায়, সে নিজে বাসাটিতে বাস করতে পারে না। রোদ-বৃষ্টি-বাদলে বসে থাকে বাইরে, বাসায় নয়। তার চোখের সামনে ভালোবাসায় তৈরি বাসাটি হাওয়ায় দোল খায়।

দাদারও তাই হলো। নীলমহলে তিনি গিয়ে উঠতে পারলেন না। কোথাও হাওয়া নেই। নীলমহলের জানালা আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে। রাতেরবেলা খড়ম পায়ে বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কে যেন হাঁটে। নীলমহলের ছাদে নাকি আগুনের কুণ্ড হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে। আজগুবি সব ব্যাপার। নিশ্চয়ই এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিংবা সবটাই মনগড়া। কিন্তু মানুষ মাত্রই কিছু-না-কিছুতে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। দাদা নীলমহল ছেড়ে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে এলেন বাস করতে।

সেই চমৎকার বাড়িটির জন্যে তার কি মন কাঁদে ? তাঁর ভালোবাসার নীলমহল। মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত অতীত নাকি ছবির মতো ভেসে ওঠে। নীলমহলের অতীত কি আসছে তাঁর সামনে ? আজ কি তাঁর মনে হচ্ছে সমস্ত অর্থহীন ? নীলমহল-লালমহল কোনো মহলই কাজে আসে না। আজ তাঁর যাত্রা অজানা এক মহলের দিকে, যার রঙ তাঁর জানা নেই।

ছোট ফুপা কাগজকলম নিয়ে বসেছেন। দাদার কিছু একটা হয়ে গেলে গণ্যমান্য যাদেরকে খবর দেওয়া হবে তাদের নাম-ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা হচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনি ফুলস্কেপ কাগজ তিন-চারটা ভরিয়ে ফেললেন। বাবু ভাইকে বললেন, দেখ তো কেউ বাকি আছে কি না ?

বাবু ভাই না তাকিয়েই বললেন, না, সবাই আছে।

না দেখেই কী করে বললি ?

দেখতে হবে না। যা লিখেছেন ঠিকই লিখেছেন। সবাই আছে।

কেউ বাদ গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

কেন ?

ফুপা বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। বরফ শীতল স্বরে বললেন, সামাজিকতার একটা ব্যাপার আছে।

মানুষ মারা যাচ্ছে এর মধ্যে আবার সামাজিকতা কী ?

মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সামাজিকতা নেই ?

না। এটার মধ্যে এসব কিছু নাই।

বাবু ভাই হাই তুললেন। তিনি ফুপাকে রাগাতে চাইছেন। ফুপা গম্ভীর স্বরে বললেন, এটা একটা খানদানি ফ্যামিলি। জলে ভাসা ফ্যামিলি না। খানদানি ফ্যামিলিতে অনেক রকম সামাজিকতা আছে।

খানদানি! আমরা আবার খানদানি হলাম কবে ? আমি যতদূর জানি আমাদের পূর্বপুরুষ চাষা ছিলেন। কেউ কেউ হাটে গিয়ে ডিম বেচতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন সিঁধেল চোর ছিল। কাল্লুচোরা নাম।

এরকম কোনো কিছু তো জানি না।

আমি জানি।

ছোট ফুপা মুখ অন্ধকার করে ফেললেন।

বাবু ভাই বললেন, একটা লোক মারা যাচ্ছে, তাকে মরতে দিন।

কিসের সঙ্গে কী বলছ ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

মাথা ঠিকই আছে। ঠিক আছে বলেই বলছি আমরা খানদানি ফানদানি না।

ছোট ফুপা গম্ভীর হয়ে বললেন, তর্ক করা তোমার একটা বদঅভ্যাস। এটা ছাড়া উচিত।

বাবু ভাই ঘাড় মোটা করে বললেন, আমাদের খানদানি কী জন্যে বলছেন, সেটা আগে বলুন।

তোমরা খানদানি না ?

না।

বেশ তো ভালো কথা। তোমার ইচ্ছাটা কী ? কাউকে কোনো খবর দেওয়া হবে না ?

খবর দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

তুমি ঠিক সোবার অবস্থায় নেই। তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই না।

কথা বলতে না চাইলে বলবেন না।

ছোট ফুপা মুখ কালো করে উঠে গেলেন।

আমি খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম। মাথা ব্যথা করছে। আমার টেবিলের ড্রয়ারে এনাসিন আছে। কিন্তু বাবু ভাই ঘর বন্ধ করে বসে আছেন। দরজায় ধাক্কা দিতেই তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, কে ?

আমি।

যা এখন।

ঘুমাচ্ছ নাকি ?

না, ঘুমাচ্ছি না। তুই যা, বিরক্ত করিস না।

দরজাটা একটু খোলো।

বাবু ভাই জবাব দিলেন না।

রান্নাঘরে আকবরের মাকে দেখা গেল কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে গ্যাসের চুলায় একটা মাঝারি আকারের ডেকচিতে পানি ফুটছে। নির্ঘাৎ আকবরের মা'র কাণ্ড। পানি ফোটাতে দিয়ে ঘুমুতে শুরু করেছে।

কাউকে ঘুমুতে দেখলেই ঘুম পায়। আমি হাই তুললাম। তারপর একসময় আবার নেমে এলাম নিচে।

নিচের বারান্দা জনশূন্য। মৌলানা সাহেব পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে বসার ঘরে তাঁর ঘুমাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মৃত্যুর অপেক্ষা করতে গিয়ে সবাই বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দাদার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—সিরিয়াস ব্যাপার। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে হ্যাঙ্গার জাতীয় জিনিসে। মোটামুটি একটা হাসপাতাল। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। রোগীর মনে হয় অক্সিজেন দেওয়ায় কিছুটা আরাম হয়েছে। ছটফটানি নেই। নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন।

এদিকে বড় চাচির ঘুম ভেঙেছে। তিনি একটি মোটামতো নার্সের সঙ্গে আলাপ করছেন। বড় চাচির মুখ গম্ভীর। নার্সটির মুখ হাসি হাসি। নার্সটি কখন এসেছে কে জানে।

ছোট ফুপার কাণ্ড নিশ্চয়ই।

একবার দাদার শরীর খারাপ হলো। ব্লাড প্রেসার বা এই জাতীয় কিছু—মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। খবর পাওয়া মাত্র ছোট ফুপা একজন নার্স নিয়ে উপস্থিত। দিনরাত এখানে থাকবে। নার্সটির নাম ছিল সুশী। খ্রিষ্টান। বয়স কম। খুব মিষ্টি চেহারা। এমন সুন্দরী নার্স থাকে আমার জানা ছিল না। সুশী সেই জাতীয় নার্স যাদের সঙ্গে হাসপাতালের ইন্টার্নি ডাক্তারদের প্রেম হয়। রোগীরা যাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল থাকে।

সুশী অল্প সময়ের মধ্যে দাদাকে সারিয়ে তুলল। দুদিনের মধ্যে দেখা গেল দাদা বারান্দায় ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সুশী তার পাশে অন্য একটি চেয়ারে বসে গম্ভীর মুখে ফুস ফুস করে সিগারেট টানছে। মাঝে মাঝে দাদা কী সব বলছেন, সুশী সে সব শুনে খুব হাসছে। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দাদা কি ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন ?

দাদা সেবার সুশীকে উপহার হিসেবে একটি রাজশাহী সিল্কের শাড়ি এবং কাশ্মীরী শাল দিলেন। উপহার পেয়ে তার কোনো ভাবান্তর হলো না। যেন এরকম উপহার সে সবসময়ই পেয়ে আসছে।

রেগে গেলেন বড় ফুপু। খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। একটা নার্সকে দু'হাজার টাকার শাল ? বাবার না হয় মাথা খারাপ, তাই বলে কি অন্য সবারও মাথা খারাপ, কেউ একটা কথা বলে না ?

আমি ফুপুকে বললাম, আপনি যখন এসেছেন আপনিই বলুন।

বলবই তো, এক'শ বার বলব। একটা রাস্তার মেয়েকে দু'হাজার টাকার শাল দেবে কেন ?

রাস্তার মেয়ে হবে কেন ? নার্স একজন। ভালো নার্স। দাদাকে সারিয়ে তুলেছে।

বাজে বকবক করিস না তো। এক্ষুনি যাচ্ছি আমি বাবার কাছে।

ফুপু ছুটে গেলেন দাদার ঘরে, ফিরে এলেন মুখ অন্ধকার করে।

কী কথাবার্তা হলো জানা গেল না।

অবশ্যি আজকের এই নার্সটির চেহারা বাজে। মুখে বসন্তের দাগ। বিরাট স্বাস্থ্য। মাংসের চাপে চোখ ছোট হয়ে গেছে।

আমাকে উঁকি দিতে দেখেই নার্সটি চট করে রোগীর কাছে গেল। অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে স্যালাইনের বোতলটি নেড়েচেড়ে দিল। এ সুশীর মতো নয়। সুশী এখানে থাকলে দাদার শরীর হয়তো অনেকখানি সেরে যেত। আমার ধারণা চোখ মেলে এই নার্সটিকে দেখামাত্র আবার দাদার হাঁপানির টান উঠবে।

বড় চাচি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন আমার কাছে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, নার্সকে আনল কে ?

জানি না।

বড় চাচি আমার সঙ্গে বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

আমি বললাম, শুধু আপনারা দুজন ? আর মানুষজন কোথায় ?

জানি না কোথায় ?

আমি লক্ষ করলাম বড় চাচি কথা বলছেন খুব নিচু গলায়। কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকলে তাঁর এরকম হয়। কথাই শুনতে পাওয়া যায় না।

শুনেছিস নাকি, তোর বড় চাচা বাবুকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে ?

কী যে বলেন!

হ্যাঁ, করেছে। আমাকে বলল।

এইসব কিছু না চাচি। মুসলিম আইনে ত্যাজ্যপুত্র হয় না।

তোকে কে বলল ?

আমি জানি। হিন্দু আইনে হয়, মুসলিম আইনে হয় না। আর খামাকা ত্যাজ্যপুত্র করবে কেন ?

মদ খেয়ে মাতলামি করছিল এই জন্যে করেছে।

না চাচি, এই সব কিছু না।

বড় চাচির মুখ সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে উঠল। ইনি যে-কোনো কথা বিশ্বাস করেন। তাঁকে কেউ যদি এসে বলে—দেখে এলাম বুড়িগঙ্গায় একটা মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, সত্যি ? কথা বলতে পারে ? চুল কত বড় ?

মানুষের বুদ্ধি যে ঠিক কতটা কম হতে পারে তা চাচিকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

বুঝলি টগর, আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোকের ছেলে মদ খাবে কি ?

আমি বললাম, কেউ যদি খায়ও সেটা কোনো সিরিয়াস ব্যাপার না। ওষুধের সঙ্গে তো সবাই খাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হুঁ। হোমিওপ্যাথি ওষুধের সবটাই তো মদ।

তুই জানলি কোত্থেকে ?

এটা নতুন কথা নাকি ? সবাই জানে।

আগে আমাকে বলিস নাই কেন ?

আগে বললে আপনি কী করতেন ?

তাও ঠিক, কী আর করতাম।

বড় চাচি নিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসলেন, তাঁর বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। আমাকে বললেন, তোর চাচা এমনভাবে বলল কথাটা আমি বিশ্বাস করে ফেলছিলাম।

সবকথা এরকমভাবে বিশ্বাস করবেন না চাচি।

না, এখন থেকে আর করব না।

এই সময় বড় ফুপুকে উত্তেজিতভাবে নিচে নামতে দেখা গেল। আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। যেন আমাদেরই খুঁজছিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, নীলু নামের এই মেয়েটির ঘরে নাকি আজ রান্না হয়নি ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এরকম চেঁচানির কী মানে ?

বড় চাচি কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে থাকলেন।

কার ঘরে রান্না হয়নি ?

ঐ যে তোমাদের ভাড়াটে। নীলু নামে যে মেয়েটি।

আমি বললাম, যা বলবার আস্তে বলেন ফুপু।

আস্তে বলব কেন ?

ওরা শুনবে।

শুনলে শুনবে। তোর আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এই রকম ভিখিরি শ্রেণীর মেয়ে, আর তুই ওর সঙ্গে দিব্যি বিয়ের কথাবার্তা চালালি ?

বড় চাচি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে ? কই আমি তো কিছুই জানি না ?

তুমি চুপ করো ভাবি। তোমার কিছু জানতে হবে না। টগর, তোদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোদের উপর নির্ভর করে আমি অনেকবার বেইজ্জত হয়েছি। মেয়েটাকে আমি বাসা পর্যন্ত যেতে বলেছি।

বলে দিলেই হয় যেন না যায়।

হ্যাঁ বলব। একদম রাস্তার ভিখিরি, ঘরে হাঁড়ি চলে না।

আস্তে বলুন, চিৎকার করছেন কেন ফুপু।

চিৎকার করব না ? তোদের কোনো মান অপমান নেই বলে কি আমারও নেই ? যত ছোটলোকের আড্ডা হয়েছে। সমস্ত ছোটলোকদের আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। পেয়েছ কী ?

দারুণ একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল।

বড় চাচা এলেন। বাবা নেমে এলেন তিনতালা থেকে। নীলু এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। রমিজ সাহেব এলেন আমাদের বসার ঘর থেকে। সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বললেন, কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি। নীলু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, উনি এসব কথা বলছেন কেন ?

তুমি দাদার ঘরের দিকে একটু যাও তো নীলু। দেখে আসো কিছু লাগবে কি না।

নীলু নড়ল না। আমি লক্ষ করলাম সে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

বড় ফুপু সমানে চেঁচাচ্ছেন—যত রাস্তার ছোট লোক দিয়ে বাড়ি ভর্তি করা হচ্ছে। এদের ঘাড় ধরে আমি বিদায় করব। আমার ছেলের সঙ্গে একটা ভিখিরির মেয়ের বিয়ের কথা বলেছে। এত বড় সাহস ?

নীলু বলল, আপনি চুপ করুন।

বড় ফুপু চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মাথা থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে নীলু বলল, বাবা, তুমি যাও এখান থেকে।

রমিজ সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

এই অবস্থা স্থায়ী হলো না। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, কিসের জটলা হচ্ছে ?

এতেই ভিড় পাতলা হলো। বড় ফুপু এবং চাচি দাদার ঘরের দিকে এগুলেন।

আমি উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। নীলুর দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করলাম। নীলুকে তা স্পর্শ করল না। হালকা স্বরে বললাম, শাহানা কোথায় নীলু ?

নীলু তার জবাব না দিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেল।

শাহানাকে পাওয়া গেল তিনতলার বারান্দায়। সেখানে একটা ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে ছিল। আমাকে দেখেই সোজা হয়ে বসল। তার বসার ভঙ্গিটা ছিল অদ্ভুত। একটা ক্লান্তির ভঙ্গি।

বাবু ভাই কি তাকে কিছু বলেছে ? বিশেষ কোনো কথা। যার জন্যে একটি মেয়ের হৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে।

আমি খুব নরম স্বরে বললাম, বাবু ভাই কি তোমাকে কিছু বলেছে ?

শাহানা জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বারান্দার আলো কম বলেই এতক্ষণ চোখে পড়েনি। এখন দেখলাম শাহানার গাল ভেজা, সে তার ভেজা গাল গোপন করার জন্যেই অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। কারও গোপন কষ্টে উপস্থিত থাকতে নেই। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

শাহানা বলল, নিচে হৈচৈ হচ্ছিল কিসের ?

বড় ফুপু একটা ঝামেলা বাধিয়েছেন। নীলুকে আজেবাজে সব কথা বললেন।

শাহানা কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না। আমি বললাম, তুমি একটু নীলুকে খুঁজে বের করবে। কথা বলবে ওর সঙ্গে ?

শাহানা উত্তর দিল না।

এই সময় নিচে থেকে সাড়াশব্দ হতে লাগল। দাদা কি মারা গিয়েছেন ? আমরা ছুটে নিচে এলাম। দাদার কিছু হয়নি। তিনি তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। হৈচৈ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচিত্র কারণে। রমিজ সাহেব একা একা বাগানে ছুটাছুটি করছেন। যেন অদৃশ্য কিছু তাকে তাড়া করছে। সবাই এসে ভিড় করছে বারান্দায়। আমাদের ড্রাইভার টর্চলাইটের আলো তার গায়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

বড় ফুপু চাপাস্বরে বললেন, পাগল ছাগল আর কী! দিব্যি ভালো মানুষের মতো বসেছিল। হঠাৎ ছুটে চলে গেল।

কদমগাছের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ ভেসে এল। এ হাসি পৃথিবীর হাসি নয়। এ হাসি অচেনা কোনো ভুবনের। যারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছিল, সবাই একসঙ্গে চুপ করে গেল। বাবু ভাই বাগানে নেমে গেল। এগিয়ে গেল কদমগাছের দিকে। নীলুকে দেখা গেল না। শুধু দেখলাম বিলু তাদের দরজার পাশে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর এক সময় ছোট মেয়েটি বাগানে নেমে গেল। চারদিক চুপচাপ। বাগানের শুকনো পাতায় তাঁর হেঁটে যাওয়ার মচমচ শব্দ হতে লাগল।

বাবু ভাই রমিজ সাহেবকে হাত ধরে এনে বারান্দায় বসাল।

রমিজ সাহেবের চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। সমস্ত মুখমণ্ডল ঘামে ভেজা।

বাবু ভাই বললেন, রমিজ সাহেব, এখন কেমন লাগছে ?

ভালো।

আমাকে চিনতে পারছেন ?

জি।

কী নাম আমার বলুন দেখি ?

রমিজ সাহেব নিঃশব্দে হাসলেন।

বিলু তার বাবার শার্ট শক্ত করে ধরে রেখেছে। ভয়ানক অবাক হয়েছে সে।

বাবার কী হয়েছে ? এরকম করছেন কেন ?

ঠিক হয়ে যাবে। মাথায় পানি ঢাললে ঠিক হয়ে যাবে।

বাবু ভাই রমিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

জি হ্যাঁ, লাগছে।

আমি কে বলুন ?

রমিজ সাহেব আবার হাসলেন। নীলু এগিয়ে আসছে। রমিজ সাহেব তাকালেন নীলুর দিকে। তাঁকে দেখে মনে হলো না তিনি নীলুকে চিনতে পারছেন। নীলু ভয় পাওয়া গলায় বলল, বাবার কী হয়েছে ?

দাদা মারা গেলেন ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে।

নব্বই বৎসর আগে দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নব্বই বৎসর পর তিনি তার ছেলেমেয়েদের অসম্ভব বিত্তশালী করে দিয়ে নিঃশব্দে মারা গেলেন।

সকাল হচ্ছে। পুবের আকাশ অল্প অল্প ফরসা হতে শুরু করেছে। অনেকদিন সূর্যোদয় দেখা হয়নি। আমি ছাদের অলিশায় হেলান দিয়ে সূর্যের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। শুধু বাবু ভাই রমিজ সাহেবের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বসে আছে।

আরও অনেক দূরে টিউবওয়েলের পাশে, পাথরের মূর্তির মতো নীলু বসে আছে একা একা। আমার খুব ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলি—নীলু, ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই তো ঠিক হয় না। সকালের পবিত্র আলোয় কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে নেই।

তবু আমাদের সবার মিথ্যা আশ্বাস দিতে ইচ্ছে করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে করছে নীলুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। ভোরের আলো এসে পড়ছে নীলুর চোখেমুখে। কী সুন্দর লাগছে নীলুকে!

প্রথম প্রহর

আমার বয়স প্রায় বত্রিশ।

প্রায় বললাম এইজন্যে যে, মাসের হিসেবে একটু গণ্ডগোল আছে। আমার বাবার খাতাপত্রে লেখা আমার জন্ম ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখ। আমার মা নিজেও বলেন ডিসেম্বর। মা-বাবার কথাই এসব ক্ষেত্রে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আমার যেখানে জন্ম সেই নানার বাড়িতে সবাই জানে আমার জন্ম হয়েছে জানুয়ারির তিন তারিখ। পুরো একটা মাসের গণ্ডগোল।

আমার মায়ের কথায় আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না। কারণ তিনি আমার বাবার সব কথাকেই অভ্রান্ত মনে করেন। বাবা যদি বলেন—না না, ফরিদের জন্ম এপ্রিল মাসে। ডিসেম্বর কে বলল ?—তাহলে প্রথম কিছুদিন মা কিছুই বলবেন না। তারপর বলবেন—হ্যাঁ, তাই তো, ওর জন্মের সময় তো গরমই ছিল। জানালা রাতে খোলা থাকত, স্পষ্ট মনে আছে।

এক মাসের তফাত এমন কিছু না। আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষেরই জন্মের দিন-তারিখে গণ্ডগোল আছে। তবু কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে একমাস খুব কমও নয়। আমার আয়ু যদি বত্রিশ বছর হয় তা হলে একমাস হচ্ছে আমার মোট জীবনের তিনশ' চুরাশি ভাগের এক ভাগ। অনেকটা সময়। তিরিশ দিন মানে হচ্ছে সাতশ' বিশ ঘণ্টা। আরও ছোট করে বললে, পঁচিশ লক্ষ সেকেন্ডেরও বেশি। খুব একটা হেলাফেলা করার মতো ব্যাপার নয়।

গত পনেরোদিন ধরেই এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি ভাবছি। তুচ্ছ বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ গত পনেরোদিন ধরেই আমি হাসপাতালে ভর্তি হবার চেষ্টা করছি। ভর্তি হতে পারলেই তলপেটের ডুওডেন্যালের মুখে একটা অপারেশন হবে। কবুতরের ডিমের মতো একটা টিউমার ডাক্তাররা সারিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবেন।

টিউমারটি ম্যালিগনেন্ট কি না তা আমাকে কেউ বলছে না। ডাক্তাররা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে শুধু বলছেন—আরে, এইসব নিয়ে আপনার এত চিন্তা কিসের ? হাসপাতালে আগে ভর্তি হয়ে যান, তারপর দেখা যাবে। ডাক্তারের কাঁধ ঝাঁকুনিটা আমার ভালো লাগেনি। যেন খুব চেষ্টা করে ঝাঁকানো। এরচেয়েও সন্দেহজনক হচ্ছে—দ্বিতীয়বার যখন এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম এবং ভিজিট দিতে গেলাম, তিনি অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে বললেন—আরে, একবার তো ভিজিট দিয়েছেন, আবার কেন ?

ভিজিট নেওয়ার ব্যাপারে কোনো ডাক্তার আপত্তি করেন বলে জানতাম না। ইনি এই বাড়তি দয়াটি কেন দেখাচ্ছেন ? কেন এই অনুগ্রহ ?

আপনি একটা সিট যোগাড় করেন। দি আরলিয়ার দি বেটার।

চেষ্টা তো করছি, পারছি না তো!

রোজ যাবেন। রোজ খোঁজ নেবেন।

আমি রোজ যাই। হেঁটে যাই। রিকশা করে ফিরি। ঘণ্টাখানিক সময় কাটে হাসপাতালে। খুব যে খারাপ কাটে তা না। অ্যাডমিশন সেকশনের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার খাতির হয়েছে। একজন হচ্ছে মতি ভাই। অসম্ভব রোগা মানুষ। সাধারণত রোগা মানুষেরা লম্বা হয়, মতি ভাই বেঁটে। তাঁর কাছে বসলেই তিনি নিচুগলায় অনবরত কথা বলেন। বিরক্তিতে কপাল কোঁচকান এবং কিছুক্ষণ পরপর দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচান। আমাকে দেখলেই চায়ের অর্ডার দিয়ে গলা নিচু করে বলেন, হবে হবে, ধৈর্য ধরেন।

আমি ধৈর্য ধরি। খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে ঘরে ফিরে এক মাসের হিসাব করি।

এক মাস হচ্ছে সাতশ বিশ ঘণ্টা। তেতাল্লিশ হাজার দুশ' মিনিট। পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সেকেন্ড। দীর্ঘ সময়।

২

আমার বন্ধুরা শেষপর্যন্ত একটা কেবিন যোগাড় করে ফেলল। কেবিন নাম্বার দু'শ এগারো। বন্ধুবান্ধবরা যোগাড় করল বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, করল মনসুর। বিয়ে করার পর তার কিছু নতুন যোগাযোগ হয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন, যে-কোনো কারণেই হোক, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে চেনে। মনসুরের বিয়েতে একজন মেজর জেনারেল পর্যন্ত এসেছিলেন। মেজর জেনারেলদের চেহারা এমন সাধারণ হয় আমার জানা ছিল না। এরাও পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বিয়ে খেতে আসে এবং রোস্টের টুকরা বদলে দিতে বলে, দেখে আমি যথেষ্ট অবাক হয়েছিলাম। মনসুরের শ্বশুর তাঁকে 'তুই তুই' করে বলেছিলেন, সেও এক বিস্ময়।

আমার সিট যোগাড় করার ব্যাপারে এই ভদ্রলোকের হাত আছে বলে আমার ধারণা। মনসুর অবশ্য ভেঙে কিছু বলল না। শুধু বলল, খুব ভালো ঘর। দিনরাত হাওয়া খেলে। ভাবটা এরকম যেন হোটেলের ঘর পছন্দ করছি। হাওয়া খেললে নেব, নয়তো নেব না। আমি বললাম, কবে যেতে হবে?

সোমবার। সোমবারে খালি হবে। যে আছে সে রিলিজ হয়ে যাবে।

জন্মের রিলিজ নাকি?

আরে না। অসুখ সেরে গেছে। এখন পেশেন্ট বাড়ি যাচ্ছে।

বলেই মনসুর গলা টেনে অনেকক্ষণ ধরে হাসল, যার মানে হচ্ছে পেশেন্টের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক নয়। পুরোপুরিই রিলিজড হয়ে অন্য কোথাও যাবে।

মনসুর বলল, তুই প্রিপারেশন নিয়ে নে।

কী প্রিপারেশন নেব?

কাপড়-টাপড় গুছিয়ে ফেল। থার্মোফ্লাস্ক আছে ? নেই, না ? একটা থার্মোফ্লাস্ক দরকার।

থার্মোফ্লাস্ক দিয়ে কী হবে ?

চা-টা খাবি। বললেই এনে দেবে।

মনসুর খুব উৎসাহ দেখাতে লাগল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটায় সে একটা উৎসব নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। যেন খুব ফুর্তির ব্যাপার।

বড় স্যুটকেস আছে ?

নাহ্।

হ্যান্ডব্যাগ তো আছে ?

আছে বোধহয়। দেখ চৌকির নিচে।

মনসুর আমার সবুজ রঙের হ্যান্ডব্যাগ টেনে বের করল এবং তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করতে বসল। কিন্তু সোমবার এখনো অনেক দেরি, আজ মাত্র বুধবার এবং বুধবারও শেষ হয়ে যায়নি। সবে শুরু হয়েছে। এখন বাজছে দশটা। আমি বললাম, চা খাবি ?

খাব। এই হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে যেতে পারবি না। হ্যান্ডেল-ফ্যান্ডেল নেই। আমি একটা নিয়ে আসব। থার্মোফ্লাস্কও আনব।

ঠিক আছে।

আর কী কী লাগবে বল, লিস্টি করে ফেলা যাক।

হাসপাতালে যেতে হলে কী কী নিতে হয় কে জানে! টুথপেস্ট এবং টুথব্রাশ এই দুটি জিনিস নিশ্চয়ই লাগে। টুথপেস্ট আছে। এ মাসের দু'তারিখেই কেনা হয়েছে। চিরুনি নিতে হয় নিশ্চয়ই। নাকি চিরুনি দিয়ে মাথা কেউ আঁচড়ায় না ? রোগীদের এসব করতে নেই।

হাসপাতাল সম্পর্কে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। প্রায় একযুগ আগে বড় আপা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেই যাওয়া ছিল উৎসবের যাওয়া। আমাদের মধ্যে দারুণ হৈচৈ ও উত্তেজনা। একটি প্রকাণ্ড স্যুটকেস ঠেসে বোঝাই করা হলো। সেখানে সকালে পরার শাড়ি, বিকেলে পরার শাড়ি, গায়ে মাখার পাউডার, পানের মসলা সবই আছে। বড় আপা ক্রমাগত কাঁদছে। আমাদের খুব ফুর্তি। সবাই হাসছি। আমি এবং আমার মেজ ভাই ছুটে গিয়ে বেবিট্যাক্সি নিয়ে এলাম। বড় আপা তার বিশাল পেট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠল বেবিট্যাক্সিতে। বড় সুখের যাত্রা। আমার বাবা, যিনি প্রায় কোনো ব্যাপারেই উৎসাহ প্রকাশ করেন না, মুখ সবসময় আমশি করে রাখেন, তাঁকেও দেখা গেল হাতে সিগারেট নিয়ে হাসিমুখে কথা বলছেন। (কথা বলছেন মানে উপদেশ দিচ্ছেন। আমার বাবা উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না।) দুলাভাই লাজুক ভঙ্গিতে বড় আপার পাশে গিয়ে বসলেন। আমার মা বললেন, বজলু, তুমি বাঁ-দিকে বসো। মা'র অনেক ডান-বামের ব্যাপার ছিল। দুলাভাই বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনলেন। মা বেবিট্যাক্সিতে ওঠার আগে তিন মিনিট

দাঁড়িয়ে লম্বা কী একটা দোয়া পড়লেন। খুব সম্ভব সুরা আ'র রহমান। এই দোয়াটি তাঁর খুব পছন্দ। খুব নাকি কড়া দোয়া। খুব কাজের।

বিভিন্ন রকম দোয়া-দরুদ মা'র মুখস্থ। তাঁর কাছে এক কপি *নেয়ামুল কুরআন* আছে। এই গ্রন্থটিকে তিনি যাবতীয় সমস্যার সমাধান বলে মনে করেন। একবার তাঁর বালিশের নিচ থেকে আংটি চুরি হয়ে গেল। তাঁর মুখ হয়ে গেল মরা মানুষের মুখের মতো। দেখলাম, তিনি *নেয়ামুল কুরআনের* পাতা ওল্টাচ্ছেন। সেখানে নাকি হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার একটা দোয়া আছে। সারা দুপুর মা সেই দোয়া পড়লেন। মাঝারি সাইজের এক বালতি চোখের পানি ফেললেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে আংটি পাওয়া গেল। মা গম্ভীর গলায় বললেন, বিশ্বাস তো করিস না, দোয়ার মরতবা দেখলি ?

মা'র দোয়া অবশ্যি সবসময় কাজ করে না। কাজ করলে বড় আপা হাসপাতাল থেকে ফিরত। সে ফেরেনি। বারো-তেরো বৎসর আগের ব্যাপার। এখন আর সবকিছু পরিষ্কার মনে নেই।

কষ্টের ব্যাপারগুলো মানুষের ভালো মনে থাকে না। সে কখনো মনে রাখতে চায় না। কিন্তু সুখের ব্যাপার খুব ভালোভাবে মনে থাকে। কারণ এগুলো নিয়ে প্রায়ই ভাবা হয়। যেমন আমার মেজ ভাইয়ের জার্মানি যাওয়ার ব্যাপারটা। একদিন সন্ধ্যাবেলা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, সে জার্মানি যাচ্ছে।

বাবা প্রচণ্ড ধমক লাগালেন, কী বলছিস এসব ? জার্মানি যাচ্ছি মানে, ফাজলামো ?

বাবা বিদেশযাত্রার পক্ষপাতি নন এবং এজন্যেই ধমকাচ্ছেন তা কিন্তু নয়। তিনি না ধমকে কথা বলতে পারেন না। পরবর্তী সময়ে আমি এর কারণ বের করেছিলাম। বাবার চাকরিটা ছিল ছোট। অফিসে সবাই তাঁকে ধমকাত। বাসায় এসে তা ভুলতে চেষ্টা করতেন। এবং প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে চেঁচাতেন। জার্মানির ব্যাপারেও তিনি চেঁচাতে শুরু করলেন।

পাখা উঠেছে ? জার্মানি ? আমেরিকা ? টাকা দেবে কে ? গাছ থেকে আসবে ? বৃক্ষ থেকে আসবে ?

টাকা দিতে হবে না।

যাবি কীভাবে ? সাঁতার দিয়ে ? এ্যাঁ, সন্তরণ ?

মেজ ভাই থতমত খেয়ে বলল, টাকা ওরা দিচ্ছে। স্কলারশিপ।

আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। চিরকাল শুনে এসেছি, ওর ভাই বাইরে যাচ্ছে, ওর চাচা যাচ্ছে। মামা আমেরিকা থেকে জিনসের প্যান্ট পাঠিয়েছে। খালা জাপান থেকে হাওয়াই শার্ট পাঠিয়েছে। শুধু আমাদের এসব ব্যাপার কখনো ছিল না। কাজেই মেজ ভাইয়ের ব্যাপারটা আমাদের কারও বিশ্বাস হলো না। তবু একদিন সে বেমানান একটা কর্ডের কোট পরে সত্যি সত্যিই জার্মানি চলে গেল। এয়ারপোর্টে বাবা কেঁদেকেটে তার চারপাশে ভিড় জমিয়ে ফেললেন। আরও অনেকের

আত্মীয়স্বজন যাচ্ছিল। তাদের হয়তো কাঁদার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবার কান্না দেখে সবার চোখে পানি এল। একজন অপরিচিত বয়স্ক লোক বাবাকে জড়িয়ে ধরে 'কাঁদবেন না ভাই, কাঁদবেন না ভাই' বলে নিজেও বাবার মতো আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেই ভদ্রলোক গাড়িতে করে আমাদের বাসায় পৌঁছে দিলেন। অনেক টাকা বেঁচে গেল। এয়ারপোর্ট থেকে ফার্মগেট। বাস ভাড়াই নেয় দুটাকা। আমরা এতগুলো মানুষ।

বাবার শোকের ভঙ্গি সবসময়ই এরকম। বড় আপার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি যে গভীর দুঃখের প্রকাশ দেখিয়েছিলেন, জগতের আর কোনো বাবা এরকম দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি অন্নজল স্পর্শ করেননি। আমি সেদিন বাবার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।

বড় আপার প্রতি বাবার একটি আলাদা পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাকে তিনি কখনো ধমক দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। খুব ছোটবেলায় নাকি একটা চড় দিয়েছিলেন, এতেই বড় আপা কাঁদতে কাঁদতে বিছানা নেন এবং তাঁর টাইফয়েড হয়ে যায়। জীবনসংশয় যাকে বলে। ব্যাপারটা হাস্যকর। টাইফয়েড একটা জীবাণুঘটিত ব্যাপার। চড় দিয়ে কারও টাইফয়েড বাঁধিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বাবাকে এসব কে বোঝাবে? টাইফয়েডের এই গল্পটি তিনি কয়েক লক্ষ বার করেছেন এবং অনেককেই অস্বস্তিতে ফেলেছেন। টাইফয়েডের জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, বড় আপার প্রতি তাঁর মমতা ছিল এবং এটা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে, সবার চোখে পড়ত। একবার ঈদের সময় বোনাস পেলেন না। বোনাস না পেলে ঈদের কাপড় হয় না, আমরা জানতাম। কাজেই আমরা বেশ সহজভাবেই পুরনো কাপড় লন্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনলাম। নতুন কাপড় কিছুই না দেওয়াটা খারাপ বলে আমরা তিন ভাই তিন জোড়া মোজা পেলাম। নতুন মোজার সঙ্গে ম্যাচ করাবার জন্যে আমরা বুটপালিশওয়ালার কাছ থেকে জুতা পালিশ করিয়ে আনলাম। এক টাকা নিল প্রতি জোড়া।

ঈদের আগের রাতে দেখি, বাবা বড় আপার জন্যে সাদার মধ্যে লাল ফুল আঁকা একটা ফ্রক নিয়ে এসেছেন। আমাদের কারও জন্যে কিছু আনেননি। এবং এজন্যে তাঁকে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত মনে হলো না। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জেদি হচ্ছে অনু। সে বলল, আমি ঈদ করব না।

বাবা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তুই ঈদ না করলে ঈদ আটকে থাকবে? যত ফালতু বাত।

ঈদের দিন আমরা সবাই মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বাবা বড় আপার হাত ধরে নির্বিকার ভঙ্গিতে তাঁর বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। বড় আপা ছাড়াও যে তাঁর আরও ছেলেমেয়ে আছে তা বোধহয় তিনি মনে করতেন না।

মনসুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ফাইন চা।

চা তেমন কিছু ফাইন নয়। কিন্তু মনসুর আজ সবকিছুতেই ফাইন বলবে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখবে। খুব সম্ভব ওর ধারণা হয়েছে, হাসপাতাল থেকে আমি আর ফিরব না। ডাক্তাররা ওকে কিছু হয়তো বলেছে।

মনসুর আবার বলল, ফার্স্টক্লাস চা হয়েছে রে।

আরেক কাপ খাবি ?

না।

আমি সিগারেট ধরালাম। অন্য সময় হলে মনসুর ছোঁ মেরে সিগারেট নিয়ে ফেলে দিত। আজ কিছুই করল না। এসব ভালো লক্ষণ নয়। তা হলে কি ফেরার লক্ষণ একেবারেই নেই ? ওয়ান ওয়ে জার্নি ?

পিজি-র যে ডাক্তার আমার অপারেশন করবেন, তাঁর কথাবার্তায় অবশ্যি সেরকম মনে হয় না। আমার ধারণা ছিল, বুড়ো না হলে প্রফেসর হওয়া যায় না। কিন্তু এ ভদ্রলোকের বয়স মনে হয় চল্লিশও হয়নি। কানের কাছের কয়েকটি চুল শুধু পাকা। চমৎকার চেহারা। দেখে মনে হয় এই লোকটি রাগ করতে জানে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে জানে না। মিথ্যা কথা বলতে পারে না। এ শুধু সবার সঙ্গে মজার মজার গল্প করে এবং ছুটিছাটা পেলেই ছেলেমেয়েদের হাত ধরে পার্কে-টার্কে বেড়াতে যায়, বাদাম কেনে, কিন্তু বাদামের খোসাগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে না, আধমাইল হেঁটে ডাস্টবিনে ফেলে আসে।

ভদ্রলোক কথাবার্তায়ও খুব চমৎকার। শুরু করলেন এইভাবে—তারপর ফরিদ সাহেব, পেট কাটবার জন্যে তৈরি তো ? হুঁ, চর্বি-টর্বি বিশেষ নেই। আরাম করে চামড়া কাটা যাবে। সার্জন হয়ে কী মুসিবত হয়েছে জানেন ? কাউকে দেখলেই কেটে ফেলতে ইচ্ছা করে। হা-হা-হা।

ডাক্তারদের নিয়ে একটা ভালো রসিকতাও করলেন। এক রোগীর অপারেশন হবে। তাকে অপারেশন টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। সে কাঁপা গলায় সার্জনকে বলল, স্যার, এটা আমার প্রথম অপারেশন। বড় ভয় লাগছে। সার্জন ভদ্রলোক তখন নার্ভাস গলায় বললেন, আমারও প্রথম অপারেশন। আমারও ভয় লাগছে ভাই। রোগীকে এনেসথেশিয়া করা হচ্ছে। জ্ঞান হারাবার আগমুহূর্তে রোগী শুনল, সার্জন সাহেব একমনে দোয়া ইউনুস পড়ছেন।

গল্প শেষ করে তিনি শব্দ করে হাসলেন। বড় ডাক্তাররা এত শব্দ করে হাসে না এবং গল্পগুজবও করে না। বোধহয় ইনি বড় ডাক্তার নন। আমি বললাম, আশা করি আমার পেট কাটার আগেও আপনি কিছু কাটাকাটি করেছেন ?

ডাক্তার সাহেব আবার ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম অপারেশনের গল্প করতে লাগলেন। বেশ জমাট গল্প। ইনি আমার সঙ্গেই এমন

গল্পগুজব করলেন, না সবার সঙ্গেই করেন ? শুধু আমার সঙ্গে করে থাকলে তার অর্থ অন্যরকম হয়।

মনসুর উঠে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, অফিসের সময় হয়ে গেল, যাই। বিকেলে আসব।

চল, এগিয়ে দিয়ে আসি।

এগিয়ে দিতে হবে না। শুয়ে থাক্। ঘুম দে।

সোমবার থেকে শুয়েই থাকব, এখন একটু হাঁটাহাঁটি করি।

আমি মনসুরকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। চেনা পানের দোকান থেকে দশটা ফাইভ ফাইভ কিনলাম। মনসুর দেখল। কিছুই বলল না। ভালো লক্ষণ নয়। তার নিষেধ করা উচিত ছিল।

বিকেলে ঘরে থাকিস, আমি আসব।

কাজ থাকলে আসার দরকার নেই।

না, কাজ কিছু না। আর শোন, রাতে আমার এখানে খাবি। আমি বৌকে বলে এসেছি।

ঠিক আছে। সিগারেট খাবি নাকি একটা ?

মনসুর একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগল।

আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। মানুষের উপর আমার মায়া পড়ে না। কিন্তু জড়বস্তুর উপর সহজেই মায়া পড়ে যায়। আমার সবসময় মনে হয়, জড়বস্তুরও যেন একটা আলাদা জীবন আছে। এবং তারাও যেন মানুষের মতো ভালোবাসতে পারে।

ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষায় অ্যালাউ হবার জন্যে ছোট মামা আমাকে একটা রাইটার কলম কিনে দিয়েছিলেন। রোজ এটাকে বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমাতাম এবং ঘুমাবার আগে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতাম, যেমন—কী ভাই, ঘুম পেয়েছে ? আচ্ছা ঠিক আছে, ঘুমাও। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বাবা আমাকে প্রচণ্ড চড় দিয়ে মেঝেতে উল্টে ফেলে দেন। সেই সঙ্গে হুঙ্কার দিতে থাকেন, মানুষের সাথে কথা নাই, কলমের সঙ্গে কথা। পাগল-ছাগলের ঝাড়। পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব, আর যদি কোনোদিন শুনি।

এই ঘরটির উপর আমার মায়া পড়ে গেছে, দীর্ঘদিন থাকলাম এখানে। প্রায় দু বছর। বত্রিশ বছর যদি আয়ু হয়, তা হলে জীবনের ষোলভাগের একভাগ। বড় দীর্ঘ পরিচয়। দশ ফুট বাই আট ফুট এই কামরায় আর কি কোনোদিন ফিরে আসব ? কত পরিচিত জিনিস চারিদিকে! কত কিছুই-না আছে! লেজ নেই একটি বুড়ো টিকটিকি। এর কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী নেই, এর পাশে অন্য কোনো টিকটিকি কোনোদিন দেখিনি। আরও দুটি আছে, তারা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। এই বুড়োটির সাথীরা একে ছেড়ে গেছে।

বাথরুমে কুৎসিত একটা মাকড়সা আছে। সে শুধু কুৎসিত নয়, ভয়াবহ। তার পেটে চকচকে রুপালি একটা ডিমের থলি। এই থলি নিয়ে বেশির ভাগ সময়ই বেসিনের নিচে কোনো-এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থাকে। রাতদুপুরে হঠাৎ করে বেরিয়ে এসে আমাকে দারুণ চমকে দেয়।

আমার এ ঘরে একটি মাত্র জানালা। বেশ বড়সড় জানালা। তবে তেমন কিছু জানালা দিয়ে দেখা যায় না। শুধু পাশের ফ্লাটের অনেকখানি চোখে পড়ে। একটি বালিকাকে প্রায়ই দেখি বারান্দায় বসে আচার খাচ্ছে কিংবা পা ছড়িয়ে বই পড়ছে। সুন্দর দৃশ্য। এই মেয়েটির উপরও মায়া পড়ে গেছে। সোমবারের পর এই চমৎকার দৃশ্যটিও হয়তো আর দেখা যাবে না।

জীবনের ষোলভাগের একভাগ যেখানে কাটল তার উপর মায়া তো পড়বেই। পড়াই স্বাভাবিক। টাঙ্গাইলের এক হোটেলে একবার সাতদিন ছিলাম। এমন মায়া পড়ে গেল! ছেড়ে চলে আসবার সময় বুক হু-হু করতে লাগল। চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম।

আমি পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটা টেনে নিলাম। একটু যেন শীত-শীত করছে। তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। সূক্ষ্ম একটা ব্যথা। মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছে— আমি আছি। তোমার ভিতরে বাস করছি। আমাকে ভুলে যাওয়া ঠিক না।

বাইরের রোদ নরম হয়ে আসছে। মেঘ জমতে শুরু করেছে। বর্ষা আসি আসি করছে। এবার খুব জাঁকিয়ে বর্ষা আসবে। তার সাজসজ্জা টের পাওয়া যাচ্ছে। আমার ঘর থেকে আকাশ দেখা যায় না। কেন যেন মেঘ দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি উঠে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। আচার-খাওয়া সেই বালিকাটি রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৈশোরে এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। মেয়েটির নাম নীলিমা। তার বাবা নেত্রকোনা কোর্টের পেশকার ছিলেন।

সেই নীলিমাও খুব আচার খেত। ক্লাস নাইনে ওঠামাত্র নীলিমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে রাত জেগে পড়ছি। বাবা রোজ একবার করে বলছেন, ডিভিশন না পেলে জুতো দিয়ে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব।

নীলিমার বিয়ে আমাকে অভিভূত করে দিল। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হলো। রাতে বালিশে মুখ গুঁজে ভেউভেউ করে কাঁদলাম। বড় আপা অবাক হয়ে বললেন, এই তোর কী হয়েছে রে?

পেট ব্যথা।

কোন জায়গায় ব্যথা, দেখি?

আমি আরও শব্দ করে কাঁদতে লাগলাম। বড় আপা মাকে ডেকে আনল এবং দুপুররাতে মা আমার পেটে তেল মালিশ করতে লাগলেন।

কৈশোরের সেই বিরহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমি যথারীতি পরীক্ষা দিই এবং সবাইকে অবাক করে একটি লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হয়ে পড়ি।

এই আচার-খাওয়া মেয়েটির সঙ্গে খুব সম্ভব নীলিমার কোনো মিল নেই, তবু মাঝে মাঝে এই মেয়েটিকে নীলিমা ভাবতে ভালো লাগে। শুধু এই মেয়েটিকে কেন, পৃথিবীর সব বালিকাকেই আমার কাছে নীলিমা বলে মনে হয়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আমি পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে বাইরে। চারদিক অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি নেই। মনসুরের আসবার কথা চারটায়, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে নিশ্চয়ই। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় হারিকেন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন করিম সাহেব। তাঁর ঘর থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে। কুকারে ভাত চড়িয়েছেন বোধহয়। করিম সাহেব আমাদের মতো হোটেলে খান না। নিজে রান্না করেন।

এই যে ফরিদ ভাই, আজ শরীরটা কেমন ?

ভালোই।

ব্যথা-ট্যথা নেই তো ?

জি-না।

ঘুমিয়েছিলেন নাকি ?

জি।

দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে বৃষ্টিতে। ক্যাট্‌স্ অ্যান্ড ডগ্‌স্ যাকে বলে। চা খাবেন নাকি ?

জি-না, থাক।

আসেন আসেন, এক কাপ চা খান। চা সবসময় খাওয়া যায়।

করিম সাহেবের ঘরে গিয়ে বসতে হলো। চাও খেতে হলো। আজকাল লোকজন আমাকে খুব খাতির করছে।

অপারেশনের ডেট দিয়েছে ?

জি-না।

অপারেশন আজকাল ডালভাত হয়ে গেছে। ভয়ের কিছুই নাই। তলপেটের অপারেশন তো এখন চোখ বন্ধ করে বাঁ হাতে করে। হা-হা-হা।

আমি চুপ করে রইলাম। পরিচিত-অপরিচিত প্রায় সবাই এখন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে অপারেশনটা কত সহজ। আমার দিক থেকে তার কোনো প্রয়োজন নেই। অপারেশনটা সহজ কিংবা জটিল, তাতে কিছু যায় আসে না। করিম সাহেব চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললেন, কত সিরিয়াস অপারেশন এখন হচ্ছে—হার্ট, ব্রেইন। একেবারে ছেলেখেলা ব্যাপার।

তা ঠিক।

করিম সাহেব ভাত টিপে দেখলেন। তারপর বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন, আজ চারটা ভাত খান-না আমার সঙ্গে, খাঁটি গাওয়া ঘি আছে। বেগুন ভাজা, গাওয়া ঘি। তার সঙ্গে শুকনো মরিচ ভেজে দেব। খারাপ লাগবে না।

আজ থাক। আরেকদিন খাব।

আজ অসুবিধা কী? বৃষ্টির দিন হোটেলে যেতে কষ্ট হবে। আসেন দুজনে মিলে খাই।

আমাকে নিতে আসবে, এক জায়গায় খাওয়ার কথা আছে।

এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আসবে কীভাবে?

কথাটা সত্যি। বেশ দুর্যোগ বাইরে। রাস্তায় বাতিও নেই। মনসুর আসতে পারবে বলে মনে হয় না। তবুও সে আসবে। আমি আমার অন্ধকার ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মোমবাতি আছে, তবুও জ্বালাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কে যেন বলেছিল—প্রতীক্ষা করতে হয় অন্ধকারে। বোধহয় মিলনের প্রতীক্ষার কথা বলা হয়েছে। বসে থাকতে থাকতে আটটা বেজে গেল। আমি যখন প্রায় নিশ্চিত মনসুর আসবে না, তখন সে এল। গা দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, কাঁপছে ঠকঠক করে।

রিকশা দাঁড় করিয়ে এসেছি, চল।

মনসুরের বাসায় যেতে আমার ভালো লাগে না। সে নতুন বিয়ে করেছে। নতুন বউরা স্বামীর বন্ধুদের সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন স্বামীর বন্ধুদের জন্যে খুব ব্যস্ত। মনসুরের বউ সে ভাবটাও দেখায় না। সে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়। সবাই তার বিরক্তি ধরতে পারে। মনসুর পারে না। উঠতে গেলেই মনসুর বলে, এত তাড়া কী রে, আরেকটু বোস, আরেকটু বোস।

মনসুরের স্ত্রী রীনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, বসতে বলছে, বসুন না। মনসুর তাতে উৎসাহ পায়। হাসিমুখে বলে, রীনা, আমাদের একটা গান শোনাও না। প্লিজ!

আজ না, আরেকদিন।

আহ, শোনাও না! এই, তোরা একটু রিকোয়েস্ট কর না! তোরা রিকোয়েস্ট করলে শোনাবে।

রিকোয়েস্ট করতে ইচ্ছে হয় না, তবু করতে হয় এবং এক সময় রীনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনায়—'আজি এ বসন্তে...।'

মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীতে বসন্তের গান শুনে আমরা প্রশংসা করি। মনসুর দাঁত বের করে হাসে। এর বুদ্ধিসুদ্ধি এমনিতেই কম। বিয়ের পর আরও কমে গেছে। তার ধারণা হয়েছে, এরকম একটা ভালো বিয়ে পৃথিবীর কেউ করেনি। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে তার উৎসাহ সীমাহীন। কেনটাকিতে তার স্ত্রীর এক ভাই থাকে। তাদের নতুন কেনা

গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ডেন্ট পড়ে গেছে। এই নিয়ে মনসুরের চিন্তার শেষ নেই। অথচ সে ভাইকে সে চোখেও দেখেনি।

কাণ্ডটা দেখ, নতুন কেনা গাড়ি। সিক্স থাউজেন্ড ইউএস ডলার দাম। অবশ্যি ইনসুরেন্স আছে। সব কভার করবে।

আমরা উৎসাহ না দেখালেও ক্ষতি নেই। মনসুর মুগ্ধভঙ্গিতে শ্বশুরবাড়ির গল্প করে যাবে।

বুঝলি ? আমার শ্বশুর সাহেবের ইচ্ছা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকা। গ্রামের বাড়ি হলে কী হবে, হুলুস্থুল ব্যাপার। বাড়ির পিছনে আলিশান পুকুর। গত বৎসর তিন হাজার টাকার রুইয়ের পোনা ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যেই এক হাত বড় হয়ে গেছে।

নির্বোধের মতো গল্প। শুনলেই অস্বস্তি হয়। তবু শুনতে হয়। হাসতে হয়। ভান করতে হয় যেন খুব আগ্রহ বোধ করছি। রীনা বসে থাকে পাথরের মূর্তির মতো। তার চোখেমুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভাব। মনসুরের গল্পগুলি সে কীভাবে গ্রহণ করে বুঝতে পারি না।

আজ অবশ্যি রীনা খুব যত্ন-টত্ন করল। তোয়ালে নিয়ে এল মাথা মোছার জন্যে এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, মাথা নিচু করুন, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার বিস্ময় গোপন করে বললাম, কোনো রমণীর কাছে আমি মাথা নিচু করি না। চির উন্নত মম শির।

রীনা একটু হকচকিয়ে গেল। আমি কথাবার্তা কম বলি। এরকম কিছু বলব আশা করেনি বোধহয়। মনসুর উঁচুগলায় বলল, আজ আমাদের ম্যারেজ-ডে।

তাই নাকি ?

আরে গাধা, রীনার ড্রেস দেখে বুঝতে পারছিস না ? বিয়ের শাড়ি। তুই আর আমি গিয়ে কিনলাম নগদ দুই হাজার টাকায়। টাকা শর্ট পড়ল, তোর কাছ থেকে নিলাম দুশ' টাকা। মনে নেই কিছু ?

শাড়ির ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ল না কেন ? ঝড়-বাদলার দিনে কোনো মেয়ে তো এমন বেনারসি পরে ঘরে থাকে না। ঘরে অবশ্যি ইলেকট্রিসিটি নেই, হারিকেন জ্বলছে। তবুও এ আলোতেও তো চোখে পড়া উচিত ছিল। মনসুর নিচুগলায় বলল, কেকের অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটা আনতে গিয়েই দেরি হলো। কেকের উপর লেখা থাকবে—'রীনার জন্যে'। শালা শুয়োরের বাচ্চারা লিখেছে—'মীনার জন্যে'। যে লেখে সেই ব্যাটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে দেরি হলো। শালা আর এলই না। কাণ্ড দেখ।

কেকটা আবার কেন ?

রীনার ইচ্ছা খাওয়াদাওয়ার পর কেক কাটবে। বয়স তো বেশি না, ছেলেমানুষ এখনো। নে, একটা সিগারেট খা। খাবার গরম করতে সময় লাগবে।

এখন অনেক কিছুই আমার চোখে পড়ছে না। এত বড় একটা কেকের বাক্স সঙ্গে ছিল, কিন্তু আমার চোখে পড়েনি। আমি হালকা স্বরে বললাম, বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী নিজেদের মধ্যে করতে হয়। আমাকে শুধু শুধু ডাকলি কেন ?

মনসুর গলা ফাটিয়ে হাসল, যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি। আমি বললাম, উপলক্ষটা বললে একটা কিছু আনতে পারতাম।

শালা, তুই আবার আনবি কী ? শুধু ফর্মালিটি।

মনসুর গভীর মনোযোগের সঙ্গে কেকের লেখা মীনাকে রীনা বানানোর চেষ্টা করতে লাগল। রীনা একবার জিজ্ঞেস করে গেল, চা দেব ভাই ? খাবার দিতে দেরি হবে। একটা জিনিস ভাজতে হবে। কুমড়ো ফুলের বড়া।

না, চা লাগবে না।

খান-না একটু, আমিও আপনার সঙ্গে খাব।

ঠিক আছে, আনুন।

মনসুর গম্ভীর হয়ে বলল, রীনাকে তুই আপনি-আপনি করিস কেন ? তুমি করে বলবি। স্ট্রেইট তুমি।

আমি কিছু বললাম না। ওর এই বিচিত্র স্বভাব, বন্ধুবান্ধবকে সে তাদের দু'জনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চায়। এটা যে হবার নয়, তা বুঝতে চায় না। আমি হালকা সুরে বললাম, আর কাউকে বলেছিস ?

নাহ, শুধু তোকে। অনলি ইউ।

কেন, শুধু আমাকে কেন ?

মনসুর তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি সহজভাবেই বললাম, তোর কি ধারণা আমি আর ফিরে আসব না ?

মনসুরের মুখ কালো হয়ে গেল। এই কথাটি তাকে না বললেই হতো। কেন বললাম ?

রীনা চা নিয়ে এসে বসল আমার সঙ্গে। বেশ লাগছে মেয়েটিকে। এমনিতে তাকে এতটা ভালো লাগে না। আমি লক্ষ করেছি, অসুন্দর মেয়েদেরও মাঝে মাঝে অপরূপ রূপবতী মনে হয়, যেমন গায়ে-হলুদের দিন। শুধু এই দিনটিতেই কোনো বিচিত্র কারণে তারা দেবীমূর্তির মতো হয়ে যায়।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা চা খাচ্ছি নিঃশব্দে। রীনা খুব কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি বললাম, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।

বিয়ের শাড়িতে সবাইকে সুন্দর লাগে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

আর কোনো কথা পাচ্ছি না। মনসুর বসে আছে গম্ভীর হয়ে। সে কি কেকের মীনাকে রীনা করেছে? আমি বললাম, কটা বাজে রে?

যতটা বাজুক, তুই বসে থাক চুপচাপ। রাতে তোকে যেতে দেব না।

বলিস কী!

রীনা নিচুস্বরে বলল, হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে ক'টি দিন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

মনসুর বলল, আমি কাল সকালে তোর জিনিসপত্র সব নিয়ে আসব।

নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

না হলে না হবে। ফালতু কথা!

রীনা বলল, আপনি থাকবেন বলে আপনার বন্ধু চাদর-বালিশ এইসব কিনে এনেছে। না থাকলে ওর কষ্ট হবে। কয়েকদিনের ব্যাপার তো, থেকে যান।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, মনসুর, আমি জানি আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসব না। কাজেই যে ক'টা দিন আমি আছি, আমাকে নিজের মতো থাকতে দে। এই নিয়ে ঝামেলা করিস না।

মনসুর গম্ভীর স্বরে বলল, এখানে তো কোনো কষ্ট হবে না।

জানি কষ্ট হবে না। এখানে অনেক সুখে থাকব। তবু তুই আমাকে আমার মতো থাকতে দে।

রীনা বলল, আজকের রাতটা অন্তত থাকুন। বেচারা আপনার জন্যে নতুন চাদর বালিশ কিনেছে।

আমি কিছু বললাম না। রীনা নরম স্বরে বলল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ফেরত যাবেন কীভাবে? রাতও অনেক হয়েছে। আজকের রাতটা থাকুন। এক রাতে কী হবে?

ঠিক আছে, থাকব।

মনসুর মুখ কালো করে বলল, ইচ্ছা না হলে থাকতে হবে না।

কিছু-কিছু মানুষের বয়স বাড়ে না। তারা মনসুরের মতো সারা জীবন শিশু থেকে যায়। আজ সারা রাত সে হয়তো কথাই বলবে না। অথচ আমাকে এখানে এনে জড়ানোর তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আজকের এই ঝড়-জলের রাত হচ্ছে তাদের দু'জনের। আজ তাদের একটা চমৎকার উৎসবের রাত। আমার এখানে স্থান কোথায়?

অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পরিবেশে আমি ঘুমুতে পারি না। তার উপর আজ বিকেলেই বড় একটা ঘুম দিয়েছি। আমি মশারির ভেতর গা এলিয়ে শুয়ে রইলাম। ঘুম আসবে না জানি, ঘুমাবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

মেঝেতে হারিকেন ডিম করা। কেমন গ্রাম-গ্রাম লাগছে। আলো না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল। কিন্তু মনসুর শুধু হারিকেন নয়, একটা টর্চলাইটও বালিশের নিচে রেখে গেছে। যত্নের চূড়ান্ত করতে চেষ্টা করছে দু'জনেই।

টেবিলের উপর ঝকঝকে পানির জগ, গ্লাস। রাতে খিদে পেলে খাওয়ার জন্যে হরলিক্সের টিনে কিছু বিসকিট। শোবার আগে রীনা এল মশারি গুঁজে দিতে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ছি-ছি ! আমি বুঝি মশারি গুঁজতে জানি না ? লাভ হলো না। মনসুর কমপক্ষে দশবার বলল, অসুবিধা হলেই ডাকবি। আমার পাতলা ঘুম, একবার ডাকলেই হবে।

ঘড়িতে রাত একটা। ফিসফিস করে ওরা কথা বলছে। এক বৎসর পরও এত কথা থাকে নাকি কারও ? স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার কথাবার্তা শুনতে বড় অস্বস্তি লাগে। ওদের কথাবার্তা অবশ্যি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তবু বড় অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে একটা-কিছু অপরাধ যেন করে ফেলেছি।

আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের পরও এমন অবস্থা। তাদের লাগোয়া ঘরটিতে আমি থাকি। গভীর রাত পর্যন্ত দু'জন কথা বলে। শুনতে ইচ্ছা করে না, তবু শুনতে হয়। কত অর্থহীন কথাবার্তা। অর্থহীন রসিকতা। সকালবেলা ঘুম ভেঙে ভাবিকে দেখলেই বড় লজ্জা লাগে। চোখ তুলে তাকাতে পারি না, এমন অবস্থা। ভাবির আচার-আচরণ কিন্তু খুব স্বাভাবিক। সবার সঙ্গে হাসছে, গল্প করছে। নতুন নতুন রান্নাবান্না করছে। ভাবিকে দিয়ে আমাদের সংসারের শ্রী ফিরে গেল। বাবা পর্যন্ত নিচুস্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। মাঝেমধ্যে হাসতেও লাগলেন।

তারপর একদিন বাসায় এসে শুনি, বড় ভাই আলাদা বাসা করছেন। তাঁর শ্বশুর নাকি অল্প ভাড়ায় একটা বাসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শুধু বাসাই নয়, তিনি নাকি তাকে কী-একটা সাইড বিজনেসের কথাও বলছেন। টাকা তিনি দেবেন। বড় ভাই অতিরিক্ত রকমের উৎসাহের সঙ্গে বললেন, এই সংসারের খরচ আমি আগে যেমন দিতাম, এখনো দেব। চিন্তা কিছু নাই। মা বিশেষ ভরসা পেলেন না। মায়েরা অনেক জিনিস আগে আগে বুঝতে পারে।

আসলে আমাদের কারোই মা-বাবার প্রতি টান ছিল না। মেজ ভাই জার্মানি গিয়ে চুপচাপ হয়ে গেল। দুমাস-তিনমাস পরপর চিঠি আসে। একটি চিঠিতে জানলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। সম্ভবত তাকে দেশে ফিরে আসতে হবে। বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে পড়লেন। সে অবশ্যি দেশে ফিরল না। মাস ছয়েক পর চিঠি এল, সুইডেনে চলে এসেছে। সে চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই, লেখা আছে—এখনো কোনো স্থায়ী ঠিকানা হয় নাই। হওয়ামাত্র জানাইব।

এক বৎসরেও তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা হলো না। আমরা তাকে কিছু লিখতে পারি না। কোনো খবর দিতে পারি না। কী অবস্থা! এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল, কাগজপত্র না থাকায় তাকে নাকি সুইডেনের এক জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর কতটুকু সত্যি জানার উপায় নেই।

সে-সময় আমাদের এখানেও অনেকগুলি খবর তৈরি হলো, যেগুলি তাকে জানানো গেল না। যেমন—অনুর বিয়ে হয়ে গেল নারায়ণগঞ্জের এক উকিলের সঙ্গে।

খুবই ভালো বিয়ে। শহরের উপর তাদের বাড়ি-টাড়ি আছে। ছেলের চেহারাও সুন্দর। অনুর (যে খানিকটা তোতলিয়ে কথা বলে) এতটা ভালো বিয়ে হওয়ার কথা ছিল না। আমরা খুবই খুশি। পরে অবশ্যি জানা গেল, উকিল সাহেব আগে একবার বিয়ে করেছিলেন এবং সেই বিয়ের একটি ছেলেও আছে। দ্বিতীয়বার বিয়ের সময় প্রথম স্ত্রীর খবর চেপে গিয়েছেন। ভদ্রলোক কেন এটা করলেন কে জানে!

বিয়ের এই খবর মেজ ভাইকে জানানো গেল না। মা মারা যাওয়ার খবরও জানানো গেল না। তিনি মারা গেলেন হঠাৎ করে। রাতেরবেলা জেগে উঠে বললেন, তাঁর বুক জ্বালা করছে। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, ও কিছু না, খেসারির ডাল বেশি খেয়েছ, তাই অম্বল হয়েছে। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খেয়ে শুয়ে থাক। মা তাই করলেন। ঘণ্টাখানিক পর উঠে বললেন, বুক জ্বলে যাচ্ছে। বাবা বললেন, এক গ্লাস লেবুর সরবত করে খাও। খেয়ে শুয়ে থাক।

বাবার কথা মা'র কাছে নবীর ওহীর মতো। ঘরে লেবু ছিল না। চিনির সরবত বানিয়ে খেলেন এবং ছটফট করতে লাগলেন। বাবা বললেন, চেঁচামেচি করলে কি আর ব্যথা কমবে ? শুয়ে থাক। ভোরবেলা ডাক্তারকে খবর দেব।

শেষরাতে আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা বললেন, ফুড পয়জনিং। আলু-পটলের তরকারি এবং খেসারির ডাল খেয়ে আমাদের কারও কিছু হলো না, মা'র ফুড পয়জনিং হয়ে গেল! কোনো মানে হয় ?

বৃষ্টি থেমে গেছে। মনসুরের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? আমি সাবধানে উঠে বসলাম। তলপেটের ব্যথাটা টের পাচ্ছি। লক্ষণ ভালো নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ব্যথা আমাকে কাবু করে ফেলবে। মনসুরকে হয়তো ডাকতে হবে। আমি প্রাণপণে ব্যথাটা সামাল দিতে চেষ্টা করলাম। কিছু-কিছু জিনিসকে কিছুতেই সামাল দেওয়া যায় না। একেও যাবে না। এর নিজস্ব একটি জীবন আছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে, নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসবে। ডাকব না ওদের, কিছুতেই ডাকব না। বমি করতে ইচ্ছা হচ্ছে। হারিকেনের আলো ক্রমেই বাড়ছে। আমি মৃদুস্বরে মাকে ডাকলাম, মা, তুমি কোথায় আছ ? এসো, ব্যথা কমিয়ে দাও।

পাশের ঘর থেকে শব্দ হচ্ছে। মনসুর উঠে আসছে। রীনার গলা পাওয়া যাচ্ছে। কী যেন বলছে সে। আমি ক্ষীণস্বরে ডাকলাম, মনসুর। কেন ডাকলাম ? সে কিছুই করতে পারবে না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এখন কেউ কিছু করতে পারবে না। তবু মনে হয়, কেউ আসুক। পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকুক। মনসুরের গলা পাওয়া যাচ্ছে, এই ফরিদ, কী হয়েছে ? আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, মরে যাচ্ছি! আমি মরে যাচ্ছি!

মনসুর আমার হাত ধরে রেখেছে। রীনা বসে আছে আমার ডান পাশে। সে বড় ভয় পেয়েছে। রীনা ফিসফিস করে বলল, কোথায়, কোন জায়গায় ব্যথা ?

ঘরের আলো কমে আসছে। রীনার মুখ অসম্ভব বড় মনে হচ্ছে। রীনা আবারও বলল, কোথায় ব্যথা ? কোথায় ?

ঠিক অন্যসব দিনের মতোই আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখলাম, মনসুর এবং রীনা বসে আছে চেয়ারে। মশারি তোলা। মাথার কাছে একটা ছোট টেবিল-ফ্যান। পাখা ঘুরছে।

কী রে, কেমন লাগছে এখন ?

ভালো।

কিছুক্ষণ পরই তুই ঘুমিয়ে পড়লি। রীনা বলেছিল, তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিস। মাথায় পানি ঢাললাম।

আমি ফ্যাকাসেভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম।

রীনা বলল, ব্যথাটা আপনার কতক্ষণ থাকে ?

বেশিক্ষণ না। কমে গেলেই ঘুম এসে যায়। লম্বা ঘুম দিয়ে ফ্রেশ হয়ে যাই।

আপনি কিছু খাবেন ? চা আর টোস্ট এনে দিই ? নাকি এক পিস কেক খাবেন ?

চা খাব। শুধু চা।

রীনা উঠে চলে গেল। মনসুর বলল, ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলি! হাতমুখ ধুবি ? পানি এনে দিই ?

এনে দিতে হবে না। নিজেই বাথরুমে যাব।

চুপচাপ শুয়ে থাক, নড়াচড়া করিস না।

এখন আর কিছু হবে না।

মনসুর বলল, আজ আমি অফিসে যাব না, ঠিক করেছি, ঘরেই থাকব।

সে হাই তুলল। তার চোখ লাল। বেচারা সারা রাত কষ্ট করেছে।

মনসুর!

বল।

চা খেয়ে আমি বেরুব।

কোথায় ?

মিরপুর পাঁচ নম্বর সেকশন। বাবাকে দেখে আসি।

আজ শুয়ে থাক, নড়াচড়া করিস না।

আজ না গেলে আর সময় পাব না।

চল, আমিও যাই সঙ্গে।

না।

আমি তোর সঙ্গে গেলে অসুবিধা কী ?

ভেবেছিলাম, আমাকে যেতে দিতে রীনা আপত্তি করবে। সে করল না। মেয়েটি ভয় পেয়েছে। কাল রাতের মতো কোনো দৃশ্য সে সম্ভবত দ্বিতীয়বার দেখতে চায় না। না চাওয়াই ভালো।

সারা রাত বৃষ্টি হবার জন্যেই বোধহয় রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। গাছের পাতা অন্যদিনের চেয়েও বেশি সবুজ। চারদিক চকলেটের রাংতার মতো ঝিলমিল করছে। মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো একটা সকাল। অপূর্ব! এরকম একটি সকালে পুরনো কথা মনে পড়ে না, শুধু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

ভেবেছিলাম, বাসে করে যাব। এই সময় মিরপুরের দিকের বাস ফাঁকা যায়। কিন্তু মনসুরের জন্যে পারা গেল না। সে আমাকে কিছুতেই বাসে উঠতে দেবে না। বাসে উঠলেই নাকি আমার তলপেটের নাড়িভুঁড়ি ঝাঁকুনিতে ফেটে চৌচির হবে। সে বাইশ টাকায় এক বুড়ো রিকশাওয়ালাকে রাজি করিয়ে ফেলল। গলার স্বর নামিয়ে অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, বুড়ো মিয়া, খুব আস্তে আস্তে চালাবেন। রোগী মানুষ। দুদিন পর অপারেশন।

রিকশাওয়ালাকে এত কথা বলার কোনো দরকার নেই। রিকশাওয়ালা চলবে তার নিজের মতো।

ফরিদ!

বল।

চাচাজির সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবি। আমার এখানে চলে আসবি, স্ট্রেইট চলে আসবি। নো হেংকি-পেংকি।

আমি হাসলাম। যার মানে হ্যাঁ-না দুই-ই হতে পারে।

আসবি কিন্তু।

দেখি।

বুড়ো মিয়া, সিরিয়াস রোগী। রিকশা খুব ধীরে টানবেন। আরেক টাকা বকশিশ আস্তে চালালে। ফরিদ, তেইশ টাকা দিয়ে দিস। শোন, হুড তুলে দে।

বাবা বর্তমানে আছেন নাজির ভাইয়ের সঙ্গে। নাজির হোসেন আমার বড় মামার ছেলে। বৎসর দুই আমাদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করেছেন।

এই দুই বৎসরেই তিনি সমগ্র পাড়ায় একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি আই. কম. পড়তেন। এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। তাঁর পড়াশোনার কথা আমার মনে নেই, কিন্তু সাতসকালে বালির বস্তার উপর কিল-ঘুসির কথা মনে আছে। অল্পদিনের মধ্যে আমার বড় ভাইও তাঁর সঙ্গে জুটে গেলেন। এবং দুজন একই সঙ্গে ফেল করলেন।

ফেল করবার পর বড় ভাইয়ের উৎসাহ খানিকটা মিইয়ে গেল, কিন্তু নাজির ভাই বিপুল উৎসাহে নাজির ড্রামা ক্লাব খুলে বসলেন। সেই ক্লাবের রিহার্সাল হতো আমাদের বাসায়। দারুণ হৈচৈ ব্যাপার। নাজির ভাইয়ের অনেক শাকরেদ জুটে গেল। বাবার মতো লোক পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করতে শুরু করলেন।

ছোটখাটো অনেক রকম কাণ্ডকারখানা নাজির ভাই করতে লাগলেন। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপারটি করলেন দুর্গাপূজার রাতে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে মডেল স্কুলের হেডমাস্টার অমিয়বাবুর মেয়ের গলা থেকে ওড়না টেনে পাগড়ি বানিয়ে মাথায় দিলেন এবং অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে ভয়ে নীল হয়ে যাওয়া মেয়েটিকে বললেন—সুফিয়া, বালিকা, তুমি কী করে জানলে ইংরেজ বিজয়ে আমরা অক্ষম ?

সেই রাতেই পুলিশ তাঁর খোঁজে এল। তিনি পালিয়ে গেলেন সরিষাবাড়ি এবং কাঠের ব্যবসায় লেগে গেলেন। বাবাকে শেষ বয়সে নাজির ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে, এটা ভাবতেও কষ্ট লাগে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

বাবা হয়তো যৌবনে প্রচুর পাপ করেছিলেন, এখন তার প্রায়শ্চিত্তের কাল চলছে। ভাসমান জীবনযাপন করতে হচ্ছে। কিছুদিন ছিলেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে। ভালোই ছিলেন। সকালে মর্নিং ওয়াক করতেন। বিকেলে পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকতেন। তারপর ভাবির সঙ্গে ঝামেলা হতে লাগল। যখনই যাই নানা অভিযোগ, ভাবি নাকি ইচ্ছা করে তরকারিতে লবণ বেশি দিচ্ছে। কাজের মেয়েকে বলে দিচ্ছে যেন তাঁর ঘর পরিষ্কার না করা হয়। এখানে থাকার চেয়ে ফুটপাতে পড়ে থাকা ভালো। নিয়ে গেলাম আমার ছোট বোন অনুর কাছে, নারায়ণগঞ্জে। মাস ছয়েক ভালোই থাকলেন। তারপর একদিন তাঁর টিনের ট্রাংক আর দুটি চটের ব্যাগ নিয়ে গেলেন নাজির ভাইয়ের সঙ্গে। সেখানেই নাকি থাকবেন। এখন সেখানেও টিকতে পারছেন না। গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি, তিনি অনুর কাছে যেতে চান। বেশি দিন তো আর বাঁচবেন না। শেষ কটা দিন মেয়ের সঙ্গে থাকতে চান। নাজির হচ্ছে পরের ছেলে। নিজের ছেলেমেয়ে থাকতে পরের কাছে থাকবেন কেন ? ইত্যাদি। মনে হয় না বাবার সে আশা পূর্ণ হবে। অনু রাজি হবে না।

নাজির ভাই বাসাতেই ছিলেন। তাঁর মুখ এমনিতেই লম্বা। আমাকে দেখে সেই মুখ আরও লম্বা হয়ে গেল। আমি বললাম, কেমন আছেন নাজির ভাই ?

ভালো। তুমি কেমন আছ ?

ভালোই আছি।

হাসপাতালে নাকি ভর্তি হচ্ছ ?

হুঁ।

হয়েছেটা কী ? সিরিয়াস কিছু ?

টিউমার।

ক্যানসার নাকি ? না শুধু টিউমার ?

জানি না, ডাক্তার তো কিছু বলে না।

এইসব জিনিস কি আর ডাক্তার আগ বাড়িয়ে বলবে ? বুঝে নিতে হয়।

আমার মনে হলো, নাজির ভাই আমার অসুখের খবরে বেশ খুশিই হলেন। লোকটিকে আমি দেখতে পারি না। এই কারণেও এরকম মনে হতে পারে। মানুষ যত খারাপই হোক অন্যের অসুখে খুশি হয় না। তা ছাড়া নাজির ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই।

ফরিদ!

জি ?

ফুপাকে আমার এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমার ভাই বা বোনের কাছে রাখ। এখানে আর পোষাচ্ছে না।

ঠিক আছে।

ঠিক আছে না, এসেছ যখন আজই নিয়ে যাও। আবার কবে আসবে তার কোনো ঠিক আছে নাকি ?

দেখি।

দেখি না। নানারকম যন্ত্রণা। তোমরা তো অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েই খালাস।

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যি সত্যি আজ নিয়ে যেতে হলে মুশকিল। কিন্তু নাজির ভাইয়ের যা ভাব দেখা যাচ্ছে, আজই হয়তো গছিয়ে দেবে।

বাবা বাসায় নেই ?

বাজারে গেছে। এসে পড়বে। চা খাও।

না, চা খাব না।

ঠান্ডা কিছু খাবে ?

নাহ।

না কেন ? খাও। একটা কোক খাও। পেটটা ঠান্ডা থাকবে।

আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে নাজির ভাই ভেতরে চলে গেলেন। এ বাড়িতে পর্দাপ্রথার ব্যাপার আছে। নাজির ভাইয়ের স্ত্রী বোরকা পরেন। বাড়িতে কোনো পুরুষ কাজের লোক রাখা হয় না। নাজির ভাই নিজেও নাকি কোন পীরের কাছে যাতায়াত করছেন। গত বৎসর শুনেছিলাম হজ্বে যাবেন। লটারিতে নাম ওঠেনি। কোথায় বারো শ' টাকা ঘুস দিলেই ব্যবস্থা হয়। ঘুস দিতে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে যাওয়া বাতিল করেছেন। এবছর আবার চেষ্টা করছেন।

নাজির ভাইয়ের বসবার ঘরটি বেশ সাজানো। সাজানোর ধরনটাও আধুনিক। ফ্রেমে বাঁধানো কাবা শরীফের ছবি নেই। কামরুল হাসানের একটি পেইনটিং আছে। কার কাছে থেকে মাত্র সাড়ে তিনশ' টাকায় কিনেছেন। দুটি আলমারি আছে, বই-এ ভর্তি। শঙ্কর থেকে শুরু করে রবীন্দ্র রচনাবলী। এইসব বই নাজির ভাই পড়েন বলে

মনে হয় না। তবে কেউ-একজন পড়ে নিশ্চয়ই। অনেকগুলো বই ছেঁড়া, যত্ন করে কাগজ দিয়ে মোড়া। পেছনে কলম দিয়ে নাম লেখা।

কোক পাওয়া গেল না, সেভেন আপ নিয়ে এসেছি।

আপনি দোকানে যাবেন না নাজির ভাই ?

যাব। গাড়ি আসবে, এগারোটায়। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে মতিঝিল গেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, গাড়ি কিনেছেন কবে ?

গত মাসে।

নতুন গাড়ি ?

নতুন গাড়ি কিনবার পয়সা কোথায় ? পুরনো। ড্রাইভারের বেতন দিতে গিয়ে অবস্থা কাহিল।

কত দেন বেতন ?

আট শ'। তোমার খবর বলো।

কী খবর চান ?

করছ কী ?

তেমন কিছু করছি না।

নাজির ভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, কখনো তো কিছু করতে শুনি না। চলে কীভাবে ?

চলে কোথায়! চলে না। থেমে থাকে।

চার-পাঁচটা প্রাইভেট টিউশনি করতে, এখনো করো ?

একটা অ্যাড ফার্মে কাজ করি। দুটো টিউশনি করি।

এটাও খারাপ বিজনেস না। এক ঘণ্টা পড়াতে একজন চার শ' পাঁচ শ' টাকা চায়, দেখ অবস্থা।

আমি কিছু বললাম না। নাজির ভাইকে মনে হলো ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছেন, কেন কে জানে।

এত বড় অপারেশন করাচ্ছ, হাতে টাকাপয়সা আছে ?

আছে কিছু।

কত আছে ?

তিন হাজার টাকার মতো আছে।

বলো কী! প্রাইভেট টিউশনি করে এত টাকা জমিয়েছ ?

আমি উত্তর দিলাম না। নাজির ভাই শুকনো গলায় বললেন, দরকার লাগলে চাইবে আমার কাছে। লজ্জা করবে না।

না, দরকার হবে না।

হবে না বুঝলে কীভাবে ? তিন হাজার টাকা আজকাল কিছুই না।

তা ঠিক।

শোনো ফরিদ, তোমার যে ভাই সুইডেনে আছে তার নামটা কী যেন ? বাবুল না ? বাবুলই তো নাম ?

জি।

তাকে টাকাপয়সার জন্যে লেখ না কেন ? ভাইয়ের কাছে চাইতে আবার লজ্জা কী ? সৎভাইও না। নিজের মায়ের পেটের ভাই। তোমাদের দাবি আছে।

দেখি, লিখব এবার। তার নিজেরই বোধহয় চলে না।

না চললেও লিখবে। বুড়ো বাপ আছে, তার দায়িত্ব আছে না ?

জি, তা তো ঠিকই।

তার উপর তোমার এত বড় অপারেশন। আমি লিখব। এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। যে দেখে না তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। এটাই নিয়ম।

এগারোটার আগেই গাড়ি এসে পড়ল। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি মনেই হয় না। নতুন কাঁচা টাকার মতো চকচক করছে।

ফরিদ, আমি গেলাম। দুপুরে খেতে আসব। তুমিও দুপুরে খেয়ে তারপর যাবে। হুট করে চলে যেও না।

দেখি।

দেখাদেখি না। আমি এলে তারপর যাবে। ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসবে। অসুবিধা হবে না।

বাবা এলেন বারোটায়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এই শরীরে কোথায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন কে জানে! আমাকে দেখে প্রথম যে-কথাটি বললেন, সেটি হচ্ছে—কী, আমাকে নিতে এসেছিস ?

কোথায় যাবেন ?

অনুর বাসায়। আর কোথায় যাব ? যাওয়ার জায়গা আছে ? অপদার্থ ছেলেপুলে তৈরি করে শেষ বয়সে এই কষ্ট। ছি-ছি।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললাম, আমার অপারেশনের কথা শুনেছেন ?

হুঁ। অপারেশন কবে ?

এখনো ডেট হয়নি। সোমবার হাসপাতালে ভর্তি হব। একুশ নম্বর কেবিন।

বাবাকে খুব চিন্তামগ্ন মনে হলো। মাথা নিচু করে বসেছিলেন। বেশ কয়েকবার মুখ তুলে তাকালেন। পরাজিত মানুষের মুখ। সারা জীবন অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন। এখনো করছেন। একটিতেও জয়লাভ করেননি। কিছু-কিছু মানুষ কি শুধু পরাজিত হবার জন্যেই জন্মায় ? একসময় থেমে বললেন, নাজিরের বাসায় আর থাকতে পারব না। হারামজাদা ছোটলোক!

অতি সামান্য আহতই হলাম। বাবা আমার কথা মোটেই ভাবছেন না। আমার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া না-হাওয়ায় তাঁর কিছুই যায় আসে না। তিনি ভাবছেন তাঁর নিজের কথা।

ফরিদ!

বলেন।

ওরা খায়দায় ভালো। খাওয়াটাই তো সব না। ইজ্জত নিয়ে থাকতে হয়। এইখানে পদে পদে বেইজ্জত।

অনুর বাসাতেও তো তাই।

তবু সেটা মেয়ের বাসা। নিজের লোকের কাছে বেইজ্জতি হওয়া অন্য কথা।

বাবা আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। আমি মৃদুস্বরে বললাম, বাবা, আমার কিছু টাকা দরকার। হাজার দুই।

টাকা, আমি টাকা পাব কোথায় ? তোর কি মাথা-টাথা খারাপ ?

বাবা দারুণ চমকে উঠলেন। এতটা চমকানোর প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর কাছে টাকা আছে। চার-পাঁচ হাজার থাকার কথা। বেশিও হতে পারে।

মা'র মৃত্যুর পর বাবা ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে বড় ছেলের বাড়িতে থাকতে গেলেন। আলনা, চেয়ার, টেবিল থেকে শুরু করে শিলপাটা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল। এ ছাড়াও মায়ের দুভরি ওজনের একটা গলার হার ছিল যা বাবা বহু চেষ্টা করেও মা'র জীবদ্দশায় বিক্রি করতে পারেননি। সেটিও নিশ্চয় এতদিনে বিক্রি হয়েছে। এবং তাঁর মতো কৃপণ লোক একটি টাকাও খরচ করবেন—বিশ্বাস হয় না। সবই জমা আছে।

বাবা, অপারেশনে অনেক খরচপত্র আছে।

সরকারি হাসপাতালে অপারেশনের আবার খরচ কিসের ?

কেবিন নিয়েছি। কেবিনের চার্জ আছে।

কেবিন নিলি কেন ? কেবিনে কি আলাদা চিকিৎসা হয় ? সব একপদের চিকিৎসা। চেষ্টা-চরিত্র করে জেনারেল ওয়ার্ডে চলে যা।

বাবা, কিছু টাকা দেন। আপনার কাছে তো আছে।

যা আছে সেটা বিড়ি সিগ্রেট খাওয়ার খরচ। একটা পয়সা কেউ দেয় ? বাবুল দিয়েছে কিছু ?

আমি তো দিতাম। মাসে পঞ্চাশ করে দিতাম।

পঞ্চাশে কী হয় ? হোটেলে একবেলা খেতে লাগে কুড়ি টাকা।

যা পেরেছি দিয়েছি। আপনি এখন কিছু দেন।

আমার কাছে টাকা নেই। বাবুলের কাছে চিঠি লিখলাম, টাকাপয়সার কথা লিখলাম। তার কোনো উত্তর নাই। সে তার মেমসাহেবের ছবি পাঠিয়েছে। হারামজাদা!

দেখি ছবিটা ?

বাবা ছবি আনতে গেলেন। বাড়ির একটি কাজের মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি গোসল করব কি না। আমি বললাম, আমি এখানে ভাত খাব না। চলে যাব। মেয়েটি মনে হলো বেশ অবাক হয়েছে। আমাকে বোধহয় সেই শ্রেণীর গরিব আত্মীয়দের মতো দেখাচ্ছে যারা ভাত না খেয়ে কখনো যায় না। যাওয়ার আগে টাকা ধার চায়।

না, শুধু মেমসাহেবের ছবি নয়, পুরো ফ্যামিলির ছবি। বিদেশিনী একটি বাচ্চাকে নিয়েছে ঘাড়ে, অন্যটিকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আছে। বাবুল তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মুখে। বাবুলের চেহারা বিশেষ বদলায়নি। শুধু মোটা হয়েছে। একটু গম্ভীর হয়েছে। কিন্তু মেমসাহেব ছবিতে খুব হাসিখুশি। মনে হচ্ছে এই মেয়েটি কথায়-কথায় হাসে। ছবি অবশ্যি কখনো সত্যি কথা বলে না। আমার নিজের ছবিতে আমাকে খুব হাসিখুশি দেখায়, বাস্তব জীবনে আমি বিশেষ হাসি না। হাসি আসে না।

বাবা, ছেলে দুটি কি ওদের ?

ওদের না তো কার ? রাস্তার বাচ্চা ধরে এনেছে নাকি ? কী যে বেকুবের কথাবার্তা! চেহারাও তো বাবুলের মতো।

মেয়েটার চেহারা তো ভালোই।

মেয়েটা বলছিস কেন ? সম্পর্ক দেখবি না ? সম্পর্ক যা হয় তাই ডাকবি। ভাবি ডাকবি।

এলে ডাকব।

আসবে-টাসবে না।

আমি উঠে পড়লাম। বাবা বললেন, খেয়ে যা। আজ চিতল মাছ এনেছে, বড় চিতল। গাদার মাছটা দিয়ে কোপ্তা করেছে, আর বড় বড় পেটি।

আপনি জানলেন কীভাবে ?

রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আসলাম। অসুবিধা কী ? আমার সাথে কেউ পর্দা করে না। বুড়ো মানুষের সাথে আবার পর্দা কী ?

বাবা আমাকে বাসে উঠিয়ে দিতে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলেন। অনুর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা হলো না। এখানকার খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে যেতে তাঁর বোধহয় খানিকটা দ্বিধা আছে। বেশ কয়েকবার খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ এল।

বুঝলি, এদের খাওয়াটা ভালো। মাসে দু'বার পোলাও হয়।

তাই নাকি ?

নাজির পোলাও খায় না, তার পেটের ট্রাবল। তার জন্যে পোলাওয়ের চালের ভাত। মোহনভোগ চাল। দিনাজপুর থেকে আসে।

ভালোই তো।

নাজিরের বউ রাঁধেও ভালো। রান্নাটা নিজেই করে, চাকরের হাতে দেয় না।

তাই বুঝি ?

হুঁ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খুব। সব জিনিস নিজের হাতে ধোয়।

আপনি সারা দিন রান্নাঘরে বসে থাকেন নাকি ?

রান্নাঘরে বসে থাকব কেন ? মাঝেমধ্যে যাই।

বাসস্ট্যান্ডটা অনেকখানি দূরে। দেখলাম, বাবার কষ্ট হচ্ছে। বয়স হয়েছে। কষ্ট হওয়ারই কথা। আমি বললাম, চলে যান। আসতে হবে না। গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করেন। বাবা তার উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতেই থাকলেন। বেচারা।

ফরিদ।

বলুন।

কড়া করে একটা চিঠি লেখ বাবুলকে। বাপ-মা'র হক আছে ছেলেপুলের উপর। আছে না ?

তা তো আছেই।

খুব কড়া করে চিঠি দে। লিখে দে—বাবা অন্যের বাড়িতে ভিক্ষুকের মতো অবস্থান করিতেছেন।

আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম। ভিক্ষুকের মতো অবস্থান। কঠিন শব্দের প্রতি বাবার খুব টান। একবার চিঠি লিখলেন—বড় বউমার আচরণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আছি। গ্লাস ভাঙার বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা তার উচিত হয় নাই। আমি তার পিতৃস্থানীয়। গ্লাস এমন কোনো মূল্যবান বস্তু নহে। জগতই অনিত্য।

দারুণ ফিলসফি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক ভাবটা বাবার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে। কথায় জীবনদর্শন চলে আসছে।

চিঠি কিন্তু দিবি বাবলুকে।

দেব।

আর বেশি করে পানি খাবি।

কেন ?

পানিটা পেটের জন্যে ভালো। জল-চিকিৎসা। খুব উপকার হয়।

ঠিক আছে, খাব।

আর শোন, একটা বিয়েশাদি কর। বুড়ো হয়ে গেলি তো!

রোজগারপাতি নাই।

রোজগারপাতি নাই বলেই সংসার করবি না ? ভিক্ষুকরাও তো বিয়েটিয়ে করে। করে না ?

আবার একটা কঠিন শব্দ, ভিক্ষুক।

হাসপাতাল থেকে ফিরেই বিয়ে করে ফেল। চিঠি লিখে দে বাবুলকে টাকা পাঠাতে। তুই ছোট ভাই, তোর হক আছে। বিয়ের খরচ দিতে বল।

ঠিক আছে, লিখব।

বাড়ি ফেরার জন্যে বাবাকে একটা রিকশা করে দিলাম। দু'টাকা দিয়ে দিলাম রিকশাওয়ালাকে। বাবা আকাশ থেকে পড়লেন।

এখান থেকে ওখানে রিকশা ? পাগল নাকি!

রোদের মধ্যে কষ্ট করবেন কেন ? চলে যান। হুড তুলে দেন।

বাবা খুবই অবাক হলেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। এত অবাক হবার কী আছে ? একজন বুড়ো মানুষের প্রতি আমি একটু মমতা দেখাতে পারি না ? মমতার পরিমাণ খুবই সামান্য, তাতে কী ? কিন্তু বাবা এমনভাবে তাকাচ্ছেন, যেন কেঁদে ফেলবেন।

কত নম্বর বেড বললি ?

একুশ নম্বর।

আচ্ছা, একদিন যাব। তুই বাবুলকে চিঠি লিখবি মনে করে।

লিখব।

খুব কড়া করে লিখবি।

আচ্ছা লিখব।

বাবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে চলে গেল। বাবা বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসেছেন। হুড তোলেননি। কড়া রোদ। তবু আমার মনে হলো তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে না। গিয়েই হয়তো গোসল সেরে চিতল মাছের পেটি নিয়ে বসবেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুবেন। সন্ধ্যাবেলা টিভি সেটের সামনে বসবেন।

আজকের দিনটা বাবার সঙ্গে কাটালেই হতো। ফিরে যাওয়ার একটা ক্ষীণ ইচ্ছা হতে লাগল। যাব নাকি ফিরে ? বললেই হবে, শরীরটা ভালো লাগছে না। বিকেলে বাসায় যাব। কিংবা হয়তো থেকেই গেলাম আজ রাতটা। দোটানা ভাব দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বাসে উঠে পড়লাম। পাশের ভদ্রলোক একটা *চিত্রালী* কিনেছেন। প্রথম পাতায় কোনো-একজন নায়িকার ছবি ছাপা হয়েছে। মোটা মোটা ঠোঁট। ইয়া লাস। বডিবিল্ডারদের মতো ফিগার। এমন একটি ধুমসী মেয়ে কী করে খুকিদের মতো কামিজ পরে আছে কে জানে! নাম কী নায়িকাটির ? নাম-ধাম লেখা নেই। হয়তো এত পরিচিত যে নামের প্রয়োজন নেই। আমি আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, এই নায়িকার নাম কী ? ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কেন হলেন কে জানে! বিরক্তি কি আমার অজ্ঞতার জন্যে ? আমার বোধহয় জানা উচিত ছিল কী নাম।

৩

আজ সোমবার।

হাসপাতালে ভর্তি হবার দিন। আজকের দিনটি অন্য আর দশটি দিনের মতো নয়। একটু যেন অন্যরকম। আলো যেন অন্য দিনের চেয়ে ম্লান। বাতাস ভেজা-ভেজা। মানুষের চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দিন বদলে যায় নাকি ?

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। শেভ করলাম। নতুন ব্লেড, খুব আরামের শেভ হলো। দাঁত ব্রাশ করতে করতে করিম সাহেবকে বললাম, বেড-টি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, দিতে পারেন এক কাপ ?

দুধ নাই। দুধ ছাড়া যদি চলে দিতে পারি।

দুধ ছাড়াই দেন।

আজ হাসপাতালে যাওয়ার কথা না ?

জি।

কখন যাবেন ?

তিনটার দিকে। রহমান গাড়ি নিয়ে আসবে।

বলতে বলতে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রহমান বেশ ছোটাছুটি করে গাড়ি যোগাড় করেছে। যেন হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারটা গাড়ি ছাড়া হবার নয়। গাড়ি করেই যেতে হবে।

গাড়ির ব্যাপারে তার খুবই উৎসাহ। কিছু একটা হলেই সে ছোটাছুটি করে গাড়ি যোগাড় করে ফেলবে। একবার মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কয়েকজন মিলে যাওয়ার কথা। লাঞ্চ নিয়ে যাব। সারা দিন থাকব। সন্ধ্যাবেলা ফিরব। যাব পাঁচ নম্বর বাসে। ফিরবও বাসে। রওনা হবার কথা সকাল ন'টায়। দেখা গেল, সাড়ে আটটায় রহমান ব্রিটিশ আমলের এক জিপগাড়ি নিয়ে উপস্থিত। সে গাড়িতে দুটি সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। মেয়েদের ছাড়া পিকনিক জমে না, এইজন্যে সে নাকি বহু ঝামেলা করে এদের যোগাড় করেছে। এরা দুজনেই রহমানের দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

আমাদের জিপগাড়ি টেকনিক্যালের সামনে এসে চারপায়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর নড়ে না। হুড খুলে বহু খোঁচাখুঁচি, বহু ঠেলাঠেলি। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো, গাড়ি ফেলে রেখে গল্প করতে করতে হেঁটেই যাব। জেসমিন নামের মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, হিল পরে আমি হাঁটতে পারব না। আমি রিকশায় যাব।

রিকশা ঠিক করা হলো। সে একা একা এরকম অচেনা জায়গায় যাবে না। অন্য মেয়েটি কোনো এক বিচিত্র কারণে তার সঙ্গে যেতে রাজি নয়। ছেলেদের একজনকে যেতে হয়। কে যাবে ? মনসুর বলল, ফরিদ অসুস্থ মানুষ, ওকে রিকশায় তুলে দিলেই হয়।

জেসমিনের মুখ দেখে মনে হলো ব্যাপারটা সে ঠিক পছন্দ করছে না। সে সম্ভবত যেতে চাচ্ছিল রহমানের সঙ্গে। কিন্তু ঐ মেয়েটি রহমানকে চোখে-চোখে রাখছে।

রহমান আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। কীভাবে কীভাবে যেন বিদেশী ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি যোগাড় করে ফেলেছে। চেহারার জোর বলাই বাহুল্য। বছরখানিক না ঘুরতেই শুনলাম তার নাকি একটা প্রমোশনও হয়েছে। এখন তার টেবিলে একটা পিবিএক্স লাইন, একটা ডিরেক্ট লাইন। কারও টেলিফোনের দরকার হলে তার কাছে গেলেই হয়। শুধু সোমবার বাদ দিয়ে। কী জন্যে সোমবারটা বাদ, কে জানে ?

আমি রিকশায় উঠতেই রহমান বলল, ছাড়লাম তো দুজনকে, কী হয় কে জানে।

সবাই হাসাহাসি করতে লাগল। জেসমিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কী অসভ্যতা করছেন রহমান ভাই!

অসভ্যতা আমরা করলাম কোথায় ? অসভ্যতা তো করছ তোমরা।

আবার একটা হাসির দমকা উঠল। জেসমিন মুখ অন্ধকার করে বলল, এই রিকশা, চালাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

পেছন থেকে ফজলু কী যেন বলল। অশ্লীল কিছু নিশ্চয়ই। কারণ ফজলু অশ্লীলতা ছাড়া কোনো রসিকতা করতে পারে না। তার প্রতিটি রসিকতাতেই মেয়েদের শারীরিক কিছু বর্ণনা থাকবেই।

কোনো অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে যাওয়া এ আমার প্রথম। হাত-পা শিরশির করতে লাগল। আমি নিচুস্বরে বললাম, হুড তুলে দেব ?

না, আমার দম বন্ধ লাগে।

মেয়েটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হেঁটে গেলেই ভালো হতো। আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা কি না বুঝতে পারলাম না। চুপ করে গেলাম। জেসমিন বলল, আপনার রোদ লাগলে হুড তুলে দেন।

না, আমার রোদ লাগছে না।

জেসমিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হেঁটে গেলে ভালো হতো, কেন বললাম জানেন ?

না।

বললাম, কারণ ওরা আজ সারা দিন আমাদের দুজনকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। খুব খেপাবে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, নিজেই দেখবেন। আমি আসলে আসতে চাইনি। রহমান ভাই এত করে বললেন, তাই আসলাম, নয়তো আসতাম না।

আমি হালকা স্বরে বললাম, এসে ভালোই করেছেন, পিকনিকে দু-একজন মেয়ে না থাকলে খুব খারাপ লাগে।

জেসমিন ঘুরে ফিরে রহমানের কথা বলতে লাগল। একজন সুন্দরী মেয়ের মুখে অন্য একজন পুরুষের কথা শুনতে ভালো লাগে না। আমি হ্যাঁ-হুঁ দিয়ে যেতে লাগলাম।

রহমান ভাই আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমার খালাত ভাইয়ের দিক থেকে।

ও আচ্ছা।

আমাদের বাসায় অবশ্যি রহমান ভাইয়ের যাতায়াত তারও আগে থেকে। আমরা একপাড়ায় থাকি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, মালিবাগে। ওয়ারলেস অফিসের কাছে। ওয়ারলেস অফিস দেখেছেন আপনি ?

হ্যাঁ।

ওর উত্তর দিকে। আমাদের অবশ্যি ভাড়া বাড়ি, রহমান ভাইয়ের মতো নিজের বাড়ি নয়।

ঐ বাড়ি রহমানদের নিজের নাকি ?

হ্যাঁ। আপনি কি ভেবেছিলেন ভাড়া বাড়ি ?

হ্যাঁ।

না, ভাড়া না। রহমান ভাইয়ের দাদা বানিয়েছিলেন।

মেয়েটি আমাকে মোটেই পছন্দ করল না, তবুও অনর্গল তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বলে যেতে লাগল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি জেনে ফেললাম, ওর এক মামাত বোনের ইউটেরাস অপারেশন হয়েছে। এখন আর তাদের বাচ্চাকাচ্চা হবে না। অথচ ভদ্রমহিলার খুব বাচ্চার শখ। ঘরভর্তি শুধু বাচ্চাদের ছবি। আর ওর বরটি এতই অমানুষ যে, দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা ভাবছে। ছেলেরা খুব হৃদয়হীন হয়। নিজেদের ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।

রিকশা থেকে নামবার সময় পেরেকে লেগে মেয়েটির শাড়ি অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। তার মুখ মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, এখন বাসায় গিয়ে আমি বলব কী ?

বাসায় কিছু বলতে হবে নাকি ?

বলতে হবে না ? শাড়িটা আমার নাকি ?

কার শাড়ি ?

ছোট আপার শাড়ি। রাজশাহী সিল্ক। একদিনও পারেনি। সে আজ আমাকে মেরেই ফেলবে।

ছিঁড়েছে যে এটা না বললেই হয়। ভাঁজ করে রেখে দেবেন।

ঠাট্টা করছেন ? এরকম অবস্থায় কেউ ঠাট্টা করে ?

মেয়েদের ব্যাপার আমি ভালো জানি না। হয়তো নতুন শাড়ি ছিঁড়ে ফেলা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মেয়েটির চোখে জল ছলছল করছে। কেঁদেই ফেলবে কি না কে জানে। বিচিত্র কিছু নয়।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে জেসমিনের সঙ্গে আমার আর কোনো কথা হয়নি। সবার হাসি-ঠাট্টা হজম করে দূরে দূরেই থেকেছি। কিন্তু আধঘণ্টা রিকশায় পাশাপাশি বসার মধ্যে অদ্ভুত কোনো ম্যাজিক আছে। আমি সত্যি সত্যি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম।

এরপর ছুটিছাটা হলেই মগবাজার ওয়ারলেস অফিসের সামনে ঘোরাঘুরি করতাম, যদি কখনো দেখা হয়। আশেপাশের যে কয়টি হলুদ রঙের বাড়ি আছে সব ক'টির সামনে দিয়ে কতবার যে গিয়েছি। দেখা হয়নি কখনো। একদিন শুধু রহমানের সঙ্গে দেখা হলো। সে অবাক হয়ে বলল, এইদিকে কোথায় ?

একজনকে খুঁজছি।

বলে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছি, অথচ খুব সহজেই জেসমিনের ঠিকানা জিজ্ঞেস করা যেত। ইচ্ছা করেনি।

আমি চাচ্ছিলাম কারও সাহায্য নিয়ে নয়, নিজেই তাকে খুঁজে বার করি।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন দেখা হয়ে গেল। মেয়েদের সঙ্গে আমি কখনো সহজভাবে কথা বলতে পারি না, কথা জড়িয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন নিউমার্কেটের সমস্ত ভিড় উপেক্ষা করে হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললাম, চিনতে পারছেন ?

জেসমিন তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। মনে হলো চিনতে পারছে না।

ঐ যে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলাম রহমানের সঙ্গে ?

মনে আছে। মনে থাকবে না কেন ?

জেসমিনকে আজ আর সেদিনের মতো রূপসী লাগছিল না। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো দেখাচ্ছিল। সাজগোজ মেয়েদের সম্ভবত অনেকটা বদলে দেয়। আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললাম, অনেকদিন থেকেই আমি আপনাকে মনে মনে খুঁজছিলাম।

কেন ?

আপনার ছোট আপা কী বলল সেটা জানতে চাচ্ছিলাম।

ছোট আপা আবার কী বলবে ? কিসের কথা বলছেন ?

ঐ যে শাড়ি ছিঁড়ে গেল।

আপনি সত্যি সত্যি জানতে চান ?

হ্যাঁ, চাই।

আপা কিছু বলেনি। ওর অনেক শাড়ি। ছিঁড়ে গেলে কী আর হবে। ইচ্ছা করে তো ছিঁড়িনি।

জেসমিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, শুধু এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে আপনি আমাকে খুঁজছিলেন ?

হ্যাঁ।

বাসায় গেলেন না কেন ? ১২১ নং মালিবাগ। বাসার সামনে একটা নারকেল গাছ আছে। রহমান ভাইকে জিজ্ঞেস করলেই ঠিকানা জানতে পারতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন ?

আমি কিছু বললাম না। জেসমিন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আমার কিছু বলার ছিল না। কিংবা ছিল, বলতে পারলাম না। ঠিক সময়ে আমরা ঠিক কথাটি কখনো বলতে পারি না। ভুল কথাটা শুধু মনে আসে।

চমৎকার লাগল লেবু-চা। আরেক কাপ খেতে ইচ্ছে করছে। করিম সাহেবকে দ্বিতীয় কাপের কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। তিনি হয়তো বিরক্ত হবেন।

জানালার পর্দা সরাতেই দেখলাম আচার-খাওয়া মেয়েটি স্কুলের জামাকাপড় পরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এদের বাড়ির সামনে দিয়ে এতবার আসা-যাওয়া করি, কখনো তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয় না। একবার দেখা হলে বুঝতাম সত্যি সত্যি নীলিমার সঙ্গে এই মেয়েটির চেহারার মিল আছে কি না। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ? বত্রিশ বৎসরের একজন লোক তের-চোদ্দ বছরের একটি বালিকার মুখ দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাপারটা খুব হাস্যকর। মাঝে মাঝে আমরা সবাই বোধহয় এরকম উদ্ভট কিছু করি। আমি রাস্তায় নেমে এলাম। এত ভোরে মেয়েটি কোথায় যাচ্ছে ? মর্নিং শিফট স্কুল নাকি ?

আনন্দ বোর্ডিং হাউসের মালিক আমাকে দেখে বললেন, স্লামালিকুম ফরিদ সাহেব, কোথায় যান ?

নাশতা খাব। দেখি রেস্টুরেন্ট খুলেছে কি না।

আজ মনে হয় সকালে উঠেছেন ?

জি। আজ হাসপাতালে যাচ্ছি। গনি সাহেব, আপনার রেন্ট কত হয়েছে হিসাব করেন। দিয়ে যাব।

এখনই কেন ? মাস শেষ হোক, তারপর দেবেন।

অসুখটা ভালো না। হাসপাতাল থেকে নাও ফিরতে পারি।

গনি সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। এই লোকটিকে আমি বেশ পছন্দ করি। নির্বিরোধী ভালোমানুষ টাইপের লোক। এরকম মানুষ বোর্ডিংয়ের ব্যবসা করে টিকে আছে কীভাবে কে জানে!

ফরিদ সাহেব!

জি ?

এইরকম কথা বলা ঠিক না। আল্লাহ নারাজ হন। হায়াত-মউত মানুষের হাতে না। আল্লাহপাকের হাতে।

তা ঠিক। গনি সাহেব, আমার চিঠিপত্র রেখে দেবেন যদি আসে, আসবে না হয়তো।

জি আচ্ছা।

আর শোনেন ভাই, আমি এখন যাচ্ছি, বারোটার দিকে ফিরব। আমার বন্ধুবান্ধবদের আসার কথা, ওদের বসতে বলবেন। চাবিটা রাখেন।

গনি সাহেব বললেন, এক কাজ করেন, আমার রিকশা নিয়ে যান। নানান জায়গায় যাবেন, সুবিধা হবে। এখন রিকশা পাওয়া ঝামেলা। অফিস টাইম।

গনি সাহেবের রিকশাটির পেছনে বড় বড় করে লেখা—'প্রাইভেট'। এটা যে সাধারণ ভাড়াখাটা রিকশা নয় সেটা বোঝানোর জন্যে এটা বানানোও হয়েছে অন্যরকমভাবে। দেখতে অনেকটা যাত্রাদলের সিংহাসনের মতো। চড়তে বড়ই অস্বস্তি লাগে। সবাই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

রিকশায় উঠেই ঠিক করে ফেললাম কোথায় কোথায় যাব। প্রথমে যাব আমার অফিসে। যাওয়ার দরকার নেই, আগেই ছুটি নিয়ে এসেছি। তবু একবার যাব। বড় ভাইয়ের বাসায় যাব। আমার এক ছোট মামা থাকেন ইন্দিরা রোডে, তাঁর কাছে যাব। তিনি বলে রেখেছেন আমাকে কিছু টাকা দেবেন। অনুর ওখানে গেলে ভালো হতো কিন্তু এখন আর নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার সময় নেই। অনুর বরকে টেলিফোনে বলা হয়েছে। সে জানিয়েছে আসবে। পাঁচটার সময় সরাসরি হাসপাতালে আসবে।

প্রথমে যাওয়া যায় কোথায় ? বড় ভাইয়ের বাসায়। তাঁর ছোট মেয়েটির জন্যে কিছু-একটা নেওয়া দরকার। এই মেয়েটি আমার খুব ভক্ত। আমাকে চাচা ডাকে না, ডাকে ফরিদ মামা। মামাদের সঙ্গেই ওর যোগাযোগ বেশি, কাজেই সবাইকেই ভাবে মামা। মেয়েটির বয়স মাত্র চার বৎসর। কিন্তু অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। তাকে যত উপদেশ দেওয়া হয় সব সে গম্ভীর হয়ে আমাকে শোনায়। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এমনভাবে কথা বলে যে, বড় মায়া লাগে। যেমন—সে গম্ভীর হয়ে বলবে, ফরিদ মামা, টিভি বেশি দেখলে মাথা ধরে, চোখ খারাপ হয়। বেশি দেখা ভালো না। শুধু কার্টুন দেখতে হয়। কার্টুন দেখলে চোখ খারাপ হয় না। আর শোনো মামা, বাইরের মানুষের সামনে নেংটো হয়ে আসা খুব খারাপ। সবাই তখন মন্দ বলবে। আর বিছানায় পেশাব করাও

খারাপ। আর পেশাব বলাও খারাপ। বলতে হয় বাথরুম। তোমার যদি পেশাব পায় তা হলে তুমি বলবে, বাথরুম পেয়েছে। তাই না মামা ?

বড় ভাইকে বাসায় পাওয়া গেল না। তাঁর এক শালির গায়ে-হলুদ। দল বেঁধে সবাই গেছে নারিন্দা। আজ আর ফিরবে না। বিয়ের ঝামেলা চুকিয়ে ফিরবে। দু-তিন দিনের মামলা। মজিদের মা বলল, নারিন্দা যাইবেন ভাইজান ?

না।

তয় বসেন। চা দেই, চা খান।

মজিদের মা কোনো-এক বিচিত্র কারণে আমাকে খুব পছন্দ করে। যখনই আসি আমার সেবাযত্নের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হয়তো আমার মতো দেখতে তার কোনো ছেলে ছিল। কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কোন শালির বিয়ে জানো মজিদের মা ?

মধ্যমটার, বেনু আফার।

বেনুকে ঠিক চিনতে পারলাম না। বড় ভাইয়ের অনেকগুলি শালি এবং সবাই বেশ রূপসী। প্রতিবছরই এদের কারও-না-কারও বিয়ে হচ্ছে। তবু সংখ্যায় কমছে না। এদের মধ্যে একজন ছিল দেবী প্রতিমার মতো। মুখের দিকে তাকালেই মন খারাপ হয়ে যেত। ভুরু, চোখ, সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

আমি একদিন ভাবিকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, এই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন না ভাবি।

ভাবি রসিকতা বুঝতে পারলেন না। রেগেমেগে অস্থির হয়ে গেলেন।

কী দেখে তোমার কাছে বোন বিয়ে দেব ? কী আছে তোমার ? টাকাপয়সা না থাকলে লোকজনের বিদ্যাবুদ্ধি থাকে। চেহারা থাকে। তোমার কোনটা আছে ?

ঠাট্টা করছিলাম ভাবি।

না, ঠাট্টা তুমি করছ না। ঠাট্টা বোঝার বুদ্ধি আমার আছে। তুমি ওর কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাক, সেটা আমি জানি না ভাবছ ? ঠিকই জানি।

দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা! কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কথাটা ঠিক না।

একদিন নিউমার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন ভাবির এ বোনটির সঙ্গে দেখা। দু'-একটা কথাবার্তা বললাম এবং পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরী মহিলার মতো তার ধারণা হলো, আমি তার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই গল্প সে করেছে ভাবির সঙ্গে।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বড় ভাই একদিন হোস্টেলে এসে নানারকম ভণিতা করে বললেন, এখন পড়াশোনার সময়, বিয়ে টিয়ের কথা চিন্তা করা ঠিক না। পড়াশোনা আগে শেষ হোক। তা ছাড়া দুই ভাইয়ের এক বাড়িতে বিয়ে করা ঠিক না। নতুন আত্মীয় করা দরকার। মহা ঝামেলা!

একবার গিয়ে দেখলে হয় না, কোন মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে ? নারিন্দা খুব একটা দূর কি ? রিকশা তো আছেই।

রোদে কোনো তেজ নেই। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। আজও বোধহয় ঝড়বৃষ্টি হবে। এ বৎসর খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। রিকশাওয়ালা বলল, এখন কুন দিকে যাইবেন ?

মগবাজার চল। ওয়ারলেস অফিস।

এই রিকশাওয়ালা প্রফেশন্যাল নয়। চালাতে পারছে না। ঘামে নেয়ে উঠেছে। উৎসাহেরও বেশ অভাব। চলছে ঢিমে তেতালা ছাঁদে। তাকে দেখে মনে হয় না সে কোনোদিন মগবাজারে পৌঁছবে।

জেসমিন তো বাসায় নেই। আপনি কে ?

সত্যিই তো, আমি কে ? বুড়ো ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। উনি নিশ্চয়ই জেসমিনের বাবা। এই দুপুরবেলা ঘামতে ঘামতে আমি উপস্থিত হয়েছি। সঙ্গত কারণেই ভদ্রলোক শঙ্কিত বোধ করছেন।

আপনি কে ? জেসমিনকে কী জন্যে দরকার ?

সত্যি তো, ওকে আমার কী জন্যে দরকার ? আমি থেমে থেমে বললাম, আমি খুব অসুস্থ। আজ আমি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। আমার তলপেটে একটা অপারেশন হবে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন।

জেসমিনকে খবরটা দেবেন দয়া করে।

তা দেব, কিন্তু আপনার নাম কী ? পরিচয় কী ? জেসমিনকে কীভাবে চেনেন ?

দেওয়ার মতো কোনো পরিচয় আমার নেই। আমার নাম ফরিদ।

এই নাম বললে জেসমিন আপনাকে চিনবে ?

জানি না। চিনতেও পারে।

আপনার অসুখটা কী ?

ক্যানসার। ডুওডেন্যাল ক্যানসার।

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

৪

বাসায় ফিরলাম একটার দিকে। বন্ধুরা কেউ আসেনি তখনো। গনি সাহেব এসে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেলেন। বাবুল ভাইয়ের চিঠি। ইংরেজিতে লেখা। যার অর্থ অনেকটা এরকম—বাবার অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি। বুঝতে পারছি তোমাদের অবস্থা শোচনীয়। কিছু করতে পারছিলাম না। আমার নিজের অবস্থাও তাই। এখন

অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। ড্রাফট একটা পাঠালাম। বেশ কিছু টাকা এতে হবার কথা। পরবর্তী সময়ে আরও পাঠাব। ধীরে ধীরে দোতলা একটি বাড়ি বানিও, যার একতলাটি ভাড়া দিয়ে বাবা যেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার নিজের আর দেশে ফেরা হবে না। তবে বাচ্চাদের একবার বাংলাদেশ দেখাতে নিয়ে আসব। ড্রাফটটি তাড়াতাড়ি ভাঙাবার চেষ্টা করবে। ডলারের দাম পড়ে যাবে এরকম একটি গুজব এখানে আছে।

তিন হাজার পাঁচশ' ইউএস ডলারের একটি ড্রাফট। গনি সাহেব বললেন, ঠিকমতো ভাঙাতে পারলে লাখখানিক টাকা হবার কথা।

আমি চুপ করে রইলাম। যে-কোনো চিঠি মানুষ দু-তিনবার করে পড়ে। এই চিঠি দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। এবং চিঠি খুব অবহেলার সঙ্গেই রাখলাম টেবিলে, যেন টাকাটার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

গনি সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন আমি খানিকটা উচ্ছ্বাস দেখাব। দেখানোই তো স্বাভাবিক।

কেউ কি এসেছিল আমার কাছে ?

আপনার ভগ্নিপতি এসেছিলেন। খানিকক্ষণ বসে চলে গেছেন।

কিছু বলে গেছেন ?

জি-না।

কিছুই বলে যাননি ?

না। শুধু বললেন, উনি আপনার ভগ্নিপতি।

দায়িত্ব পালনের দেখা। এর বেশি কিছু না। মুখ কালো করে বসেছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তেই হয়তো বিরক্তি বাড়ছিল। বাড়ি ফিরে হয়তো অনুর সঙ্গে বড় রকমের একটা ঝগড়া বাঁধিয়েছেন। তিনি হয়তো বলেছেন, তোমার ভাইয়ের খোঁজে গিয়ে সারাটা দিন নষ্ট হলো। অনু তার উত্তরে বলল, গিয়েছিলে কেন ? তোমাকে যেতে বলেছি ? অনু খুব শান্তমুখে কাটা-কাটা কথা বলতে পারে। এবং এত সহজে পুরনো সব কথাবার্তা তোলে যে মনে হয় রাতদিন সে এসব নিয়েই ভাবে। এমন তিক্ততার মধ্যে দু'জন মানুষ বাস করে কীভাবে ?

অনুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই মন ভার করে ফিরে আসতে হয়। মনে হয় বেঁচে থাকার মতো শাস্তি আর নেই। অনু শান্তমুখে সহজ গলায় বলে, আমি এভাবে বেশি দিন থাকব না। এ কথায় সে কী বুঝাতে চায় আমি জানি না। জানতে চেষ্টাও করি না।

একদিন-না-একদিন চলে যাব।

কোথায় চলে যাবি ?

তাও তো ঠিক। আমার যাওয়ার জায়গা নেই।

অনুকে বাড়িতেই থাকতে হবে। তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, এই চিন্তাটিই কি তাকে সবসময় পীড়িত করছে ?

হাত-পা কুটকুট করছিল। গা ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে দেখি মাকড়সাটা বেরিয়ে এসেছে। শেষ দেখা দিতে এসেছে নাকি ? আমি বেশ শব্দ করে বললাম, কী-রে ব্যাটা, কেমন আছিস ? বলাটা ঠিক হলো না, কারণ এটা মেয়ে-মাকড়সা, এর পেটের নিচে ডিমের থলি। একে বলা উচিত—কী-রে মা, কেমন আছিস ? কিন্তু এমন কুৎসিত জিনিসকে মা ডাকা যায় না। আমি ওর গায়ে পানি ছিটিয়ে দিলাম। সে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তার কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে পড়ল। আমাদের দুজনের বিদায়ের দৃশ্যটি ঠিক সুখকর হলো না। পানি না দিলেই হতো।

শরীর এখন বেশ ভালোই লাগছে। বাথরুমের আয়নাটা ভালো না। কেমন ঢেউ-খেলানো ছবি আসে, তবু নিজেকে খারাপ লাগছে না। এ মুখ ভরসা-হারানো লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের একটি নয়। ঠিক বললাম কি ? নাকি নিজেকে এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু ভাবছি ? যেন আমি সবার চেয়ে আলাদা ?

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বাবুল ভাই-ই ছিল একটু অন্যরকম। তার একফোঁটা সাহস ছিল না, তবু সে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব সাহসী কাণ্ডকারখানা করত। মোজাম্মেল স্যারের সঙ্গে যে কাণ্ডটা করল! স্যার ক্লাসে অঙ্ক করাচ্ছেন, সে উঠে বলল, স্যার, মনিরকে আপনি হাফইয়ারলির অঙ্ক প্রশ্ন আউট করে দিয়েছেন কেন ? মোজাম্মেল স্যার রাগের চোটে তোতলা হয়ে গেলেন। চোখমুখ লাল করে বললেন, আ... আ... আমি... কোশ্চেন আউট করেছি ? বলেছে কে ?

মনির বলেছে স্যার।

কথাটা খুবই সত্যি। মনির সব সাবজেক্টে গোল্লার কাছাকাছি পেয়েছে, শুধু অঙ্কে পেয়েছে বিরানব্বই। তবু মোজাম্মেল স্যার বাবুল ভাইকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেললেন। দু-তিনজনে মিলে তাকে বাসায় দিয়ে গেল। বাসায় বাবা দ্বিতীয় দফায় তার উপর চড়াও হলেন। শিক্ষককে অপমান! তোর বাপের নাম আজ ভুলিয়ে ছাড়ব। বাপের নাম তিনি ভোলাতে পারলেন না, তবে দিন সাতেকের জন্যে বিছানায় ফেলে দিলেন।

গা-টা ফুলে প্রচণ্ড জ্বর। বাবুল ভাই রাতদিন শুয়ে থাকে। এক রাতে বিড়বিড় করে কী-সব বলতে লাগল। বাবা গিয়েছেন পাশের বাড়ি তাস খেলতে। বড় ভাই তাঁকে ডাকতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এলেন। আমার কেন জানি ধারণা হলো, বাবুল ভাই বাঁচবে না। এবং আশ্চর্য, এই ভেবে সূক্ষ্ম একটা আনন্দ বোধ করলাম। সে মরে গেলেই ভালো হয়। বাবার একটা উচিত শিক্ষা হয়।

বাবাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া গেল না। বাবুল ভাই সেরে উঠল। বাবা তাকে মোজাম্মেল স্যারের বাসায় নিয়ে গেলেন। বাবুল ভাই পা ধরে বলল, স্যার, আর কোনোদিন করব না। মাফ করে দেন স্যার। রীতিমতো নাটক। বাবা সে-রাতে ভাত

খেতে খেতে বললেন, শিক্ষকের অমর্যাদা করলে বড় হতে পারবি না। শিক্ষক বড় মারাত্মক জিনিস। বাবা-মা'কে একবার সালাম দিলে হয়, কিন্তু শিক্ষককে সালাম দিতে হয় দশবার, বুঝলি ?

আমরা কেউ কোনো জবাব দিলাম না। বাবুল ভাই জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগল। বাবা হৃষ্টচিত্তে বলতে লাগলেন, কোশ্চেন আউট করে সে খুব খারাপ কাজ করেছে, কিন্তু তোরা তো অঙ্ক শিখছিস তার কাছে। শিখছিস না ? সেটাই বড়।

তার দিনকয়েক পর মোজাম্মেল স্যার বাবুল ভাইকে ডেকে নিয়ে বললেন, তুই এক কাজ করিস, সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসিস, অঙ্কটা দেখিয়ে দেব। টাকাপয়সা কিছু দিতে হবে না। বলিস তোর বাবাকে।

বাবুল ভাই রাজি ছিল না। কিন্তু বাবা বিনা পয়সায় সুযোগ হারাবার লোক নন। তিনি কড়া ধমক দিয়ে বাবুল ভাইকে পাঠাতে লাগলেন।

মোজাম্মেল স্যার অঙ্ক খুবই ভালো জানতেন। স্কুলে তাঁর নাম ছিল মুসলমান যাদব। বাবুল ভাই তাঁর কাছ থেকে ভালো অঙ্ক শিখলেন। ভালো বললে কম বলা হবে। খুবই ভালো।

৫

আমার হাসপাতাল-জীবন শুরু হলো।

সোমবার বিকাল চারটায় রহমানের জোগাড় করা জিপে চড়ে এলাম হাসপাতালে। এই জীবন দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে। এখন যেমন খারাপ লাগছে একসময় তেমন খারাপ লাগবে না। ফিনাইলের গন্ধও আপন মনে হবে। ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয় হবে। নার্সদের কেউ কেউ হাসপাতালের গল্প শুনিয়ে যাবে। যে সুইপার বাথরুম পরিষ্কার করতে আসবে তাকে হয়তো আমি নাম ধরে ডাকব।

মনসুর খুব উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগল—ভালো ঘর, কেমন হাওয়া দেখছিস নাকি ? ফার্স্টক্লাস।

ঘরটি ভালোই। পেছনে এক চিলতে বারান্দা। দাঁড়ালে শিশুপার্ক দেখা যায়। সে দিকটা বড় সবুজ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লাগে।

এই ফরিদ, অ্যাট্যাচ্‌ড্ ইংলিশ বাথরুম।

বাথরুম খুলেই মনসুর মহা উল্লসিত। ভাবখানা এরকম যেন ইংলিশ বাথরুম ছাড়া আমি বাথরুম করতে পারি না।

ফরিদ, ময়লা আছে, সুইপার দিয়ে ক্লিন করিয়ে দেব। পাঁচটা টাকা খাওয়াতে হবে। ফ্লাস্ক খোল, চা খাওয়া যাক।

রহমান বলল, আমি খাব না। আমার বমি-বমি আসছে। হাসপাতালের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। মনসুর দাঁত বের করে হাসল—হাসপাতালে ফুলের গন্ধ থাকবে

নাকি রে শালা ? হাসপাতালে থাকবে ওষুধের গন্ধ, রোগের গন্ধ। যেখানকার যা নিয়ম। এর মধ্যেই মনসুর আবিষ্কার করল, ফ্যানের রেগুলেটরটা খারাপ, ধরলেই শক দেয়। বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করে না। দরজার ছিটকিনি কাজ করে না। সে নোটবই বের করে লিখে ফেলল। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই নাকি সে সব ঠিক করে ফেলবে। টাকা খাওয়াতে হবে। টাকা খাওয়ালেই সব ঠিক। টাকাটা সে কাকে খাওয়াবে কে জানে! আমি বললাম, আরেকজন রোগী থাকার কথা না ?

রোগীর বিছানা-বালিশ সবই আছে, রোগী নেই। মনসুর গম্ভীর হয়ে বলল, রুমমেট যাকে পেয়েছিস, মালদার পার্টি। জিনিসপত্র দেখ-না। থার্মোফ্লাস্কটা দেখেছিস ? মিনিমাম এক হাজার টাকা দাম।

রহমান সত্যি সত্যি অস্বস্তি বোধ করছে। দুবার বলল, ফিনাইলের গন্ধে তার মাথা ধরে যাচ্ছে। কিন্তু মনসুরের ওঠার কোনো তাড়া দেখা গেল না। সে রোগী সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেল। সেই সঙ্গে একজন আয়া নিয়ে আসবে, যে নাকি সব দেখেশুনে রাখবে। এটা-সেটা এনে দেবে। অসুবিধা হলে রাত-বিরেতে ডাক্তারকে খবর দেবে। মনসুর বিজ্ঞের মতো বলল, হাসপাতাল কি ডাক্তাররা চালায় ? হাসপাতাল চালায় আয়ারা। একজন ভালো আয়া পাওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। রহমান বিরক্ত হয়ে বলল, ছেলেদের ওয়ার্ডে আয়া আসতে দেবে নাকি ? কী যে সব কথাবার্তা!

আয়া নয়, একজন বেঁটে ছোকরাকে সে ধরে নিয়ে এল। খুব নাকি ওস্তাদ। ছোকরার নাম মঞ্জু মিয়া।

নতুন জীবন শুরু হলো।

আমার পাশের বেডের রোগীর নাম জুবায়ের। আনকমন নাম। ভদ্রলোকও বেশ আনকমন। দারুণ ফরসা এবং দারুণ রোগা। লম্বাও প্রায় ছ'ফুটের মতো। যখন শুয়ে থাকেন তখন কেন জানি সাপের মতো লাগে। সাপের উপমাটি ঠিক হলো না। সাপের মধ্যে একটা ঘিনঘিনে ব্যাপার আছে। একটা গতি আছে। এর মধ্যে তা নেই। এর চারদিকে একটা আলস্যের ভাব আছে। রোগের জন্যেই হয়তো। বয়সও ধরা যাচ্ছে না, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। রোগা মানুষের বয়স ধরা যায় না। ভদ্রলোক কথা বলেন খুবই কম। আমি যখন বললাম, আমি আজ বিকেলে এসেছি। আপনি অন্য কোথাও ছিলেন, আপনার সঙ্গে সে জন্যেই দেখা হয়নি। আমার নাম ফরিদ। তিনি শুধু বললেন, আমার নাম জুবায়ের। আর কোনো কথা হলো না।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার পর ভদ্রলোকের স্ত্রী এলেন। তিনি আমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন—এ অ্যানি, আমার স্ত্রী।

অ্যানি নামের মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন। নরম স্বরে বললেন, আপনাকে কিন্তু ও খুব জ্বালাবে। রাত জেগে বই পড়বে। আগে যে রোগীটি ছিল সে রোজই কমপ্লেইন করত।

আমি করব না। কারও বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কেন ? আপনি সন্ন্যাসী ?

মেয়েটির মুখ হাসি-হাসি। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। উত্তর জানতে চায় হয়তো।

কী, বলুন ? আপনি কি সংসার-বৈরাগী ?

জি-না।

সন্ন্যাসী হওয়া ঠিক না। রাগ, ঘৃণা, অভিমান, অভিযোগ এসব থাকা উচিত। এসবের দরকার আছে।

মেয়েরা এত গুছিয়ে কথা বলতে পারে তা জানা ছিল না। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হবে না। কালো রঙ। মাথাভর্তি চুল, বেণি করা নেই, পিঠময় ছড়িয়ে দেওয়া। এর দিকে তাকিয়ে বলে দেওয়া যায়—অনেক ছেলে এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি এদের সবাইকে ছেড়ে ফরসা ও রোগা লোকটির কাছে এসেছে। এসেছে কেন ? কী আছে লোকটির মধ্যে ?

অ্যানির অন্যসব প্রেমিককে আমার দেখতে ইচ্ছে করল। মেয়েটি বসেছে বিছানার পাশে। কথা বলছে মৃদুস্বরে। কিন্তু কথা বলছে সে একাই। লোকটি শুধু শুনে যাচ্ছে। এমনকি হ্যাঁ-হুঁ পর্যন্ত বলছে না। শুয়ে শুয়ে ওদের কথা শোনা ঠিক হচ্ছে না। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ বড় বারান্দা। রোগী দেখতে আসা লোকজনরা হাঁটাহাঁটি করছে। একটা লাল স্যুয়েটার-পরা বাচ্চা টুকটুক করে দৌড়াচ্ছে। এই গরমে তাকে স্যুয়েটার পরিয়েছে কেন কে জানে! আমি ডাকলাম—এই খোকা, এই! ছেলেটি অবাক হয়ে আমাকে দেখল, তারপর খেলতে লাগল নিজের মনে। শিশুদের মন পাওয়া খুব কঠিন। অ্যানি বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল।

ফরিদ সাহেব! যান, ভেতরে যান। আমরা এমন কিছু বলি না যে অন্যকেউ শুনতে পারবে না। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করে বাইরে এলেন।

ওর চোখ ভেজা। কাঁদছিল হয়তো।

অনেকদিন ধরে সে আর কথা বলে না, শুধু শোনে। কথা বলি আমি একা। আচ্ছা, আজ চলি।

ওনার কী হয়েছে ?

কী হয়েছে শুনে কী করবেন ? ও মারা যাচ্ছে।

ভদ্রলোক রাত একটা পর্যন্ত বই পড়লেন। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছে। এই অপরিচিত জায়গায় আমার ঘুম আসার কথা নয়, তবু আজ বোধহয় ঘুম আসবে। ভদ্রলোক বাতি নিবিয়ে নরম স্বরে ডাকলেন, ফরিদ সাহেব!

বলুন।

ঘুমাননি ?

জি-না। নতুন জায়গায় ঘুম আসে না।

আমারও আসে না। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন, হাসপাতালের প্রথম রাতে আমি মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম। ওষুধপত্র ছাড়াই দীর্ঘ ঘুম।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ফরিদ সাহেব, আপনারও কি ঘুম পাচ্ছে ?

জি।

ঘুমাবেন না। কষ্ট করে হলেও জেগে থাকেন। হাসপাতালের অনেকরকম কুসংস্কার আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, যে হাসপাতালের প্রথম রাতে আরাম করে ঘুমায় সে আর হাসপাতাল ছেড়ে জীবিত অবস্থায় বের হয় না।

তাই নাকি ?

এই কুসংস্কারটা আগে জানতাম না। জানলে আমি জেগে থাকতাম।

ভদ্রলোক অন্ধকারের মধ্যেই হাসলেন। যিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা বলেননি তিনি আমার সঙ্গে এত কথা বললেন কী জন্যে ?

ফরিদ সাহেব!

জি ?

আপনার সঙ্গে সিগারেট আছে ?

জি, আছে।

দিন একটা। আমার খাওয়া নিষেধ, কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে নাকি ?

মনে হয় পাচ্ছে।

ঘুমাবেন না, উঠে বসুন। ভুল করবেন না।

কুসংস্কারটাকে আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন ?

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। সিগারেটের আলো এক-একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। তাঁর ফরসা মুখ দেখা যাচ্ছিল। এত ফরসাও মানুষ হয়!

ফরিদ সাহেব!

বলুন।

অ্যানির সঙ্গে আমার ক'দিন হয় বিয়ে হয়েছে বলুন তো ?

বলতে পারব না।

অনুমান করুন।

দু' বছর ?

না। তিন মাস। আমি নিজে আমার অসুখের কথাটা জানি। কিন্তু সেটা গোপন করেই ওকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু কিছু-কিছু মেয়ে থাকে ফরিদ সাহেব, যাদের জন্যে যে-কোনো ধরনের অন্যায় করা যায়।

তা ঠিক।

আমি অবশ্যি বিয়ের পরই অ্যানিকে সব খুলে বলি। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, সে রাগ করেনি।

হয়তো রাগ করেছে, আপনাকে বুঝতে দেয়নি।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, দেখি, আরেকটা সিগারেট দিন।

আর খাবেন না।

এখন সিগারেট খাওয়া না-খাওয়া আমার কাছে সমান।

আমি আরেকটি সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম।

ফরিদ সাহেব!

বলুন।

ঘুম আসছে ?

হ্যাঁ।

ঘুমাবেন না। কুসংস্কার হোক যাই হোক, ঘুমাবেন না।

ঠিক আছে, ঘুমাব না।

আপনি যে বললেন সে রাগ করেছে এটা ঠিক না। রাগ করলে ঠিকই বুঝতে পারতাম। অসুস্থ অবস্থায় মানুষের সেনসিটিভিটি বেড়ে যায়। সে ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও ধরতে পারে।

তাহলে হয়তো রাগ করেননি।

না, করেনি।

ভদ্রলোক বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেলেন। ফিরে এলেন অনেকক্ষণ পর। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার নয়। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। তার আলোয় ঘরের ভেতরটাও আলোকিত। আবছা করে হলেও সবকিছু চোখে পড়ে। আমি বললাম, আপনি জেগে আছেন কেন ? আপনি শুয়ে পড়ুন।

হ্যাঁ, শুয়ে পড়ব। ঘুম আসছে। তবে একটা কথা শোনেন, জীবনের উপর আমার একটা রাইট আছে। আছে কি না ?

হ্যাঁ, আছে।

যাকে ভালোবাসি তাকে যদি একদিনের জন্যেও পেতে চাই তা হলে সেটা কি খুব অন্যায় ?

না, অন্যায় নয়।

আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এটা বলেছেন। কিন্তু আপনি মনে মনে এটাকে অন্যায় ভাবছেন।

না, তা ভাবছি না।

আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আমি কারও সান্ত্বনা চাই না। এসবের আমার দরকার নেই।

আমি চুপ করে গেলাম। ভদ্রলোক শুয়ে পড়লেন। এবং বোধহয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

হাসপাতালের নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে। সে কখনো ঘুমায় না। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে থাকে। এখন রাত বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বারান্দায় কাদের কথা শোনা যাচ্ছে, হাসির শব্দও শুনলাম। রোগীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়স্বজনরা হাঁটাহাঁটি করে।

রোগীদের কেউ কেউ কাঁদে। ব্যথায় কাঁদে কিংবা ভয়ে কাঁদে। আয়ারা খাবারের ভাগ নিয়ে দুপুররাতে ঝগড়া করতে বসে।

কমবয়সী ইন্টার্নি ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে রসিকতা করতে করতে বারান্দা দিয়ে হাঁটেন।

কোনো-একটি সময়ে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। রেসিডেন্ট সার্জন আসেন। নার্সরা ছোটাছুটি করতে থাকে। অপারেশন টেবিলে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুম-ঘুম চোখে স্ট্রেচার হাতে অ্যাটেনডেন্টরা। এনেসথেসিয়া যিনি করবেন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রেসিডেন্ট সার্জন ধৈর্য হারিয়ে চেঁচাতে থাকেন।

ঘুম চটে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে কত রকম শব্দ শুনলাম। সব অচেনা শব্দ। এই বিচিত্র শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে কত দিন লাগবে কে জানে!

হাসপাতালের খাবারদাবার খুব খারাপ হয় বলে জানতাম। সকালের নাশতা আমার ভালোই লাগল। এক পিস মাখন লাগানো রুটি, একটি সেদ্ধ ডিম, একটা কলা।

পাশের বেডের ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাশতা ঢাকা পড়ে রইল। তিনি ঘুম থেকে উঠলেন ন'টার দিকে এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড একটি টিফিন ক্যারিয়ারে করে তাঁর জন্যে খাবার এল।

ফরিদ সাহেব!

জি ?

আপনি কি নাশতা করে ফেলেছেন ?

হ্যাঁ।

এর পর থেকে করবেন না। অ্যানি সবসময় দুজনের জন্যে খাবার পাঠায়। আজ যখন সে আসবে আপনি তাকে বলে দেবেন কী কী জিনিস আপনার পছন্দ।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সারা দিন আমার আর একটি কথাও হলো না। যেন তিনি আমাকে চেনেন না। একটি বই মুখের সামনে ধরে রইলেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, কী পড়ছেন ?

থ্রিলার।

কথাটা বলেই এমনভাবে তাকালেন, যার অর্থ হচ্ছে আমাকে বিরক্ত করবেন না।

দুপুরের পর থেকে চারদিক অন্ধকার করে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। বেশ ভালো ঝড়। আজ কোনো ভিজিটর আসবে না। এমন দিনে ঘর থেকে কেউ বেরুবে না।

আজ অবশ্য কারও আসার কথা নয়। তবু কেউ কেউ হয়তো আসতে চাইবে। পিছিয়ে যাবে ঝড় দেখে। ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমাকে দেখতে আসার কেউ নেই।

আশ্চর্য, যার কথা কখনো ভাবিনি সেই দুলাভাই এসে পড়লেন। দুলাভাই বলাটা ঠিক হচ্ছে কি না কে জানে! বড় আপা মারা গেছেন সেই কবে! এর মধ্যে তিনি বিয়েটিয়ে করে ঘরসংসার শুরু করেছেন। পুরনো আত্মীয়তা বা সম্পর্কের কিছুই তো এখন নেই।

ফরিদ, কেমন আছ ?

ভালো আছি।

দুলাভাই বেশ কিছু কলা নিয়ে এসেছেন। সেগুলি থেকে টুপটুপ করে পানি পড়ছে। তাঁর গা বেয়েও জল ঝরছে।

গামছা দিয়ে গা মুছে ফেলুন। অসুখ করবে।

না, কী অসুখ করবে!

তিনি সাবধানে কলাগুলি বেডের নিচে রাখলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর স্বভাব বেশি বদলায়নি। তাঁকে আগের মতোই ভাবুক মনে হলো।

খবর পেয়েছেন কার কাছে দুলাভাই ?

তোমার বন্ধু মনসুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ও।

অপারেশনের ডেট দিয়েছে ?

জি-না।

টাকাপয়সা লাগবে ফরিদ ?

জি-না, লাগবে না। আপনি চলে যান দুলাভাই, ঠান্ডা লাগবে।

এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যাব কোথায় ? বসি খানিকক্ষণ।

ফ্লাস্কে চা আছে, খাবেন ?

না, চা খাই না। গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে।

দুলাভাই খুব সাবধানে শার্টের ভেতরের পকেট থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলেন।

কী রাখলেন ?

তেমন কিছু না।

এটা দুলাভাইয়ের আজ নতুন কিছু না। আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে হয়তো মেসে এসেছেন। চুপচাপ বসে থেকেছেন কিছুক্ষণ। যাওয়ার সময় লজ্জিত ভঙ্গিতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন টেবিলের উপর।

টাকা লাগবে না। টাকা কী জন্যে ?

চা-টা খাও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে, বেশি কিছু তো না। সেই সামর্থ্যও নাই।

তিনি এসব কি তাঁর মৃতা স্ত্রীর স্মরণে করেন ? কী জানি! মানুষের কত রকম বিচিত্র স্বভাব থাকে! সব মানুষই অবশ্যি বিচিত্র। একজনের সঙ্গে অন্যজনের কিছুমাত্র মিল নেই। সেজন্যেই কি একজনের মধ্যে অন্যজনের ছায়া দেখলে আমরা এমন চমকে উঠি ? অসংখ্যবার বলি, আজ নিউমার্কেটে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা— অবিকল সালামের মতো। ঠিক সেইরকম হাঁটার ভঙ্গি।

দুলাভাই খোলা জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছেন। কবি-সাহিত্যিকরা বোধহয় এভাবে তাকায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে ওঠে। দুলাভাইয়ের যেমন হয়েছে। আমি বললাম, দুলাভাই, আপনার বাচ্চারা ভালো ?

হুঁ।

এই প্রশ্নটি কি আমি তাঁকে দ্বিতীয়বার করলাম ? আমার মনে হতে লাগল একটু আগে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে। যখন কথা বলার কিছু থাকে না তখনই আমরা ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন করি।

দুলাভাই, আপনি কিছু মনে না করলে একটা সিগারেট খাই।

আরে ছি-ছি, খাও। এই বয়সে মুরুব্বি দেখলে চলে ? খাও। কোনো অসুবিধা নেই।

সিগারেট ধরাতে আমার সঙ্কোচ হতে লাগল। মনে হতে লাগল কাজটা অন্যায়। সাদাসিধা ধরনের যে মানুষটি আমার সামনে বসে আছে তাঁকে আরও খানিকটা সম্মান আমার করা উচিত।

আশ্চর্য, এই দীর্ঘদিনে একবারও কেন তাঁর খোঁজখবর করিনি ? কেন একদিনও তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে বলিনি, আপনাকে দেখতে এলাম দুলাভাই। ভালো আছেন তো ?

কেমন করে দুলাভাই তাঁর নতুন সংসার সাজিয়েছেন ? হঠাৎ বড় দেখতে ইচ্ছে করল। দুলাভাই বললেন, যাই, কেমন ? বৃষ্টি কমেছে।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, যদি অসুখ সারে তা হলে প্রথমেই যাব আপনার বাসায়। দুলাভাই হাসলেন। হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস না করারই কথা। কেউ কথা রাখে না, আমিও নিশ্চয়ই রাখব না। তবু তাঁর তাতে মন খারাপ হবে না। আবারও কোনোদিন আমাকে দেখতে আসবেন। সঙ্কুচিতভাবে একটা ময়লা পঞ্চাশ টাকার নোট আমার বালিশের নিচে রেখে দেবেন।

দুলাভাই চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় আমার মন খারাপ থাকল। কেন বলতে পারি না। অত্যন্ত সাধারণ কিছু মানুষ আছে যারা অন্যদের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। খুবই ক্ষণস্থায়ী প্রভাব, তবু তার ক্ষমতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

মনসুর এসে উপস্থিত হলো সন্ধ্যাবেলা। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার মিনিট পাঁচেক বাকি। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আসবার দরকারটা কী ছিল ?

আসতাম না। রীনা বলল, ঠান্ডার মধ্যে চা-টা খেতে ইচ্ছা হবে। ফ্লাস্কটা দিয়ে এসো। চা দিয়েছে ফ্লাস্কে করে।

ফ্লাস্ক তো আমার একটা আছে। রহমান দিয়ে গেল না ?

সারছে। আমি আবার একটা কিনলাম।

মনসুর চা ঢালল। পাশের ভদ্রলোককে চা সাধল। তিনি শীতল কণ্ঠে বললেন, চা খাব না।

দোকানের চা না, ঘরের চা। খান এক কাপ। ঠান্ডার মধ্যে ভালো লাগবে। তেজপাতা দেওয়া আছে।

থ্যাংক য়্যু, আমি চা খাব না।

আপনার অসুখটা কী ?

অসুখ নিয়ে আমি কারও সঙ্গে ডিসকাস করি না। কিছু মনে করবেন না।

না না, ঠিক আছে।

মনসুর থাকল সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। সে কথা না বলে এক সেকেন্ডও থাকতে পারে না। সাতটা পর্যন্ত সে ক্রমাগত কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিল। আমি বললাম, এখন বাড়ি যা মনসুর।

এত সকাল-সকাল বাড়ি গিয়ে করব কী ?

বউয়ের সঙ্গে গল্প করবি।

দেখি, যাব। আরেকটু বসি। এমন করছিস কেন ?

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে, এখন যা।

মনসুর তবু বসেই রইল। সম্ভবত তার যেতে ইচ্ছে করছে না। তার স্বভাবই এরকম, কোথাও গেলে কিছুতেই উঠতে চাইবে না। বিয়ের পরও সে স্বভাবের তেমন পরিবর্তন হয়নি।

ফরিদ, উঠি ? কাল রীনাকে নিয়ে আসব।

আসতে হবে না।

হবে না কেন ? আজই আসতে চেয়েছিল। বৃষ্টির জন্যে আনিনি।

আমি মনসুরকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে এল। তার এক মামাশ্বশুর নাকি তাকে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করেছেন, তার ফ্রিজ আছে কি না। এই কথা ক'টি সে বলল নিচুগলায়। এমন কী রহস্যময় কথা যে ফিসফিস করে বলতে হবে ? মনসুর বলল, এটা কেন জিজ্ঞেস করল বুঝতে পারছিস ?

না।

একটা ফ্রিজ কিনে দেবে আর কী।

বলিস কী!

আরে, ওদের কি আর অভাব আছে ?

সুখী মানুষের মতো হাসিমুখে নিচে নামতে লাগল মনসুর। তার মনে কি কোনো দুঃখ নেই ? সে কি সত্যি সত্যি একজন পরিতৃপ্ত সুখী মানুষ।

আমি মনসুরকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দেখি একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসেছেন আমাদের ঘরে। আমার রুমমেটের বাবা। অবিকল একরকম চেহারা। বাবা ও ছেলের মধ্যে এমন মিল সচরাচর দেখা যায় না। তাঁরা কথা বলছেন নিচুস্বরে। আমি বুড়ো ভদ্রলোককে সালাম-টালাম কিছু দিতাম। কিন্তু তিনি একবারও ভালো করে তাকালেন না আমার দিকে।

আমি বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে বসে রইলাম। একজন প্রফেসর সাহেব সম্ভবত রাউন্ড দিতে বের হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তিনজন ছাত্র, একজন নার্স। প্রফেসর সাহেবকে খুব মেজাজি মনে হলো। যাকে দেখছেন তাকেই ধমকাচ্ছেন। আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

আপনি কি রোগী ?

জি।

বাইরে বসে আছেন কেন ?

এমনি বসে আছি।

যান, ঘরে যান।

ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রফেসর সাহেব বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে আগুনচোখে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বুড়ো ভদ্রলোক নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, আপনার ওপেনিংয়ের ডেট দিয়েছে ?

আমি তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না।

অপারেশনের ডেট হয়েছে কি না ?

জি-না।

প্রিলিমিনারি টেস্ট ?

এখনো কিছু হয়নি।

সে-কী!

আমি মাত্র গতকাল এসেছি।

তাতে কী, চব্বিশ ঘণ্টা তো পার হলো। এই যে ইয়ং ডক্টরস, তোমরা করছ কী ?

ইন্টার্নি ডাক্তাররা নার্ভাস ভঙ্গিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ডাক্তার সাহেব এগিয়ে এলেন আমার রুমমেটের দিকে।

জুবায়ের সাহেব, আছেন কেমন ?

ভালো।

কী পড়ছেন ?

থ্রিলার।

ইন্টারেস্টিং নাকি ?

আছে মোটামুটি।

আপনার অপারেশন সিডিউল হয়েছে তো ?

জি, কাল।

কী, নার্ভাস ?

নাহ্।

দ্যাট্স্ গুড। কখন টাইম দিয়েছে ?

সকাল এগারোটা।

আজ বেশি রাত জাগবেন না। শুয়ে পড়বেন।

জুবায়ের সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

টেনশন কমাবার জন্যে দুটি ট্যাবলেট দিচ্ছি, খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবেন।

ঠিক আছে।

জুবায়ের সাহেব ঘুমুতে গেলেন না। রাত এগারোটা পর্যন্ত নিঃশব্দে থ্রিলার পড়তে লাগলেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, সিগারেট খেতে চান কি না। নতুন এক প্যাকেট দামি সিগারেট দিয়ে গেছে রহমান, দিনে চারটার বেশি খাব না এই চুক্তিতে। জুবায়ের সাহেব সিগারেটের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন না।

আমি চাদর টেনে ঘুমুতে গেলাম। তখন তিনি ডাকলেন।

ফরিদ সাহেব!

বলুন।

লক্ষ করেছেন, অ্যানি আজ আসেনি ?

জি, লক্ষ করেছি।

আপনার কথাও ঠিক হতে পারে।

কিসের কথা বলছেন ?

ঐ যে বলছিলেন অ্যানি রাগ করেছে, কিন্তু জানতে দেয়নি।

আমি কোনো কথা বললাম না।

কাল আমার অপারেশন, আজ তার আসা উচিত ছিল।

ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, আসতে পারেননি।

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তো অনেকেই এসেছে। তা ছাড়া সে আসবে গাড়িতে। ঝড়বৃষ্টিতে তার কী অসুবিধা ?

হয়তো মন-খারাপ হবে বলে আসেননি, কিংবা হয়তো শরীর খারাপ।

দিন একটা সিগারেট। মন-খারাপের কথা যেটা বললেন সেটাই বোধহয় ঠিক। ওকে আপনার কেমন লাগল ?

ভালো।

শুধু ভালো ?

বেশ ভালো।

ও একটি এক্সেপশনাল মেয়ে। দূর থেকে এতটা বোঝা যায় না। ভালো করে না মিশলে আপনি বুঝবেন না।

আমি চুপ করে রইলাম। জুবায়ের সাহেব গাঢ়স্বরে বললেন, অ্যানির সঙ্গে পরিচয় হওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার। পরিচয়টা স্থায়ী হলো না।

এখনই এত নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে ?

তিনি থেমে থেমে বললেন, আমি নিজেও একজন ডাক্তার। দিন, আরেকটা সিগারেট দিন।

আমি প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম।

ফরিদ সাহেব!

জি ?

আপনি কি বিয়ে করেছেন ?

না।

বিয়ে করেননি কেন ?

বিয়ে করার মতো সামর্থ্য কখনো হয়নি।

শুধু এই জন্যেই বিয়ে করলেন না ?

হ্যাঁ, এই জন্যেই।

কোনো মেয়ের সঙ্গে কি কখনো পরিচয় হয়েছে ?

আপনি যে অর্থে বলছেন সেই অর্থে হয়নি।

ভালো লাগেনি কাউকে ?

লেগেছে।

তাদের কাউকে কি তা বলেছেন ?

না, বলা হয়নি।

ফরিদ সাহেব!

জি!

বলেননি কেন ?

সাহস হয়নি।

বলা উচিত ছিল। অ্যানিকে কিছু বলার সাহস আমারও ছিল না। আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। আর দেখছেন তো আমাকে, বাঁশগাছের মতো লম্বা। মেডিকেল কলেজে আমার নাম ছিল—বেঙ্গল বেম্বো—বাংলাদেশের বাঁশ। তবু আমি সাহস করে বলেছিলাম।

অ্যানিও কি ডাক্তার ?

হ্যাঁ, সেও ডাক্তার। আমরা এক ইয়ারেই পাস করি।

জুবায়ের সাহেব, ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ রাতটা আমি জেগে থাকতে চাই। আজ সারা দিন কী ভেবে রেখেছিলাম জানেন ?

কী ?

অ্যানিকে বলব রাতটা এখানে থেকে যেতে। গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। আপনিও গল্প করতেন আমাদের সঙ্গে। অসুবিধা কিছু ছিল না। কী বলেন ?

না, অসুবিধা কী!

ফরিদ সাহেব!

বলেন।

আপনি কি মৃত্যুর কথা ভাবেন ?

হাসপাতালে আসবার আগে ভাবতাম, এখন ভাবি না।

এর কারণ কী, জানেন ?

না, জানি না।

চূড়ান্ত ভয়ের মুখোমুখি হলে এড্রেলিন নামের একটা এনজাইম প্রচুর পরিমাণে আমাদের শরীরে আসে। তখন আর ভয়টয় থাকে না। আপনার রক্তে এখন এড্রেলিন প্রচুর পরিমাণে আছে। কাজেই ভয়টয় লাগছে না। যত দিন যাবে এড্রেলিনের প্রভাব কমে আসতে থাকবে। তখন আবার ভয়। আবার হতাশা।

আমি কিছু বললাম না। কথাটা হয়তো সত্যি। হাসপাতালে আমার খুব একটা খারাপ লাগছে না। এই ক'দিন মৃত্যুর কথা একবারও মনে হয়নি। যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে। নাকি এরকম ভাব আমার মধ্যে সবসময়ই ছিল ?

মনে হয়, ছিল। সংসারে কারও জন্যেই আমার কোনো বিশেষ টান নেই। মা মারা যাওয়ার তিনদিনের দিন আমি স্কুলের অন্যসব ছেলেদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিলাম। সেখানে মায়ের কথা একবারও মনে হয়নি। আমরা সবাই বোধহয় নিজেদের জন্যেই বাঁচি। জুবায়ের সাহেব যদি সত্যি সত্যি মারা যান, আমার খুব কি খারাপ লাগবে ? সাপের মতো লম্বা ফরসা একটা মানুষ মারা গেলে আমার কী যায় আসে ? শুধু আমার কেন, এ জগতের কারোই কিছু যায় আসে না। অ্যানি নামের এই চমৎকার মেয়েটি হয়তো কিছুদিনের ভেতরই সুস্থ সবল একটি ছেলেকে বিয়ে করবে। ছুটির দিনে নাটক দেখতে যাবে মহিলা সমিতিতে। ভালোবাসার কথা বলাবলি করবে গভীর রাতে। এদের ঘরে আসবে চমৎকার একজন বাবু। খুব দুষ্টু হবে বাবুটি।

৬

ভিজিটিং আওয়ার চারটায়। বাবা তিনটার সময় উপস্থিত। গেটে আটকে রেখেছিল, তিনি হৈচৈ চেঁচামেচি করে চলে এসেছেন।

কী রে, আছিস কেমন ?

ভালো। চিঠি পেয়েছেন তো ?

হ্যাঁ।

আজই পেয়েছেন ?

হ্যাঁ।

বাবা কী বলবেন তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ব্যাপারে খোঁজ করবেন, নাকি বাবুলের পাঠানো টাকার পরিমাণটা জিজ্ঞেস করবেন ? কোনটি তাঁর কাছে বেশি জরুরি ? বাবা বললেন, টাকাটা তুলেছিস ?

না। ড্রাফট জমা দিয়েছি, ক্যাশ হতে সময় লাগবে।

কতদিন লাগবে ?

এই ধরেন দিন সাতেক। কত টাকা সেটা তো জিজ্ঞেস করলেন না ?

কত টাকা ?

লাখখানিক হতে পারে।

বলিস কী!

আরও পাঠাবে। দেখেন, চিঠিটা পড়ে দেখেন।

বাবা চার-পাঁচবার চিঠিটা পড়লেন। এখনো বোধহয় ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি বললাম, রাজার হালে থাকবেন, এখন চিন্তা নেই কিছু। বাড়ি বানাতে চাইলে বানাতে পারেন। কিংবা টাকাটা ব্যাংকে রেখে তার ইন্টারেস্ট দিয়ে চলতে পারেন। যেটা ভালো মনে করেন।

বাড়ি বানানোই ভালো। একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার। বাবুলও তো দেশে বেড়াতে-টেড়াতে আসবে। উঠবে কোথায় ? ওঠার জায়গা দরকার তো।

তা ঠিক।

আর কিছু থাক আর না থাক, একটা বাড়ি সবার থাকা দরকার। একটা ঠিকানা থাকে। মানুষের একটা ঠিকানা দরকার।

ফিলসফারের মতো কথা বলছেন আমাদের বাবা। ফিলসফার অ্যান্ড ফ্রেন্ড। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। সে-মুখে বিস্ময় এবং আনন্দ। যেন চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখছেন। এবং বুঝতে পারছেন এটা স্বপ্ন। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে যাবে। আমি হালকা স্বরে বললাম, বাবা, অনুকে আপনাদের বাড়িতে এনে রাখবেন। ওর অনেক কষ্ট। বাবা অবাক হয়ে বললেন, ওর আবার কিসের কষ্ট ? টাকাপয়সা আছে, ঘরবাড়ি আছে। দুইটা নতুন দোকান কিনেছে। উত্তরায় প্লট কিনেছে।

অভাবের কষ্ট ছাড়াও আরও সব কষ্ট আছে বাবা। আমি জানি ও খুব কষ্টে আছে।

তিনি ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমি বললাম, বাবা, আপনি কি চা-টা কিছু খাবেন ? ফ্লাস্কে চা আছে।

দে, খাই একটু চা। বড় পরিশ্রম হয়েছে।

শুয়ে থাকবেন ?

নাহ্।

বাবা আগ্রহ নিয়ে চা খেতে লাগলেন। বড় মায়া লাগল। এতটা বয়স হয়েছে তাঁর বোঝাই যায় না।

তোর এখানে আরেকজন থাকে না ?

ওনার আজ সকালে অপারেশন হয়েছে। ভালো আছেন। বেশ ভালো। ডাক্তাররা যা ভেবেছিলেন তা না। ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবেন।

তোর অপারেশন কবে ?

এখনো ডেট দিতে পারেনি। আরও সপ্তাহখানেক লাগবে বোধহয়। আপনি আর কিছু খাবেন ? এখানে মঞ্জু বলে একজন আছে, তাকে বললেই সে এনে দেবে। খিদে লাগছে ?

হুঁ।

কী খাবেন ? ভালো প্যাটিস আছে। আনাব ?

আনা।

বাবা চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে রইলেন। আমি বললাম, টাকাটা ক্যাশ হলেই করিম সাহেব আমাকে খবর দেবেন। তাঁদের ব্যাংকেই জমা দিয়েছি। করিম সাহেবকে চেনেন তো ? আমার পাশের ঘরে থাকেন।

চিনি।

অপারেশনে আমার যদি ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায় তাতেও অসুবিধা হবে না। করিম সাহেব ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার নামে চেক লিখে ওনার কাছে দিয়ে রেখেছি।

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। যেন আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। এমন কোনো রহস্যময় কথা তো আমি বলছি না।

তোর অসুখটা কী ?

আপনি জানেন না ?

না, তুই তো ভালো করে কিছু বলিসনি।

আমার পেটের নালিতে টিউমার হয়েছে। টিউমারটা খারাপ ধরনের হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। পেট না কাটলে ডাক্তাররা বুঝতে পারবেন না।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। থেমে থেমে বললেন, কাল আবার আসব।

দরকার নেই, কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন ?

বাবা অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালেন। আমি নরম স্বরে বললাম, আমার কোন মাসে জন্ম হয়েছিল আপনার মনে আছে ? ডিসেম্বর না জানুয়ারি ?

কেন ?

না, এমনি। কোনো কারণ-টারণ নেই।

তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছিস ?

রাগ করব কেন ?

টাকা চেয়েছিলি, দিইনি।

ছিল না, তাই দেননি। রাগ করব কেন ?

বাবা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষীণস্বরে বললেন, ছিল, আমার কাছে ছিল।

৭

আমার অপারেশন ডেট দিয়েছে। বুধবার সকাল নটায়। যে প্রফেসর অপারেশন করবেন তিনি একদিন দেখা করতে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, কী ভাই, কেমন আছেন ?

ভালোই আছি।

ভয় লাগছে নাকি ?

জি-না।

দ্যাট্‌স্‌ ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি কি আপনাকে ঐ গল্পটা বলেছিলাম, ঐ যে অপারেশন...

জি, এই গল্পটা বলেছেন।

এই দেখেন, একই গল্প আমি দুবার-তিনবার করে বলি। আরেকটা শোনেন, হাতির পেটে অপারেশন হবে। যন্ত্রপাতি সব পেট কেটে ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুজন নার্সও ঢুকেছে পেটে। ডাক্তার সাহেব অপারেশন শেষ করে স্টিচ করবার পর আঁতকে উঠে বললেন—আরে, নার্স দুজন কোথায় ?

আমি হাসলাম। ডাক্তার সাহেবও প্রাণ খুলে হাসলেন। বেশ লাগল ভদ্রলোককে। আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, আপনি কি সব রোগীর সাথে অপারেশনের আগে দেখা করেন ?

হ্যাঁ, করি।

কেন ?

রোগীরা সাহস পায়। আমি নিজেও কেন জানি সাহস পাই। আসলে আমি একজন ভীতু মানুষ। সার্জারি পড়াটা আমার ঠিক হয়নি।

তিনি আবার ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন। বেশ মানুষ! আমার পাশের বেডের নতুন রোগী বারো-তেরো বছরের একটি বাচ্চা ছেলে। সে ডাক্তার সাহেবের সাথে হাসল। ডাক্তার সাহেব বললেন, তোমার নাম কী খোকা ?

টগর।

টগর আবার কীরকম নাম ?

ফুলের নাম।

ফুলের নাম তো হয় মেয়েদের। বকুল, কদম, পারুল। ফুলের নামে ছেলেদের নাম হওয়া উচিত না। ছেলেদের নাম হওয়া উচিত ফলের নামে, যেমন—আপেল, কলা। হা-হা-হা।

টগর খুব হাসল। এই ছেলেটিও জুবায়ের সাহেবের মতো। হাসে না। কথা বলে না। সবসময় মুখ কালো করে বসে থাকে। *আনন্দমেলা*'র পাতা ওল্টায়।

ছেলেটির মা নেই বোধহয়। তার বড় বোন রোজ আসে এবং ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। চমৎকার একটি দৃশ্য। টগর বড় লজ্জা পায়। আড়চোখে বারবার তাকায় আমার দিকে। আমি ভান করি যেন কিচ্ছু দেখছি না।

রাতেরবেলা সে প্রায়ই ফিসফিস করে আমাকে ডাকে। আমি যদি বলি—কী ? সে সাড়া দেয় না। বড় লাজুক ছেলে।

আমি তাকে জুবায়ের সাহেবের কথা বলি। তিনি কেমন ভয় পেয়েছিলেন। ভোরবেলা যখন তাঁকে নিতে আসে তখন কেমন কাঁদতে শুরু করেন। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবেই না হাসিমুখে ঘরে ফিরে যান। ছেলেটি এই গল্প বারবার শুনতে চায়। এটি এমন গল্প যা কখনো পুরনো হবে না।

টগর চোখ বড় বড় করে বলে, ওনার অসুখ পুরোপুরি সেরে গেছে ?

হ্যাঁ, এবং তোমারও সারবে।

কেমন করে জানেন ?

জানি। জানি।

কেমন করে জানেন, সেটা বলেন।

তা বলব না। এটা গোপন কথা।

সে হাসে। সম্ভবত আমার কথা বিশ্বাস করে। শিশুরা সবকিছুই বিশ্বাস করে।

৮

অপারেশনের দুদিন আগে বড় ভাই দেখা করতে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। হাতে আপেলের একটা প্যাকেট।

কী রে, কেমন আছিস ?

ভালো।

এতবড় একটা ব্যাপার, তুই আমাকে মুখের কথাটা বললি না ?

বলতে গিয়েছিলাম। আপনাকে পাইনি। চিঠি তো দিয়েছি।

আমার উপর সবার রাগ। এর কারণটা তো আমার জানা দরকার।

রাগ হবে কেন ?

বড় ভাই গম্ভীর গলায় বললেন, সংসারের জন্যে কি আমি কিছু করিনি ? অনুর বিয়ের খরচ কে দিয়েছে ?

আপনি দিয়েছেন, আর কে দেবে ?

তোর আইএ পরীক্ষার ফিস ? কলেজের বেতন ? আমি এইসব দিইনি ?

হ্যাঁ, দিয়েছেন।

এখনো তো প্রতিমাসের তিন তারিখে বাবা এসে আমার কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে যান হাতখরচ। নেন না ?

এটা আমি জানতাম না। বাবার কথাবার্তায় কখনো প্রকাশ পায়নি। বড় ভাই নিচুস্বরে বললেন, অনেক কিছু আমার করার দরকার ছিল, আমি করতে পারিনি। কিন্তু তোরাও আমার জন্যে কিছু করিসনি।

পুরনো কথা বাদ দেন।

বাদ দেব কেন ? তোর ভাবি হাত ভেঙে এক মাস পড়ে রইল হাসপাতালে। কেউ তোরা গিয়েছিলি তাকে দেখতে ? স্বীকার করলাম সে ভালো মেয়ে নয়। ঝগড়াটে। কিন্তু মানুষ তো ? ডাক্তার বলল, হাত কেটে বাদ দিতে হবে। কী কষ্ট, কী দৌড়াদৌড়ি! কেউ এসেছিলি দেখতে ?

হাত কেটে বাদ দিতে হবে এটা শুনিনি।

বড় ভাই আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে শুরু করলেন।

টগর অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল। তারপর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললাম, ভাবি কেমন আছে ? বাচ্চারা ?

ভালোই। ওরা সবাই এসেছে। নিচে আছে।

নিচে কেন ?

আমি আগে এসেছি তোর সঙ্গে ফয়সালা করতে। কেন এত বড় একটা ব্যাপারে আমি কিছু জানলাম না ?

বাদ দেন। আমার ভুল হয়ে গেছে।

ভুলটা কেন করলি সেটা বল ? তোকে বলতে হবে।

আমি থেমে থেমে বললাম, কাউকেই কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। আপনি আমার চিঠি কি আজই পেয়েছেন ?

না, গত পরশু পেয়েছি। ভাবছিলাম আসব না।

এসে ভালো করেছেন।

আমি এলে না-এলে কারও কিছু যায় আসে না। আমি আবার কে ? তোর এখানে সিগারেট খাওয়া যায় ?

যায়। খান। নেন, আমার কাছে ভালো সিগারেট আছে। বাবা এখন বিরাট বড়লোক, শুনেছেন ?

হ্যাঁ। তোর চিঠিতে পড়লাম। বাবা আমাকে কিছু বলেননি।

আপনি দেখে শুনে বাবাকে একটা ছোটখাটো বাড়ি বানিয়ে দেন। তাঁর বাড়ির খুব শখ।

আমি কেন ? তুই দে।

আমি কিছু বললাম না। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার চোখ মুছতে শুরু করলেন।

৯

আমি কি ভয় পাচ্ছি ?

মনে হয় পাচ্ছি। সারাক্ষণ কেমন এক নতুন ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে শুরু করেছি। যেন সবকিছুই আছে, তবু কিছুই নেই। স্বপ্ন দেখার মতো ব্যাপার। সবকিছুই ঘটছে। অথচ কিছুই ঘটছে না। মনের ভেতর কোথায় যেন চাপা একটি উত্তেজনাও অনুভব করছি। সেই উত্তেজনাটি কী কারণে তাও স্পষ্ট নয়।

গত রাতে অনেকক্ষণ জেগে থেকে ঘুমুতে গেলাম। ঘুমুবার আগে আগে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন নার্স এসে বলল, আপনি কি ওষুধ খেয়েছেন ? কোন ওষুধের কথা বলেছে বুঝতে পারলাম না। তবু হাসিমুখে বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন। জেগে আছেন কেন ? মেয়েটির চেহারা ভালো নয় কিন্তু এমন মিষ্টি গলার স্বর। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে।

ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো। এবং আশ্চর্য, চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখলাম। কে যেন বলেছিল ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুলে কেউ স্বপ্ন দেখে না। কথাটা সত্যি নয়।

আমি দেখলাম, জেসমিন হাসপাতালে আমাকে দেখতে এসেছে। পিকনিকে যে শাড়ি পরে গিয়েছিল সেই শাড়ি তার পরনে। গলায় চিকন একটি চেইন। চুল বেণি করে বাঁধা। আমার স্বপ্ন হলো বাস্তবের চেয়েও স্পষ্ট। ঘুমের মধ্যেই আমি তার গায়ের ঘ্রাণ পেলাম। জেসমিন বলল, আপনাকে দেখতে এলাম। অবেলায় ঘুমুচ্ছেন কেন, উঠুন তো! আমি উঠে বসলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটা অন্যরকম হয়ে গেল। দেখলাম হাসপাতাল না, আমি আছি আমার মেসে। জেসমিন চুল আঁচড়াচ্ছে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, তার চুল এখন আর বেণি করা নয়। খুলে দেওয়া। সে চুল হাওয়ায় উড়ছে।

স্বপ্নে সবকিছুই খুব স্বাভাবিক মনে হয়। হাসপাতাল থেকে মেসে চলে আসার দৃশ্যটিও আমার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হলো। একবার অবশ্যি অস্পষ্টভাবে মনে হলো, এটা সত্যি নয়। এটা নিশ্চয়ই স্বপ্ন। হয়তো এক্ষুনি আমার ঘুম ভেঙে যাবে। জেসমিন চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, ইস্, আপার শাড়িটা ছিঁড়ে ফেলেছি। আপা যা রাগ করবে! বলতে বলতে সে হাসল। আমিও হাসতে শুরু করলাম। শাড়ি ছেঁড়ার প্রসঙ্গে দুজনের হাসার ব্যাপারটি মোটেও অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। যেন এটাই স্বাভাবিক। স্বপ্ন কত অর্থহীনই-না হতে পারে!

জেগে উঠে দেখি বালিশ ভিজে গেছে। অর্থহীন হাসাহাসির একটি স্বপ্ন দেখেও খুব কেঁদেছি।

জেসমিন, জেসমিন, তোমার সঙ্গে এ জীবনে বোধহয় আর দেখা হবে না। এ জীবনের পরেও কি অন্য কোনো জীবন আছে ? অনন্ত নক্ষত্রবীথির কোথাও কি আবার দেখব তোমাকে ?

১০

মাথার উপর উজ্জ্বল আলো। চারদিকে মুখোশপরা সব মানুষ। সবাই বড্ড বেশি চুপচাপ। আমার একটু শীত-শীত করছে। কে-একজন আমার নাকের উপর কী একটা চেপে ধরে বললেন, সহজভাবে নিঃশ্বাস নিন। বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। নেত্রকোনায় আমাদের বাড়ির পাশে বকুলগাছে প্রচুর ফুল ফুটত। সেই বকুলগাছে একবার কে চাকু দিয়ে লিখল—ফরিদ+নীলু। নীলু ফুড কনট্রোলার সাহেবের বড় মেয়ে। বাবা সেই লেখা পড়ে আমাকে উঠোনে চিৎ করে ফেলে পেটে পা দিয়ে চেপে ধরে বললেন, বেশি রস হয়েছে ? গাছে প্রেমপত্র লেখা হচ্ছে ?

নীলু এখন কোথায় আছে ? কত বড় হয়েছে সে ? সে কি দেখতে আগের মতোই আছে, না বদলে গেছে ? সবাই আমরা বদলে যাই কেন ?

আবার কে যেন বললেন, সহজভাবে নিঃশ্বাস নিন। তাঁর কথা অনেক দূর থেকে আসছে। আমি মনে মনে বললাম, আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে তুলুন। একটি খুব জরুরি কথা আমার বলা হয়নি। অস্পষ্টভাবে কেউ যেন বলল, কী সেই কথা ? কী কথা সেটা আর মনে পড়ছে না। আমি প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করলাম। বকুল ফুলের গন্ধের সঙ্গে সেই কথা মিশে গেছে। কিছুতেই আলাদা করা যাচ্ছে না। কে যেন গম্ভীর স্বরে বলল, তাড়াতাড়ি মনে করবার চেষ্টা করুন, সময় নেই। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি খুব স্পষ্টভাবে বললাম, আমি সবাইকে ভালোবাসি। এই কথাটি কখনো কাউকে বলা হয়নি। আমাকে বলার সুযোগ দিন, আমার প্রতি দয়া করুন।

ডাক্তারের কথা শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলছেন, আপনি বড্ড নড়াচড়া করছেন। সহজভাবে শ্বাস নিন।

আমি শ্বাস নিই। বকুল ফুলের গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

আমার আছে জল

রেলস্টেশনের এত সুন্দর নাম আছে নাকি ? 'সোহাগী'—এটা আবার কেমন নাম ? দিলু বলল, আপা, কী সুন্দর নাম দেখেছ!

নিশাত কিছু বলল না। তার ঠান্ডা লেগেছে। সারা রাত জানালার পাশে বসে ছিল। খোলা জানালায় খুব হাওয়া এসেছে। এখন মাথা ভারভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নাক দিয়ে জল ঝরতে শুরু করবে। দিলু বলল, আপা, স্টেশনের নামটা পড়ে দেখ না। প্লিজ।

পড়েছি। ভালো নাম।

দিলুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে আশা করেছিল নিশাত আপাও তার মতো অবাক হয়ে যাবে। চোখ কপালে তুলে বলবে—ও মা, কেমন নাম! কিন্তু সে আজকাল কিছুতেই অবাক হয় না। কথাবার্তা বলে স্কুলের জিওগ্রাফি আপার মতো। নিশাত বলল, দিলু, দেখ তো বাবু কোথায় ? দুধ খাবে বোধহয়।

দিলু বাবুকে কোথাও দেখতে পেল না। এমন দুষ্টু হয়েছে। ওয়েটিং রুমে ঘাপটি মেরে বসে আছে হয়তো। কাছে গেলেই টু দেবে। ধরতে গেলেই আবার ছুটে যাবে।

ওয়েটিং রুমের সামনে একগাদা জিনিসপত্রের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্ত মুখ। তিনি দিলুকে দেখেই বললেন, একেকজন একেক দিকে চলে গেছে। ব্যাপারটা কী ? তোর মা কোথায় ?

জানি না তো।

তোর মাকে খুঁজে বের কর।

আমি পারব না বাবা, আমি বাবুকে খুঁজছি।

বাবুকে খুঁজলে তোর মাকে খোঁজা যাবে না—এরকম কথা কোথাও লেখা আছে ?

সবাই আজ এরকম করে কথা বলছে কেন ? কোথাও বেড়াতে গেলে সবার খুব হাসিখুশি থাকা উচিত। কিন্তু এখানে সবাই কেমন রেগে কথা বলছে। রাগটা তার উপরই। ট্রেনে মা তিনবার বললেন, দিলু, পা নাচাচ্ছ কেন ? পা নাচানো একটা অসভ্যতা। চুপ করে বসো।

পা নাচানোর মধ্যে আবার সভ্যতা-অসভ্যতা কী! যত আজগুবি কথা।

দিলু।

বলো।

তোর মাকে খুঁজে বের কর। আমার পাইপের তামাক রেখেছে কোথায় সে ?

আমি কী করে জানব ? আমি রাখলে আমি জানতাম। আমি তো রাখিনি।

দিলুর বাবা ওসমান সাহেব রাগী চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওসমান সাহেবের বয়স আটান্ন। কিন্তু দেখায় আরও বেশি। শরীর হঠাৎ করে ভারী হয়ে

গেছে। মাথার সমস্ত চুল পাকা। মেজাজের পরিবর্তনও হয়েছে হঠাৎ করেই। এখন আর কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেন না। তিনি দিলুর উপর ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। দিলুর বয়স এই মার্চে চৌদ্দ হবে। নাকি পনের ? মেয়েদের এই বয়সটা অন্যরকম। এই বয়সে চেনা মেয়েগুলোকেও অচেনা লাগে। মনে হয় অন্য বাড়ির মেয়ে। এদের উপর কিছুতেই রাগ করা যায় না।

দিলু পরেছে একটা ধবধবে সাদা স্কার্ট। পায়ের মোজা ও জুতা দুই-ই লাল। মাথায় দুটি লম্বা বেণি। শীতের সকালের রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে বড় অচেনা লাগছে। এর উপর রাগ করা যায় না। ওসমান সাহেব বাক্স-পেটরা হাতড়াতে লাগলেন। পাইপ ধরানোর ইচ্ছা হচ্ছে। অনিয়ম করা যায়। ছুটি হচ্ছে অনিয়মের জন্যে।

দিলু ওয়েটিং রুমে কাউকে দেখল না। তবে ওয়েটিং রুমের বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কেউ আছে নিশ্চয়ই। মা বোধহয় বাবুকে বাথরুম করাচ্ছেন। দিলু ডাকল, বাথরুমে কে ? জল পড়ার শব্দ থেমে গেল। দিলু আবার বলল, বাবু তুমি ? কোনো সাড়া নেই। তার মানে মা। মা একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাথরুম থেকে কথা বলবেন না।

দিলু যদি বলে—মা, গায়ে মাখার সাবানটা আছে ? মা জবাব দেবেন না। বাথরুম থেকে কথা বলা নাকি অসভ্যতা। এর মধ্যে অসভ্যতার কী আছে ?

খুট করে দরজা খুলল। দিলু দেখল ভেজা মুখে জামিল ভাই বের হয়ে আসছেন।

কী-রে দিলু, ইমার্জেন্সি নাকি ? যা ঢুকে পড়।

ছি, কী অসভ্যতা! জামিল ভাইয়ের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। মেয়েদের কেউ বাথরুমে যাওয়ার কথা ওভাবে বলে নাকি ? সে যে বড় হচ্ছে এটা কি জামিল ভাইয়ের চোখে পড়ে না। এখন শাড়ি পরলে অনেকেই তাকে 'আপনি' করে বলে। জামিল ভাই বোধহয় তাকে কখনো শড়ি পরা দেখেনি।

জামিল ভাই, বাবুকে দেখেছেন ?

না।

মা-কে দেখেছেন ?

না। কেন ?

আপা খুঁজছে বাবুকে। বাবা খুঁজছে মা-কে।

ওরা মনে হয় স্টেশনের বাইরে হাঁটতে গেছে। চল যাই খুঁজে নিয়ে আসি। তোকে তো দারুণ লাগছেরে দিলু। ট্রেনে কি এই ড্রেসেই ছিলি নাকি ?

হুঁ।

মাই গড! তখন তো চোখেই পড়েনি।

জামিল দেখল দিলু খুব লজ্জা পাচ্ছে। এর কারণ সে ঠিক বুঝতে পারল না। মেয়েটি কি বড় হয়ে যাচ্ছে নাকি ?

'দেখতে দারুণ লাগছে'—এই কথায় কানটান লাল করার মানেটা কী ? জামিল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

দিলু, তুই যেন কোন ক্লাসে এবার ?

ক্লাস নাইনে। ইস আপনি যেন জানেন না!

কোন গ্রুপ, সায়েন্স না আর্টস ?

সায়েন্স।

বাপরে বাপ, সায়েন্স! ইলেকটিভ অংকে গোল্লা খাবি তো।

কেন, গোল্লা খাব কেন ?

মেয়েরা অংক-মানসাংক এসব জানে নাকি ?

জামিল পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিরুনি বের করে বাথরুমের আয়নায় চুল আঁচড়াতে গেল। দরজা পর্যন্ত বন্ধ করল না। কী বাজে অভ্যাস। দিলু শুনল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জামিল ভাই গুনগুন করে গান গাচ্ছে—'আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে, এত পাখি গায়।'

এই শীতে বসন্তের গান ? দিলু বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখল। সুরেরও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। বাথরুমে ঢুকলেই গান গাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে ?

চল দিলু, দেখি কাউকে পাওয়া যায় কি না।

ওসমান সাহেব একটা কালো ট্রাঙ্কের উপর বসে আছেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব এখন আর নেই। পাইপের তামাক পাওয়া গেছে। পাইপ তৈরি করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন ধরাতে পারছেন না। জামিলদের বেরুতে দেখে হাসিমুখে বললেন, জামিল, আমাকে এখানে বসিয়ে একেকজন একেক দিকে কেটে পড়েছে, ব্যাপারটা কী বলো তো ?

সম্ভবত ছুটির দিনে আপনাকে কেউ ভয়-টয় পায় না। আপনাকে নিরীহ মনে করে।

ওসমান সাহেব শব্দ করে হাসলেন। এত শব্দে তিনি কখনো হাসেন না। দিলুও হাসল। কাউকে হাসতে দেখলেই দিলুর হাসি পায়। ওসমান সাহেব বললেন, কী রকম মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে দেখলে ? স্টেশনে জিপ নিয়ে থাকার কথা। জিপ তো নেই-ই, একজন মানুষ পর্যন্ত নেই।

এসে পড়বে।

কিছু মুখে দেওয়া দরকার। এত বেলা হয়েছে, সবার ক্ষিধে পেয়েছে।

বেলা কিন্তু চাচা বেশি হয়নি, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। সকাল হয়েছে মাত্র।

তাই নাকি! ওসমান সাহেব বেশ অবাক হলেন।

জামিল বলল, আমি দেখি চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ঐখানে একটা চায়ের দোকান আছে।

ঐ চা কি মুখে দেওয়া যাবে ?

চেষ্টা করতে দোষ কী। লেট আস ট্রাই।

ওসমান সাহেব আবার শব্দ করে হাসলেন। তাঁর মেজাজ সম্ভবত ভালো হতে শুরু করেছে। দিলু হাসল। এখন বেশ পিকনিক পিকনিক লাগছে।

২

নিশাত একটা কাঠের বেঞ্চিতে লাল চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিল। রোদ পড়েছে তার মুখে। শীতের বাতাসে তার কপালে ছোট ছোট কিছু চুল নাচছে। সে বসে আছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে। তার ফর্সা গালে লাল চাদরের আভা পড়েছে। দিলু ফিসফিস করে বলল, আপা কত সুন্দর দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখলাম।

আপাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই ?

ডাক। ডাকলেই হয়।

দিলু ডাকল, আপা, এই আপা। নিশাত ওদের দুজনকে দেখল। কিছু বলল না। মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিটি রাগী ভঙ্গি। সে এমন রেগে আছে কেন ?

আপা, আমাদের সঙ্গে যাবে ? আমরা স্টেশনের বাইরে হাঁটতে যাচ্ছি।

না, বাবু কোথায় ?

বাবু মা'র সঙ্গে। ওদেরই খুঁজতে যাচ্ছি। তুমিও চল।

না, আমি যাব না।

চল না আপা।

এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। তোরা যা।

দিলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আপা মাঝে মাঝে এমন কড়া করে কথা বলে। এত সুন্দর একটি মেয়ে এরকম করে কথা বলবে কেন ? দিলু হাঁটতে শুরু করল।

জামিল ভাই, এগুলো কী গাছ ?

জানি না কী গাছ।

কৃষ্ণচূড়া নাকি ?

না, কৃষ্ণচূড়া না। কৃষ্ণচূড়ার পাতা তেঁতুল গাছের পাতার মতো। এগুলো খুব সম্ভব জারুল। কচুরিপানার মতো ফুল হয় এদের। লালচে বেগুনি রঙের। খুব সুন্দর।

এই স্টেশনের নামটা কত সুন্দর দেখেছেন ?

নামটার একটা গল্প আছে, জানো ?

কী গল্প ?

এখানে এক রাজা ছিলেন। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের নাম সোহাগী। রাজ্যে পানির খুব কষ্ট। রাজা ঠিক করলেন এমন এক পুকুর কাটবেন যে, রাজ্যে পানির কষ্ট থাকবে না। তিনি সত্যি প্রকাণ্ড এক পুকুর কাটালেন। কিন্তু আশ্চর্য, একফোঁটা পানি নেই। সেবছর খুব খরা। রাজ্যের লোক হাহাকার করছে। রাজা শুকনো মুখে পুকুরপাড়ে বসে আছেন, তখন শুনলেন কে যেন বলছে—রাজন, তোমার কন্যাকে পানিতে নামিয়ে দাও, জল আসবে। রাজা সোহাগীকে নামিয়ে দিলেন এবং বললেন—কোনো ভয় নেই মা, জল আসতে শুরু করলেই তোমাকে টেনে তুলে ফেলব।

মেয়ে পুকুরে নামামাত্রই চারিদিক থেকে হু-হু করে জল আসতে লাগল। রাজা আর তাকে টেনে তুলতে পারলেন না। পুকুরটির নাম হলো সোহাগী পুকুর। জায়গাটার নাম হলো সোহাগী।

যান, এটা সত্যি না। বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

বানাব কেন ? সোহাগী পুকুর সত্যি সত্যি আছে। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আর তুমি যদি ভরা পূর্ণিমার রাতে পুকুরপাড়ে বসে থাক তাহলে সোহাগীর কান্নাও শুনবে। ঐ মেয়েটি ভরা পূর্ণিমায় কাঁদে।

কেন ?

পূর্ণিমার রাতে সে পুকুরে নেমেছিল তাই। প্রতি পূর্ণিমাতেই সে আসে।

দিলু অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তার চোখ ভিজে আসছে। তার খুব অল্পতেই কান্না পায়।

নিশাত দেখল—ওরা লোহার গেট পার হয়ে স্টেশনের ওপাশের কাঁচা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জামিল ভাই গল্প করছেন হাত নেড়ে নেড়ে। কী গল্প কে জানে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে দিলু। দিলুকে আজ অন্যদিনের চেয়েও একটু বড় লাগছে। এত বড় মেয়ের স্কার্ট পরা ঠিক না। চোখে লাগে। মাকে বলতে হবে।

লোকজন বিশেষ নেই চারদিকে। শুধু একজন বুড়ো খুব মন দিয়ে নিশাতকে দেখছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। নিশাত ভেবেছিল ভিক্ষা চায় বুঝি। কিন্তু না, এ ভিক্ষুক নয়। ভিক্ষুকদের এতটা কৌতূহল থাকে না। তারা সরাসরি ভিক্ষা চায়। না পেলে চলে যায় অন্য কোথাও।

নিশাতের নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। দুটি প্যারাসিটামল খেয়ে নেওয়া দরকার। নিশাত উঠে দাঁড়াল। বুড়োটি বলল, কই যাইবেন গো মা ? আশ্চর্য, কত সহজেই 'মা' ডাকল। প্রশ্ন করাতেও কোনো সংকোচ নেই। যেন কতদিনের চেনা।

আমরা যাব নীলগঞ্জ।

ডাকবাংলায় ?

জি।

নিশাত চলতে শুরু করল। তার পেছনে পেছনে গেঞ্জি গায়ে বুড়োটি আসছে। আরও কিছু জানতে চায় হয়তো। গ্রামের মানুষদের খুব কৌতূহল। ওরা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে।

জামিল একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। দিলু বলল, এখানে চা খাবেন ? যা ময়লা! জামিল বলল, গ্রামে ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট কোথায় ? এটা মন্দ কী!

বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে চা বানাচ্ছিল। তার সামনে কাঠের একটা লম্বা বেঞ্চে পিঠ মেলে দু'জন লোক বসে চা খাচ্ছে। তাদের একজন বলল, আপনারা যাইবেন কোনখানে ?

নীলগঞ্জ।

মেলা দূর। যাইবেন ক্যামনে ?

জিপ আসার কথা।

রাস্তা তো ঠিক নাই। জিপগাড়ি আওনের পথ নাই।

তাই নাকি ?

জি। এইজন কি আপনের মাইয়া ?

না, আমার বোন।

দিলু দেখল দুটি লোকই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। তার বড় অস্বস্তি লাগতে লাগল। জামিল ভাই এই বেঞ্চে বসেই চা খাবেন নাকি ? লোক দুটির কৌতূহলের সীমা নেই। একজন বলল, সাব, আপনের নাম ?

আমার নাম জামিল।

আপনে করেন কী ?

মাস্টারি করি ভাই। দেখি, একটু বসার জায়গা দেন।

দিলু অবাক হয়ে দেখল ওরা সবাই বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসল। আগের মতোই তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এতটুকু সংকোচ নেই। জামিল বলল, দেখি, দু'কাপ চা দাও তো। দিলু খাবি তো ?

খাব।

লোক দু'জনের একজন বলল, বজলু, সাবরে আর মাইয়াডারে কুকি বিসকুট দে। খালি পেডে চা খাওন ঠিক না। ছেলেটি দুটি লম্বা বিসকিট হাতে করে এগিয়ে দিল। দিলু নিল না, কিন্তু জামিল নিল এবং চায়ে ভিজিয়ে বাচ্চাদের মতো খেতে লাগল। কী যে সব কাণ্ড জামিল ভাইয়ের। দেখতে মজা লাগে।

৩

রেহানা বাবুকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সাব্বির। সাব্বির তাঁর দূরসম্পর্কের ভাগ্নে। সাব্বিরের এখানে আসার কথা ছিল না। হঠাৎ করেই এসেছে। এই হঠাৎ করে আসার অন্য কোনো অর্থ আছে কি না রেহানা তা বুঝতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাব্বির ছেলেটি হয় খুব চাপা কিংবা অতিরিক্ত চালাক। তার হাবভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

রেহানার ধারণা ছিল ট্রেনে সাব্বির নিশাতের আশেপাশে বসতে চেষ্টা করবে। এবং গল্পটল্প করবে। সে তেমন কিছু করেনি। বসেছে কোণার দিকে। কিছুক্ষণ অত্যন্ত মন দিয়ে একটা কমিক পড়েছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একজন মানুষ মুগ্ধ হয়ে কমিক পড়ছে, ব্যাপারটা তার ভালো লাগেনি। কমিক শেষ হওয়া মাত্র সে জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করেছে কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশাতের দিকে তার কোনোরকম আগ্রহ বোঝা যায়নি। তবে এও হতে পারে যে, সে চেষ্টা করে তার আগ্রহ গোপন রাখছে। নিশাতকে ভালোরকম জানতে চায়।

আজ ভোরে তিনি দেখলেন সাব্বির ক্যামেরা হাতে একা একা যাচ্ছে। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও এগুলেন। অল্পকিছু কথাবার্তা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দেশে কতদিন থাকবে ?

বেশি দিন না। ক্রিসমাসের ছুটির পর যাব। জানুয়ারির তিন-চার তারিখের মধ্যে পৌঁছতে হবে।

তাহলে তো খুব অল্পদিন।

জি।

রেহানা ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরবে নাকি ? অনেকে তো তাই করে।

এখনো কিছু ঠিক করিনি। আমার মা অবশ্যি মেয়ে-টেয়ে দেখছেন। বিয়ে করতেও পারি।

রেহানা কিছু বললেন না। দেখলেন সাব্বির ক্রমাগত ছবি তুলছে। গাছের ছবি। নদীর ছবি। নৌকার ছবি। কুয়াশায় সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভালো ছবি আসার কথা নয়। তবু ছবি তুলছে। রেহানা একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন—এই ছেলেটি অত যে ছবি তুলছে, একবারও বলেনি—আসুন মামি, আপনার একটা ছবি তুলে দেই। এই বয়সে ছবি তোলার তাঁর কোনো শখ নেই। তবু এটা সাধারণ ভদ্রতা। সাব্বির বলল, আপনার নাতি খুব শান্ত। খুব চুপচাপ।

খুব শান্ত না। বিরক্ত করে। নতুন জায়গা দেখে চুপ করে আছে। অপরিচিত মানুষের সামনে সে ভেজা বেড়াল।

ওর বয়স কত ?

পাঁচ বছরে পড়ল।

রেহানা আশা করছিলেন সাব্বির এবার বাবুর সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা বকের ছবি ফোকাসে আনতে চেষ্টা করল। টেলিস্কোপিক লেন্স থাকা সত্ত্বেও বকের ছবিটি স্পষ্ট হচ্ছে না। বেশ কুয়াশা। মোটামুটি স্পষ্ট হলে ছবিটি ভালো হতো। বকের ধ্যানী ছবিটি হালকা সবুজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভালো আসছে। রোদ আরেকটু চড়ে গেলে ছবি ভালো হবে না।

সাব্বির, চল যাই। তোমার মামা বোধহয় রেগে যাচ্ছেন।

চলুন।

বাবুকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। একবার বললেন—বাবু, আমার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে চল। বাবু শক্ত করে তাঁর গলা চেপে ধরল। তার মানে সে কিছুতেই নামবে না। রেহানা আশা করছিলেন সাব্বির বলবে—আমার কোলে দিন। আমি নিয়ে যাব। কিন্তু সাব্বির সে-সব কিছুই বলল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। মেয়েদের সঙ্গে এত দ্রুত হাঁটা যায় না। এই সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানও কি ওর নেই ? রেহানা মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন।

স্টেশনের কাছে এসে তিনি দিলু এবং জামিলকে দেখলেন। নোংরা একটি বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। তাদেরকে ঘিরে চার-পাঁচজন গ্রামের মানুষ বসে আছে মাটিতে। দিলু স্কার্ট পরে থাকায় তার ফর্সা পা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি তার ভালো লাগল না। গ্রামের মানুষগুলি বোধ করি বসে আছে ফর্সা পা দেখার জন্যে। তিনি একবার ভাবলেন দিলুকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। দিলুর জামাকাপড় কী কী এনেছেন তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। মনে পড়ল না। জামাকাপড় সব গুছিয়েছে নিশাত, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

দিলু তাদের দেখেই ডাকল, মা, কোথায় ছিলে তোমরা ? তারপর ছুটে এল তাদের দিকে। আমরা ভাবলাম তোমরা বোধহয় হারিয়েই গেছ।

হারিয়ে যাব কেন ? নে, বাবুকে কোলে নে।

দিলু বাবুকে কোলে নিয়েই বলল, সাব্বির ভাই, আমাদের একটা ছবি তুলে দিন তো। এই বাবু, উনার দিকে তাকিয়ে হাস তো লক্ষ্মী ছেলের মতো।

সাব্বির ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল। এবং ছবি তুলল বেশ কয়েকটি। রেহানার মনে হলো এই একটি ব্যাপারে ছেলেটির আগ্রহ আছে। ছবি তোলায় তার কোনো ক্লান্তি নেই।

ওসমান সাহেব ভেবে রেখেছিলেন রেহানার উপর খুব রাগ করবেন। সেটা সম্ভব হলো না। সাব্বির রয়েছে। তার সামনে কোনো সিন ক্রিয়েট করার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিরক্ত স্বরে বললেন, তোমারা ছিলে কোথায় ?

কাছেই। তোমার জিপ তো এখনো আসেনি। এত তাড়া কিসের ?

জিপ আসবে না। নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে।

গরুর গাড়ি ?

দু'টা গরুর গাড়ি, একটা মহিষের গাড়ি। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হবে।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, তিনটা গাড়ি কেন ?

পাগল-ছাগলের কাণ্ড। যতগুলো পেয়েছে, নিয়ে এসেছে।

তোমার পুলিশের লোকজন কেউ আসেনি ?

না।

ওসমান সাহেবের মনে হলো রেহানা মুখ টিপে হাসছে। কেউ নিতে আসেনি ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ নিয়ে হাসবে কেন ? রেহানা বললেন, তোমার খবর বোধহয় পায়নি। পেলে আসত।

ওয়ারলেস ম্যাসেজ দিয়েছি। পাবে না মানে ?

তোমাদের নীলগঞ্জ থানায় হয়তো ওয়ারলেস নেই।

প্রতিটি থানায় ওয়ারলেস সেট আছে। কী বলছ এসব ?

দিলু বলল, বাবা, আমি কিন্তু মহিষের গাড়িতে করে যাব।

ওসমান সাহেব একটা ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বের হয়েছেন, ছুটির সময়টায় কোনো রাগারাগি করবেন না।

কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখা যাচ্ছে না। কেন কেউ নিতে আসবে না ? থানাওয়ালাদের এত বড় স্পর্ধা থাকা ঠিক নয়।

৪

গাড়িতে গুছিয়ে বসতে বসতে ন'টা বেজে গেল। প্রথম কথা হয়েছিল একটিতে যাবে শুধু মালপত্র। অন্য দুটির একটিতে জামিল ও সাব্বির এবং আরেকটিতে দিলুরা। কিন্তু নিশাত বলল, আমি মা-বাবুকে নিয়ে একটি গাড়িতে একা যেতে চাই।

কেন ?

কোনো কেন-টেন নেই। এম্নি যেতে চাই।

সবসময় তুই একটা ঝামেলা করতে চেষ্টা করিস।

ঝামেলা করতে চেষ্টা করি না। কমাতে চেষ্টা করি। আমি মা একা যেতে চাই।

নিশাত শেষ পর্যন্ত অবশ্যি একা একা গাড়িতে ওঠেনি। রেহানা উঠেছেন তার সঙ্গে। প্রথম গাড়িতে বাবা, দিলু ও বাবু। মহিষের গাড়িটিতে জামিল ও সাব্বির।

গাড়ি চলা শুরু করা মাত্রই সাব্বির মাথার নিচে একটা হ্যান্ড ব্যাগ দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। জামিল বলল, কি, ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

হ্যাঁ। রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

এই ঝাঁকুনিতে ঘুম হবে ?

হবে। আমার অভ্যেস আছে।

ঘুমুবার আগে একটা সিগারেট খাবেন ?

জি-না, আমি সিগারেট খাই না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাব্বির ঘুমিয়ে পড়ল। জামিল একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা বোধ করল। এত সহজে কেউ অমন ঘুমিয়ে পড়তে পারে ? একা বসে থাকা ক্লান্তিকর ব্যাপার। নেমে গিয়ে প্রথম গাড়িটিতে উঠা যেতে পারে। সেখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না এই একটা ঝামেলা। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে ওসমান সাহেব বেশ বোরিং হবেন বলেই তার ধারণা। লোকটির রসবোধ নেই। অফিসের বাইরে যে আরও কিছু থাকতে পারে তা খুব সম্ভব তিনি জানেন না।

এক পর্যায়ে জামিলের মনে হলো, এখানে আসা কি সত্যি দরকার ছিল ? মানুষ বেড়াতে যায় ফুর্তি করবার জন্যে। এখানেও কি সেরকম কিছু হবে ? সম্ভাবনা খুব কম। জামিল গাড়োয়ানের পাশে এসে বসল। রাস্তায় ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি খুব ধীরে চলে বলে যে ধারণা আছে সেটা ঠিক নয়। বেশ দ্রুতই চলছে। গান শুনতে শুনতে যেতে পারলে হতো। কিন্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি নিশাতদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে নাকি ?

নিশাতের নাক ভার হয়ে আছ। মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। সে বলল, মা, তোমার কাছে প্যারাসিটামল আছে ?

আছে। তোর জ্বর নাকি ?

না সর্দি। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রেহানা তার গায়ে হাত দিলেন—গা তো বেশ গরম। শুয়ে থাক।

শুয়ে থাকতে হবে না। তুমি দুটো ট্যাবলেট দাও।

পানি তো নাই। পানির বোতল পেছনের গাড়িতে।

পানি লাগবে না। তুমি দাও।

রেহানা দুটি ট্যাবলেট দিলেন। নিশাত একটুও মুখ বিকৃত করল না। ট্যাবলেট দুটি গিলে ফেলল।

শুয়ে থাক।

আমার শুয়ে থাকার যখন প্রয়োজন হবে আমি শুয়ে থাকব। তোমার বলতে হবে না।

তুই এত রেগে আছিস কেন ?

নিশাত মায়ের চোখে চোখ রেখে শীতল গলায় বলল, সাব্বির সাহেব আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন ? ঠিক করে বলো তো মা।

বেড়াতে যাচ্ছে, আবার কেন ? ও বাংলাদেশের অনেক ছবি তুলে নিতে চায়। আমরা গ্রামের দিকে যাচ্ছি শুনে সে-ও আগ্রহ করে যেতে চাইল।

না, সে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তুমি ঝুলাঝুলি করছিলে।

যদি করেই থাকি তাতে অসুবিধা কী ? আমাদের আত্মীয়, এতদিন পর দেশে এসেছে। ঘুরেফিরে দেখতে চায়।

আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয় মা।

আসল ব্যাপারটা কী শুনি ?

তুমি চাচ্ছ ঐ ছেলেটি যাতে আমাকে পছন্দ করে ফেলে। এবং পুরনো দুঃখ-কষ্ট ভুলে আমি তাকে বিয়ে করে ফেলি।

যদি চেয়েই থাকি সেটা কি খুব অন্যায় ?

হ্যাঁ অন্যায়। তুমি যা ভাবছ সেটা ঠিক নয়।

আমি কী ভাবছি ?

তুমি ভাবছ—আমার স্বামী নেই, একটা বাচ্চা আছে। কাজেই আমার একটি অবলম্বন দরকার। এটা মা ঠিক না। আমি তোমাদের বিরক্ত করব না, আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নেব। অনেকবার তো তোমাদের বলেছি।

নিশাত দেখল জামিল এগিয়ে আসছে। সে চুপ করে গেল।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমাদের কাছে ?

জি-না, দিলুর কাছে।

জামিল এগিয়ে গেল। সামনের গাড়িটি অনেক দূর চলে গেছে। নিশাত দেখল জামিল দৌড়াতে শুরু করেছে। এই দৃশ্যটি তার কেন জানি ভালো লাগল। রেহানা বললেন, জামিলকে বলে দে পানির বোতলটা দিয়ে যাক।

কেন ?

ওষুধ খেয়ে তোর মুখ তেতো হয়ে আছে না ?

মা, আমার জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

দিলু ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছিল। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি দিলুর কথা বেশ মন দিয়ে শুনছেন এবং তাঁর ভালোই লাগছে।

সোগাহী নাম কেমন করে হয়েছে শুনবে বাবা ?

বল শুনি।

আমার দিকে তাকাও বলছি। অন্যদিকে তাকিয়ে আছ কেন ?

ওসমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন। দিলু হাত নেড়ে নেড়ে গল্পটা বলল। ওসমান সাহেব বললেন, এই জাতীয় মিথ প্রায় সব পুকুর সম্পর্কেই থাকে। এটা ঠিক নয়। একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় মাটি কাটলেই পানি আসবে। শীতের সময় যদি নাও আসে বর্ষার সময় বৃষ্টির পানিতে ভরে যাবে।

দিলুর মন খারাপ হলো। গল্পটা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, রাজার মেয়ের নাম সোহাগী—এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন ?

রাজাদের মেয়ের এমন সাধারণ নাম থাকে না। ওদের গালভরা নাম থাকে। ফুলকুমারী, রূপকুমারী, নূরজাহান, নূরমহল।

দিলুর বেশ মন খারাপ হলো। সে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল জামিল ভাই আসছেন।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোর কাছে ?

হ্যাঁ।

ওটা নিতে এসেছি।

জামিল গরুর গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসল।

দিলু, ভালো দেখে কয়টা ক্যাসেট দে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

না হিন্দি-ফিন্দি।

দিলু ক্যাসেট বাছতে বাছতে বলল, বাবা কিন্তু সোহাগী পুকুরের গল্পটা বিশ্বাস করেননি। বাবা বলছেন, মাটি কিছুদূর খুঁড়লেই পানি আসবে।

এটা ঠিক নয়। ঢাকা আর্ট কলেজে একটা বিরাট পুকুর আছে। খুব গভীর। বর্ষাকালে পর্যন্ত সেখানে একফোঁটা পানি থাকে না।

সত্যি ?

হ্যাঁ। এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কেউ যদি সেই পুকুরে নামে তাহলে খিলখিল হাসির শব্দ শোনে।

ওসমান সাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, জামিল, সত্যি নাকি ?

পুকুরে পানি নেই বর্ষাকালেও এটা সত্যি, আমি নিজে দেখেছি। তবে হাসির কথাটা জানি না, ওটা বানানোও হতে পারে।

দিলু বলল, আমাকে ঐ পুকুরটা দেখাবেন ?

একদিন গিয়ে দেখে এলেই হয়। তোদের বাসার কাছেই তো।

জামিল ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে নেমে গেল। দিলু বলল, জামিল ভাই অনেক কিছু জানে। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

জামিল ভাই আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল, সেটা দারুণ মজার, তোমাকে জিজ্ঞেস করব ?

কর।

আচ্ছা মনে করো তোমার কাছে দশ সের পানি দেওয়া হলো। এখন তুমি কি পারবে এই দশ সের পানি একবারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে ? বালতি-টালতি কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু হাত দিয়ে নেবে এবং একবারে নেবে।

ওসমান সাহেব ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। দিলু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, খুব সহজ বাবা। চেষ্টা করলেই পারবে। একটু হিন্টস দেব ?

না, হিন্টস দিতে হবে না।

ওসমান সাহেব সত্যিই গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

জামিল নিজের গাড়িতে ফিরে এসে দেখে সাব্বির উঠে বসেছে। ক্যামেরা নিয়ে কী সব যেন করছে।

কি, ঘুম হয়ে গেল ?

হ্যাঁ।

কী করছেন ?

একটা ব্লু ফিল্টার লাগাচ্ছি।

ব্লু ফিল্টার দিয়ে কী হয় ?

দিনের বেলা ছবি তুললে মনে হয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছবি তোলা হয়েছে।

আপনি নিজে তো একজন ইঞ্জিনিয়ার ?

জি।

আপনাকে দেখে মন হয় ছবি তোলাই আপনার একমাত্র কাজ।

এটা আমার একটা হবি।

খুব বড় ধরনের হবি মনে হচ্ছে ?

সাব্বির শান্ত স্বরে বলল, আমি কিন্তু খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। আমার নিজের তোলা ছবি নিয়ে আমেরিকান এক পাবলিশার একটি বই বের করেছে, নাম হচ্ছে, *অন দি টপ অব দি ওয়ার্লড*।

আপনার কাছে কপি আছে ?

আছে, দিচ্ছি।

সাব্বির আহমেদ তিনশ' পৃষ্ঠার একটি বই বের করল তার স্যুটকেস থেকে। জামিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই বইটির কথা কি দিলুরা জানে ?

না। নিজের কথা বলতে ভালো লাগে না।

সাব্বির ছবি তুলতে শুরু করল। ক্যামেরার শাটার পড়ছে। কোনো কিছু যে সে দেখছে মন দিয়ে তা মনে হচ্ছে না।

একটি গ্রাম্য বধূ লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাটার পড়তে লাগল খটাখট।

ছাগলের গলার দড়ি ধরে একটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। খটাখট শাটার পড়তে শুরু করল। জামিল বলল, এই ছবিটা আপনার ভালো হবে না। জোছনা রাতে কেউ ছাগল চড়াতে বের হয় না। আপনি বরং ব্লু-ফিল্টার বদলে নিন।

সাব্বির হালকা গলায় বলল, উল্টোটাও হতে পারে, ছবি দেখে মনে হতে পারে রাতের রহস্যময়তায় মুগ্ধ হয়ে একটি শিশু তার পোষা প্রাণীটি নিয়ে বের হয়েছে। দু'জনের চোখেই বিস্ময় ও ভয়, তাদের ঘিরে আছে জোছনা।

আপনি কি ফটোগ্রাফার না কবি ?

আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

জামিল বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আপনার এই বইটিতে তো মানুষের কোনো ছবি নেই। শুধুই জড়বস্তুর ছবি। মানুষের ছবি বেশি তোলেন না ?

আমার অন্য একটি বইতে মানুষের ছবি আছে। সবই অবশ্যি 'নুড' ছবি।

বইট আছে ?

আছে।

আমেরিকায় আপনি কতদিন ধরে আছেন ?

প্রায় এগারো বছর।

দেশে ফিরবেন না ?

না।

কেন ?

থাকবার জন্যে ঐ জায়গাটি ভালো। বিশাল দেশ, ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার সুযোগ। এরকম পাওয়া যায় না। তা ছাড়া...।

তা ছাড়া কী ?

সাব্বির কথা শেষ করল না। মাঠের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, এগুলো সর্ষে ফুল না ? হলুদ রঙের কী চমৎকার ভেরিয়েশন।

৫

তারা নীলগঞ্জে ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছল বিকেল চারটায়, তখন আলো নরম হয়ে এসেছে। শীতের উত্তরী হাওয়া বইছে।

ডাকবাংলোটি চমৎকার। ফিসারিজের বাংলো। হাফ বিল্ডিং। উপরের ছাদ টালির, মন্দিরের গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে গেছে। বাড়ি যত বড় তার চেয়েও বড় তার বারান্দা। সেখানে কালো একটি গোল টেবিলের চারপাশে গোটাপাঁচেক ইজিচেয়ার।

দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। বাড়িটির চারপাশে রেন্টি (রেইন ট্রি) গাছ। বিকেল বেলাতেই বাড়িটিকে অন্ধকার করে ফেলেছে। পেছনে বেশ বড়সড় একটা পুকুর। কাকের চোখের মতো কালো জল।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, এই জঙ্গলে এত চমৎকার বাড়ি গভর্নমেন্ট কেন বানিয়েছে ? ওসমান সাহেব নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর প্রথম আসা। খোঁজখবর এসেছে জামিলের কাছ থেকে।

জামিল, এই ডাকবাংলো তৈরি হয় কবে ?

এটা সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার শিকার বাড়ি। পরে সরকার নিয়ে নেয়। এখন ফিসারিজ ডিপার্টমেন্টের হাতে দেওয়া হয়েছে। আগে আরও সুন্দর ছিল।

এরচেয়ে সুন্দর আর কী হবে ?

একটা কাচঘর ছিল। গোটা ঘরটাই কাচের তৈরি। লোকজন কাচটাচ সব নিয়ে গেছে। অনেক ঝাড় লণ্ঠন ছিল। বড় বড় অফিসার একেকজন এসেছেন, একেকটা করে নিয়ে গেছেন। পেছনের পুকুরের ঘাটে মার্বেল পাথরের একটি দেবশিশু ছিল, ঢাকা মিউজিয়াম নিয়ে গেছে।

তুমি এত কিছু জানো কীভাবে ?

আমি তো এখানে প্রায়ই আসি।

দিলু বলল, বাবা, আমি একা একটা ঘরে থাকব। ওসমান সাহেব উত্তর দিলেন না। জামিল বলল, তা পারবি না দিলু। সব পুরনো ডাকবাংলোয় ভূত থাকে।

আপনাকে বলেছে!

সন্ধ্যা হলেই টের পাবি। সন্ধ্যা নামুক। তখন দেখা যাবে।

বাবুর্চি আছে দু'জন। তারা রান্নাবান্না সেরে ফেলেছে। খাবার ঘরে খাবার দিতে শুরু করেছে। খাবার ঘরটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয়েছে। সবাই হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। শুধু নিশাত নেই। রেহানা খোঁজ নিতে গেলেন। নিশাত শুয়ে ছিল। সে ক্লান্ত গলায় বলল, আমি কিছু খাব না।

কেন খাবি না ?

খেতে ইচ্ছে করছে না, তাই খাব না।

সারা দিন তো কিছুই মুখে তুলিসনি। কিছু মুখে দে।

আমি গোসল না করে কিছু মুখে দেব না। আমার গা ঘিনঘিন করছে।

জ্বর গায়ে গোসল করবি কী!

প্লিজ মা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। বাবুকে খাওয়াও। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করো।

রেহানা মুখ কালো করে বের হয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল নিশাত। ঠান্ডা পানি। গায়ে জ্বর থাকার জন্যে পানি বরফশীতল মনে হচ্ছে। তবু ভালো লাগছে। ঝকঝকে বাথরুম। পিতলের বালতিতে পরিষ্কার জল। মোড়ক খোলা নতুন সাবান।

নিশাত যখন বেরিয়ে এল তখন সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে এসেছে। নিশাত একটি ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিল। উঁকি দিল মায়ের ঘরে। বাবু অবেলায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। আজ সারা দিন বাবুর সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা হয়নি। বাবু কি ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? রাতে সে এখন তার সঙ্গে ঘুমায় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, দাদির কাছে যাব। রেহানাকে সে দাদি বলে। কেন বলে কে জানে!

নিশাত বলল, ও কি কিছু খেয়েছে?

ভাত মুখে দেয়নি। দুধ খেয়েছে।

নিশাত নিচু হয়ে ছেলের কপালে চুমু খেল। রেহানা বললেন, কিছু খাবি মা?

না। চা খাব এক কাপ।

বস তুই এখানে। আমি চায়ের কথা বলে আসি। মশারি খাটানোর কথাও বলতে হবে। খুব মশা এদিকে।

দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। নিশাত মুখ তুলে দেখল জামিল ভাই।

নিশাত, তোমার নাকি জ্বর?

ব্যস্ত হবার মতো কিছু না।

ব্যস্ত হইনি নিশাত, খোঁজ নিচ্ছি। খোঁজ নেওয়াটা অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

আমি ভালো আছি।

জামিল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। চলে যেতে চাইল। নিশাত বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে জামিল ভাই।

বলো।

আপনি বারান্দায় বসুন, আমি আসছি।

ঝগড়া করবে মনে হচ্ছে।

নিশাত জবাব দিল না। বাবুর গালে একটা মশা বসেছিল। হাত দিয়ে সেটিকে উড়িয়ে দিল। ছেলেটিকে বড় রোগা রোগা লাগছে। এ ক'দিন ওর দিকে একটুও নজর দেওয়া হয়নি। নিশাতের মনে হলো সে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। বাবু এখন আর মা'র জন্যে খুব ব্যস্ত নয়। শিশুরা অবহেলা খুব সহজেই টের পায়। নিশাত বাবুর চুলে হাত রাখল। পাতলা লালচে ধরনের চুল। বাবার মতো। কবিরের চুলও এরকম ছিল। তবে বাবুর মতো পাতলা ছিল না। কবিরের চেহারার সঙ্গে বাবুর খুব বেশি মিল নেই। কবিরের নাক ছিল খাড়া, বাবুর তা নয়। সে হয়েছে মা'র মতো।

নিশাত নিচু হয়ে বাবুর ঠোঁঠে চুমু খেল। কেমন দুধ দুধ গন্ধ। নিশাত আবার নিচু হলো। বাবু ঘুমের মধ্যেই তাকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল।

বারান্দা অন্ধকার। এখানে কোনো বাতি দিয়ে যায়নি। জামিল বসে ছিল একা। নিশাত এসে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসল। হালকা গলায় বলল, ভেতরে বসলেই হতো, এখানে বড় হাওয়া।

থাকুক হাওয়া। বারান্দাই ভালো।

আলো দিতে বলব ?

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সহজভাবে বলল, বলো কী বলবে ?

আপনি আমাদের এই বাংলোয় কেন নিয়ে এসেছেন ?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী মিন করছ।

আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন। এখন ভান করছেন বুঝতে পারছেন না।

দেখ নিশাত, আমি ভান করি না। ঐ একটা জিনিস আমি কখনো করি না।

তাহলে বলুন—এত ডাকবাংলো থাকতে আপনি এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন কেন ?

কবির এবং আমি অনেক রাত এই ডাকবাংলোয় কাটিয়েছি। এই ডাকবাংলোর উপর ওর একটা দুর্বলতা ছিল। আমি জানি বিয়ের পর ও অনেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছে। আসা হয়ে ওঠেনি। আমি তাই ভেবেছিলাম এখানে এলে তোমার ভালোই লাগবে।

আমি ওর সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিলাম, আর কারও সঙ্গে নয়।

ভেবে নাও ও তোমার সঙ্গেই আছে।

সবকিছু কি ভেবে নেওয়া যায় ? জীবন এত সহজ মনে করেন ?

জীবন সহজও নয়, জটিলও নয়। জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে জটিল করি, সহজ করি। তুমি একে ক্রমেই জটিল করছ।

নিশাত চুপ করে গেল। জামিল হালকা সুরে বলল, দুঃখ শুধু কি তোমার একার ? আমাদের সবারই দুঃখ আছে।

আপনার আবার কিসের দুঃখ ? দুঃখের আপনি কী জানেন ?

নিশাত উঠে দাঁড়াল। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। কে একজন এসে বারান্দায় একটি হারিকেন রেখে গেল। হারিকেনের আলোয় সব কেমন অদ্ভুত লাগছে।

জামিল সাহেব, আপনি যেভাবে বসে আছেন বসে থাকুন। একটা ছবি তুলব। নড়বেন না, শাটার স্পিড খুব কম।

অনেকখানি সময় নিয়ে সাব্বির ছবি তুলল।

৬

পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ধাঁধাটি ওসমান সাহেবের মাথায় ঘুরতে শুরু করেছে দুপুর থেকে। ওসমান সাহেব নিজের উপরই বিরক্ত হচ্ছিলেন। ধাঁধার মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এই বয়সে কেউ এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে না। কিন্তু তিনি হচ্ছেন। এটা কি বয়সজনিত স্থবিরতা ? তিনি কেমন যেন চ্যালেঞ্জ বোধ করছেন। এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ বোধ করার কী আছে! ধাঁধার উত্তর জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

তিনি পাইপ হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁর গায়ে ভারী একটা ওভারকোট। গলায় মাফলার। তবু তাঁর শীত করতে লাগল। বয়স! বয়স বাড়ছে। এখন একদিন একটা মাইল্ড স্ট্রোক হবে। তার লক্ষণও টের পাওয়া যাচ্ছে। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। ঘুম কমে গেছে। খিদে কমে গেছে। চিন্তাও পরিষ্কার করতে পারছেন না। পারলে এই সহজ ধাঁধার জবাব বের করতে পারতেন। কিংবা কে জানে এটা হয়তো সহজ নয়। হয়তো বেশ জটিল।

বারান্দায় রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। ওসমান সাহেব রেহানার ডানদিকের খালি চেয়ারটিতে বসলেন। রেহানা বললেন, নিশাতের বেশ জ্বর।

তাই নাকি ?

একশ' দুই-টুই হবে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ ?

না।

তাহলে বুঝলে কীভাবে একশ' দুই ?

অনুমান করে বলছি।

অনুমান করে আমাকে কিছু বলবে না।

তুমি এরকম করছ কেন ?

কী রকম করছি ?

এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন ?

মেজাজ কোথায় দেখালাম ?

থানার ওসি ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলে কেন ?

খারাপ ব্যবহার তো করিনি। আমি বিরক্ত হয়েছি। এই বিরক্তির ব্যাপারটি তাকে জানিয়েছি। সে জানে আজ ভোরে আমি আসব, কিন্তু সে স্টেশনে আসেনি। আমি ডাকবাংলোয় পৌঁছানোর পর সে এসেছে। আমাকে সে কী ভেবেছে ?

তুমি কোনো সরকারি ট্যুরে আসনি। তুমি ছুটি কাটাতে এসেছ। কেন সে আসবে ?

সে আসবে। তার পুরো দলবল নিয়ে আসবে। কারণ আমি পুলিশের আইজি।

রেহানা একবার ভাবলেন বলবেন না, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন। এবং বললেন বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই, তুমি এখন আর আইজি নও। রিটায়ারমেন্ট নিয়েছ। রিটায়ারমেন্টের আগে পাওনা ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি পুলিশের আইজি এটা এখন যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পার ততই ভালো।

ওসমান সাহেবের পাইপ নিভে গেছে। নিভে যাওয়া পাইপ হাতে তিনি মূর্তির মতো দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। রেহানা শীতল স্বরে বললেন, এখন আর তোমাকে দেখামাত্র পুলিশের অফিসাররা ছুটোছুটি করবে না। এটা মানসিকভাবে একসেপ্ট করার চেষ্টা করো। তোমার জন্যেও ভালো। আমাদের সবার জন্যেও ভালো। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। দূরের রেন্টি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রেহানার মনে হলো এই কথাগুলি হয়তো না বললেও চলত। তিনি গলার স্বর স্বাভাবিক করতে করতে বললেন, চা খাবে ?

না।

শীতের মধ্যে ভালো লাগবে।

আমাকে এক ঢোক হুইস্কি দিতে বলো।

হুইস্কি এখানে কোথায় পাবে ?

আছে, আলিম নিয়ে এসেছে। আলিমকে বলো।

আলিম ওসমান সাহেবের বাসায় গত বিশবছর ধরে আছে। তার বয়স ওসমান সাহেবের চেয়েও বেশি। কিন্তু গৃহভৃত্যদের কোনো পেনশনের ব্যবস্থা নেই, কাজেই তাকে একদিন আগেই রান্নার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নীলগঞ্জে আসতে হয়েছে। আজ প্রচণ্ড দাঁতব্যথা থাকা সত্ত্বেও সারা দিন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রেহানা বললেন, আলিম শুয়ে আছে। ওর শরীর ভালো না। তাছাড়া এখানে এসব করতে পারবে না।

কেন, এখানে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা আছে। ঘরে তুমি যা করো, তাই বলে বাইরে এসেও করবে ?

রেহানা, এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। রিলাক্স করতে এসেছি।

তুমি একা আসনি। তোমার সঙ্গে বাইরের মানুষ আছে।

বাইরের মানুষ এখানে কেউ না। জামিল ঘরের ছেলে, সে আমার অভ্যাস জানে আর সাব্বির এগারো বছর ধরে বাইরে আছে।

আমি তোমাকে মদ খেতে দেব না।

রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় হারিকেন হাতে করে তুলে নিয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব অন্ধকার বারান্দায় একা একা বসে রইলেন। এখানে মশা আছে। বন্য মশা। মানুষ কামড়িয়ে অভ্যেস নেই বোধহয়। কামড়াচ্ছে না। শুধু বিরক্ত করছে। ওসমান সাহেব আবার ধাঁধা নিয়ে ভাবতে বসলেন। পানি

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হবে। শুধু হাতে নিতে হবে এবং একবারে নিতে হবে। কোনো মানে হয় ?

বাবা, তুমি অন্ধকারে বসে কী করছ ?

দিলু ঢুকল। ওসমান সাহেব মিষ্টি একটা গন্ধ পেলেন। দিলু পাউডার মেখেছে কিংবা গায়ে সেন্ট-টেন্ট দিয়েছে। গন্ধটা হালকা এবং চেনা। পরিচিত কোনো ফুলের গন্ধ। কী ফুল ওসমান সাহেব সেটা মনে করতে পারলেন না। অনেকদিন সচেতনভাবে কোনো ফুলের গন্ধ নেওয়া হয় নি। দিলু তার পাশের চেয়ারে বসল এবং আবার বলল, অন্ধকারে একা একা বসে কী করছ ?

তোর সমস্যা নিয়ে ভাবছি।

আমার ? আমার আবার কী সমস্যা ?

দিলু বেশ অবাক হলো। ওসমান সাহেব নরম গলায় বললেন, ঐ যে পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ব্যাপারটা।

ও আল্লা, তুমি এটা নিয়ে এখনো ভাবছ ?

হ্যাঁ, ভাবছি।

বলে দেব ?

না, বলিস না। নিজেই বের করব।

আরেকটা সহজ ধাঁধা ধরব ? জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি। দারুণ মজার।

না, আর না। যেটা দিয়েছিস সেটাই আগে সল্‌ভ করি।

দিলু হাসল খিলখিল করে।

হাসছিস কেন ?

বলা যাবে না।

যা আলিমকে একটু আসতে বল।

আমি পারব না বাবা।

পারবি নে কেন ?

কী অন্ধকার—দেখছ না ? ভয় ভয় লাগে। বাবা!

কী ?

একটা ভূতের গল্প শুনবে ? সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি। উনার নিজের লাইফের ঘটনা।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। পাইপ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খুব হাওয়া। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে।

বাবা বলব ?

বল।

দিলু তার বাবার কাছে ঘেঁসে এল। একটা হাত রাখল বাবার হাতে। গলার স্বর নিচু করে গল্প শুরু করল।

বুঝলে বাবা, তখন শ্রাবণ মাস। জামিল ভাই গিয়েছেন তার বন্ধুর বাড়ি। গ্রামের দোতলা বাড়ি। জামিল ভাইকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে তার জানালাগুলো খুব ছোট ছোট। বাবা শুনছ তো?

শুনছি।

তাহলে হুঁ বলবে একটু পরপর। না বললে মনে হবে গল্প শুনছ না।

ঠিক আছে বলব। তারপর কী হলো?

মাঝরাতে হঠাৎ খুব ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। ঘরে হারিকেন ছিল, হারিকেনটা গেল নিভে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না।

তারপর?

তারপর হলো কী শোনো। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। জামিল ভাই বললেন, কে? একজন মেয়েমানুষের গলা শোনা গেল—দয়া করে দরজা খুলুন।

তারপর কী হলো?

জামিল ভাই দরজা খুলতেই ঘরে একটা মেয়ে ঢুকল, ষোল-সতের বছর বয়স। বাইরে এত ঝড়বৃষ্টি কিন্তু মেয়েটি খটখটে শুকনো।

ওসমান সাহেব বললেন, ঘুটঘুটে অন্ধকারে জামিল কী করে দেখল মেয়েটি শুকনো এবং বুঝলইবা কী করে ওর বয়স সতের-আঠার?

দিলু থমকে গেল। এটা সে ভাবেনি। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে। তাই না দিলু? দিলু জবাব দিল না। তার একটু মন খারাপ হয়ে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, গল্পটা শেষ কর।

না, থাক!

থাকবে কেন? বাকিটা শুনি।

তোমাকে শুনতে হবে না।

দিলুর গলার স্বর ভারী। যেন সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছিস?

জামিল ভাইকে কথাটা জিজ্ঞেস করে আসি।

পরে জিজ্ঞেস করলেও হবে।

না, আমি এখন জিজ্ঞেস করব। কেন সে আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে?

গল্প তো গল্প। গল্প কখনো সত্যি হয়?

জামিল ভাই বলেছিল এটা সত্যি গল্প।

দিলু প্রথমে গেল খাবার ঘরে। সেখানে একজন অপরিচিত রোগা লোক হ্যাজাক লাইট ঠিক করতে চেষ্টা করছে। এক একবার দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, লোকটি 'খাইছেরে' বলে এক লাফে পেছনে সরে। ব্যাপারটা দিলুর কাছে খুব মজার লাগল। দিলু হাসিমুখে বলল, আপনার কী নাম ?

আমার নাম বাদলা।

বাদলা আবার নাম হয় ?

বাপ-মায় দিছে, কী করমু কন ?

তারা বোধহয় নাম দিয়েছিল বাদল।

দিলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজাকটা ঠিক হয়ে গেল। বাদলা দাঁত বের করে বলল, আফা, আপনের খুব পয়। দিলু বলল, আপনি কি জামিল ভাইকে দেখেছেন ? ঐ যে লম্বা। গায়ে পাঞ্জাবি আর ক্রিম কালারের চাদর।

জি দেখছি।

কোথায় দেখেছেন ?

এই সাব আরেকজন কোট পরা সাব বইসা আছে পুকুরঘাটে। গফ করতাছে।

আপনি যান তো, জামিল ভাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলবেন, দিলু আপনাকে ডাকছে। আমার নাম দিলু। দিলশাদ থেকে দিলু।

লোকটি চলে গেল। দিলু মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। রাত বেশি হয় নি। মাত্র আটটা কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। ঝিঁঝি ডাকছে চারদিকে। বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছে। সে সারা দিন ঘুমিয়েছে। কাজেই সারা রাত সে জেগে থাকবে। একটু পরে পরে কাঁদবে। মা-কে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। দিলু শুনল মা তাকে গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তুলারাশি কন্যার গল্প। এই গল্পটি ছোটবেলায় সে-ও শুনেছে। এক রাজকন্যার ওজন মাত্র এক ছটাক। কিন্তু এক রাতে হঠাৎ তার ওজন বেড়ে গেল।

কী ব্যাপার দিলু! জরুরি তলব কেন ?

জামিল ভাই, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন ? কেউ আমাকে মিথ্যে বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

কোনটা মিথ্যে বলেছি বল তো ? মিথ্যে আমি তেমন বলি না।

ঐ যে, একটা সত্যি ভূতের গল্প বললেন, ওটা আসলে মিথ্যে ভূতের গল্প।

কোন গল্পটি ?

ঐ যে, বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন। ঝড়বৃষ্টির সময়। ষোল-সতের বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিথ্যে হবে কেন ? ওটা সত্যি গল্প।

না, সত্যি না। এই অন্ধকারে আপনি কী করে বুঝলেন ওর বয়স ষোল-সতের। ওর কাপড় ভেজা না।

জামিল গম্ভীর গলায় বলল, ঐ রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝড়ের সময় ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুতের আলো শহরের ইলেকট্রিকের আলোর চেয়েও কড়া।

দিলু তাকিয়ে রইল চোখ বড় করে। জামিল বলল, তবে মেয়েটির বয়সের ব্যাপারটা আমার কল্পনা। আমি নিজে তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, কাজেই সব মেয়ের বয়সই মনে হতো ষোল-সতের।

দিলু কিছু বলল না।

কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ?

হচ্ছে। জামিল ভাই—

বল।

আরেকটা সত্যি গল্প বলেন।

আরেকদিন বলব!

জামিল ভাই, আপনি কি আমার উপরে রাগ করেছেন ?

না, রাগ করব কেন ?

দিলু হঠাৎ উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। জামিল হাসল। দিলু নিশাতের মতো হয় নি। সে হয়তো এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে।

৭

রাতের খাবার দেওয়া হলো ন'টার দিকে। দেখা গেল কারোই খাওয়ার দিকে মন নেই। শুধু সাব্বির, খাবার দেওয়া হয়েছে শোনামাত্র, এসে বসেছে এবং খেতে শুরু করেছে। রেহানা বাবুকে কিছু-একটা মুখে দেওয়াবার জন্যে আবার ঘরে এসে সাব্বিরের একা একা খাওয়ার দৃশ্যটি দেখলেন। সাব্বির ঘনঘন পানি খাচ্ছে। রেহানা বললেন, খুব ঝাল হয়ে গেছে নাকি ?

একটু হয়েছে, অসুবিধা নেই।

এরা বেশ ঝাল দেয়। আলিম রান্না করলে এটা হতো না। আলিম অসুখ হয়ে পড়ে আছে।

কী অসুখ ?

দাঁতে ব্যথা।

সাব্বির গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে। রেহানা লক্ষ করলেন সে একবারও বলল না— অন্যরা কেউ খেতে আসছে না কেন ? এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। দশ-এগার বছর বিদেশে থাকলেই কেউ অভদ্র হয়ে যায় না। বরং আরও ভদ্র হয়। সেটাই স্বাভাবিক। রেহানা বললেন, এতকিছু রান্না হয়েছে কিন্তু কেউ খেতে চাচ্ছে না। সব নষ্ট হবে।

দিলু ঘরে ঢুকল। সে এসেছে নিশাতের জন্যে এক গ্লাস পানি নিতে। রেহানা দেখলেন, পানি ঢালতে গিয়ে সে অনেকখানি পানি টেবিলে ফেলল। মেয়েটা কাজকর্মে এত আনাড়ি হয়েছে। পানি গড়িয়ে যাচ্ছে সাব্বিরের দিকে। তাকে অল্প সরে বসতে হলো। দিলু বলল, সাব্বির ভাই, আপনি এত পেটুক কেন, সবাইকে ফেলে খেতে বসেছেন।

রেহানার কপালে ভাঁজ পড়ল। মেয়েটা এমন রুচিহীন কথাবার্তা বলে। লজ্জায় পড়তে হয়।

দিলু চলে যেতেই সাব্বির বলল, আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। ওর মধ্যে একধরনের সরলতা আছে।

রেহানা কিছু বললেন না। মনে মনে সাব্বিরের কথাটার অন্য কোনো অর্থ হয় কিনা বুঝতে চেষ্টা করলেন। এই মেয়েটিকে তার পছন্দ—এর মানে কি এই নয় যে, বড় মেয়েটিকে পছন্দ নয়। বড় মেয়েটির মধ্যে সরলতা নেই। প্রথমদিকে সাব্বিরকে যতটা ভালো লেগেছিল এখন আর ততটা ভালো লাগছে না। ছেলেটি অভদ্র, অমিশুক। অবশ্যি সে অত্যন্ত সুপুরুষ। চেহারায় অন্য ধরনের কাঠিন্য আছে যা সহজেই চোখে পড়ে।

কবির এরকম ছিল না। কবিরের মধ্যে একটা হালকা ফুর্তির ভাব ছিল যা কোনো বয়স্ক মানুষকে ঠিক মানায় না। এটা ভাবতে ভাবতে রেহানা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে কবিরকে অপছন্দ করার চেষ্টা করছেন। এটা অন্যায়। কবিরকে অপছন্দ করার উপায় নেই। সে এ বাড়ির সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। ওসমান সাহেব, যিনি পৃথিবীর কোনো কথাই প্রায় বিশ্বাস করেন না, তিনি পর্যন্ত কবিরের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। একবার কবির এসে বলল, খবর শুনেছেন নাকি ? মালয়েশিয়ায় একটা মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে।

কী ধরা পড়েছে ?

মৎস্যকন্যা। মারমেইড। মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল পত্রিকায় বিরাট ছবি ছাপা হয়েছে। হুলস্থুল কাণ্ড!

বলো কী!

অন্যকেউ এ কথা বললে ওসমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। কবিরের বেলায় সেরকম কিছুই হলো না। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো তিনি বিশ্বাসও করছেন না, আবার ঠিক অবিশ্বাসও করছেন না। রাতে শোবার সময় গম্ভীর মুখে স্ত্রীকে বললেন, দুনিয়ায় কত অদ্ভুত জিনিসই না হয়। রেহানা বললেন, জামাইয়ের কথার কি কোনো ঠিক আছে ? তুমি এটা বিশ্বাস করে আছ ? ওসমান সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, কোন কথাটা এ পর্যন্ত সে মিথ্যে বলেছে শুনি ? ওসমান সাহেব কবিরের কোনো বদনাম সহ্য করতে পারতেন না। এখনো পারেন না। যে লোক জীবনে কোনোদিন নামাজ-রোজা করেছে বলে রেহানার মনে পড়ে না সেই

লোকও দেখা যায় একুশে আগস্টে একটা জায়নামাজ টেনে বের করেন। এবং গভীর রাত পর্যন্ত টুপি মাথায় বসে থাকেন। অপরিচিত এই পোশাকে তাঁকে অদ্ভুত দেখায়। একুশে আগস্ট কবিরের মৃত্যুদিন।

পানি আনতে এতক্ষণ লাগল ?

দিলু পানি আনতে দেরি করে নি। গিয়েছে, নিয়ে এসেছে। নিশাত আজ অকারণে রাগ করছে। দিলু বলল, নাও, পানি নাও।

লাগবে না, যা। তৃষ্ণা মরে গেছে।

এটা কেমন কথা! তৃষ্ণা কখনো মরে যায় ? তৃষ্ণা থাকেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দিলু নরম স্বরে বলল, আপা, খেয়ে নাও, প্লিজ। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। নিশাত পানির গ্লাস হাতে নিল।

তুমি রাতেও কিছু খাবে না ?

না।

কেন ?

দেখছিস না আমার শরীর ভালো না।

মাথা টিপে দেব ?

না, লাগবে না। তুই এখন যা।

অন্ধকারে একা বসে থাকবে কেন ? আমিও থাকি তোমার সঙ্গে।

দিলু খাটের উপর পা উঠিয়ে বসল। অন্ধকারে পা নামিয়ে বসতে তার ভালো লাগে না। সবসময় মনে হয় কেউ-একজন খাটের নিচ থেকে চুপি চুপি এসে পা চেপে ধরবে।

আপা, একটা ভূতের গল্প শুনবে ?

নিশাত জবাব দিল না।

সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের নিজের জীবনে ঘটেছিল।

নিশাত তবুও চুপ করে রইল।

এ গল্প শুনলে তুমি আর একা একা অন্ধকারে বসে থাকতে পারবে না। এবং রাতে ঘুমও আসবে না।

এত ভয়ের গল্প শুনতে চাইনে। থাক। মাথাধরার মধ্যে গল্প শুনতে ভালো লাগে না।

আপা, তোমার মাথার চুল টেনে দেই ?

দে। আস্তে আস্তে টানবি।

দিলু নিশাতের কপালে হাত দিয়েই চমকাল। বেশ জ্বর গায়ে। এতটা জ্বর তা বোঝা যায়নি।

আপা, তোমার গা তো খুব গরম।

হুঁ।

জানালা বন্ধ করে দেই, ঠান্ডা হাওয়া আসছে।

না থাক। জানালা বন্ধ থাকলে আমার কেমন যেন লাগে। মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

মশারি ফেলা নেই। মাঝে মাঝে মশা কামড়াচ্ছে। দিলু হালকা স্বরে বলল, জানো আপা, আমি কখনো মশা মারি না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। কারণ যেসব মশা মানুষকে কামড়ায় তারা সব স্ত্রী মশা। পুরুষ মশারা কামড়ায় না। আমি নিজে মেয়ে হয়ে একটা মেয়ে মশাকে কী করে মারি, বলো ?

পুরুষ মশারা কামড়ায় না—এ কথাটা তোকে বলেছে কে ?

জামিল ভাই বলেছেন।

নিশাত বিছানায় উঠে বসল। নিচুস্বরে বলল, জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কেন ?

দিলু অবাক হয়ে বলল, এই কথা কেন বলছ ?

সব সময় তোর মুখে জামিল ভাই, জামিল ভাই। এটা ভালো নয়।

ভালো নয় কেন ?

তোর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা খুব সহজে নানান রকম দুঃখ-কষ্ট পায়।

নিশাত চুপ করে রইল। দিলু বলল, পরিষ্কার করে বলো আপা।

নিশাত কঠিন স্বরে বলল, তোর মতো বয়েসী মেয়েরা খুব সহজে মুগ্ধ হয়। দুঃখ-কষ্ট আসে সেজন্যেই।

তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয় তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস। আমার যখন তোর মতো বয়স ছিল তখন তো আমি সবই বুঝতাম। তুই জামিল ভাইয়ের সঙ্গে বেশি মিশবি না।

কেন, সে কি খারাপ লোক ?

না, সে খারাপ লোক না। ভালো মানুষ। বেশ ভালো মানুষ। সে-জন্যেই ভয়। এক সময় তুই তাকে ভালোবাসতে শুরু করবি। তোর জন্যে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে।

দিলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। নিশাতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশাতের মনে হলো দিলু কাঁদছে।

তুই কাঁদছিস নাকি ?

দিলু কোনো উত্তর দিল না। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

চলে যাচ্ছিস ?

দিলু সে-কথারও কোনো জবাব দিল না। নিশাতের মনে হলো দিলুকে এসব কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন আর মনে করে কী লাভ? যা বলা হয়ে গেছে তা আর ফেরানোর উপায় নেই।

হারিকেন হাতে রেহানা ঢুকলেন। তার কোলে ঘুমন্ত বাবু। তিনি বাবুকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলেন। নিশাত বলল, ওকে তোমার কাছে রাখ মা। আমি আজ এ ঘরে একা শোব।

কেন, একা শুবি কেন?

সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

তোর শরীর ভালো নেই, একজন কেউ তোর সাথে থাকা দরকার। আমি থাকি কিংবা দিলু থাকুক।

কাউকে থাকতে হবে না।

রেহানা একটি কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন—রাতে কী খাবি?

কিছু খাব না।

খাবি না কেন? তোর রাগটা আসলে কার উপর? ঠিক করে বল তো?

কারও উপর আমার কোনো রাগ-টাগ নেই। শরীর ভালো নেই, তাই খাব না।

ঠিক আছে।

রেহানা চলে যাচ্ছিলেন, নিশাত বলল, দিলুকে একটু পাঠিও তো মা।

দিলু আসবে না। তুই ওকে কী বলেছিস জানি না। দিলু কাঁদছে।

কাঁদার মতো আমি কিছু বলিনি।

রেহানা শীতল স্বরে বললেন, তোর কথাবার্তা শুনে আমারই কাঁদতে ইচ্ছে হয়, আর ও তো বাচ্চামেয়ে।

ও বাচ্চামেয়ে নয়। এই বয়সে মেয়েরা বাচ্চা থাকে না।

সবাই তোর মতো নয়। কেউ কেউ বাচ্চা থাকে।

এ কথার মানে কী, মা?

মানে-টানে কিছু নেই। তুই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ নিশাত। যার দুঃখে আজ এরকম করছিস তার সঙ্গে তোর আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?

তার মানে?

ক'টা দিন তুই কবিরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছিস?

মানুষ সব সময় হাসিমুখে থাকতে পারে না।

তা পারে না। কিন্তু তুই ভালোমতো ভেবে দেখ তো কবিরের সঙ্গে তোর ব্যবহারটা কেমন ছিল।

তুমি যাও তো মা।

রেহানা চলে এলেন। নিশাত অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনি লাগাল। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ সময়। বাবু ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করেছে—মা'র কাছে যাব। মা'র কাছে যাব। রেহানা তাকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। নিশাত শুনল মা বলছেন—কেন যে মরতে এখানে এলাম!

নিশাতের চোখ জ্বালা করছে। আজকাল তার চোখে জল আসে না। চোখ জ্বালা করে। মা একটু আগে যা বলে গেলেন সেটা কি ঠিক ? মা কি ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করছেন না যে, সে এখন যা করছে তা করার তার কোনো অধিকার নেই। মা একটা মোটা দাগের ইঙ্গিত করেছেন। স্থূল ধরনের কথা বলেছেন।

সবার স্বভাব এক রকম নয়। সব মেয়েরাই তাদের স্বামীকে নিয়ে আহ্লাদ করে না। কেউ কেউ গম্ভীর স্বভাবের থাকে। সহজে উচ্ছ্বসিত হয় না। তাছাড়া কবিরের মধ্যে কি সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু ছিল ?

সে ভালো ছেলে এতে সন্দেহ নেই। আমুদে ছেলে। হৈচৈ করত। প্রচুর মিথ্যে কথা বলত। টিভি'র প্রতিটি বাংলা সিনেমা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখত এবং শেষ হওয়ামাত্র বলত—শালা, সময়টাই মাটি। আগে জানলে কে বসে থাকত ? কবির এমন একটি ছেলে যে পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েকে বিয়ে করেই সুখী হতো। এই সব ছেলেদের সুখী হবার ক্ষমতা অসাধারণ। এরা হয় সুখী স্বামী, সুখী বাবা এবং বুড়ো বয়সে একজন সুখী দাদা। সূক্ষ্ম রুচির মানুষ এত সহজে সুখী হয় না। সংসারে সুখী হবার মতো উপকরণ ছড়ানো নেই।

বাবু খুব কাঁদছে। নিশাত দরজা খুলে বের হলো। হ্যাজাক লাইটটি বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে। জামিল বাবুকে কোলে নিয়ে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটছে।

জামিল ভাই, ওকে আমার কাছে দিন।

জামিল ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করল। বাবুর ঘুমিয়ে পড়ার একটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মায়ের কথা শুনে জেগে উঠতে পারে। নিশাত অপেক্ষা করতে লাগল।

আচ্ছা, কবির বেঁচে থাকলে কি এরকম করত ? ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াত ? এটি কখনো জানা হবে না। কিন্তু সবাই বলবে—বেঁচে থাকলে কত আদর করেই না ছেলে মানুষ করত। মৃত মানুষদের সম্পর্কে সব সময় ভালো ভালো কথা ভাবতে হয়। মৃত মানুষেরা অনেক সুবিধা ভোগ করেন। সবার বয়স বাড়ে কিন্তু মৃত মানুষদের বয়স কখনো বাড়ে না। নিশাত একসময় বুড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কবিরের বয়স সাতাশ বছরেই থেমে থাকবে। তার কোনোদিন চুলে পাক ধরবে না। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হবে না। কোনো মানে হয় না।

নিশাত, বাবু ঘুমিয়ে পড়ছে। কোথায় রাখবে ?

মা'র কাছে দিয়ে আসুন।

জামিল হাঁটছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। হাঁটার ভঙ্গিটাও কেমন চেনা চেনা। কবির কি এমন করেই হাঁটত ? এখন তার অনেক কিছুই মনে পড়ে না। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। একদিন হয়তো কিছুই মনে থাকবে না।

নিশাত, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

থ্যাংকস।

তোমার জ্বর কেমন ?

আমার জ্বরের খবর মনে হচ্ছে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জামিল তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বলল, বেড়াতে এসে অসুখে পড়াটা খুব খারাপ।

আমি বেড়াতে-টেড়াতে আসিনি। সবাই এসেছে, বাধ্য হয়ে আমিও এসেছি।

জামিল হালকা স্বরে বলল, অবস্থা এরকম হবে জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে জুটতাম না।

জুটেছেন কেন, আপনাকে তো কেউ সাধাসাধি করেনি। নাকি করেছে ?

না, করেনি। আমি নিজে থেকেই এসেছি।

কেন এসেছেন ?

নিশাত, তোমার শরীর ভালো না। যাও তুমি শুয়ে থাক।

না, আপনি আমাকে বলুন আপনি কেন এসেছেন ? ইউ গট টু টেল মি দ্যাট!

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সে লক্ষ করল—নিশাত অল্প অল্প কাঁপছে।

জামিল ভাই, আমি আপনাকে আগেও পছন্দ করিনি, এখনো করি না। আমার মনে হয় আপনি সেটা জানেন না।

নিশাত, যাও ঘুমাতে যাও।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে উঠে এলেন—এই নিশাত, কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি বাবা।

জামিলকে কী বলছিলি ?

কিছু বলছিলাম না।

নিশাত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, জামিল, ও চেঁচামেচি করছিল কেন ?

জানি না চাচা। আপনি এখনো বারান্দায় বসে আছেন কেন ? ঠান্ডা লাগবে তো।

ঠান্ডা অলরেডি লেগে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকতে ভালোই লাগছে। জামিল, তুমি একটা কাজ করো তো, দেখ, আলিমকে কোথাও পাও কি না। আর

শোন, এই হ্যাজাকটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করো। আলো চোখে লাগছে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ?

হয়েছে।

সাব্বির কোথায় ? ওকে এখানে আসার পর একবারও দেখিনি।

উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আলিম ওসমান সাহেবের সামনে তাঁর প্রিয় গ্লাসটি রাখল। লম্বা গ্লাস। জার্মান ক্রিস্টালের অপূর্ব গ্লাস। এই গ্লাস ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পান না। ওসমান সাহেব স্পষ্ট একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন। আলিম মনে করে এনেছে। আলিম দ্বিতীয়বারে একটা বড় বাটিতে একগাদা বরফ নিয়ে এল।

আরে তুই বরফ পেলি কোথায় ?

আসার সময় নেত্রকোণা থেকে বিশ সের বরফ কিনলাম।

বলিস কী! গলে নাই ?

কাঠের গুঁড়া দিছি চাইর দিকে। তবু গলছে। এখন আছে অল্প।

আলিম খুব সাবধানে হোয়াইট হর্সের বোতল খুলে হুইস্কি ঢালল। ওসমান সাহেবের পেগ সাধারণ পেগের চেয়ে একটু বড়। আলিম মাপটা জানে। তবু অন্ধকারে কিছু বেশি পড়ল। অন্য সময় হলে ধমকে দিতেন। আজ কিছুই বললেন না। বরফের ব্যাপারটা তাকে অভিভূত করেছে।

তোর দাঁতের ব্যথার কী অবস্থা ?

ব্যথা আছে।

রেহানার কাছ থেকে নিয়ে তিনটা অ্যাসপিরিন খা, ব্যথা কমে যাবে।

আলিম কথা বলল না। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, তোর এখানে থাকার দরকার নেই। যা শুয়ে পড়।

স্যার, আপনে ঘরে বসেন, বাইরে ঠান্ডা।

বাইরেই ভালো। শোন আলিম, দু'টো পানির বোতল আর কিছু বরফ দিয়ে যাস।

আচ্ছা।

আলিম চলে যেতেই বিদ্যুতের মতো ওসমান সাহেব দিলুর ধাঁধার রহস্য ভেদ করলেন। অত্যন্ত সহজ উত্তর। বরফ। দশ সের পানিকে প্রথমে জমিয়ে বরফ করতে হবে। তারপর সেই বরফের টুকরোটি হাতে করে যেখানে যাওয়ার সেখানে যেতে হবে।

ওসমান সাহেব গভীর আনন্দ বোধ করলেন। নীলগঞ্জ ডাকবাংলোটি তার কাছে হঠাৎ করে বড় প্রিয় হয়ে গেল। যেন তিনি জীবনের সবচে বড় পাওয়াটি এই ডাকবাংলোয় পেয়ে গেলেন। যেন তার আর কিছু পাওয়ার নেই। জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়েছে।

বাবা!

দিলু একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে উঠে এসেছে, শীতে কাঁপছে অল্প অল্প।

কী-রে দিলু ?

তুমি এখানে বসে কী করছ ?

কিছু করছি না। বসে আছি।

আমার ঘুম আসে না বাবা। তোমার সঙ্গে একটু বসি ?

বোস।

হুইস্কি খাচ্ছ, না ? মা জানলে খুব রাগ করবে।

ওসমান সাহেব একটি হাত মেয়ের পিঠের উপর রাখলেন। দিলু হালকা স্বরে বলল, বাবা, চা চামুচ দিয়ে এক চামুচ খেয়ে দেখি ? আমার খুব খেতে ইচ্ছে করে।

ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন—যা একটা চামুচ নিয়ে আয়। বলতে পারলেন না।

দিলু বলল, তোমার শীত করছে না ?

করছে। তোর মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

হ্যাঁ। সবাই ঘুমুচ্ছে। শুধু আমরা দুজন জেগে আছি।

জায়গাটা কেমন লাগছে ?

ভালো।

পুকুরটা দেখেছিস ?

হুঁ।

বিরাট পুকুর, তাই না ?

হুঁ। এরকম একটা বাড়ি আমাদের থাকলে খুব ভালো হতো—তাই না বাবা ? পেছনে বিরাট একটা পুকুর থাকবে। সামনে থাকবে প্রকাণ্ড সব রেন্টি গাছ।

এগুলো রেন্টি গাছ নাকি ?

হুঁ।

কে বলেছে ?

জামিল ভাই বলেছেন।

দিলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর খুব হালকা গলায় বলল, আপা আমার সঙ্গে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

আমরা সবাই কখনো না কখনো খারাপ ব্যবহার করি।

কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি তো কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না। করি ? তুমি বলো ?

ঘুমুতে যা দিলু।

দিলু উঠে গেল। ওসমান সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ল, আরে তাই তো, ধাঁধার উত্তরটা তিনি জানেন এটা দিলুকে বলা হলো না। উঠে গিয়ে ডাকবেন নাকি ? কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। গাছে জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। শীতল উত্তরী হাওয়া। ওসমান সাহেব চতুর্থ পেগটি ঢাললেন। অনেক বেশি পড়ে গেল, অন্ধকারে অনুমান ঠিক হয় না।

দিলু ঘুমিয়েছে নিশাতের সঙ্গে। প্রকাণ্ড একটা খাট। খাটের নিচে আলো কমিয়ে হারিকেনটা রাখা। ঘরময় আবছা অন্ধকার। পায়ের দিকের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। সেই ভাঙা গলে শীতের হাওয়া আসছে। দুটি কম্বল আছে গায়ে, তবু শীত মানছে না। দিলু নিশাতের দিকে আরও একটু সরে এল। নিশাত শীতল স্বরে বলল, গায়ের উপর এসে পড়ছ কেন, দিলু ? সরে শোও। এত ঘেঁসাঘেঁসি আমার ভালো লাগে না। দিলু অনেকখানি সরে গেল। পাশের ঘরে বাবু কাঁদছে। বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছে। বোঝা যাচ্ছে না। দিলু বলল, আপা, বাবু কাঁদছে।

কাঁদছে কাঁদুক।

ওকে এখানে নিয়ে এসো না। অনেক জায়গা তো।

ভ্যানভ্যান করিস না। চুপ করে থাক।

দিলুর চোখ ভিজে উঠল। এমন বাজে করে কথা বলে কেন আপা ? কী করেছে সে ? কিছুই তো করেনি। শুধু বলেছে, বাবু কাঁদছে। এটা বলা কি দোষের ? দিলু কম্বলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেলল। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাবুর কান্নার শব্দও সেখানে যাচ্ছে না। অন্ধকার দিলুর ভালো লাগে না। অন্ধকারে তার মৃত্যুর কথা মনে হয়। দাদিজান মারা যাওয়ার সময় থেকেই তার এরকম হয়েছে। দাদিজান মারা গিয়েছিলেন রাত ন'টায়। সবাই যখন কান্নাকাটি করছে তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। কী ভয়াবহ অবস্থা! সবাই কান্না থামিয়ে 'মোমবাতি মোমবাতি' বলে চেঁচামেচি শুরু করল। দিলু বসে ছিল সোফায়। হঠাৎ তার মনে হলো দাদিজান যেন উঠে আসছেন তার দিকে। কী অবস্থা! ভাগ্যিস বাবা তখন লাইটার জ্বালিয়ে দিলুর পাশে এসে বসলেন।

নিশাত মৃদুস্বরে ডাকল, দিলু, ঘুমিয়ে পড়েছিস ? দিলু জবাব দিল না। নিশাত কম্বলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলুকে কাছে টানল। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে

মেয়েটা। এত অভিমানী হয়েছে কেন ? নিশাতের ইচ্ছা হলো দিলুকে ডেকে তুলে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে। সে আবার ডাকল, এই দিলু, এই পাগলি। দিলুর ঘুম ভাঙল না। নিশাত ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর ঠিক তখনই জামিলের হাসির শব্দ শোনা গেল। কী আশ্চর্য, অবিকল কবিরের মতো ঘর কাঁপিয়ে হাসি। জামিল ভাই তো এরকম কখনো হাসেন না। তার সবকিছুই মাপা। এবং কোনো কিছুর সঙ্গেই কবিরের কোনো মিল নেই। তবু আজ এরকম মিল পাওয়া গেল কেন ? নাকি সব মানুষের মধ্যেই অদৃশ্য কোনো মিল আছে ?

রাত বাড়ছে। বাবু কাঁদছে না। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নিশাত হাত বাড়িয়ে দিলুকে কাছে টানল। দিলু ঘুমের মধ্যেই কাঁদছে। কোনো মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে হয়তো। কতদিন হয়ে গেল নিশাত কোনো স্বপ্ন দেখে না!

৮

নিশাত খুব ভোরে জেগে উঠল।

তখনো অন্ধকার কাটেনি। পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। ঘন কুয়াশা চারদিকে। নিশাত দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। প্রচণ্ড ক্ষিধে। এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ জাগেনি।

নিশাত টুথব্রাশ হাতে বারান্দায় হাঁটতে লাগল। এত সুন্দর বাড়ি। রাতে ঠিক বোঝা যায়নি। নিশাত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছনের দিকে চলে এল। প্রকাণ্ড পুকুরটি চোখে পড়ল তখন। কুয়াশার জন্যে পুকুরটি পুরোপুরি দেখা যায় না। মনে হয় বিশাল সমুদ্র। পানি দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। নিশাত এগিয়ে গেল।

এই ভোরেও পাতলা একটা উইন্ডব্রেকার পরে বাঁধানো ঘাটে সাব্বির বসে আছে। তার পাশেই স্ট্যান্ড-ক্যামেরা বসানো। নিশাত বলল, এত ভোরে ক্যামেরায় কার ছবি তুলছেন ?

কুয়াশার ছবি। আপনার জ্বর সেরে গেছে ?

হ্যাঁ।

নিশাত সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত নেমে গেল। হাত বাড়িয়ে পানিতে আঙুল ডুবাল। তার ধারণা ছিল পানি বরফশীতল হবে। কিন্তু তেমন ঠান্ডা নয়।

আপনি যেমন বসে আছেন ঠিক তেমনিভাবে বসে থাকুন, আমি আপনার একটা ছবি তুলব।

অনুমতি প্রার্থনা নয়। যেন আদেশ। নিশাত বলল, মুখে টুথব্রাশ ঝুলতে থাকবে ?

হ্যাঁ। থাকুক। আপনি হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করছেন। এটাই আমার ছবির থিম।

সাব্বির ক্যামেরা হাতে কয়েকটা ধাপ নেমে এল। নিশাতের কি রাগ করা উচিত না ? বলা উচিত—এভাবে আমি ছবি তুলি না। কিন্তু নিশাত রাগ করতে পারছে না।

কেন পারছে না সে-ও এক রহস্য। সাব্বির বলল, আজ ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ছবির জন্যে একটা ভালো কম্পোজিশন পাব।

আপনি ছবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না ?

ভাবতে পারি হয়তো কিন্তু ছবির কথা ভাবতেই ভালো লাগে।

নিশাত হাসতে হাসতে বলল, আপনার মাথার মধ্যে শুধু কম্পোজিশন ঘুরে, তাই না ? সাব্বির তার জবাব দিল না। ক্রমাগত ছবি তুলতে লাগল। পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে রইল নিশাত। সে একটা ব্যাপার লক্ষ করল, সাব্বির অন্য ফটোগ্রাফারদের মতো নয়। অন্য ফটোগ্রাফাররা বলত—একটু বাঁ দিকে ফিরুন, একটু হাসুন। মাথাটা একটু উপরে তুলুন। শাড়ির আঁচল টেনে দিন। সাব্বির কিছুই বলছে না। শুধু ছবি তুলছে! নিশাত হাসতে হাসতে বলল, এত ছবি তুলছেন একটা তো ভালো হবেই।

সবসময় হয় না। ছত্রিশটি ছবির মধ্যে যার একটি ছবি ভালো হয় সে একজন বড় ফটোগ্রাফার।

আপনি একজন বড় ফটোগ্রাফার ?

হ্যাঁ।

নিশাত লক্ষ করল সে 'হ্যাঁ' বলেছে খুব জোরের সঙ্গে। যেন সে মনেপ্রাণে কথাটা বিশ্বাস করে। সাব্বির বলল, যে ছবিটি দিয়ে আমি প্রথম নাম করি তার কথা শুনতে চান ?

বলুন।

ছবির নাম 'সরলতা'। ইনোসেন্স।

সাব্বির সহজভাবেই নিশাতের পাশে বসল। যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ পাশাপাশি বসেছে।

আমি তখন থাকি নর্থ ডাকোটায়। একবার রুজভেল্ট ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে গিয়েছি। একা একা গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটা জলা জায়গা। চারদিকে বড় বড় সব উইলি গাছ। উইলি গাছের ছায়া পড়েছে পানিতে। অপূর্ব পরিবেশ। এবং সেই অপূর্ব পরিবেশে অল্পবয়েসী একটি মেয়ে লাঞ্চবক্স হাতে নিয়ে বসে আছে। ওর বন্ধুটি বোধহয় কাছেই কোথাও গেছে। আমি মেয়েটিকে বললাম—তোমার কয়েকটি ছবি তুলতে চাই। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি বললাম—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়বার মতো একটা ভঙ্গি করতে পার ? সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অসংখ্য ছবি তুললাম, কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ছবিটি অসম্পূর্ণ। ঠিক তখনই একটা বুনো প্রজাপতি এসে বসল লাঞ্চবক্সে, তৈরি হয়ে গেল ছবি। বিখ্যাত ছবি।

বুনো প্রজাপতি আবার কী ? সব প্রজাপতিই তো বুনো। পোষা প্রজাপতি আবার আছে নাকি ?

ঐ প্রজাপতিটির পাখায় কোনো রঙ ছিল না। কালো কালো দাগ। কাজেই বুনো প্রজাপতি বলছি। আপনি কি ঐ ছবিটি দেখতে চান ?

আছে আপনার কাছে ?

হ্যাঁ। বসুন আপনি, আমি নিয়ে আসছি।

সাব্বির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

সাব্বিরকে নিশাত কি আগে ভালো করে লক্ষ করেনি নাকি ? বেশ লাগছে একে। মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভান নেই। শুধু কথাবার্তা নয়, চোখের দৃষ্টিও বেশ স্বচ্ছ। মেয়েদের মতো বড় বড় চোখ। না, কথাটা ঠিক হলো না। সব মেয়ের চোখ বড় বড় নয়। বরং বলা উচিত মেয়েলি চোখ। পুরুষ মানুষকে এত বড় বড় চোখে মানায় না। না, এটাও ঠিক হলো না। সাব্বির সাহেবকে তো ভালোই মানিয়েছে। নিশাত বেশ আগ্রহ নিয়ে ছবির বইটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যেন এই আগ্রহ থাকাটা ঠিক নয়। এটা অন্যায়।

এত চমৎকার একটা ফটোগ্রাফির বই নিয়ে সাব্বির ফিরবে নিশাত আশা করেনি। সে দু'বার বলল, এ বইয়ের সব ছবি আপনার তোলা ?

হ্যাঁ। ব্যাক কভারে ফটোগ্রাফারের ছবি আছে। দেখুন না।

আপনি তো বিখ্যাত ব্যক্তি।

হ্যাঁ। আমি মোটামুটি বিখ্যাত। ঐ দেশে অনেকেই আমাকে চেনে।

নিশাত পাতা উল্টাতে লাগল। অপূর্ব সব ছবি। মন খারাপ করিয়ে দেওয়ার মতো ছবি।

তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় ঐ ছবিটি আছে। দেখুন। ঐ ছবিটি দিয়ে আমি ফটোগ্রাফির জগতে প্রথম এন্ট্রি পাই।

নিশাত তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুলে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

ছবিটা ভালো লেগেছে ?

হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটির গায়ে কোনো কাপড় ছিল না— এই কথা আপনি আগে বলেননি। ও কি এইভাবে বনে বসে ছিল ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি ছবি তুলতে চাইতেই রাজি হয়ে গেল ? কোনো আপত্তি করল না ?

না, কোনো আপত্তি করেনি।

ঐ মেয়েটির কী নাম ?

নাম জানি না। ছবির জন্যে মেয়েটির নামের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সাব্বির হেসে উঠল। রোদ উঠে গেছে। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন চমৎকার লাগছে চারদিক। নিশাত নরম গলায় বলল, এই বইটি আমার কাছে থাকুক ?

থাকুক।

নিশাত উঠে দাঁড়াল। নিচুস্বরে বলল, যাই।

সাব্বির বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন।

দয়া করে রাগ করবেন না বা মন খারাপ করবেন না।

এমন কী কথা যে আমি রাগ করব ?

সাব্বির অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলল, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। শুধু ভালো লেগেছে বললে কম বলা হয়। আমার আরও কিছু বলা উচিত। কিন্তু গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার ভালো লাগার ব্যাপারটা আপনার মা'কে বলতে পারি।

নিশাত ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু কিছু বলল না। ঘাটের ধাপ ভেঙে উপরে উঠে এল।

আপা, তুমি এখানে—আর আমি সারা বাড়ি খুঁজছি।

কেন ?

দিলু হাত নেড়ে নেড়ে বলল, আমরা সবাই মিলে শিকারে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

শিকারে। বালিহাঁস মারব আমরা। এসো, তাড়াতাড়ি নাশতা খেয়ে নাও। রোদ বেশি কড়া হলে হাঁস পাব না।

বাবু কোথায় রে ?

জনি না কোথায়। তোমার জ্বর নেই তো ?

নাহ্।

তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন আপা ?

সুন্দর—সেই জন্যে সুন্দর লাগছে।

নিশাত হাসল। আজকের দিনটি চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে।

কুয়াশা নেই। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আকাশ চৈত্রের আকাশের মতো ঘন নীল। আহ, চমৎকার একটি দিন!

৯

শিকারে যাওয়ার প্রোগ্রাম হঠাৎ করেই হয়েছে। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব সকালবেলা একটি দোনলা বন্দুক আর একগাদা ছর্‌রা গুলি নিয়ে উপস্থিত—স্যার, শিকারে যাবেন নাকি ? বড় গাঙের চরে বালিহাঁস পড়েছে। কায়দামতো একটা গুলি করতে পারলে বিশ-পঁচিশটা পাখি পড়বে।

বলেন কী ?

স্যার, একটা স্পিডবোটের ব্যবস্থা করেছি।

ওসমান সাহেব বহুদিন পর উৎসাহিত বোধ করেন। শিকার করা অনেক দিন হয় না। শেষ শিকারে গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ওসি সাহেব, তাহলে তো তাড়াতাড়ি রওনা হতে হয়।

জি স্যার।

চা-টা খেয়েই রওনা দেব, কী বলেন ওসি সাহেব ?

ঠিক আছে স্যার।

ওসমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর রক্তে যৌবনের উত্তেজনা অনুভব করেন। থানার ওসি'র মতো একজন অধস্তন অফিসারকেও হঠাৎ করে বন্ধুস্থানীয় মনে হয়।

ওসি সাহেব।

জি স্যার।

দিনটাও আজ শিকারের জন্যে ভালো। কুয়াশা নেই, কিছু নেই।

না স্যার, কুয়াশা থাকলেই ভালো। পরিষ্কার দিন শিকারের জন্যে না। একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার স্যার।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল সবাই যাবে। পাখি শিকার হোক না হোক নৌকাভ্রমণ হবে। কিন্তু সাব্বির যেতে রাজি হলো না। তার নাকি শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। রেহানাও থেকে গেলেন। কারণ বাবুর গা গরম হয়েছে। সকালে একবার বমি করেছে। রেহানা ধরেই নিয়েছিলেন নিশাত বাবুকে রেখে যাবে না। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নিশাত দিলুর মতোই উৎসাহ নিয়ে সাজ করছে। অনেকদিন পর তার চোখ ঝলমল করছে।

স্পিডবোটটি আহামরি কিছু নয়। দেশী নৌকায় বারো হর্স পাওয়ারের একটা মেশিন বসানো, বসবার জায়গা নেই। চারদিক ভেজা। এটা বোধহয় মাছ আনা-নেওয়া করে। মাছের বোটকা গন্ধ। তবু দিলুর ভীষণ ভালো লাগছে। সে বসেছে জামিলের পাশে। বেণি দুলিয়ে দুলিয়ে ক্রমাগত গল্প করছে। ওসমান সাহেব হাসি মুখে বললেন, মেয়েটা তো বড্ড বকবক করতে পারে। সবাই হেসে উঠল। দিলু মোটেও

অপ্রস্তুত হলো না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার এক বান্ধবীর গল্প করতে শুরু করল। তার নাম লীনা, কিন্তু সবাই তাকে ডাকে বক লীনা। কারণ সে বকের মতো মাথা নিচু করে হাঁটে। দিলু মাথা নিচু করে ব্যাপারটা দেখাল। ওসমান সাহেব বললেন, আয় মা, তুই আমার পাশে বসে গল্প কর। কিন্তু দিলু নড়ল না। সে জামিলের পাশেই বসে রইল।

বড় গাঙের চর পর্যন্ত স্পিডবোট নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। পানি কম। তাছাড়া ভট ভট শব্দ হচ্ছে। শব্দে পাখি উড়ে যাবে। ওসি সাহেব বললেন, এখান থেকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। অসুবিধা হবে না তো স্যার ?

না, অসুবিধা কী ?

খানিকটা পানি ভেঙে যেতে হবে।

বেশি পানি ?

জি-না স্যার। খুব বেশি হলে হাঁটুপানি। জুতো খুলে ফেলেন।

ওসমান সাহেব জুতা খুলে ফেললেন। দিলুও জুতা খুলল। ওসি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তুমিও যাবে নাকি খুকি ?

জি।

কষ্ট হবে। একটু পরেই রোদ উঠবে কড়া।

উঠুক।

ওসমান সাহেব বললেন, শখ করে এসেছে, চলুক। নিশাত, তুই যাবি নাকি ?

আমি হাঁটু পানি ভেঙে যাব ? পাগল হয়েছ বাবা ?

দিলু বলল, চলো না আপা। আমি তো যাচ্ছি। তোমার ভালোই লাগবে।

এখানে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।

ওসমান সাহেব বললেন, একা একা বসে থাকবি, খারাপ লাগবে না ?

একা একা থাকব না। জামিল ভাই থাকবেন। কি জামিল ভাই, আমাকে একা ফেলে নিশ্চয়ই আপনি পাখি শিকারে যাবেন না ? নাকি আপনিও যেতে চান ?

না, আমি আছি।

রোদের তাপ বাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে মাঠ থেকে। এ অঞ্চল বেশ নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা মাছ ধরার নৌকা শুধু যাচ্ছে। নৌকায় বসে থাকা লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু খুব-একটা অবাক হচ্ছে না। স্পিড বোট নিয়ে শহরের লোকজন হয়তো প্রায়ই এদিকে শিকারে আসে।

নিশাত হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে বলল, জামিল ভাই, এই কি সেই বিখ্যাত কাশফুল ?

হুঁ। তবে এখনো ফুল ফোটেনি। সময় হয়নি।

কই, তেমন কিছু তো লাগছে না।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের মতো উঠানামা করে তখন ভালো লাগে। তুমি কি বোটেই বসে থাকবে, না নামবে ?

চলুন নামি। হিল পরে হাঁটা যাবে তো ?

হিল পরে এসেছ ?

হ্যাঁ, দেখছেন না কত লম্বা লাগছে আমাকে।

জামিল ঠিক বুঝতে পারছে না। নিশাতকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে। সাজগোজের মধ্যেও যথেষ্ট যত্নের ছাপ। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দিয়েছে।

নিশাত বলল, গ্রাম-নদী এইসব কিন্তু আমার কাছে তেমন এক্সাইটিং মনে হয় না।

একেকজনের দেখার ক্ষমতা একেক রকম। সাব্বির সাহেব যা দেখে মুগ্ধ হবেন তুমি হয়তো তা দেখে মুগ্ধ হবে না। তাছাড়া...।

সাব্বির ভাইকে আপনার কেমন লাগে ?

চমৎকার। ভদ্রলোক অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে দারুণ ইমপ্রেস করেছেন। এই একটি লোক দেখলাম যার মধ্যে ভান নেই।

নিশাত ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এত তাড়াতাড়ি একটা ডিসিশনে আসা ঠিক না। আপনি মানুষ সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে আসেন।

নিশাত খুব সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগল। জামিল বলল, জুতো পরে তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জুতো খুলে ফেল।

খালি পায়ে হাঁটব ?

হ্যাঁ। খারাপ লাগবে না। শুকনো পথঘাট।

নিশাত হিল খুলে ফেলল, খালি পায়ে হাঁটতে তার ভালোই লাগল। খুশি খুশি গলায় বলল, ফ্লাস্কটা নিয়ে এলে ভালো হতো। কোথাও বসে চা খাওয়া যেত।

শাড়ি পরা আট-ন' বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছে। চোখ বড় বড় করে দেখছে। নিশাত বলল, এ্যাই, তোমার নাম কী ? মেয়েটি জবাব দিল না।

বাড়ি কোথায় তোমার ?

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে যেদিকে দেখাল সেদিকে কোনো ঘরবাড়ি নেই।

জামিল ভাই, মেয়েটি কি হারিয়ে গেছে নাকি ?

না, ওরা হারাবে না। গ্রামের মেয়ে, সমস্ত অঞ্চল এদের খুব ভালো করে চেনা। নিশাত, কোনদিকে যেতে চাও ?

চলুন, ঐ গাছটার নিচে বসি। কী গাছ ওটা ? বিরাট বড় তো।

শিমুল গাছ।

শিমুল গাছে এত বড় বড় কাঁটা থাকে নাকি ?

থাকে।

জামিল সিগারেট ধরাল। নিশাত হ্যান্ডব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে দিল। হালকা স্বরে বলল, একটা হাসির গল্প বলুন তো। দিলুকে রোজ কী-সব গল্প বলেন। দেখি এবার আমি একটা শুনি।

দিলুকে হাসির গল্প বলি না। দিলুকে বলি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প শুনতে চাইলে বলতে পারি।

নিশাত খিলখিল করে হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে ছোট্ট মেয়েটাও হাসতে শুরু করল। জামিল নিজেও হাসল।

না জামিল ভাই, বলুন একটা হাসির গল্প। দেখি আপনি আমাকে হাসাতে পারেন কিনা।

হাসাতে পারলে কী দেবে ?

আপনি আগে বলুন, তারপর দেখা যাবে।

টেলিফোনের খুঁটি বসানো হচ্ছে। সারা দিন ধরে কাজ চলছে। সন্ধ্যাবেলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজ দেখতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা ক'টা খুঁটি পুঁতলে ? ওরা বলল, স্যার বারোটা। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, মন্দ না, বারোটা খারাপ না। তারপর গেলেন অন্য একটা দলের কাছে—তোমরা ক'টা পুঁতলে ? ওরা বলল, স্যার একটা। ইঞ্জিনিয়ার রেগে আগুন—এত কম! ঐ দল তো বারোটা পুঁতলো। দলের সর্দার বলল, আমাদের কাজ আর ওদের কাজ ? ওদের খুঁটির সবটাই মাটির উপর, আর আমাদেরটা দেখুন। মাটির উপর আছে চার আঙুল। সবটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি।

নিশাত গল্প শুনে হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, এই গল্পটা জামিল ভাই আপনি আমাকে ইচ্ছে করে বললেন।

ইচ্ছে করে বলব কেন ?

গল্পটা বাবুর আব্বার।

হ্যাঁ, আমি কবিরের কাছ থেকে শুনেছি। এটা একটা চমৎকার গল্প, তাই তোমাকে বললাম। অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সব কিছুতেই তুমি এত উদ্দেশ্য খোঁজ কেন ?

নিশাত উঠে দাঁড়াল—চলুন, বোটে ফিরে যাই।

ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ছোট মেয়েটি আবার পেছনে পেছনে আসছে। খুব কৌতূহল মেয়েটির। ছোট্ট শাড়িটা পরেছেও খুব গুছিয়ে। শাড়ির রঙ গাঢ় সবুজ। তার মধ্যে লাল পাড়। জামিল বলল, নিশাত, তুমি কি লক্ষ করেছ বেশির ভাগ গ্রামের মেয়ের শাড়ির রঙ সবুজ ?

না, আমি লক্ষ করিনি। গ্রামই দেখিনি। গ্রামের মেয়ে দেখব কোথায় ?

গ্রামের মেয়েরা যে সবুজ শাড়ি পরে এটাও কিন্তু প্রথম নোটিস করে কবির। তার ধারণা, এরা সবুজ দেখতে দেখতে সবুজ রঙের প্রতি একটা উইকনেস জন্মিয়ে ফেলে। আমার ধারণা কিন্তু তা নয়।

আপনার কী ধারণা ?

আমার ধারণা, সবুজ রঙের কাপড় ময়লা হয় কম, সে-জন্যেই এরা সবুজ কাপড় পরে।

আপনার ধারণাটাই প্রাকটিক্যাল। কিন্তু হঠাৎ করে আপনি রঙের প্রসঙ্গ আনলেন কেন ?

জামিল কিছু বলল না। স্পিডবোটে উঠে বসল। স্পিডবোটের ড্রাইভার রোদের মধ্যে পা মেলে দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। নিশাত ফ্লাস্ক খুলল—চা দেব জামিল ভাই ?

দাও।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু ? কেক আছে। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

নিশাত এক পিস কেক বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। সে নিল না। পিছিয়ে গেল অনেকখানি। জামিল বলল, এ ভিখিরি নয়, কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়া এর অভ্যেস নেই।

আপনি চট করে সবকিছু বুঝে যান কীভাবে ?

জামিল হাসল। ঠিক তখনি পর পর দুটি গুলির শব্দ হলো। ওরা পাখি পেয়েছে কিনা কে জানে। স্পিডবোটের ড্রাইভার চোখ কচলে উঠে বসল। শিকারিরা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। নিশাত অবাক হয়ে দেখল তার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এত পাখি! তারা ডাকছে কর্কশ গলায়। শুনতে ভালো লাগে না।

ওরা কোথায় যাবে ?

নিরাপদ কোনো জায়গায় যাবে। তারপর সেখানেও শিকারিরা যাবে। সেখান থেকেও এদের উড়ে যেতে হবে।

নিশাত তাকিয়ে রইল। জামিল বলল, সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পাখির জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে গিয়ে। মানুষের জন্যেও এটা সত্যি। আমরাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি।

মাস্টারি করতে করতে বক্তৃতা দেওয়া আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি মনে করেন, জগতসংসারের সমস্ত রহস্য আপনি বুঝে ফেলেছেন ?

না, তা বুঝিনি। তবে বুঝতে চেষ্টা করি। তোমার মতো চোখ বন্ধ করে থাকি না।

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে বড়সড় একটা বক্তৃতা দেবে, কিন্তু জামিল তেমন কিছুই করল না। সিগারেট টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পিডবোটের ড্রাইভার নেমে গিয়ে ছোট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যে মেয়ে একটি কথাও বলেনি, তার মুখে এখন খই ফুটছে।

তোর নাম কী ?

ফুলি।

তোর বাপের নাম কী ?

কসির শেখ।

কোন গ্রাম ?

আতরা, মিয়াবাড়ি।

ভাই-ভইন কয়জন ?

ছয়জন।

নিশাত খুব মন দিয় ওদের কথাবার্তা শুনছে। এই মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল কেন ?

জামিল ভাই।

বলো।

এই মেয়েটি এতক্ষণ কোনো কথাবার্তা বলেনি, কিন্তু দেখুন ঐ লোকটির সঙ্গে কেমন জমিয়ে গল্প করছে।

জামিল কোনো উত্তর দিল না।

জামিল ভাই, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ?

না, রাগ করিনি। রাগ করতে হলে একটা অধিকার থাকতে হয়। তোমার উপর আমার সেরকম কোনো অধিকার নেই।

দিলুর উপর আছে ?

হ্যাঁ, আছে। ওর সঙ্গে আমি কিন্তু প্রায়ই রাগ করি।

আপনারা কী নিয়ে এত কথা বলেন ?

যা মনে আসে তাই বলি। ওর সঙ্গে তো আর হিসাব করে কথা বলতে হয় না।

নিশাত গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, আমার কিন্তু মনে হয় ওর সঙ্গেই আপনার সবচেয়ে সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

কেন ?

এই বয়সে মন অন্যরকম থাকে। আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাচ্ছি ?

পারছি।

আপনি কি এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান ?

চাই। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়।

তার মানে ?

দিলুর মতো যখন তোমার বয়স ছিল তখন তুমি আমার প্রতি অন্যরকম ধারণা পোষণ করতে।

এসব আপনি কী বলছেন ?

স্কুল ছুটির পর ক'দিন এসেছ আমাদের বাড়িতে মনে আছে ?

কেন আপনি এখন এসব পুরনো কথা তুলছেন ?

জমিল চুপ করে গেল।

দেখা গেল শিকারিরা ফিরে আসছে। ওসি সাহেবের হাতে কয়েকটা হাঁস। ওদের জবাই করা গলা দিয়ে তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। দিলু ওসমান সাহেবের শরীরে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে। জামিল বলল, কী হয়েছে দিলু ?

পায়ে কাঁটা ফুটেছে।

শিকার কেমন লাগল ?

ভালো না।

ওসমান সাহেব উল্লাস বোধ করছিলেন। তার চোখে-মুখে ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই। ওসি সাহেব বললেন, স্যার, কাল আবার যাব নাকি ?

চলেন যাই। নতুন কোনো স্পটে চলেন।

স্যার, যেতে হবে কিন্তু আরও সকালে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি শেষ রাতে উঠতে পারেন।

উঠব। শেষ রাতেই উঠব। নো প্রবলেম।

ওসমান সাহেব নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন বোধ করেন।

ওসি সাহেব, রাতে খান আমাদের সঙ্গে।

জি-না স্যার। জি-না।

দিলু বসে নিশাতের পাশে। গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে— এই, নাম কী তোমার ?

ফুলি।

বাহ্ কী সুন্দর নাম ! ফুল থেকে ফুলি।

ছোট্ট মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। দিলু বলল, সাব্বির ভাই থাকলে এই মেয়েটির ছবি তুলতে বলতাম। কী সুন্দর মেয়ে, দেখেছ আপা ? নিশাত জবাব দিল না। দিলু বলল, গ্রামের মেয়েরা কী সুন্দর হয়! বড় মায়া লাগে।

১০

ওসমান সাহেব হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছেন। তাঁর ভাগ্য ভালো বরফের জোগাড় হয়েছে। ওসি সাহেব জিপ পাঠিয়ে রবফ আনিয়েছেন। শুধু বরফ নয়, তিনি এক কেস বিয়ার এনেছেন। ওসমান সাহেব বিয়ার খান না। তবু খুশি হলেন। প্রথম দিনে এই ওসির উপর এতটা বিরক্ত হওয়া ঠিক হয়নি।

ওসমান সাহেব সত্যিকার অর্থেই ছুটির আনন্দ ভোগ করলেন। আলিম এসে পেঁয়াজ, মরিচ ও ভিনিগার মাখানো এক প্লেট চিনাবাদাম রেখে গেছে। হুইস্কির সঙ্গে এই প্রিপারেশনটি অপূর্ব।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হলো বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কাঁপছে। হুইস্কি নিয়ে তো প্রায়ই বসেন, এরকম কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন ? ইচ্ছে হচ্ছে হেসে হেসে সবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। চাঁদ উঠেছে কিনা কে জানে। যদি চাঁদ উঠে তাহলে ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে একটু হেঁটে আসলে হয়তো ভালো লাগবে।

বারান্দার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত কেউ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু তিনি পরিষ্কার বুঝলেন লোকটির গায়ে ইউনিফর্ম।

খট শব্দে স্যালুট হলো—স্যার, আমি। ওসি সাহেব পাঠিয়েছেন।

কী ব্যাপার ?

কিছু না স্যার। পাহারার জন্যে। ফিক্সড সেন্ট্রি।

পাহারা লাগবে না, তুমি চলে যাও।

সে ইতস্তত করতে লাগল। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, যাও যাও, পাহারার কোনো দরকার নেই। আমি কি মিনিস্টার ?

এই বলেই তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন। খালি পেটে দু'পেগ পড়ার জন্যেই বোধহয় তাঁর কিঞ্চিৎ নেশা হয়েছে।

আলিমের দাঁতের ব্যথা কমেনি। আজ সারা দিনে আরও বেড়েছে। ডান দিকের গাল ফুলে গেছে অনেকখানি।

আলিম, গোটা চারেক প্যারাসিটামল খাও।

স্যার খাইছি।

লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচি করো।

করেছি স্যার।

গরম সেঁক দাও। সেঁকটা খুব উপকারী।

স্যার, আর কিছু লাগব ?

না, লাগবে না। খানা তৈরি হতে দেরি হবে নাকি ?

জি স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আজ রাতে রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে সাব্বির। ওয়াইল্ড ডাক রোস্টের সে নাকি একটি চমৎকার প্রিপারেশন জানে। দুপুরবেলাতেই সে বালিহাঁসগুলির চামড়া তুলে টক দৈ-এ ডুবিয়ে রেখেছে। টক দৈ-এ আট ঘণ্টা ডুবানো থাকতে হবে, এক মিনিটও এদিক-ওদিক হতে পারবে না।

আট ঘণ্টা পার হয়েছে রাত আটটায়। এখন হাঁসগুলোকে স্টিম করা হচ্ছে। কেটলিতে পানি ফুটানো হচ্ছে। কেটলির নল দিয়ে যে বাষ্প বেরিয়ে আসছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে স্টিম করবার জন্যে। কায়দাটা ভালোই। দিলু সমস্ত ব্যাপারটা দেখছে মুগ্ধ হয়ে। সে রান্নাঘরে একটা চেয়ার নিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে আরাম করে বসে আছে। এবং সারাক্ষণই কথা বলছে।

সাব্বির ভাই, স্টিম দিচ্ছেন কেন ?

স্টিম দেওয়ার জন্যে মাংস নরম হবে।

টক দৈ-এ ডুবিয়ে রাখলেন কেন ?

রেসিপিতে বলা হয়েছে তাই। টক দৈ না পেলে ভিনিগারেও ডুবিয়ে রাখা যেত। টক দৈ ভিনিগারের চেয়ে ভালো।

এরপর কী করবেন ?

পেটের ভেতর রসুন ভরে আগুনে ঝলসাব। ব্যস।

এই রান্না কার কাছ থেকে শিখলেন ?

আমার এক মেক্সিকান বান্ধবী ছিল— ও রাঁধত। ও অনেক রকম রান্না জানত।

দিলু একটু লজ্জা পেল। কেউ এভাবে বান্ধবীর কথা বলে নাকি ? কিন্তু সাব্বির ভাই এমন সহজভাবে বলছেন যেন বান্ধবী থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

উনার নাম কী সাব্বির ভাই ?

ওর নাম মারিয়া।

মারিয়া ? কী বিশ্রী নাম।

বিশ্রী কোথায় ? মেরী থেকে মারিয়া।

উনি দেখতে কেমন ?

আমার কাছে তো ভালোই লাগত। খুব লম্বা। বড় বড় কালো চোখ। খুব শব্দ করে হাসত।

উনার ছবি আছে ?

আছে। দেখতে চাও ?

হুঁ।

আচ্ছা দেখাব।

সাব্বির ভাই, আমার কয়েকটা সুন্দর ছবি তুলে দেবেন তো ?

দেব।

কবে দেবেন ?

যখন চাও। কাল ভোরেই দিতে পারি। এক কাজ করো—তোমার লাল শাড়ি আছে ?

না, লাল স্কার্ট আছে।

ঠিক আছে, ঐ লাল স্কার্ট পরে পুকুরে সাঁতার দেবে। আমি ছবি তুলব। সবুজ পানির ব্যাকগ্রাউন্ডে লাল স্কার্ট চমৎকার আসবে। তবে আমার ফিল্ম হাই স্পিড এ.এস.এ. ফাইভ হানড্রেড। আরেকটু কম হলে ভালো হতো।

আমি তো সাঁতার জানি না।

ইস, সাঁতার দেওয়া ছবি ভালো আসত। জলকন্যার এফেক্ট পাওয়া যেত।

রাত-দিন আপনি শুধু ছবির কথা ভাবেন। তাই না ?

হুঁ, ভাবি।

দিলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। দেখল সাব্বির কীভাবে হাঁসের গায়ে স্টিম লাগাচ্ছে। দেখে মনে হয় লোকটা এ কাজ দীর্ঘদিন ধরে করছে। দিলু বলল, মারিয়া বুঝি খুব ভালো মহিলা ছিলেন ?

হ্যাঁ। বাঙালি মেয়েদের মতো।

বাঙালি মেয়েরা বুঝি ভালো ?

হ্যাঁ। বাঙালি মেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল। সেন্টিমেন্টাল না হলে মেয়েদের মানায় না।

আচ্ছা সাব্বির ভাই, আমি সেন্টিমেন্টাল ?

হ্যাঁ।

কীভাবে বুঝলেন ?

জামিল সাহেবের সঙ্গে বসে তুমি গল্প করছিলে, আমি শুনছিলাম।

কথা শুনেই বুঝে গেলেন ?

দিলু, কথা শুনে অনেক কিছুই বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারি।

দিলু ভয়ে ভয়ে বলল, আর কী বুঝেছেন ?

বুঝলাম যে, তুমি জামিল সাহেবের প্রেমে পড়েছ। এডোলেসেন্স লাভ। চমৎকার জিনিস।

দিলুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক কোনো কথাবার্তা না বলে সে চুপচাপ বসে রইল। সাব্বির হাসিমুখে বলল, কি দিলু, ঠিক বলিনি ?

দিলু কোনো জবাব দিল না।

রেহানা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন চোখমুখ লাল করে দিলু চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে আছে। তিনি বিরক্ত স্বলে বললেন, তুই এখানে কী করছিস ?

দেখছি।

বাবুকে একটু সামলাবার চেষ্টা করলেও তো পারিস। আমি কতক্ষণ দেখব ?

দিলু নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। রেহানা বললেন, সাব্বির, তোমার রান্নার কতদূর ?

হয়ে এসেছে। এখন শুধু আগুনে ঝলসাব।

খাওয়া যাবে তো ?

আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো না লাগলে এতটা কষ্ট শুধু শুধু করতাম না।

রেহানা বললেন, আমাকে কিছু করতে হবে ?

না, আপনি বিশ্রাম করুন।

রেহানা চলে গেলেন। পুরুষমানুষ রান্নাঘরে হাঁড়িপাতিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এটা তাঁর দেখতে ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে। রেহানা বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন। নিচুগলায় বললেন, আজও বসেছ ?

হ্যাঁ, বসলাম।

বোতল ক'টা এনেছ ?

বেশি না, দুটো মাত্র। রেহানা, একটু বসো আমার পাশে।

না।

কেন এরকম করছ ? বেশিদিন তো আর বাঁচব না। শেষ ক'টা দিন আরাম করতে দাও।

বেশিদিন বাঁচবে না—এই তথ্যটা আবার কবে জোগাড় করলে ?

এক পামিস্ট আমার হাত দেখে বলেছে আমি বাঁচব মাত্র ষাট বছর। ভালো পামিস্ট। যা বলে তাই ঠিক হয়। একটু বসো রেহানা।

রেহানা বসলেন। ওসমান সাহেব হৃষ্ট গলায় বললেন, একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি, দেখি বলতে পার কিনা।

ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ।

দারুণ ধাঁধা, দিলুর কাছ থেকে শিখেছি এবং নিজে নিজেই উত্তর বের করেছি। আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখছি, তুমি পারবে না। কি, বলব ?

ওসমান সাহেব দিলুর পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ধাঁধাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন।

কাচঘরের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় হাঁস ঝলসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন তেমন জ্বলছে না। বাঁশের চাটাই দিয়ে হাওয়া আটকানোর ব্যবস্থা করা

হয়েছে। জামিল তদারক করছে মোড়ায় বসে। দিলু বারান্দা থেকে তাদের দেখল। একবার ভাবল কাছে যাবে। কিন্তু গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। জামিল ডাকল— এই দিলু, এদিকে আয়। দিলু এগিয়ে গেল।

আমাদের ফটোগ্রাফার সাহেব কি হাঁসকে বাতাস দিয়ে শেষ করেছেন ?

দিলু জবাব দিল না।

কী ব্যাপার, এত গম্ভীর কেন ?

মাথা ধরেছে।

আগুনের পাশে বস। মাথা ধরা সেরে যাবে। চেয়ারটা টেনে আন।

দিলু বসল।

গল্প শুনাব নাকি বল ? মারাত্মক একটা ভূতের গল্প জানি। বলব ?

না।

না কেন ? তোর কী হয়েছে ?

দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাই, আপনি আমাকে তুই করে বলবেন না।

কেন ? বলব না কেন ?

আমার খারাপ লাগে।

আপনি করে বলব। তাই চাস ?

দিলু জবাব দিল না।

তোর কী হয়েছে ?

তুই করে বললে আমি জবাব দেব না।

আপনার কী হয়েছে ?

দিলু গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। জামিল তাকে হাত ধরে টেনে বসাল।

দিলু, তোমার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি।

না, কিছু-একটা হয়েছে। আমাকে বলো।

আমার খুব মন খারাপ লাগছে। মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দূর বোকা মেয়ে।

জামিল শব্দ করে হাসল। একটা হাত রাখল দিলুর পিঠে। নিশাত দূর থেকে দৃশ্যটি দেখল। একবার ভাবল—দিলুকে সে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। আগুনের পাশে বসে থাকা মানুষ দুটিকে সুন্দর লাগছে। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। রেহানা এসে বললেন, বাবুকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দে না নিশাত।

আমি পারব না।

দাঁড়িয়েই তো আছিস।

দাঁড়িয়ে আছি না মা। দেখছি।

কী দেখছিস ?

দিলুকে দেখছি। দিলু কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ মা ?

রেহানা তাকালেন। তিনি দিলুর বড় হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলেন না। দিলু চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। এটা একটা অভদ্রতা, দিলুকে বলতে হবে। তিনি বাবুর কাছে গেলেন। নিশাত চড়া গলায় বলল, দিলু, তুই একটু আয়।

দিলু শান্ত স্বরে বলল, না।

জামিল বলল, যাও না, শুনে আস কী জন্যে ডাকছে।

না, আমি যাব না।

জামিল কৌতূহলী হয়ে তাকাল। তার মনে হলো দিলু কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাই।

কী!

চলুন, আমরা আজ সারা রাত এরকম আগুনের পাশে বসে গল্প করি।

কী নিয়ে গল্প করবে ?

আগে বলুন আপনি রাজি আছেন কিনা ?

না। দারুণ ঘুম পাচ্ছে। তার উপর সারা রাত এরকম ঠান্ডায় বসে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

দিলু উঠে দাঁড়াল। জামিল বলল, কোথায় যাও ? দিলু তার জবাব দিল না।

১১

রোস্ট ডাক জিনিসটি যে খেতে এতটা ভালো হবে রেহানা কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর আফসোস হতে লাগল তিনি পাশে বসে রান্নার পুরো ব্যাপারটা কেন দেখলেন না। সাব্বির বলল, আমি খুব গুছিয়ে লিখে রেখে যাব, আপনার যখন ইচ্ছা রান্না করতে পারবেন।

বালি হাঁস ছাড়া সাধারণ হাস দিয়ে রান্না হবে ?

জানি না। হওয়া তো উচিত। আমি অবশ্যি কখনো ট্রাই করিনি।

জামিল বলল, আমার মনে হয় না সাধারণ হাঁস দিয়ে এটা হবে। সাধারণ হাঁসগুলোর গায়ে প্রচুর চর্বি থাকে। বালি হাঁসের গায়ে চর্বি থাকে না।

নিশাত হাসিমুখে বলল, আপনি বুঝি পৃথিবীর সব জিনিস জানেন ?

না, আমি খুব কমই জানি, মাঝে মাঝে লজিক খাটিয়ে দু'একটা কথা বলতে গিয়ে সবাইকে বিরক্ত করি।

ওসমান সাহেব বললেন, দিলুকে দেখছি না যে। দিলু কোথায় ?

ও খাবে না। ওর মাথা ধরেছে।

চেখে দেখুক। ডেকে নিয়ে আয় তো নিশাত।

অনেক বলেছি বাবা।

জামিল বলল, আমি নিয়ে আসছি।

দিলু কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। জামিলকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। আলো চোখে লাগে বলে হারিকেন ডিম করে রাখা হয়েছে। জামিল বলল, দিলু, আমাদের সঙ্গে এসে বসো! জিনিসটা বেশ ভালো হয়েছে। তোমার ভালো লাগবে। দিলু জবাব দিল না।

তুমি হয়তো লক্ষ করনি—আমি 'তুমি' করে বলছি। এসো দিলু। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে গল্প করব।

আমার মাথা ধরেছে জামিল ভাই।

এমন মজার গল্প বলব যে মাথা ধরা সেরে যাবে। এসো!

দিলু উঠে এল। গল্প খুব জমে উঠল খাবার টেবিলে। ওসমান সাহেব পর্যন্ত একটা হাসির গল্প বলে ফেললেন। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প। সবারই জানা, তবু সবাই হাসল। কিছু কিছু সময় আসে যখন সব কিছুই ভালো লাগে।

সাব্বির বলল নিউইয়র্কে এক হোটেলে তার অভিজ্ঞতার গল্প। তার বিছানার সঙ্গে একটি যন্ত্র ফিট করা। সেখানে লেখা—গা ম্যাসাজ করতে হলে এখানে দুটি কোয়ার্টার ফেলুন। বেচারা সরল মনে দুটি কোয়ার্টার ফেলল। তারপর বিছানায় শোয়ামাত্র বিছানা কাঁপতে শুরু করল। সে কী কাঁপুনি! বসে থাকা যায় না, ছুড়ে ফেলে দিতে চায়। মিনিট দশেক পর কাঁপুনি থামল। কিন্তু যন্ত্রটির বোধহয় কিছু একটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হলো কাঁপুনি। থামে, আবার শুরু হয়। আবার থামে, আবার শুরু হয়।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রেহানা বিষম খেলেন এবং মনে মনে স্বীকার করলেন ছেলেটি রসিক। প্রচুর রসজ্ঞান না থাকলে গল্পটি এত সুন্দরভাবে বলা সম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বললেন, সবাই একটা না একটা গল্প করছে। নিশাত চুপ করে আছে কেন ?

বাবা আমি শুনছি।

শুধু শুনলে হবে না। বলতেও হবে।

নিশাত মৃদুস্বরে বলল, একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম আমি। জামিল ভাই হঠাৎ করে দিলুকে 'তুমি তুমি' করে বলছেন।

জামিল শান্ত স্বরে বলল, দিলু বড় হচ্ছে, এখন আর ওকে তুই বলা ঠিক না।

বড় কোথায়, ওর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স।

দিলু শীতল কণ্ঠে বলল, নভেম্বরে আমার পনের হয়েছে আপা। তোমার কিছু মনে থাকে না।

পনের হলেই যদি তুমি বলতে হয় তাহলে তো আমাদেরও তুমি বলতে হয়।

দিলু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, দিলু মা'র মনটা মনে হয় খারাপ।

নিশাত বলল, ওর মন ভালোই আছে। লোকজন ওকে তুমি করে বলা শুরু করেছে। মন খারাপ হবে কেন ?

আমার মন ভালোই আছে।

সাব্বির বলল, মন ভালো থাকলে আমাদের একটা হাসির গল্প শোনাতে হবে।

দিলু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করল। পরীক্ষায় গরু সম্পর্কে রচনা এসেছে। সবাই লিখছে। একটি ছেলে বলল, স্যার, জহির নকল করছে। স্কুলের মাঠে একটা গরু বাঁধা আছে। জহির জানালা দিয়ে গরুটা দেখছে আর লিখছে।

ওসমান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মদ্যপানজনিত কারণে তিনি ঈষৎ তরল অবস্থায় আছেন। ছোট ছোট হাসির ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হলো।

আরেকটা বল তো মা দিলু।

ইতিহাসের স্যার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলো তো, শেরশাহ কোথায় মারা গেছেন ? ছাত্র বলল, ইতিহাস বইতে স্যার। পনের পাতায়।

রেহানার মনে হলো তার এই মেয়েটি একটু অন্যরকম হয়েছে। কারও সঙ্গেই ঠিক মেলে না। একটু যেন আলাদা। নিশাত বলল, দুটি গল্পই জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা, তাই না ?

হ্যাঁ। তাতে কোনো অসুবিধা আছে ?

দিলু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে যেন সে সত্যি জবাবটি শুনতে চায়। সাব্বির বলল, এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। কেউ কি কষ্ট করে চা বানাবে ?

নিশাত উঠে দাঁড়াল—আমি বানাব। দিলু, তুই আয় তো আমার সঙ্গে, একা একা ভয় লাগে।

কেটলিতে চায়ের পানি ফুটছে। নিশাত এবং দিলু বসে আছে চুপচাপ। দিলুর মুখ থমথম করছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদবে। নিশাত বলল, তুই চা খাবি নাকি দিলু ?

না।

আয় আমরা বরং কফি খাই। ইন্‌স্‌টেন্ট কফির পটটা কোথায় দেখেছিস ?

আপা, আমি কফি খাব না। তুমি কী বলবে বলো।

আমি আবার কী বলব ?

কিছু-একটা বলবার জন্যেই আমাকে রান্নাঘরে এনেছ। এখন বলো কী বলবে।

দিলু, তুই কি রাগ করেছিস ?

দিলু চুপ করে রইল। নিশাত বলল, চল দু'জনে দু'কাপ চা নিয়ে পুকুরঘাটে বসি। যা, গরম চাদর একটা গায়ে জড়িয়ে আয়।

তুমি কি ওখানে নিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাও ?

আয় না গিয়ে বসি, তারপর বলা যাবে। যা চাদর-টাদর কিছু-একটা গায়ে দিয়ে আয়।

দিলু উঠে গেল। লাল রঙের একটা শাল বের করে গায়ে দিল। কাচঘরের পাশে জামিল সিগারেট টানছে। সে উঁচু গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে ?

দিলু জবাব দিল না। জামিল ভাই 'তুই' বললে সে আর জবাব দেবে না। জামিল বলল, দিলু কোথায় যাচ্ছ ?

পুকুরঘাটে।

একা একা ? একটু সাবধানে থাকবে।

কেন ?

ভূত আছে।

আপনার মাথা আছে।

জামিল শব্দ করে হাসল—তুমি চাইলে আমি সাহস দেওয়ার জন্যে সঙ্গে থাকতে পারি।

সাহস দিতে হবে না।

পুকুরঘাটটি বড় বেশি নির্জন। মাঝে মাঝে হাওয়া আসে, গাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। ক্রমাগত ঝিঁঝি ডাকে, আবার কোনো-এক বিচিত্র কারণে হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হয়ে চারদিকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। নিশাত বলল, একটু যেন ভয় ভয় লাগেরে।

ফিরে যাবে ?

নাহ্, বস।

তারা বসল। নিশাত ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। দিলু বলল, আপা, তুমি কী বলতে চাও বলো। নিশাত চাপাস্বরে বলল, আমার যখন তোর মতো বয়স তখন জামিল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। জামিল ভাইরা তখন আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন। মগবাজারে।

আপা, আমি জানি।

না, সবটা তুই জানিস না। তারপর কী হলো শোন। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সটা তো খুব খারাপ। সেই বয়সে কাউকে ভালো লাগলে সেটা যে কত তীব্র হয় তা তুই বুঝতে পারছিস কিছুটা। পারছিস না?

দিলু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। নিশাত বলল, অল্প বয়সের ভালো লাগার অনেক রকম ব্যাপার আছে। যখন কলেজে উঠলাম তখন লক্ষ করলাম জামিল ভাইকে আর ভালো লাগছে না। এরকম হয়। বি.এ. পড়বার সময় বিয়ে হয়ে গেল। যার সঙ্গে বিয়ে হলো সে জামিল ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু।

এসব তো আপা আমি জানি।

সবটা জানিস না। শোন মন দিয়ে। তোর দুলাভাই একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন। পৃথিবীর যে-কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত। কিন্তু আমি হইনি। আমার সারাক্ষণই জামিল ভাইয়ের কথা মনে হতো।

নিশাত চোখ মুছল। দিলু বলল, আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন আপা?

জানি না কেন।

আমার এসব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

নিশাত চুপ করে রইল। কাছেই কোথাও সরসর শব্দ হচ্ছে। দিলু বলল, চল আপা ঘরে যাই।

আরেকটু বস। তোকে একটা মজার গল্প বলি। ক্লাস টেনে উঠলাম যেবার সেবার আমি আর জামিল ভাই মিলে ঠিক করলাম পালিয়ে যাব।

কোথায় পালিয়ে যাবে?

সে-সব কিছু ঠিক হয়নি। ঐ বয়সে ভেবেচিন্তে তো কিছু কখনো করা হয় না। ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারলে এত ঝামেলা হয়?

নিশাত হাসতে চেষ্টা করল।

গল্প-উপন্যাসের মতো সত্যি সত্যি একদিন স্কুলে যাওয়ার নাম করে চলে গেলাম কমলাপুর রেলস্টেশন।

তোমরা যাওনি নিশ্চয়ই?

না, জামিল ভাই আসেননি।

ভালোই করেছ, যাওনি।

না, ভালো করিনি। এখনো তার জন্যে মনে একটা কষ্ট আছে আমার।

দিলু ছোট্ট করে বলল, তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?

নিশাত জবাব দিল না। দিলু দ্বিতীয়বার বলল, তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে চাই।

দিলুর মনে হলো নিশাত কাঁদছে। গলার স্বর যেন ভাঙা ভাঙা। নিশাত খুব শক্ত মেয়ে। সে কি সত্যি সত্যি কাঁদবে ? বিশ্বাস হয় না। দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাইকে কিছু বলেছ ?

না।

বলো তাকে। তিনি তোমার জন্যেই আসেন।

নিশাত দিলুকে বুঝতে চেষ্টা করল। শান্ত ভাবলেশহীন মুখ। উজ্জ্বল চোখ। বড় মায়াবতী চেহারা দিলুর।

নিশাতের মনে হলো, আজ ঠিক এই মুহূর্তে দিলুর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

লেবু ফুল ফুটেছে কোথাও, মিষ্টি গন্ধ আসছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। নিশাত কাঁদতে শুরু করল। দিলু বসে রইল চুপচাপ। নিশাত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বেঁচে থাকা বড় কষ্ট।

আপা, চল যাই। শীত লাগছে।

আরেকটু বস ! প্লিজ।

তারা দুজন বসে রইল প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। এক সময় হাতে টর্চ নিয়ে তাদের খুঁজতে এল জামিল।

পানিতে ডুবে গেছ কিনা তাই দেখতে এলাম। মনে হচ্ছে ঠিকমতোই আছ। কাজেই ডিসটার্ব না করে চলে যাচ্ছি। শুধু একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে—এ বাড়িতে ভূত আছে। ঠাট্টা না, সত্যি।

নিশাত কিছু বলল না। দিলু বলল, জামিল ভাই, আপনি বসুন এখানে। আপা কী যেন বলবেন আপনাকে। টর্চটা দিন। আমি চলে যাই।

যেতে পারবে একা ?

পারব।

দিলু যেতে যেতে থমকে পেছনে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে জামিল ভাইয়ের জ্বলন্ত সিগারেট উঠানামা করছে। এর বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কত কাছাকাছি বসে তারা দুজন! নিশাত আপা যদি আজ বলে—জামিল ভাই, চলুন আজ সারা রাত আমরা গল্প করি—তাহলে জামিল ভাই কী বলবেন ?

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ঝিমুনি ধরে গেছে। তিনি উঠব উঠব করছিলেন কিন্তু আবার ঠিক উঠতেও চাচ্ছিলেন না।

দিলু একসময় এসে দাঁড়াল তার পাশে।

ঘুমোসনি মা ?

না বাবা।

কোথায় ছিলি ?

পুকুরঘাটে বসে ছিলাম আপার সঙ্গে। বাবা, আমি তোমার পাশে একটু বসি ?

ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে পাশের চেয়ারটি টানতে গেলেন। দিলু বলল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে বসব। আমাকে একটু জায়গা দাও। ওসমান সাহেব সরে জায়গা করে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, দিলু, তোর কী হয়েছে ?

বাবা, আমার বড় কষ্ট!

কিসের কষ্ট ?

জানি না বাবা।

ওসমান সাহেব মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মনে হলো দিলু কাঁদছে। কিন্তু দিলু কাঁদছিল না।

ওসমান সাহেব ভরাট গলায় বললেন, যাও মা, ঘুমুতে যাও। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শরীর খারাপ করবে।

রেহানা বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলেন। দিলুকে দেখে বললেন, তোর কি শরীর খারাপ ? তোকে এমন লাগছে কেন ?

শরীর ভালোই আছে।

নিশাত কোথায় ?

পুকুরঘাটে।

রেহনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, এত রাতে একা একা সেখানে কী করছে ?

একা একা না মা। জামিল ভাই আছেন।

রেহানা উঠে বসলেন। তাঁর ধারণা ছিল জামিলকে নিশাত সহ্য করতে পারে না। তিনি কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও জিজ্ঞেস করলেন না। দিলু বলল, মা, আমি তোমার পাশে একটু শুয়ে থাকি ?

দিলু মা-কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, নিশাত আপার সঙ্গে জামিল ভাইয়ের বিয়ে হলে ভালোই হবে মা।

কী বলছিস বিড়বিড় করে। পরিষ্কার করে বল।

কিছু বলছি না মা।

দিলু আরও শক্ত করে মা-কে জড়িয়ে ধরল। চারদিকে আবছা অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। শীতের হিমেল হাওয়া। বাবু ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠল। একটা টিকটিকি ডাকল—টিক টিক টিক।

১২

দিলু ভাসছিল মাঝপুকুরে।

তার পরনে লাল একটা স্কার্ট। মাথার কালো চুল চারদিকে ছড়ানো। দীঘির সবুজ জলের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি অসাধারণ কম্পোজিশন। একজন ফটোগ্রাফার এরকম একটি দৃশ্যের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে।

সাব্বির দীর্ঘ সময় দিলুর ভেসে থাকা শরীরটির দিকে তাকিয়ে রইল। ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। স্কার্টের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। সাব্বির ছবি তুলতে গিয়েও তুলতে পারল না। পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল—তোমরা কে কোথায় আছ এই মেয়েটিকে বাঁচাও!

দমকা একটা হাওয়া এল তখন। সে হাওয়ায় দিলু ভেসে আসতে লাগল ঘাটের দিকে। যেন সে বলছে—'ছবি তুলুন সাব্বির ভাই।'

১৯৭১

মীর আলি চোখে দেখে না।

আগে আবছা আবছা দেখত। দুপুরের রোদের দিকে তাকালে হলুদ কিছু ভাসত চোখে। গত দুবছর ধরে তাও ভাসছে না। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তার বয়স প্রায় সত্তর। এই বয়সে চোখ-কান নষ্ট হতে শুরু করে। পৃথিবী শব্দ ও বর্ণহীন হতে থাকে। কিন্তু তার কান এখনো ভালো। বেশ ভালো। ছোট নাতনিটি যতবার কেঁদে ওঠে ততবারই সে বিরক্ত মুখে বলে, চুপ, শব্দ করিস না।

মীর আলি আজকাল শব্দ সহ্য করতে পারে না। মাথার মাঝখানে কোথায় যেন ঝনঝন করে। চোখে দেখতে পেলেও বোধহয় এরকম হতো—আলো সহ্য হতো না। বুড়ো হওয়ার যন্ত্রণা! সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা—রাতদুপুরে বাইরে যেতে হয়। একা একা যাওয়ার উপায় নেই। তাকে তলপেটের প্রবল চাপ দিয়ে মিহি সুরে ডাকতে হয়, বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!

বদিউজ্জামান তার বড় ছেলে। মধুবন বাজারে তার একটা মনোহারী দোকান আছে। রোজ সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে সাত মাইল হেঁটে সে বাড়ি আসে। পরিশ্রমের ফলে তার ঘুম হয় গাঢ়। সে সাড়া দেয় না। মীর আলি ডেকেই চলে, বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান! জবাব দেয় তার ছেলের বউ অনুফা। অনুফার গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ স্বর কানে এলেই মীর আলির মাথা ধরে। তবু সে মিষ্টি সুরে বলে, ও বৌ, এট্টু বাইরে যাওন দরকার। বদিরে উঠাও।

অনুফা তার স্বামীকে জাগায় না। নিজেই কুপি হাতে এগিয়ে এসে শ্বশুরের হাত ধরে। বড় লজ্জা লাগে মীর আলির। কিন্তু উপায় কী? বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। অনেক কষ্ট। মীর আলি নরম স্বরে বলে, চাঁদনি রাইত নাকি, ও বৌ?

জি-না।

চউখে ফসর ফসর লাগে। মনে হয় চাঁদনি।

না, চাঁদনি না। এইখানে বসেন। এই নেন বদনা।

অনুফা দূরে সরে যায়। মীর আলি ভারমুক্ত হয়। অন্যরকম একটা আনন্দ হয় তার। ইচ্ছা করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অনুফা ডাকে, আব্বাজান, হইছে?

হুঁ।

উঠেন। বইসা আছেন কেন?

ফজর ওয়াক্তের দেরি কত?

দেরি আছে। আব্বাজান উঠেন।

মীর আলি অনুফার সাহায্য ছাড়াই উঠানে ফিরে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে বোধহয়। একটা-দুটা করে শিয়াল

ডাকতে শুরু করেছে। মীর আলি হৃষ্ট গলায় বলে, রাইত বেশি বাকি নাই। অনুফা জবাব দেয় না, হাই তোলে।

একটা জলচৌকি দেও, উঠানে বইয়া থাকি।

দুপুর-রাইতে উঠানে বইবেন কী ? যান, ঘুমাইতে যান।

মীর আলি বাধ্য ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে। একবার ঘুম ভাঙলে বাকি রাতটা তার জেগে কাটাতে হয়। সে বিছানায় বসে ঘরের স্পষ্ট অস্পষ্ট সব শব্দ অত্যন্ত মন দিয়ে শোনে।

বদি খুকখুক করে কাশছে। টিনের চালে ঝটপট শব্দ। কিসের শব্দ ? বানর ? চৌকির নিচে সবগুলি হাঁস একসঙ্গে প্যাঁক প্যাঁক করল। বাড়ির পাশে শেয়াল হাঁটাহাঁটি করছে বোধহয়। পরীবানু কেঁদে উঠল। দুধ খেতে চায়। অনুফা দুধ দেবে না। চাপা গলায় মেয়েকে শাসাচ্ছে। বদি আবার কাশছে। ঠান্ডা লেগেছে নাকি ? পরশু দিন ভিজে বাড়ি ফিরেছে। জ্বর তো হবেই। বদির কথা শোনা যাচ্ছে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে। কী বলছে ? এত ফিসফিসানি কেন ? মীর আলি কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কাক ডাকল। সকাল হচ্ছে নাকি ? মীর আলি ভোরের প্রতীক্ষা করে, তার তলপেট আবার ভারী হয়ে ওঠে।

বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!

কী ?

এট্টু বাইরে যাওন দরকার।

বদি সাড়াশব্দ করে না। পরীবানু তারস্বরে কাঁদে। দুধ খেতে চায়।

ও বদি, বদিউজ্জামান।

আসি আসি।

তাড়াতাড়ি কর।

আরে দুত্তোরি! এক রাইতে কয়বার বাইরে যাইবেন ?

বদি প্রচণ্ড একটা চড় বসায় পরীবানুর গালে। বিরক্ত গলায় বলে, টর্চটা দাও অনুফা। অনুফা টর্চ খুঁজে পায় কিন্তু অন্ধকারে ব্যাটারি খুঁজে পায় না।

মীর আলি অপেক্ষা করতে করতে একসময় অবাক হয়ে বুঝতে পারে তার প্রস্রাব হয়ে গেছে। বিছানার একটা অংশ ভেজা। সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। এরকম তার আগে কখনো হয়নি।

আসেন যাই। যত ঝামেলা! দেখি হাতটা বাড়ান।

বদি তার হাত ধরে। মীর আলি খুব দুর্বল ও অসহায় বোধ করে।

এখন থাইক্যা ঘরের মইধ্যে একটা পাতিলে পেশাব করবেন। ঝামেলা ভালো লাগে না।

আইচ্ছা।

আর পানি কম খাইবেন। বুঝলেন ?

আইচ্ছা।

বদি তাকে উঠোনের এক মাথায় বসিয়ে দেয়। মীর আলি প্রস্রাব করার চেষ্টা করে। প্রস্রাব হয় না, ভোঁতা একটা যন্ত্রণা হয়। বদি হাঁক দেয়।

কি, হইছে ? রাইত শেষ করবেন নাকি ?

আর ঠিক তখন মীর আলির সামনে দিয়ে সরসর শব্দ করে একটা কিছু চলে যায়। কী এটা! সাপ ? মীর আলির দেখতে ইচ্ছা করে।

আরে! বিষয় কী, ঘুমাইয়া পড়ছেন নাকি ?

না। একটা সাপ গেল সামনে দিয়া।

আরে দুত্তোরি সাপ! উঠেন দেখি।

মনে হয় জাতি সাপ। বিরাট লম্বা মনে হইল।

আরে ধ্যুৎ! উইঠা আসেন।

মীর আলি উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখন আজান হয়। মীর আলি হাসিমুখে বলে, আজান দিছে। ও বদি, আজান দিছে।

দিছে দেউখ। ঘরে চলেন।

ওখন আর ঘরে গিয়া কী কাম ? গোসলের পানি দে। গোসল সাইরা নামাজটা পড়ি।

বদি বিরক্ত গলায় বলে, অজু কইরা নামাজ পড়েন। গোসল ক্যান ?

শইলডা পাক না। নাপাক শইল।

আপনে থাকেন বইয়া, অনুফারে পাঠাই। যত ঝামেলা!

বদিউজ্জামান তার বাবাকে একটা জলচৌকির ওপর বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর আসে না। পরী বানু ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদে। মীর আলি বসে থাকে চুপচাপ।

তার কিছুক্ষণ পর পঞ্চাশজন সৈন্যের ছোট একটা দল গ্রামে এসে ঢোকে। মার্চ-টার্চ না, এলোমেলোভাবে চলা। তাদের পায়ের বুটে কোনো শব্দ হয় না। তারা যায় মীর আলির বাড়ির সামনে দিয়ে এবং তাদের একজন মীর আলির চোখে পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো ফেলে। মীর আলি কিছু বুঝতে পারে না। শুধু উঠোনে বসে থাকা কুকুরটা তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। মীর আলি ভীত স্বরে ডাকে, বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!

কুকুরটি একসময় আর ডাকে না। দলটির পেছনে পেছনে কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তারপর দ্রুত ফিরে আসে মীর আলির কাছে। মীর আলি উঁচু গলায় ডাকে, ও বদি! ও বদিউজ্জামান!

কী হইছে ? বেহুদা চিল্লান কেন ?

বাড়ির সামনে দিয়া কারা যেন গেল।

আরে দুত্তোরি! যত ফালতু ঝামেলা। চুপ কইরা বইয়া থাকেন।

মীর আলি চুপ করে যায়। চুপ করে থাকে কুকুরটিও। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। তারা টের পায়।

গ্রামের নাম নীলগঞ্জ। পহেলা মে। উনিশশো একাত্তর। ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক একজন মেজর—এজাজ আহমেদ। কাবুল মিলিটারি একাডেমির একজন কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গাঁয়ের নাম রেশোবা।

২

ময়মনসিংহ-ভৈরব লাইনের একটি স্টেশন নান্দাইল রোড।

ছোট্ট গরিব স্টেশন। মেল ট্রেন থামে না। লোকাল ট্রেন মিনিটখানেক থেকেই ফ্ল্যাগ উড়িয়ে পালিয়ে যায়। স্টেশনের বাইরে ইট বিছানো রাস্তায় চার-পাঁচটা রিকশা ঠুন ঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রী খোঁজে। সুরেলা গলা শোনা যায়, রুয়াইল বাজার যাওনের কেউ আছুইন। রুয়াইল বা-জা-র।

রুয়াইল বাজার এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। নান্দাইল রোড থেকে সোজা উত্তরে দশ মাইল। খুব খারাপ রাস্তা। বর্ষাকালে রিকশা চলে না। হেঁটে যেতে হয়। এঁটেল মাটিতে পা দেবে যায়, থিক থিক ঘন কাদা। নান্দাইল রোড থেকে রুয়াইল বাজার আসতে বেলা পুইয়ে যায়।

বাজারটি অন্য সব গ্রাম্য বাজারের মতো। তবে স্থানীয় লোকদের খুব অহঙ্কার একে নিয়ে। কী নেই এখানে? ধানচালের আড়ত আছে। পাটের গুদাম আছে। ধান ভাঙানোর কল আছে। চায়ের দোকান আছে। এমনকি রেডিও সারাবার একজন কারিগর পর্যন্ত আছে। গ্রামের বাজারে এরচেয়ে বেশি কী দরকার?

রুয়াইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরও মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ি। তাও শীতকালে। বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ। নদীনালা নেই যে নৌকা চলবে।

মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পুবদিকে সাত-আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গলা মাঠ। কাঁটাঝোপ বাঁশ আর জারুলের মিশ্র বন। বেশ কিছু গাব ও ডেফল জাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর গাছও আছে। জঙ্গলা মাঠের এক অংশ বেশ নিচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেইসব মোরতা কেটে এনে পাটি বোনা হয়। পাকা লটকনের খোঁজে বালক-বালিকারা বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বর্ষাকালে কেউ যায় না সেদিকে। খুব সাপের উপদ্রব। বনে ঢুকে প্রতি বছরই দু-একটা গরু-ছাগল সাপের হাতে মারা পড়ে।

জঙ্গলা মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র শ্রীহীন ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কাস্তের মতো দুদিকে ঘিরে আছে।

এখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে। পাখি-মারা জাল নিয়ে পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করে পাখি-মারারা। চাষবাস যা হয় দক্ষিণের মাঠে। জমি উর্বর নয় কিংবা এরা ভালো চাষি নয়। ফসল ভালো হয় না। তবে শীতকালে এরা প্রচুর রবিশস্য করে। বাগার আগে আগে করে তরমুজ ও বাঙ্গি। দক্ষিণের জমিতে কোনোরকম যত্ন ছাড়াই এ দুটি ফল প্রচুর জন্মায়।

গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। বদিউজ্জামানের ঘরটি টিনের। তার হাতে এখন কিছু পয়সাকড়ি হয়েছে। টিনের ঘর বানানো ছাড়াও সে একটা সাইকেল কিনেছে। চালানো শিখে উঠেনি বলে এখনো সে হেঁটেই মধুবন বাজারে যায়। সপ্তাহে একবার নতুন সাইকেলটি ঝাঁড়পোছ করে।

গ্রামের একমাত্র পাকা দালানটি প্রকাণ্ড। দুবিঘা জমির ওপর একটা হুলস্থুল ব্যাপার। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার নায়েব চন্দ্রকান্ত সেন মশাই এ বাড়ি বানিয়ে গৃহপ্রবেশের দিন সর্পাঘাতে মারা পড়েন। চন্দ্রকান্ত সেন প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেসবের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। সবার ধারণা, সোনাদানা পিতলের কলসিতে ভরে তিনি যক্ষ করে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পিতলের কলসির খোঁজে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকান্ত সেন মশাইয়ের বর্তমান একমাত্র উত্তরাধিকারী নীলু সেন প্রকাণ্ড দালানটিতে থাকেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখায় তার চেয়েও বেশি। নীলু সেনকে গ্রামে যথেষ্ট খাতির করা হয়। যাবতীয় সালিশিতে তিনি থাকেন। বিয়েশাদির কোনো কথাবার্তা তাঁকে ছাড়া কখনো হয় না। লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী।

এ গ্রামে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি হচ্ছে জয়নাল মিয়া। প্রচুর বিষয়সম্পত্তির মালিক। মধুবন বাজারে তার দুটি ঘরও আছে। লোকটি মেরুদণ্ডহীন। সবার মন রেখে কথা বলার চেষ্টা করে। গ্রাম্য সালিশিতে সবার কথাই সমর্থন করে বিচার সমস্যা জটিল করে তোলে। তবু সবাই তাকে মোটামুটি সহ্য করে। সম্পদশালীরা এই সুবিধাটি সব জায়গাতেই ভোগ করে।

দুজন বিদেশী লোক আছেন নীলগঞ্জে। একজন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। এত জায়গা থাকতে তিনি এই দুর্গম অঞ্চলে ইমামতি করতে কেন এসেছেন সে রহস্যের মীমাংসা হয়নি। তিনি মসজিদেই থাকেন। মাসের পনেরোদিন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে খান। বাকি পনেরোদিন পালা করে অন্য ঘরগুলিতে খান। কিছুদিন হলো তিনি বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তাবটিতে কেউ এখনো তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। ধানি জমি দিতে পারে জয়নাল মিয়া। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। শুনেও না শোনার ভান করছে।

দ্বিতীয় বিদেশী লোকটি হচ্ছে আজিজ মাস্টার। সে নীলগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। প্রাইমারি স্কুল সরকারি সাহায্যে তিন বছর আগে শুরু হয়। উদ্দেশ্য বোধহয় একটিই, দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছানো। উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

শিক্ষকরা কেউ বেশিদিন থাকতে পারে না। খাতাপত্রে তিনজন শিক্ষক থাকার কথা। এখন আছে একজন—আজিজ মাস্টার। লোকটি রুগ্ন, নানান রকম অসুখবিসুখ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে হাঁপানি। শীতকালে এর প্রকোপ হয়। গরমকালটা মোটামুটি ভালোই কেটে যায়।

আজিজ মাস্টার একজন কবি। সে গত তিন মাসে চার নম্বরি একটি রুলটানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি কবিতা একটি রমণীকে উদ্দেশ করে লেখা, যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, যেমন—স্বপ্ন-রানী, কেশবতী, অচিন পাখি ইত্যাদি। তার তিনটি কবিতা নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত *মাসিক কিষাণ* পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আজিজ মাস্টারের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে গ্রামের লোকজন ওয়াকিবহাল। তারা এই কবিকে যথেষ্ট সমীহ করে। সমীহ করার আরেকটি কারণ হলো, আজিজ মাস্টার গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বিএ পর্যন্ত পড়েছিল। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তার আবার পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

সে জয়নাল মিয়ার একটি ঘরে থাকে। তার স্ত্রীকে সে 'ভাবিসাব' ডাকে কিন্তু তার বড় মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন বিচলিত বোধ করে। মেয়েটির নাম মালা। মাঝে মাঝে মালা তাকে ভাত বেড়ে দেয়। সে-সময়টা আজিজ মাস্টার বড় অস্বস্তি বোধ করে। সে যখন বলে, মামা, আরেকটু ভাত দেই ? তখন কোনো কারণ ছাড়াই আজিজ মাস্টারের কান-টান লাল হয়ে যায়। আজিজ মাস্টার কয়েকদিন আগে 'মালা রানী' নামের একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছে। কবিতাটি *কিষাণ* পত্রিকায় পাঠাবে কি না এ নিয়ে সে খুব চিন্তিত। হয়তো পাঠাবে।

নীলগঞ্জের যে দিকটায় জলাভূমি, একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। গ্রামের সঙ্গে তাদের খুব একটা যোগ নেই। মাছ ধরার সিজনে জলমহালে মাছ মারতে যায়। আবার ফিরে আসে। কর্মহীন সময়টাতে চুরি-ডাকাতি করে। নীলগঞ্জের কেউ এদের ঘাঁটায় না।

গত বৎসর কৈবর্তপাড়ায় খুন হলো একটা। নীলগঞ্জের মাতবররা এমন ভাব করলেন যেন তাঁরা কিছুই জানেন না। থানা-পুলিশ কিছুই হলো না। যে বাড়ির ছেলে খুন হলো সে কিছুদিন ছুটাছুটি করল নীলু সেনের কাছে। নীলু সেন শুকনো গলায় বলল, তোদের ঝামেলা তোরা মিটা। থানাওয়ালার কাছে যা। বুড়ি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, থানাওয়ালার কাছে গেলে আমারে দহের মইধ্যে পুইত্তা থুইব কইছে। নীলু সেন গম্ভীর হয়ে গেল। টেনে টেনে বলল, এদের ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। রক্তগরম জাত। কী করতে কী করে।

বিচার অইত না ?

নীলু সেন তার জবাব দিতে পারল না। অস্পষ্টভাবে বলল, এখন বাদ দে। পরে দেখি কিছু করা যায় কি না।

বুড়ি আরও কিছুদিন ছোটাছুটি করল। এবং একদিন দেখা গেল কৈবর্তরা দলবেঁধে জলমহালে মাছ মারতে গিয়েছে। বুড়িকে সঙ্গে নেয়নি। বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল কিছুদিন। নীলু সেনের দালানের একপ্রান্তে থাকতে লাগল। চরম দুর্দিন। কৈবর্তরা ফিরে এল তিনমাস পর, কিন্তু বুড়ির জায়গা হলো না। সে বাড়ি ওবাড়ি ভিক্ষা করে খেতে লাগল। হতদরিদ্র নীলগঞ্জের প্রথম ভিক্ষুক।

সব গ্রামের মতো এই গ্রামে একজন পাগলও আছে। মতি মিয়ার শালা নিজাম। সে বেশির ভাগ সময়ই সুস্থ থাকে। শুধু দু'একদিন মাথা গরম হয়ে যায়। তখন তার গায়ে কোনো কাপড় থাকে না। গ্রামের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে থাকে। দুপুরের রোদ খুব বেড়ে গেলে মধুবন জঙ্গলায় ঢুকে পড়ে। 'পাগলদের সাপে কাটে না' প্রবাদটি হয়তো সত্যি। নিজাম বহাল তবিয়তেই বন থেকে বেরিয়ে আসে। ছোটাছুটি করা এবং বনের ভেতরে বসে থাকা ছাড়া সে অন্য কোনো উপদ্রব করে না। গ্রামের পাগলদের গ্রামবাসীরা খুব স্নেহের চোখে দেখে। তাদের প্রতি অন্য একধরনের মমতা থাকে সবার।

৩

চিত্রা বুড়ি রাতে একনাগাড়ে কখনো ঘুমায় না।

ক্ষণেক্ষণে জেগে উঠে চেঁচায়, কেলা যায় গো ? লোকটা কে ?

তার ঘুমোবার জায়গাটা হচ্ছে সেনবাড়ির পাকা কালী মন্দিরের চাতাল। নীলু সেন তাকে থাকবার জন্যে একটা ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তার ঘুম হয় না। দেবী মূর্তির পাশে সে বোধহয় একধরনের নিরাপত্তা বোধ করে। গভীর রাতে দেবীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়, যেমন—দেখিস হেই মা কালী, হেইগো নেংটা বেটি, আমার পুতরে যে মারছে তুই তার কইলজাটা টাইন্যা খা। তরে আমি জোড়া পাঁঠা দিমু। বুক চিইরা রক্ত দিমু—হেই মা কালী, দেখিসরে বেটি, দেখিস।

মা কালী কিছু শোনেন কি না বলা মুশকিল। কিন্তু চিত্রা বুড়ির ধারণা তিনি শোনেন এবং তিনি যে শুনছেন তার নমুনাও দেন। যেমন এক রাত্রিতে খল-খল হাসির শব্দ শোনা গেল। বুড়ির রক্ত জল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সে কাঁপা গলায় ডাকল, হেই মা, হেই গো নেংটা বেটি ? হাসির শব্দ দ্বিতীয়বার আর শোনা গেল না। দেবীরা তাদের মহিমা বারবার করে দেখাতে ভালোবাসেন না।

চিত্রা বুড়ি আজ রাতেও মা কালীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলল। জোড়া পাঁঠার আশ্বাস দিয়ে ঘুমাতে গেল। তারপর জেগে উঠে চেঁচাল, কেলা যায় গো ? লোকটা কে ? কেউ জবাব দিল না, কিন্তু বুড়ির মনে হলো অনেকগুলি মানুষ যেন এদিকে আসছে। শব্দ করে পা ফেলছে। হুঁ হাঁ হুঁ হাঁ এরকম একটা আওয়াজও আসছে। ডাকাত নাকি ? চিত্রা বুড়ি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে দিয়ে মিলিটারি দলটি পার হলো। আলো কম। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চিত্রা বুড়ি কিছু বুঝতে পারল না। এরা কারা ? এই রাতে কোত্থেকে এসেছে ? বুড়ি দেখল সেন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার টর্চের আলো ফেলল। এর মানে কি ডাকাত ? কিন্তু সেন বাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয়। সেনরা এখন হতদরিদ্র। এই বিশাল বাড়ির ইটগুলো ছাড়া ওদের আর কিছুই নেই।

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। জুম্মাঘরের কাছে এসে আবার সেনবাড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলল। কোনদিকে যাচ্ছে ? কৈবর্তপাড়ার দিকে ? ওদের আগেভাগে খবর দেওয়া দরকার। সেনবাড়ির পেছন দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে খবর দেবে ? চিত্রা বুড়ির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। এই রাতের বেলা দলবেঁধে এরা কেন আসবে ?

না, কৈবর্তপাড়ার দিকে যাচ্ছে না। জুম্মাঘর পেছনে ফেলে এরা সড়কে উঠে গেল। টর্চের আলো এখন আর ফেলছে না। বুড়ির মনে হলো এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে। আজিজ মাস্টারকে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তারও আগে খবর দেওয়া দরকার কৈবর্তপাড়ায়। বিপদের সময় নিজ গোত্রের মানুষের কথাই প্রথম মনে পড়ে।

চার-পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। এরা কিছু টের পেয়েছে। কুকুর-বেড়াল অনেক কিছু আগেভাগে জানে। বুড়ি কালী মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে এল। সে কোনদিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না।

গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে এটা প্রথম বুঝতে পারলেন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। পাকা মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সুরা ইয়াসিন পড়ছিলেন। আজান দেওয়ার আগে তিনি তিন বার সুরা ইয়াসিন পড়েন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় অবাক হয়ে পুরো দলটাকে দেখলেন। এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত তিনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। সুরা ইয়াসিন শেষ করে দীর্ঘ সময় মসজিদের সিঁড়িতে বসে রইলেন। অন্ধকার এখনো কাটেনি। পাখপাখালি ডাকছে। ইমাম সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না এখানে বসে থাকবেন, না খবর দেওয়ার জন্যে ছুটে যাবেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হলো, সিঁড়িতে এরকম প্রকাশ্যে বসে থাকা ঠিক না। মসজিদের ভেতরে থাকা দরকার। কিন্তু নীলগঞ্জ মসজিদে তিনি কখনো একা ঢোকেন না। এই মসজিদে জিন নামাজ পড়ে এরকম একটা প্রবাদ আছে। অনেকেই দেখেছে। তিনি অবশ্য এখনো দেখেননি। কিন্তু তাঁর ভয় করে।

একা বসে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, এই যে তিনি দেখলেন একদল মিলিটারি, এটা চোখের ভুল না তো ? নান্দাইল রোডে মিলিটারি আসেনি, সোহাগীতে আসেনি। এখানে আসবে কেন ? এখানে আছেটা কী ? নেহায়েতই গণ্ডগ্রাম।

ইমাম সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। স্কুলঘর বাঁশবনের আড়ালে পড়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসল্লিরা কেউ আসছে না কেন ? নাকি

মিলিটারির খবর জেনে গেছে সবাই ? তাঁর প্রবল ইচ্ছে হতে লাগল নামাজ না পড়েই ঘরে ফিরে যেতে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে অথচ কারও দেখা নেই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার পর মতি মিয়াকে আসতে দেখা গেল। মতি মিয়া একটা মামলায় জড়িয়ে ইদানীং ধর্মকর্মে অতিরিক্ত রকমের উৎসাহী হয়ে পড়েছে। ইমাম সাহেব নিচুগলায় বললেন, এই মতি, কিছু দেখলা ?

কী দেখমু ? কিসের কথা কন ?

কিছু দেখো নাই ?

নাহ। বিষয়ডা কী ?

ইমাম সাহেব আর কিছু না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে আজান দিতে গেলেন। আজান শেষ করে মতি মিয়াকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইস্কুল ঘরের কাছে কিছুই দেখো নাই ?

না। ব্যাপারডা কী ভাইঙা কন।

মনে হয় গেরামে মিলিটারি ঢুকছে।

কী ঢুকছে ?

মিলিটারি।

আরে কী কন ? এই গেরামে মিলিটারি আইব ক্যান ?

আমি যাইতে দেখলাম।

চউক্ষের ধান্ধা। আন্ধাইরে কী দেখতে কী দেখছেন। নান্দাইল রোডে তো এখন তক মিলিটারি আসে নাই।

তুমি জানলা ক্যামনে ?

আমার শালা আইছে গতকাইল। নেজামের বড় ভাই।

আমি কিন্তু নিজের চউক্ষে দেখলাম।

আরে না। মিলিটারি আইলে এতক্ষণে গুলি শুরু হইয়া যাইত। মিলিটারি কি সোজা জিনিস ?

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করবার আগেই আরও তিনজন নামাজি এসে পড়ল। তারাও কিছু জানে না। একজন এসেছে স্কুলঘরের সামনে দিয়ে, সেও কিছু দেখেনি।

ইমাম সাহেব আজ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে সাধারণত তিনি হাদিস-কোরআনের দুই-একটি কথা বলেন। আজ কিছুই বললেন না। বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বেশ আলো চারদিকে। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জোড়া শিমুলগাছের কাছে এসে তিনি আড়চোখে স্কুলঘরের দিকে তাকালেন। বারান্দায় সারি সারি সৈন্য বসে আছে। ইমাম সাহেবের মনে হলো, স্কুল কম্পাউন্ডের গেটের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছে। লোকটির পরনে ফুল প্যান্ট এবং নীল রঙের একটা হাফ শার্ট। কিন্তু তাঁকে ডাকছে কেন ? নাকি তিনি ভুল

দেখছেন ? ইমাম সাহেবের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তিনি একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার দোয়া ইউনুস পড়ে স্কুলঘরের দিকে এগুলেন।

নীল শার্ট পরা লোকটিও এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। ব্যাপার কী ? এ কে ? তিনি অতি দ্রুত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন—'লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জুয়ালিমিন।' এই দোয়াটি খুব কাজের। হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে বসে এই দোয়া পড়েছিলেন।

নীল শার্ট পরা লোকটা এগিয়ে আসছে। কী চায় সে ?

আপনি কে ?

আমি এই গেরামের ইমাম।

আচ্ছালামু আলায়কুম, ইমাম সাহেব।

ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ারাহমতুল্লাহ।

আপনি একটু আসেন আমার সাথে।

কই যাইতাম ?

আসেন। মেজর সাব আপনাকে ডাকেন। ভয়ের কিছু নাই, আসেন।

ইমাম সাহেব তিনবার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগে ফেললেন। সঙ্গের নীল শার্ট পরা লোকটি মৃদুস্বরে বলল, এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? ভয়ের কিছুই নাই।

৪

আজিজ মাস্টারের অনিদ্রা রোগ আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত তাকে জেগে থাকতে হয় বলেই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে হয়। আজ তাকে ভোরের আলো ফোটার আগেই জাগতে হলো। কারণ স্কুলের দপ্তরি ও দারোয়ান রাসমোহন প্রচণ্ড শব্দে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এক্ষুনি আজিজ মাস্টারকে ঘর থেকে বের করতে হবে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আজিজ মাস্টার কথা বলল, এই রাসমোহন, কী ব্যাপার ?

আপনারে ডাকে, আপনারে ডাকে।

কে ডাকে ?

মিলিটারি। গেরামে মিলিটারি আসছে। ইস্কুল ঘরে।

কী বলছিস রাসমোহন ?

আপনারে স্যার ডাকে।

আজিজ মাস্টার দরজা খুলে দেখল, রাসমোহনের থুতনি বেয়ে ঘাম পড়ছে। গায়ের ফতুয়াটাও ঘামে ভেজা। স্কুল থেকে দৌড়ে এসেছে বোধহয়। শব্দ করে শ্বাস টানছে। রাসমোহন আবার বলল, মিলিটারি আপনারে ডাকে স্যার। আজিজ মাস্টার রাসমোহনের কথা মোটেও বিশ্বাস করল না। সময়টা খারাপ। খাকি পোশাকের

একজন পিয়ন দেখলেও সবাই ভাবে পাঞ্জাবি মিলিটারি। রাসমোহনের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। থানাওয়ালারা কেউ এসেছে কেন্দুয়া থেকে। খুব সম্ভব চিত্রা বুড়ির ছেলের ব্যাপারে। মার্ডার কেইসে পুলিশের খুব উৎসাহ। দলবেঁধে চলে আসে। নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানেও তাই হয়েছে। আজিজ মাস্টার অনেকখানি সময় নিয়ে হাতমুখ ধুল। তার মাথায় চুল নেই, তবু যত্ন করে চুল আঁচড়াল। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুল। অর্ধেক পথ আসার পর তার মনে পড়ল চাবি ফেলে এসেছে। আবার ফিরে গেল চাবি আনতে। বাড়ি ফিরবার পথে সত্যি সত্যি বুঝল গ্রামে মিলিটারি এসেছে। মতি মিয়ার সঙ্গে তার দেখা হলো। রতন মাঝির সঙ্গে দেখা হলো। বাড়ি ঢুকবার মুখে জয়নাল মিয়াকেও ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে দেখা গেল। রাসমোহন এদের প্রত্যেককে একবার একবার করে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

রাসমোহনের বর্ণনামতে, সে স্কুল ঘরের বারান্দায় ঘুমাচ্ছিল। তখনো চারদিকে অন্ধকার। কে যেন তার পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে টর্চের আলো ফেলল। সে উঠে বসে দেখে স্কুলে মিলিটারি গিজগিজ করছে।

জয়নাল মিয়া নিচুগলায় বলল, আন্দাজ কতজন হইব ?

চাইর-পাঁচশ'র কম না।

কও কী তুমি ?

বেশিও হইতে পারে। সবটি মস্ত জোয়ান।

জোয়ান তো হইবই। মিলিটারি দুর্বল পাতলা হয় নাকি ?

হাতে অস্ত্রপাতি আছে ?

জয়নাল মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, অস্ত্রপাতি তো থাকবই। এরা কি বিয়া করতে আইছে ? আজিজ মাস্টার গম্ভীর গলায় বলল, তারপর কী হয়েছে রাসমোহন ?

তারা আমার নাম জিগাইল।

আজিজ মাস্টার বলল, কোন ভাষায়, উর্দু না ইংরেজি ?

বাংলায়। পরিষ্কার জিগাইল—তোমার নাম কী ? তুমি কে ? কী করো ?

তা কীভাবে হয় ? এরা তো বাংলা জানে না।

আমি স্যার পরিষ্কার হুনলাম। নিজের কানে হুনলাম।

তারপর বলো। তারপর কী হলো ?

আমি কইলাম, আমার নাম রাসমোহন। আমি স্কুলের দপ্তরি। তখন তারা কইল, হেডমাস্টাররে ডাইক্যা আনো।

বাংলায় বলল ?

জি স্যার।

আরে কী যে বলে পাগল-ছাগলের মতো, এরা বাংলা জানে নাকি ? কী শুনতে কী শুনেছ ?

আজিজ একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে। এবং প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুনি হাঁপানির টান শুরু হবে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার হাঁপানির টান ওঠে। এখন সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না জেনেও আজিজ মাস্টার লম্বা লম্বা টান দিতে শুরু করল। সে সাধারণত জয়নাল মিয়ার সামনে সিগ্রেট খায় না।

জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, তুমি যাও মাস্টার, বিষয়ডা কী জাইন্যা আস।

আমি, আমি কী জন্যে যাব ?

আরে ডাকতাছে তোমারে। তুমি যাইবা না তো যাইবটা কে ?

আজিজ মাস্টারের সত্যি সত্যি হাঁপানির টান উঠে গেল। সিগারেট ফেলে দিয়ে সে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করল। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, এরা এইখানে থাকবার জন্যেই আসে নাই। বুঝলা ? যাইতাছে অন্য কোনোখানে। ভয়ের কিছু নাই। একটা পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়া যাও। একটা পতাকা আছে না ? বাঁশের আগায় বান্ধ।

আমি একলা যাব ? বলেন কী ?

একসঙ্গে বেশি মানুষ যাওয়া ঠিক না।

ঠিক-বেঠিক যাই হোক, আমি একা যাব না।

এই রকম করতাছ কেন মাস্টার, এরা বাঘও না—ভাল্লুকও না।

একা যাব না। আপনারা চলেন আমার সাথে।

বেলা প্রায় সাতটার দিকে ছজনের একটি ছোট্ট দলকে একটি পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে ইস্কুল ঘরের দিকে আগাতে দেখা গেল। রোগা আজিজ মাস্টার দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে ইস্কুল ঘরের কাছাকাছি এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, পাকিস্তান! দলের অন্য সবাই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বলল, জিন্দাবাদ!

কায়দে আযম!

জিন্দাবাদ!

লিয়াকত আলী খান!

জিন্দাবাদ!

মহাকবি ইকবাল!

জিন্দাবাদ!

৫

রোদ উঠে গেছে।

বৈশাখ মাস—অল্প সময়েই রোদ ঝাঁঝাল হয়ে ওঠে।

ছোট্ট দলটি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আজিজ মাস্টার, রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছে। তাদের মুখ রক্তশূন্য। তারা বুকের মাঝে একধরনের কাঁপুনি অনুভব করছে।

রাস্তার ওপাশে চার-পাঁচটা জারুল গাছ। গাছের নিচে গেলে ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া ঠিক হবে কি না আজিজ মাস্টার বুঝতে পারছে না। তারা জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্বনি দেয়। আড় চোখে মিলিটারিদের দিকে তাকায়। সরাসরি তাকাতে সাহসে কুলায় না। সমস্ত বারান্দাজুড়ে মিলিটারিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ বসে আছে। কেউ মাথার নিচে হ্যাভারস্যাক দিয়ে ঘুমের মতো পড়ে আছে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসা দলটির প্রতি তাদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টি সন্ন্যাসীদের মতো নির্লিপ্ত। যেন জগতের কোনো কিছুতেই তাদের কিছু আসে যায় না।

পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটি মতি মিয়ার হাতে। সে হাত উঁচু করে ফ্ল্যাগটি দোলাচ্ছিল—হাত ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু নামাবার সাহস হচ্ছে না। আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কয়েকবার কাশল। সেই শব্দে বারান্দায় বসা কয়েকজন তাকাল তার দিকে। আজিজ মাস্টার প্রাণপণে কাশি চাপতে চেষ্টা করল। সময়টা খারাপ। এরকম সময়ে কাউকে অযথা বিরক্ত করা ঠিক না। কিন্তু ক্রমাগত কাশি উঠছে। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল, উঠোনে চেয়ার পেতে যে অফিসারটি বসে আছেন তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

অত্যন্ত রূপবান একজন মানুষ। মিলিটারি পোশাকেও তাকে রাজপুত্রের মতো লাগছে। এর চোখেমুখে কোনো ক্লান্তি নেই। তবে বসে থাকার ভঙ্গিটি শ্রান্তির ভঙ্গি। তিনি তার সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। পায়ে খয়েরি রঙের মোজা। মানুষটি প্রকাণ্ড তবে সেই তুলনায় পায়ের পাতা দুটি ছোট।

তার কাছাকাছি যে রোগা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে বাঙালির মতো লাগছে। তার গায়ে চকচকে নীল রঙের একটা শার্ট। এই লোকটি খুব ঘামছে। ময়লা একটা রুমালে ক্রমাগত ঘাড় মুছছে। অফিসারটি মৃদুস্বরে কী যেন বলল নীল শার্ট পরা লোকটিকে। নীল শার্ট পরা লোকটি তীক্ষ্ণগলায় বলল, আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার সাহেব কে ?

আজিজ মাস্টারের বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগল।

কে আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার ?

মতি মিয়া আজিজ মাস্টারের পিঠে মৃদু ধাক্কা দিল। আজিজ মাস্টার কাশির বেগ থামাতে থামাতে বলল, জি আমি।

আপনি থাকেন। অন্য সবাইকে যেতে বলেন। যান ভাই, আপনারা সবাই যান। ভয়ের কিছুই নাই।

আজিজ মাস্টার একা দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে তারা চলেও গেল না। জুম্মাঘরের কাছে ছাতিম গাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাস্টার ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু পরিষ্কার হবে না।

মতি বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। সে জয়নাল মিয়ার সামনে বিড়ি খায় না। এই কথা তার মনে রইল না। সময়টা খারাপ। এই সময় কোনো কিছু মনে থাকে না। ছোট চৌধুরীও সিগারেট ধরালেন। তিনি সকাল থেকেই ঘামছেন।

মতি মিয়া বলল, ভয়ের কিছু নাই, কী কন ?

নাহ, ভয়ের কী ? এরা বাঘও না ভাল্লুকও না।

একেবারে খাঁটি কথা।

অন্যায় তো কিছু করি নাই। অন্যায় করলে একটা কথা আছিল।

একেবারে খাঁটি কথা। অতি লেহ্য কথা।

জয়নাল মিয়া উৎসাহিত বোধ করে। মতি বলল, নীলু চাচার বাড়িত যাই, চলেন। কথাটা তার খুব মনে ধরে। কিন্তু আজিজ মাস্টার ফিরে না আসা পর্যন্ত নড়তেও ইচ্ছে করে না। রোদ চড়তে শুরু করে। ছাতিম গাছের নিচে একটি-দুটি করে মানুষ জমতে শুরু করে। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

উত্তরবন্দে বোরো ধান পেকে আছে। কাটতে হবে। কিছু কিছু জমিতে পাট দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত নিড়ানির সময় এখন। দক্ষিণবন্দে আউশ বোনা হবে। কিন্তু আজ মনে হয় এ গ্রামের কেউ কোথাও যাবে না। আজকের দিনটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করবে। এ গ্রামে বহুদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি।

বদিকে দেখা গেল ফর্সা জামা গায়ে দিয়ে হনহন করে আসছে। তার বগলে ছাতা। ছাতিমগাছের নিচে একসঙ্গে এতগুলি মানুষ দেখে হকচকিয়ে গেল।

বিষয় কী ?

মতি মিয়া ঠান্ডা গলায় বলল, জানো না কিছু ?

কী জানুম ?

আরে মুসিবত! জান লইয়া টানাটানি আর কিছুই জানো না ?

বদি চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। জয়নাল মিয়া ঠান্ডা গলায় বলে, গেরামে মিলিটারি আইছে।

এইটা কী কন ? এইখানে মিলিটারি আইব ক্যান ?

স্কুলঘরে গিয়া নিজের চউক্ষে দেখো। আজিজ মাস্টাররে রাইখ্যা দিছে।

অ্যাঁ।

আজ মধুবনে গিয়া কাম নাই, বাড়িত যাও।

বদি রাস্তার ওপর বসে পড়ে। ফিসফিস করে বলে, কী সর্বনাশ! জয়নাল মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, সর্বনাশের কী আছে ? আমরা কী করলাম ? কিছু করছি আমরা ? বদি মুখ লম্বা করে বসে থাকে। একসময় মৃদুস্বরে বলে, মুসলমানের জন্যে ভয়ের কিছু নাই। এরা মুসলমানদের খুব খাতির করে। তবে পাক্কা মুসলমান হওয়া লাগে। চাইর কলমা জিজ্ঞেস করে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চার কলমা কারও জানা নেই। বদি উৎসাহিত হয়ে বলে, সুন্নত হইছে কিনা এটাও দেখে। কাপড় খুইল্লা দেখে।

তুমি জানলা ক্যামনে ?

নান্দাইল রোডে হুনছি। সুন্নত না থাকলেই দুম। গুল্লি।

কও কী তুমি ?

মিলিটারি মানুষ। রাগ বেশি। আমরার মতো না। রাগ উঠলেই দুম।

বদি আরেকটি বিড়ি ধরিয়ে দ্রুত টানতে থাকে। তার মধুবনে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। কে জানে হয়তো মধুবনেও মিলিটারি এসে দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল। মতি মিয়া বলল, যাও কই ? বদি তার উত্তর না দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করল। ইস্কুল ঘরকে পাশ কাটিরে যেতে হবে। হাঁটতে হবে অনেক পথ।

কড়া রোদ উঠেছে। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। বদি হনহন করে ছুটছে।

৬

রোগা নীল শার্ট পরা লোকটি বাঙালি।

সে আজিজ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, ইনি মেজর এজাজ আহমেদ, ইনারে সালাম দেন। আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো বলল, স্লামালিকুম। মেজর এজাজ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনার নাম কী ?

জি, আমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক।

সে ইট অ্যাগেইন।

আজিজ মাস্টার নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকাল। সে ঠান্ডা গলায় বলল, নামটা আরেক বার বলেন। স্পষ্ট করে বলেন। গলায় জোর নাই ? আজিজ মাস্টার বলল, আজিজুর রহমান মল্লিক।

আপনি বসুন।

কোথায় বসতে বলছে ? বসার দ্বিতীয় কোনো চেয়ার নেই। মাটিতে বসতে বলছে নাকি ? আজিজ মাস্টারের গলা শুকিয়ে গেল। রোগা লোকটি স্কুলঘর থেকে একটি চেয়ার নিয়ে এল। ঠান্ডা গলায় বলল, বসেন। স্যার বসতে বলেছেন, বসেন। আজিজ

মাস্টার সংকুচিত ভঙ্গিতে বসল। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বললেন না। সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, স্যার, ভালো আছেন ? রোগা লোকটি বলল, শুনেন ভাই, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। যা জিজ্ঞেস করবে শুধু তার জবাব দিবেন। ইনি লোক ভালো, ভয়ের কিছুই নাই। স্যার বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু ভালো বোঝেন।

জি আচ্ছা।

আপনার ভয়ের কিছু নাই। আরাম করে বসেন।

আজিজ মাস্টার আরাম করে বসার একটা ভঙ্গি করল। মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, স্যার দিচ্ছেন যখন, নেন। বললাম না ইনি লোক ভালো। আজিজ মাস্টার একটা সিগারেট নিল। কী আশ্চর্য! মেজর সাহেব নিজে সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। আজিজ মাস্টার তাঁর ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। অত্যন্ত শরিফ আদমি।

পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। মেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, আজিজ মাস্টার জবাব দিল বাংলায়। কিছু প্রশ্ন আজিজ মাস্টার বুঝতে পারল না। নীল শার্ট পরা লোকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল।

তোমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক ?

জি স্যার।

মল্লিক মানে কী ?

জানি না স্যার!

এই গ্রামে কতজন মানুষ ?

জানি না স্যার।

কতজন হিন্দু আছে ?

জানি না স্যার।

তুমি দেখি কিছুই জানো না।

স্যার, আমি বিদেশী মানুষ।

বিদেশী মানুষ মানে ? তুমি পাকিস্তানি না ?

জি স্যার।

তাহলে তুমি বিদেশী হলে কীভাবে ?

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আজিজ মাস্টারের মাথায় কোনো জবাব এল না।

তুমি, ইকবাল জিন্দাবাদ বলছিলে, ইকবাল কে ?

কবি স্যার। বড় কবি। মহাকবি।

তুমি তাঁর কবিতা পড়েছ ?

জি-না স্যার।

পড় নাই—চীন ও আরব হামারা, সারা যাঁহা হ্যায় হামারা ?

জি-না স্যার।

মেজর সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল, লোকটিকে দূর থেকে যত অল্প বয়স্ক মনে হচ্ছিল আসলে তার বয়স তত অল্প নয়। চোখের নিচে কালি। কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ। কত বয়স হতে পারে ? পঁয়ত্রিশের কম নয়। আজিজ মাস্টারের বয়স আটত্রিশ। এই লোকটি তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অথচ এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন কেঁচোর মতো লাগছে।

মেজর সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। পা থেকে মোজা জোড়া টেনে খুলে ফেললেন। আবার প্রশ্ন-উত্তর শুরু হলো।

এ গ্রামে কোনো দুষ্ট লোক আছে ?

জি-না, স্যার।

মুক্তিবাহিনী আছে ?

জি-না, স্যার।

তুমি ঠিক জানো ?

জি স্যার। এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি।

তোমার ধারণা, এই গ্রামে মুক্তিবাহিনী নেই ?

জি-না।

মেজর সাহেব মৃদু হাসলেন। কেন হাসলেন কে জানে। তিনি কি বিশ্বাস করছেন না ? আজিজ মাস্টার আবার বলল, মুক্তিবাহিনী নাই স্যার।

শেখ মুজিবের লোকজন আছে ?

জি-না স্যার।

তুমি জি-না স্যার ছাড়া অন্যকিছু বলছ না কেন ? তুমি কি ভয় পাচ্ছ ? ভয় পাচ্ছ তুমি ?

জি-না স্যার।

গুড। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার দিকে ভালো করে তাকাও। তাকাও ভালো করে।

আজিজ মাস্টার তাকাল। মেজর সাহেবের চোখ দুটি তার কাছে একটু নীলচে মনে হলো। বিড়াল-চোখ নাকি ?

আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি খারাপ লোক ?

জি-না স্যার।

কফি খাবে ?

আজিজ মাস্টার চোখ তুলে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, খেতে চাইলে বলেন, খাব। আমার দিকে তাকান কেন ? অভ্যাস না থাকলে বলেন, খাব না। ব্যস। বারবার আমার দিকে তাকাবেন না।

কী, কফি খাবে ?

জি-না স্যার।

না কেন, খাও কফি। তৈরি হচ্ছে। তুমি কি কফির সঙ্গে ক্রিম খাও ?

আজিজ মাস্টার না বুঝেই মাথা নাড়ল। কফি এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। অতি বিস্বাদ জিনিস। আজিজ মাস্টার চুক চুক করে কফি খেতে লাগল। কাপ নামিয়ে রাখার সাহস হলো না।

বুঝলে আজিজ, পাকিস্তানি মিলিটারির নামে আজগুবি সব গল্প ছড়ানো হচ্ছে। আমরা নাকি কোথায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দুটি মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মেরেছি। গল্পটা তোমার বিশ্বাস হয় ?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, আমরা কাঠুরে হলে সেটা করতাম। কিন্তু আমরা কাঠুরে নই, আমরা সৈনিক। আমরা গুলি করে মারব। ঠিক না ?

জি স্যার।

হিন্দুস্থান বেতারে এসব প্রচার চালাচ্ছে। এবং অনেকেই এসব শুনছে। ঠিক না ? বলো ঠিক বলছি কি না ?

জি স্যার, ঠিক।

আচ্ছা এ গ্রামে ট্রানজিস্টার আছে কার কার ? তোমার আছে ?

আজিজ মাস্টারের গলায় কফি আটকে গেল। তার আছে এবং সে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে।

কি, আছে ?

জি স্যার।

কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শোনো না।

মাঝে মাঝে শুনি স্যার।

শুনলেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না। ঠিক না ?

মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয়।

আজিজ!

জি স্যার।

তুমি একজন সৎলোক। অন্যকেউ হলে বলত বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা একেবারেই বলতে পার না। আচ্ছা, এখন বলো, আর কার ট্রানজিস্টার আছে ?

নীলু সেনের আছে। জয়নাল মিয়ার আছে।

ওরা কেমন লোক ?

ভালো লোক স্যার। নির্বিরোধী মানুষ। এই গ্রামে খারাপ মানুষ কেউ নাই।

তাই নাকি ?

জি স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও। ভয়ের কিছু নাই।

আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। তার মনে হলো মেজর সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আজিজ মাস্টারের কেন যেন মনে হলো এক্ষুনি তাকে আবার ডাকা হবে। সে এগোতে লাগল খুব সাবধানে। কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। প্রায় ত্রিশ গজের মতো যাওয়ার পর সে ভয়ে ভয়ে একবার পেছনে তাকাল—মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার সঙ্গের রোগা লোকটিও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। আজিজ মাস্টারের বুক ধক করে উঠল। কেন উঠল কে জানে। একবার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যায় না। আজিজ মাস্টার দ্বিতীয়বার বলল, স্লামালিকুম।

মেজর সাহেব তখন তাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, এই যে মাস্টার সাহেব! এদিকে আসেন ভাই। স্যার ডাকেন। আজিজ মাস্টার ফিরে এল। মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, শুনলাম তুমি কবিতা লেখ। আজিজ মাস্টার বেকুবের মতো তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

এখানকার মসজিদের যে ইমাম সাহেব আছে তার কাছে শুনলাম। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি কি সত্যি কবিতা লেখ ?

জি স্যার।

বেশ। একটা কবিতা শোনাও। কবিতা আমি পছন্দ করি। শোনাও একটা কবিতা।

আজিজ মাস্টার তাকাল নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে। সে শুকনো গলায় বলল, স্যার শোনাতে বলছেন, শোনান। চেয়ারে বসেন। বসে শোনান। ভয়ের কিছু নাই।

আজিজ মাস্টার হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, বলো, বলো, সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। লেটেস্ট কবিতাটি বলো।

আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো চার লাইন বলে গেল—

আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি সুন্দর চেয়ে থাকি তাই কল্পলোকের চোখে
ভালোবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে।

নীল শার্ট সেটি অনুবাদ করে দিল। মেজর সাহেব বললেন, এটিই তোমার লেটেস্ট ?

জি স্যার।

ভালো হয়েছে। বেশ ভালো। তা মেয়েটি কে ?

জি স্যার ?

কবিতার মেয়েটি কে ? ওর নাম কী ?

মালা।

মেয়েটি এখানেই থাকে ?

আজিজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, এইখানেই থাকে।

তোমার স্ত্রী নাকি ?

জি-না স্যার। আমি বিয়ে করিনি।

এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও ?

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল। বলে কী এই লোক!

কী বলো ? চুপ করে আছ কেন ? নাকি মেয়ের বাবা তোমার মতো বুড়োর কাছে বিয়ে দিতে চায় না ?

আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কাশতে লাগল। নীল শার্ট তীক্ষ্ণগলায় বলল, স্যারের কথার জবাব দেন। স্যার রেগে যাচ্ছেন।

মেজর সাহেব কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খুশিখুশি।

বলো, মেয়েটির বয়স কত ?

বয়স কম।

কত ?

তেরো-চৌদ্দ।

তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়েই তো ভালো। যত কম বয়স তত মজা।

আজিজ মাস্টার স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী বলছে এসব!

মেয়েটির সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক আছে ?

না।

মাথা নিচু করে আছ কেন ? মাথা তোল।

আজিজ মাস্টার মাথা তুলল।

মেয়েটির বুক কেমন আমাকে বলো। আমি শুনেছি বাঙালি মেয়েদের বুক খুব সুন্দর, কথাটা কি ঠিক ?

আমি জানি না।

জানো না! বলো কী ? তুমি এখনো কোনো মেয়ের বুক দেখোনি ?

আমি বিয়ে করিনি।

তাতে কী ?

আজিজ মাস্টারের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বমি বমি ভাব হলো। মেজর সাহেব হঠাৎ সুর পাল্টে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কার ? আই মিন ওর বাবার নাম কী ? আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, শুধু শুধু দেরি করছ, বলে ফেল। নীল শার্ট বলল, কেন শুধু শুধু রাগাচ্ছেন ? বলে দেন না।

জয়নাল মিয়ার মেয়ে। উনার বড় মেয়ে।

যার বাড়িতে ট্রানজিস্টার আছে ?

আজিজ মাস্টার বেশ অবাক হলো। এই লোকটির স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। মনে রেখেছে।

তুমি এখন আর আগের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছ না। প্রতিটি প্রশ্ন দুবার করে করতে হচ্ছে। কারণ কী ?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ ? বলো রাগ করেছ ?

না।

এখন তুমি আর স্যার বলছ না কেন ? নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

জি-না স্যার।

মেজর সাহেব অনেকখানি ঝুঁকে এলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। গলার স্বর নিচে নামিয়ে বললেন, শোনো, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ রাতে সম্ভব হবে না। আজ রাতে আমরা ব্যস্ত। কাল ভোরে। কী, তুমি খুশি তো ?

আজিজ মাস্টার তাকিয়ে রইল।

কী, কথা বলছ না যে ? বলো, শুকরিয়া।

শুকরিয়া!

আমি কথার খেলাফ করি না। যা বলেছি তা করব। এখন তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।

মেজর সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। নিজে একটি ধরালেন। তাঁর চোখে এখন আর হাসি ঝিকমিক করছে না।

তোমাদের এই জঙ্গলা মাঠে কী আছে ?

কিছু নাই। জঙ্গল।

আমরা জানি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু জোয়ান এবং কয়েকজন অফিসার এখানে লুকিয়ে আছে।

আজিজ মাস্টারের চোখ বড় হয়ে গেল।

ওরা আমাদের দুজন অফিসারকেও নিয়ে গেছে। একজন হচ্ছে আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার। ফুটবল প্লেয়ার।

আমি কিছুই জানি না স্যার।

কিছুই জানো না ?

জি-না স্যার।

আমি যতদূর জানি, এ গ্রাম থেকেই তো ওদের খাবার যাচ্ছে।

আমি স্যার কিছুই জানি না।

আমি ভাবছিলাম জানো।

জানি না স্যার।

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে আজিজ মাস্টারের। সে ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার আমি যাই ?

মেজর সাহেব চোখ না খুলেই বললেন, সেটা কি ঠিক হবে ? আমরা ওদের ধরতে এসেছি। এখন তোমাকে যেতে দিলে খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পারে না ?

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল।

তুমি ঐ ঘরে আজ রাতটা কাটাও। আমরা অপারেশন শুরু করব বিকেলের দিকে। আরেকটি বড় কম্পানি আসবে আমাকে সাহায্য করতে। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।

আজিজ মাস্টারের হাঁপানির টান উঠে গেল। টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, তোমাকে অনেক গোপন খবর দিয়ে দিলাম। তবে অসুবিধা নেই, তুমি বন্ধু মানুষ, যাও, ঐ ঘরে চলে যাও।

স্যার, আমি কিছুই জানি না।

জানো না সে তো আগেই বলেছ। সবাই কি আর সবকিছু জানে ? জানে না। যাও, ঐ ঘরে গিয়ে বসে থাক।

রোদ থেকে এসেছে বলেই কি না কে জানে এই পরিচিত ঘরও আজিজ মাস্টারের কাছে অচেনা লাগতে লাগল। অথচ এটা টিচার্স রুম। আজিজ মাস্টার রোজ এখানে বসে।

মাস্টার সাব!

কে ?

আজিজ মাস্টার অবাক হয়ে দেখল একটা চেয়ারে ইমাম সাহেব জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন। ইমাম সাহেবের নাক-মুখ ফুলে গেছে। নিচের ঠোঁটটি কেটে গেছে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের ছোপ। কাটা ঠোঁট দিয়ে হলুদ রঙের রস বেরুচ্ছে। আজিজ মাস্টার দীর্ঘ সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। এবং নিজের অজান্তেই এক সময় তার প্রস্রাব হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। মেঝেতে প্রস্রাব গড়াচ্ছে। তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না।

৭

দিনের বেলা মীর আলির কাজ হচ্ছে পরীবানুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা। পরীবানুর বয়স তিন। দাদাকে সে খুবই পছন্দ করে। মীর আলিও জগতের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। মীর আলির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সে পরীবানুর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

আজ ভোরবেলাও সে নাতনিকে কোলে নিয়ে মুড়ি খেতে বসেছিল। দাঁত না থাকায় মুড়ি চিবোতে পারে না। একগাল মুড়ি নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। ঘরে আম আছে। একটা পাকা আমের রস, মুড়ির বাটিতে ঢেলে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। অনুফা সেটা করবে না। বদি বাড়িতে না থাকলে সে তার শ্বশুরের খাওয়াদাওয়ার দিকে তেমন নজর দেয় না।

আজ তার চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ঘরে চায়ের পাতা আছে, গুড় আছে। বদি এনে রেখেছে। তার বাবার জন্যেই এনেছে। তিনি নিজের কানে শুনেছেন, বদি বলছে— বাজানরে মাঝে মধ্যে দিও। বুড়া মানুষ। চায়ে কাশির আরাম হয়।

মীর আলি প্রতিদিন ভোরেই বেশ সাড়ম্বরে খানিকক্ষণ কাশে, যাতে অনুফার চায়ের কথাটা মনে পড়ে। বেশির ভাগ দিনই তার মনে পড়ে না। আজও হয়তো পড়বে না। তবু সে কাশতে লাগল। কাশতে কাশতেই পরীবানুকে বলল, চা হইল সর্দি কাশের বড় ওষুধ। বুঝছস পরী ?

পরী উত্তর দিল না।

বড় জামবাটির এক বাটি চা যদি সকালে খায় কেউ, তা হইলে সর্দি কাশি, বাত সব যায়। চা-টা খুব বড় ওষুধ।

মীর আলির জন্যে আজ দিনটি সম্ভবত খুব শুভ। কারণ অনুফা তাকে এক বাটি চা এনে দিল। সেই চায়ে তেজপাতা দেওয়ায় বেশ সুন্দর একটা গন্ধ। অভিভূত হয়ে পড়ল মীর আলি।

মিষ্টি হইছে কি না দেখেন।

হইছে গো বেটি, হইছে। জবর বালা হইছে।

অনুফাকে দু-একটা সুন্দর সুন্দর কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কী বললে সে খুশি হয় তা মীর আলির জানা নেই।

মুড়ি চায়ের মইধ্যে ভিজাইয়া চামুচ দিয়া খান। চামুচ দিতাছি।

মীর আলি অনুফার প্রতি বড় মমতা বোধ করল। সংসারের আয়-উন্নতি যা হচ্ছে এই মেয়েটির কারণেই হচ্ছে। ঘরে এখন চামুচ আছে। নতুন সাইকেল আছে। গত বৎসর বদি তাকে লেপ বানিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে গত শীত কোন দিকে গিয়েছে বুঝতেই পারা যায়নি। অথচ বদিকে বিয়ে করানোর আগে কী হাল ছিল সংসারের! সব ভাগ্য! একেকজনের একেকরকম ভাগ্য। অনুফা এ সংসারে ভাগ্য নিয়ে এসেছে। মীর আলি ভাবতে চেষ্টা করল, অনুফা এ বাড়িতে আসার পর তারা কি কখনো একবেলা না খেয়ে থেকেছে? না। নীলগঞ্জে এরকম ভাগ্য কয়জনের আছে? অথচ কত ঝামেলা বদির বিয়েতে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। বদির মামা বলল, এই মেয়ের মা নাই। জামাইয়ের কোনো আদর হইত না। কথা খুবই সত্য। কিন্তু বিয়ের কথা ঠিকঠাক হওয়ার পর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটা ঠিক না। মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে সে ছেলে নিয়ে গেল। কী ঝড় বিয়ের রাত্রে! লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দুপুররাতে ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল, ঝড়ে গ্রামে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু তার ঘরটি পড়ে গেছে। কী অলক্ষণ!

দাদা চা দেও।

পুলাপান মাইনষের চা খাওন নাই।

চা দেও দাদা।

মীর আলি হাঁক দিল—বৌমা, আরেকটা বাটি দেও। এই সময় এক ঝাঁক গুলি হলো। হালকা মেশিনগানের কানে তালা-ধরানো ক্যাট ক্যাট শব্দ। পরীবানু আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। মীর আলি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চায়ের বাটি উল্টে ফেলল পরীবানুর পায়ে।

নীলগঞ্জ গ্রামে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় একটা সৈন্যদল এসে ঢুকল। তারা ঢুকল মার্চ করে। গর্বিত ভঙ্গিতে। তাদের সঙ্গে আছে চল্লিশজন রাজাকারের একটি দল। তালে তালে পা ফেলবার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তারা। দলটি অনেক দূর থেকে আসছে। এদের চোখেমুখে ক্লান্তি। হয়তো সারা রাত ধরেই হাঁটছে। কোথাও বিশ্রাম করেনি।

বদিউজ্জামান হনহন করে হাঁটছিল। হাঁটা না বলে একে দৌড়ানো বলাই ঠিক হবে। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। দ্রুত হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তার একমাত্র চেষ্টা কত তাড়াতাড়ি মধুবন বাজারে গিয়ে পৌঁছানো যায়। মাঝামাঝি পথে

সে মত বদলাল—ফিরে চলল নীলগঞ্জের দিকে। যা হওয়ার হোক, এই সময় বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া ঠিক না। জঙ্গলা মাঠের কাছাকাছি আসতেই সে দ্বিতীয় মিলিটারি দলটিকে দেখতে পেল। ওরা আসছে উত্তরদিক থেকে। বদিউজ্জামান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গলা মাঠের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচু একটা গর্তে। সেখানে এক-কোমর পানি। তাকে কেউ সম্ভবত দেখতে পায়নি। বদিউজ্জামান এক-কোমর পানিতে ঘণ্টাখানেক বসে রইল। মিলিটারিদের এই সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এরা যাচ্ছে না কেন ? কিছুক্ষণ পর খুব কাছেই ওদের কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। এর মানে কী ?

বদিউজ্জামান মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল। চোখের ভুল কি না কে জানে। তার মনে হলো, মিলিটারিরা জঙ্গলা মাঠ ঘিরে বসে আছে। বদিউজ্জামান গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে একটা মোরতা ঝোপের আড়ালে মাথা ঢেকে রাখল। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু পানি বেশ ঠান্ডা। বদিউজ্জামানের শীত শীত করতে লাগল। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে ? গা কুট কুট করছে। সবুজ রঙের একটা গিরগিটি চোখ বড় বড় করে তাকে দেখছে। বদিউজ্জামান হাত ইশারা করে তাকে সরে যেতে বলল। রোদ বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। পচা গন্ধ আসছে পানি থেকে। পাট পচানোর গন্ধের মতো গন্ধ। গিরগিটিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। বদিউজ্জামান মৃদুস্বরে বলল, যা হোস। আর তখনই নীলগঞ্জের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ আসতে লাগল। কী ব্যাপার ?

জয়নাল মিয়া তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ সময় ছাতিম গাছের নিচে অপেক্ষা করল—আজিজ মাস্টার ফিরে এল না। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায় ? রাসমোহন কয়েকবার বাঁশ ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। আজিজ মাস্টার চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সে এসে বলল, আজিজ মাস্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এর মানেটা কী ? জয়নাল মিয়া বলল, বিষয়ডা কী রাসমোহন ? রাসমোহন শুকনো মুখে বসে রইল।

মাইরা ফেলছে না কি ?

মারলে গুলির শব্দ হইত। গুলি তো হয় নাই।

তাও ঠিক।

জয়নাল মিয়া মতি মিয়ার কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরাল। তার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আর তখন মতি মিয়ার পাগল শালা নিজামকে আসতে দেখা গেল। তার মুখ হাসিহাসি। পাগলামির অন্য কোনো লক্ষণ নেই। মতি মিয়া ধমকে উঠল, কই গেছিলা ?

নিজামের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হলো। সে হাত নেড়ে নেড়ে বলল, ইস্কুল ঘরের পিছনের দিক দিয়া আইতেছিলাম, একটা মজার জিনিস দেখলাম দুলাভাই।

কী দেখলা ?

দেখলাম দুইটা মিলিটারি হাগতে বসছে। লজ্জাশরম নাই। হাগে আর কথা কয়। আবার হাগে, আবার কথা কয়।

নিজাম হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। ঠিক তখন গুলি ছুড়তে ছুড়তে মিলিটারি ও রাজাকারের দ্বিতীয় দলটি গ্রামে উঠে এল। জয়নাল মিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল দক্ষিণ দিকে। বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। নিজাম শুধু মুখটা হাসিহাসি করে দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে বড় মজা পাচ্ছে।

৮

ইমাম সাহেব এক সময় বললেন, দোয়া ইউনুসটা দমে দমে পড়েন মাস্টার সাব। আজিজ মাস্টার তাকাল তাঁর দিকে, তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। গত তিন ঘণ্টা যাবৎ এই দুটি মানুষ একসঙ্গে আছে। এই তিন ঘণ্টায় তাদের কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি। আজিজ মাস্টার তার পায়জামা ভিজিয়ে ফেলার পর থেকেই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছে না।

হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে এই দোয়া পড়তেন। এর মরতবাই অন্য। দোয়াটা জানেন ?

আজিজ মাস্টার মাথা নাড়ল। সে জানে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মনে হলো সে কিছুই পড়ছে-টড়ছে না। বসে আছে নির্বোধের মতো।

মাস্টার সাব!

জি।

আমাদের সামনে খুব বড় বিপদ।

কেন ?

বুঝতে পারতেছেন না ?

না।

এরা কী জন্যে আসছে সেটা বলেছে ?

হুঁ।

তবু বুঝতে পারতেছেন না ?

না।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। আজিজ মাস্টার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এখান থেকে সৈন্যদলের একটা অংশ দেখা যায়। কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, কাগজের একটা বল বানিয়ে ছুড়ে ছুড়ে মারছে। এবং ক্রমাগত হাসছে। কাগজের একটা বল ছুড়ে মারার মধ্যে এত আনন্দের কী আছে কে জানে ?

স্কুলঘরটি টিনের। রোদে টিন তেতে উঠেছে। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আজিজ মাস্টারের পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও বোধ হচ্ছে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধা হওয়ারই কথা। অন্য সময় এত দেরি হলে মালা খোঁজ নিত— মামা, ভাত বাড়ছে, আসেন। বলেই সে চলে যেত না। দরজা ধরে এঁকেবেঁকে দাঁড়াত। যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

গতবার ময়মনসিংহ থেকে মালার জন্যে একটা আয়না কিনেছিল আজিজ মাস্টার। খুব বাহারি জিনিস। দুটো আয়না পাশাপাশি। একটি সাধারণ আয়না, অন্যটি অন্যরকম। সেটায় মুখ অনেক বড় দেখা যায়।

আয়নাটা দেওয়া ঠিক হবে কি না তা নিয়ে আজিজ মাস্টার প্রায় এক সপ্তাহ ভাবল। কেউ কিছু মনে করে বসতে পারে। তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

কেউ কিছু মনে করল না। মালা অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা আয়নায় মুখ বড় দেখায় কেন এই প্রশ্ন কয়েকবার করা হলো। এমনকি মালার মা একদিন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, মুখ বড় দেখালে কী লাভ ? আজিজ মাস্টার লাজুক স্বরে বলেছিল, সাজগোজের সুবিধা হয় ভাবি।

কী সুবিধা ?

কী সুবিধা সেটি আর ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কারণ এটা আজিজ মাস্টারেরও জানা ছিল না।

ইমাম সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

মাস্টার সাব!

বলেন।

জোহর নামাজের ওয়াক্ত হইছে না ?

জানি না।

নামাজটা পড়া দরকার। বের হয়ে ওদের কাছে পানি চাব ? অজু নাই আমার।

দেখেন আপনি চিন্তা করে।

আপনি তো আর নামাজ পড়তে পারবেন না। শরীর নাপাক। গোসল লাগবে। পেশাব করে দিয়েছেন তো।

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। ইজি চেয়ারটিতে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে পড়ে রইল। ইজি চেয়ারটি নীলু সেনের। শুয়ে থাকতে বড় আরাম।

মাস্টার সাব। পানি চাইব নাকি বলেন ?

আপনার ইচ্ছা হলে চান।

এর মধ্যে তো দোষের কিছু নেই। এরাও মুসলমান।

হুঁ।

নামাজের পানি চাইলে এরা খুশিই হবে। পাক্কা মুসলমানদের এরা খুব পেয়ার করে। এরাও তো সাচ্চা মুসলমান।

যান না। গিয়ে চান।

ভয় লাগে।

ভয়ের কী আছে ?

ইমাম সাহেব নড়েন না। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারেই বসে থাকেন। চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে থাকতে আজিজ মাস্টারের ঝিমুনি আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে। এর মধ্যেই ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারে এগুলি স্বপ্ন। তবু তার ভালোই লাগে।

ইমাম সাহেব বিরক্তমুখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। এ কেমন মানুষ—ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি মৃদুস্বরে ডাকেন, এই যে মাস্টার সাব! এই! আজিজ মাস্টার নড়েচড়ে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

নীলু সেন গত রাতে এক পলকের জন্যেও ঘুমুতে পারেনি। দোতলার যে-ঘরটিতে তার বিছানা সে-ঘরের বারান্দায় গড়াগড়ি করেছে। নীলু সেনের বোন-পো বলাই চোখ বড় বড় করে মামার অবস্থা দেখেছে। রাত দুটোর দিকে বলাই ঠিক করল, মামার জন্যে ডাক্তার আনতে সরাইল বাজারে যাবে। পথঘাট এখন শুকনো। বদিউজ্জামানের সাইকেল নিয়ে যাওয়া যাবে। নীলু সেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এতক্ষণ বাঁচব না রে বলাই। এতক্ষণ বাঁচব না। বলাইয়েরও তাই ধারণা হলো। এত কষ্ট সহ্য করে কেউ দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

ব্যথাটা কোথায় ?

তলপেটে।

বলাই দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় পেল না। নীলু সেনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে লাগল। সময় শেষ হয়েছে বোধহয়। এতবড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। বলাইয়ের ভয় করতে লাগল। কী সর্বনাশ! এ কী বিপদ!

মামা, গ্রামের দুই একজন মানুষরে ডাক দিয়া আনি ?

তুই নড়িস না। আমার সময় শেষ।

বলাই মামার হাত ধরে বসে রইল। তার কাছে মনে হলো, মামার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বলাই ঘামতে লাগল।

কিন্তু শেষরাত্রে হঠাৎ ব্যথা কমে গেল। নীলু সেন শান্তস্বরে বলল, ব্যথা নাই। বলাই, ঠান্ডা পানি দে এক গ্লাস।

বলাই পানি এনে দেখে মামা মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম! বড় মায়া লাগে দেখে।

গ্রামে মিলিটারি আসার এতবড় একটা খবরেও বলাই তার ঘুম ভাঙাল না। আহা, বেচারা ঘুমাক!

নীলু সেনের ঘুম ভাঙাল মিলিটারিরা। ডাকাডাকি, হইচই শুনে নীলু সেন দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করল। কী ব্যাপার ? নীলশার্ট পরা একটি লোক বলল, আপনার নাম কি নীলু ? নীলু সেন ?

জে আজ্ঞে।

আপনার বাড়িতে আর কে আছে ?

বলাই। আমার বোন-পো বলাই। আপনারা কে ?

বলাইকে নিয়ে নিচে নেমে আসেন।

নীলু সেন বলাইকে কোথাও খুঁজে পেল না। গায়ে একটা পাতলা সুজনী চড়িয়ে নিচে নেমে এল। ভারী দরজা খুলতে সময় লাগল। বাইরে থেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে কে যেন বলল, এত সময় লাগছে কেন ?

নীলু সেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তার ঘুমের ঘোরেও বোধহয় ভালোমতো কাটেনি। সে দরজা খুলে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আদাব।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই চার-পাঁচটা গুলির শব্দ হলো। নীলু সেন কাত হয়ে পড়ে গেল দরজার পাশে। কোনো চিৎকার না। নিঃশব্দ মৃত্যু। নীল শার্ট পরা লোকটি ডাকল, বলাই! বলাই।

৯

বদিউজ্জামান মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। তার মনে হলো পায়ে আর কোনো বোধশক্তি নেই। মাথা কেমন যেন করছে। গিরগিটিটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর চোখ দুটি মানুষের মতো। মনে হয় হাসছে। বুড়ো মানুষের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে হাসা। সে হাত ইশারা করে গিরগিটিটাকে বিদেয় করতে চাইল। কিন্তু সে যাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা, মিলিটারিদের সম্পর্কে যেসব গল্প শোনা যায় সেগুলি সত্যি ? শুধু শুধু এরা মানুষ মারবে কেন ? এরা নাকি নতুন কোনো জায়গায় গেলেই প্রথম ধাক্কায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মানুষ মেরে ফেলে ভয় দেখাবার জন্যে ? এটা একটা কথা হলো ? সব গুজব। এরাও তো আল্লাহর বান্দা। মিলিটারি মানুষ, রক্ত একটু গরম এই আর কী। এটা তো দোষের কিছু না। পোশাকটাই এরকম। গায়ে দিলে রক্ত গরম হয়ে যায়।

বদিউজ্জামান খুকখুক করে দুবার কাশল। নিজের কাশির শব্দে নিজেই চমকে উঠল। কেমন বেকুবের মতো কাণ্ড করছে। নির্জন জায়গা। অল্প শব্দ হলেই অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আবার কাশি আসছে। বদিউজ্জামান কাশি সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘড়ঘড় একটা শব্দ বের করল। গিরগিটিটা ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে। না

যাচ্ছে না। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। পানি খেতে এসেছে বোধহয়। তাকে দেখে পানি খাবার সাহস হচ্ছে না। আবার তৃষ্ণা নিয়ে চলেও যেতে পারছে না।

বদির আবার তৃষ্ণা বোধ হলো। সে মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল।

১০

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, আপনারা দুজন আসেন আমার সঙ্গে। আজিজ মাস্টার তাকাল ইমাম সাহেবের দিকে। ইমাম সাহেব ভীতস্বরে বললেন, কোথায় ? নীল শার্ট পরা লোকটির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাকে কোনো প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করার সাহস হয় না। তবু ইমাম সাহেব দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ?

বিলের কাছে।

কেন ?

মেজর সাহেব নিয়ে যেতে বলেছেন।

কী জন্যে ?

এত কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। আপনারা ওঠেন। মেজর সাহেব অপেক্ষা করছেন।

বড় ভয় লাগতেছে ভাই।

ভয়ের কিছু নাই, আসেন।

আজিজ মাস্টার একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। সবার শেষে বেরুলেন ইমাম সাহেব। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

স্কুলঘরের বারান্দায় কেউ নেই। ধুধু করছে চারদিক। বসে থাকা সেপাইরা কখন গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে কে জানে। ঘরের ভেতরে বসে কিছুই বোঝা যায়নি। হয়তো কোনো পাহারা-টাহারা ছিল না। ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যাওয়া যেত। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এরা সব কোথায় গেল ?

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, বেশি কথা বলবেন না। আপনারা মৌলভি মুসল্লিরা বেশি কথা বলেন আর ঝামেলার সৃষ্টি করেন। কম কথা বলবেন।

জি আচ্ছা।

ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক পর্যন্ত তারা এগোল নিঃশব্দে। জুম্মাঘরের পাশে আট-নজন সেপাইয়ের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ইমাম সাহেবের ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, ভাই, আপনার নাম কী ?

রফিক।

রফিক সাহেব, আমার জোহরের নামাজ ক্বাজা হয়ে গেছে। পানির অভাবে অজু করতে পারি নাই।

রফিক তার কোনো জবাব দিল না। আগে আগে হাঁটতে লাগল। কোথাও কোনো মানুষজন নেই। গ্রামের সবাই কি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে নাকি? ইমাম সাহেব বললেন, ভাই, আপনার দেশ কোথায়? বাড়ি কোন জিলায়?

বাড়ি দিয়ে কী করবেন?

না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমার দেশ কুমিল্লা। নবীনগর।

ভালো।

সামনের মাসে ইনশাল্লাহ দেশে যাব। বহুত দিন যাই না।

রফিক কিছুই বলল না। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। এমনভাবে হাঁটছে যেন পথঘাট ভালো চেনা। কিন্তু এ লোকটি এই গ্রামে আগে কখনো আসেনি। আজিজ মাস্টার বলল, মেজর সাহেব কেন ডেকেছেন আপনি জানেন?

জানি।

জানলে আমাদের বলেন।

রফিক নিস্পৃহ স্বরে বলল, একটা অপরাধীর বিচার হবে। ওর নাম মনা। সে খুন করেছে। সেই খুন নিয়ে কোনো থানা-পুলিশ হয়নি। এক বুড়ি নালিশ করেছে মেজর সাহেবের কাছে। ঐ বুড়ির নাম চিত্রা বুড়ি।

ইমাম সাহেব বললেন, চিত্রা বুড়ি! খুব বজ্জাত। মসজিদের একটা বদনা চুরি করেছে।

বদনা চুরি করুক আর না করুক, মেজর সাহেব তার কথা শুনে খুব রাগ করেছেন। মনাকে ধরা হয়েছে। কঠিন শাস্তি হবে।

আজিজ মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, কী শাস্তি?

মিলিটারিদের তো আর জেল-হাজত নাই যে জেলে ঢুকিয়ে দেবে! ওদের শাস্তি একটাই। ছোট অপরাধের জন্যে যে শাস্তি, বড় অপরাধের জন্যেও সেই শাস্তি।

কী সেটা?

বুঝতেই তো পারছেন। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ইমাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, আমরা গিয়ে কী করব?

আপনারা শাস্তি দেখবেন।

শাস্তি দেখব?

হ্যাঁ। এর দরকার আছে।

কী দরকার?

মেজর সাহেবের ধারণা, এটা দেখার পর আপনারা তার কথা শুনবেন। কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি জবাব দেবেন।

ও।

শুনেন ইমাম সাহেব, আপনি কথা বেশি বলেন। কথা বেশি বলে একবার মার খেয়েছেন। কথা খুব কম বলবেন।

জি আচ্ছা।

নিজের থেকে কোনো কথা বলবেন না। এখন সময় খারাপ।

জি, তা ঠিক।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন।

মীর আলি বাড়ির উঠোনে বসে ছিল। আজ বাড়িতে রান্না হয়নি। খিদের যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। এই বয়সে খিদে সহ্য হয় না। অনুফাকে কয়েকবার ভাতের কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু অনুফা কিছুই করছে না। সে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভাত রাঁধায় তার মন নেই। ভয় মীর আলিরও লাগছে। কিন্তু খিদের কষ্ট বড় কষ্ট।

আজিজ মাস্টাররা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে একথালা মুড়ি নিয়ে বসেছিল। এই বয়সে মুড়ি চিবোতে কষ্ট হয়, তবু চিবোতে হয়। যা ভাবসাব তাতে মনে হচ্ছে, আজ আর রান্না হবে না। পায়ের শব্দে মীর আলি চমকে উঠে বলল, কেডা যায় ?

আমি আজিজ। আজিজ মাস্টার।

তোমার সঙ্গে কেডা যায় ?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

কথা কও না যে, ও মাস্টার ? মাস্টার!

রফিক বলল, দাঁড়াবেন না, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ও মাস্টার, কে কথা কয় ?

রফিক শীতল স্বরে বলল, আমার নাম রফিক। চাচা মিয়া, আপনি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসেন।

মাস্টার, এই লোকটা কে ? মিলিটারি ?

না। আমি মিলিটারি না।

আপনার বাড়ি কোন গ্রাম ?

রফিক তার জবাব দিল না। হাঁটতে শুরু করল। ইমাম সাহেব তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছেন না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। তাঁর জন্যে দুজনকেই মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হচ্ছে। রফিক বলল, হাঁটতে কষ্ট হলে আমার হাত ধরে হাঁটেন।

জি-না। কোনো কষ্ট নাই।

লজ্জার কিছু নাই। আমার হাত ধরে হাঁটেন।

শুকরিয়া! ভাই আপনার বয়স কত ?

আমার বয়স দিয়ে কী করবেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

আপনাকে তো বলেছি বিনা প্রয়োজনে কথা বলবেন না।

জি আচ্ছা।

আমার বয়স তিরিশ।

রফিককে দেখে বয়স আরও বেশি মনে হয়। রোগা এবং লম্বা। ছোট ছোট চোখ। কথা বললে চোখ আরও ছোট হয়ে যায়। মনে হয় লোকটি যেন চোখ বন্ধ করে কথা বলছে।

ইমাম সাহেব দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজুয়ালেমিন।

মনা কৈবর্ত তার এগারো বছরের ভাইকে নিয়ে তেঁতুল গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে। মনার শরীর বিশাল, প্রায় দৈত্যের মতো। তার ভাইটি অসম্ভব রোগা। সে মনার লুঙ্গির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে আছে। তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনাকে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না।

মেজর সাহেব প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তার সঙ্গে একজন নন কমিশন্ড অফিসার। এরা দুজন নিচুগলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। মেজর সাহেব সম্ভবত কোনো রসিকতা করলেন। দুজনেই উঁচুগলায় হাসতে শুরু করলেন। মনার ভাইটি চোখ বড় বড় করে তাকাল তাদের দিকে। বিলের পাড়ের উঁচু জায়গায় একদল রাজাকার দাঁড়িয়ে। খুব কাছেই মিলিটারি আছে বলেই হয়তো তারা বুক ফুলিয়ে আছে। অহঙ্কারী গর্বিত ভঙ্গি। এদের মধ্যে শুধু দুজনের পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। বাকি কারও পায়ে কিছু নেই। এরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলছে। তবে এদের মুখ শুকনো। ভয়-পাওয়া চোখ।

মেজর সাহেব এগিয়ে এলেন মনার দিকে। মনার ছোট ভাইটি শক্ত হয়ে গেল। মনার সঙ্গে মেজর সাহেবের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। কথাবার্তা হলো রফিকের মাধ্যমে। আজিজ মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তারা বসে রইল বিলের পাড়ে। প্রশ্নোত্তর শুরু হলো।

তুমি একটি খুন করেছ ?

মনা জবাব দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

চুপ করে থাকবে না। স্পষ্ট জবাব দাও। বলো, হ্যাঁ কিংবা না।

হ্যাঁ।

গুড। স্পষ্ট জবাব আমি পছন্দ করি। এখন বলো—কেন করেছ ? বিনা কারণে তো কেউ মানুষ মারে না।

হে আমার পরিবারের সঙ্গে খারাপ কাম করছে।

তাই নাকি ?

জে আজ্ঞে।

উত্তেজিত হওয়ার মতোই একটি ব্যাপার। তোমার স্ত্রীকে কি শাস্তি দিয়েছ ?

মনা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না। প্রশ্নের ধারা সে বুঝতে পারছে না।

বলো বলো। কুইক। সময় বেশি নেই আমার।

মনা ঘামতে শুরু করেছে।

আমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো শাস্তি দাওনি।

জি-না।

সে নিশ্চয়ই খুব রূপবতী ?

মনা চোখ তুলে তাকাল। কিছুই বলল না।

বলো। চট করে বলো। সে কি রূপবতী ?

জি।

তাহলে অবশ্য শাস্তি না দিয়ে ভালোই করেছ। একটি সুন্দরী নারীকে শাস্তি দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তোমার স্ত্রীর নাম কী ?

মনার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। মেজর সাহেবের কথাবার্তা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

বলো, তোমার স্ত্রীর নাম বলো।

মনা কিছুই বলল না। রফিক বলল, গ্রামের মানুষরা অপরিচিত মানুষের কাছে স্ত্রীর নাম বলে না।

কেন বলে না ?

আমি জানি না, স্যার।

তুমি তো অনেক কিছুই জানো। এটা জানো না ?

আমি অনেক কিছু জানি না।

মেজর সাহেব মনার দিকে আরও কয়েক পা এগুলেন। আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, এই ছেলেটি কী হয় তোমার ?

এ আমার ছোট ভাই।

ওর নাম কী ?

বিরু।

মেজর সাহেব তাকালেন বিরুর দিকে। বিরু কুঁকড়ে গেল। মেজর সাহেব শান্তস্বরে বললেন, বিরু, তুমি লুঙ্গি ধরে টানাটানি করছ কেন ? লুঙ্গি ছেড়ে দাও।

বিরু লুঙ্গি ছেড়ে দিল না। আরও ঘেঁসে গেল ভাইয়ের দিকে। তার চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। শিশুরা অনেক কিছু আগেই বুঝতে পারে। সেও হয়তো পারছে।

মনা।

জি।

তুমি বড় একটা অন্যায় করেছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শাস্তি হবে। তোমার কি কিছু বলার আছে ?

মনা তাকিয়ে রইল। তার চোখে পলক পড়ছে না। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। অস্থির ভঙ্গিতে দৃঢ়স্বরে বললেন, এই দুজনকে পানিতে দাঁড় করিয়ে দাও। রফিক ইংরেজিতে বলল, এই বাচ্চাটিকেও ?

হ্যাঁ।

স্যার, এর কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

প্রয়োজন আছে। এর প্রয়োজন আছে। আমি নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চাই।

স্যার, তার কোনো প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন আছে। আজ এই ঘটনাটি ঘটবার পর মিলিটারির নাম শুনলে ওরা কাপড় নষ্ট করে দেবে। গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে।

তাতে কী লাভ স্যার ?

লাভ-লোকসান আমার দেখার কথা, তোমার না। আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, এসব কথা পরবর্তী সময়ে কেউ মনে রাখবে না। অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজান্ডারের নৃশংসতার কথা কি কেউ জানে ? সবাই জানে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট।

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব সহজ সুরে বললেন, যা করতে বলা হয়েছে, করো। আর শোনো, ঐ ইমাম এবং ঐ মাস্টার—ওদের দুজনকে খুব কাছাকাছি কোথাও বসিয়ে দাও। আমি চাই যাতে ওরা খুব ভালোভাবে দৃশ্যটা দেখে।

ঠিক আছে, স্যার।

বাই দা ওয়ে, আমি দেখলাম, ঐ ইমাম তোমার হাত ধরে ধরে আসছে ? কী ব্যাপার ?

হাঁটতে পারছিল না।

ঠিকই পারবে। দৃশ্যটি তাদের দেখতে দাও। তারপর ওদের হাঁটতে বললে হাঁটবে, দৌড়াতে বললে দৌড়াবে। লাফাতে বললে লাফাবে। ঠিক নয় কি ?

হয়তো ঠিক।

হয়তো বলছ কেন ? তোমার সন্দেহ আছে ?

জি-না, স্যার।

গুড। সন্দেহ থাকা উচিত নয়। রফিক!

জি স্যার।

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরুব। গ্রামটি ভালোমতো ঘুরে দেখতে চাই।

ঠিক আছে স্যার।

মনে হয় দেখার মতো ইন্টারেস্টিং অনেক কিছুই আছে এ গ্রামে।

কিছুই নেই স্যার। এটা একটা দরিদ্র গ্রাম।

রাজাকাররা মনা আর তার ভাইটিকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিল। বিরু তার ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সে কাঁপছে থরথর করে। মনা এক হাতে তার ভাইকে ধরে আছে।

রাইফেল তাঁক করামাত্র বিরু চিৎকার করতে লাগল, দাদা, বড় ভয় লাগে! ও দাদা, ভয় লাগে! মনা মৃদুস্বরে বলল, ভয় নাই। আমাকে শক্ত কইরা ধর। বিরু প্রাণপণ শক্তিতে ভাইকে আঁকড়ে ধরল।

ইমাম সাহেব গুলি হওয়ার সময়টাতে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এবং তার পরপরই মুখ ভর্তি করে বমি করলেন। আজিজ মাস্টার সমস্ত ব্যাপারটি চোখের সামনে ঘটতে দেখল। এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

১১

আলো মরে আসছে।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রফিক, বৃষ্টি হবে ?

হতে পারে। এটা ঝড়বৃষ্টির সময়।

তোমার দেশের এই ঝড়বৃষ্টিটা ভালোই লাগে।

রফিক মৃদুস্বরে বলল, তোমার দেশ বললেন কেন ?

মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেন গ্রামে কোনো জনমানুষ নেই। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আছে না ?

রফিক জবাব দিল না। মেজর সাহেব বললেন, মানুষের ইনস্টিংক্ট-এর মধ্যে এটা আছে। অন্যকে পায়ের নিচে রাখার আকাঙ্ক্ষা। তোমার নাই ?

না।

আছে, তোমারও আছে। সবারই আছে। থাকতেই হবে।

রফিক কিছু বলল না। তারা হাঁটছে পাশাপাশি। মেজর সাহেব কথা বলছেন বন্ধুর মতো। তাঁর কথার ধরন দেখে মনে হয় রফিককে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

বদিউজ্জামানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মীর আলি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, কেডা যায় ? কেডা যায় জয়নাল মিয়া ?

মেজর সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। রফিক বলল, লোকটা স্যার অন্ধ। মেজর সাহেবকে মনে হলো এই খবরে বেশ উৎসাহ বোধ করছেন।

কে ? লোকটি কথা বলে না। কেডা গো ?

আমি রফিক।

রফিকটা কেডা ? কোন বাড়ির ?

ঘরের ভেতর গিয়ে বসেন, চাচা।

মেজর সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, তুমি ওকে কী বললে ?

রফিক ইংরেজিতে বলল, আমি তাঁকে ঘরে যেতে বললাম।

কেন ?

এমনি বললাম।

মীর আলি ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচাল, এরা কে ? এরা কে ?

মেজর সাহেব বললেন, তুমি ওকে বলো আমি মেজর এজাজ আহমেদ, কমান্ডিং অফিসার, ফিফটি এইটথ্ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন।

স্যার বাদ দেন। বুড়ো মানুষ।

তোমাকে বলতে বলেছি, তুমি বলো। যাও, কাছে গিয়ে বলো।

রফিক এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তিনি কি বুড়োর চোখেমুখে কোনো পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছিলেন ? কোনোরকম পরিবর্তন অবশ্য দেখা গেল না। রফিক ফিরে আসতেই মেজর সাহেব বললেন, তুমি এই অন্ধ বুড়োকে বলো, মেজর সাহেব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন।

রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? যাও।

রফিক এগিয়ে গেল। বুড়ো মীর আলি কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল।

আকাশে মেঘ জমছে। প্রচুর মেঘ। কালবৈশাখি হবে নিশ্চয়ই। তারা হাঁটছে নিঃশব্দে। রফিক একটি সিগারেট ধরিয়েছে। মেজর সাহেব তাকে মাঝে মাঝে লক্ষ করছেন।

রফিক!

জি স্যার।

তুমি তো জানাতে চাইলে না আমি ওকে সালাম জানালাম কেন। জানতে চাও না ?

রফিক কিছু বলল না।

রেশোবা গ্রামে আমার যে বৃদ্ধ বাবা আছেন তিনি অন্ধ। তিনিও বাড়ির উঠোনে এই বুড়োটির মতো বসে থাকেন। পায়ের শব্দ পেলেই এই বুড়োটির মতো বলেন, ইয়ে কৌন ?

পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই আসলে এক রকম।

কথাটি কি তুমি বিশেষ কোনো কারণে বললে ?

না, কোনো বিশেষ কারণে বলিনি।

রফিক, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। সারভাইভালের প্রশ্ন। এই সময়ে অন্যায় কিছু হবেই। উল্টোটা যদি হতো—ধরো বাঙালি সৈন্য আমার গ্রামে ঠিক আমাদের মতো অবস্থায় আছে। তখন তারা কী করত ? বলো, কী করত তারা ? যে অন্যায় আমরা করছি তারা কি সেগুলি করত ?

না।

না! কী বলছ তুমি! যুক্তি দিয়ে কথা বলো। রাগ, ঘৃণা, হিংসা আমাদের মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যেও আছে।

রফিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত ইশারা করে বলল, এরা ডেডবডিটা এখনো সরায়নি। মেজর সাহেব দেখলেন, দরজার পাশে বুড়োমতো একটি লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। নীল রঙের বড় বড় মাছি ভনভন করে উড়ছে চারদিকে।

স্যার, এই লোকটির নাম নীলু সেন।

এর কি কোনো আত্মীয়স্বজন নেই ? এভাবে ফেলে রেখেছে কেন ?

রফিক গলা উঁচিয়ে ডাকল, বলাই, বলাই! কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কাকে ডাকছিলে ?

বলাইকে। ওর ছেলে কিংবা এরকম কিছু। এরা দুজন এই বাড়িতে থাকে।

এতবড় একটা বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী থাকে ?

এখন থাকে একটি।

রফিক!

জি স্যার!

আমার মনে হয়, তুমি সূক্ষ্মভাবে আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছ।

স্যার, আমি কিছুই বলবার চেষ্টা করছি না। এখন যা বলার তা আপনি বলবেন। আমি শুধু শুনব।

এর মানে কী ?

কোনো মানে নাই, স্যার। আপনি এত মানে খুঁজছেন কেন ?

দুজন আবার হাঁটতে শুরু করল। কালীমন্দিরের সামনে মেজর সাহেব থামলেন। কালীমূর্তি তিনি এর আগে দেখেননি। একটি মাত্র দরজা খোলা, পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেজর সাহেব ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখতে চাইলেন। রফিক বলল, স্যার, ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত।

ফিরব। তোমাদের কালীমূর্তি দেখে যাই।

তোমাদের বলা ঠিক নয় স্যার। আমি মুসলমান।

তোমরা মাত্র পঁচিশ ভাগ মুসলমান, বাকি পঁচাত্তর ভাগ হিন্দু। তুমি মন্দিরে ঢুকে মূর্তিকে প্রণাম করলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হব না।

রফিক কোনো জবাব দিল না। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে আগ্রহ নিয়ে মূর্তি দেখলেন। হাসিমুখে বললেন, চারটি হাতে এই মহিলাটিকে মাকড়সার মতো লাগছে। লাগছে না ?

আমার কাছে লাগছে না। আমরা ছোটবেলা থেকেই মূর্তিগুলি এরকম দেখে আসছি। আমার কাছে এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়।

মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, রফিক!

জি স্যার!

এই মূর্তিটির পেছনে একজন কেউ লুকিয়ে আছে।

রফিক চুপ করে রইল।

তুমি সেটা আমার আগেই বুঝতে পেরেছ। পারোনি ?

রফিক জবাব দিল না।

বুঝতে পেরেও আমাকে কিছু বলোনি।

রফিক ক্লান্তস্বরে ডাকল, বলাই!

মূর্তির পেছনে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল।

তুমি কী করে বুঝলে ও বলাই ?

আমি অনুমান করছি। মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে, তাই অনুমান করছি। বলাই নাও হতে পারে। হয়তো অন্যকেউ। হয়তো কানাই।

মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে সে কি ভাবছে মা কালী ওকে রক্ষা করবেন ?

ভাবাই তো স্বাভাবিক। অনেক মুসলমান এরকম অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়। ভাবে, আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন।

মেজর সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। রফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, অনেক জায়গায় মসজিদ থেকে টেনে বের করে ওদের মারা হয়েছে। আল্লাহ তাদের রক্ষা করতে পারেননি।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

আপনি যদি বলাইকে মারতে চান কালীমূর্তি ওকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই বলতে চাচ্ছি, এর বেশি কিছু না।

একে বের হয়ে আসতে বলো।

রফিক ডাকল, বলাই, বলাই!

বলাই জবাব দিল না।

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় শুরু হলো। প্রচণ্ড ঝড়। মেজর সাহেব মন্দিরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হুম হুম শব্দ উঠছে। দেখতে দেখতে আবহাওয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। মন্দির সংলগ্ন বাঁশঝাড়ে ভয়-ধরানো শব্দ হতে লাগল। রফিক এসে দাঁড়াল মেজর সাহেবের পাশে। মেজর সাহেব মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, বিউটিফুল! কালীমূর্তির পেছনে উবু হয়ে বসে থাকা বলাইয়ের কথা তাঁর মনে রইল না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মেজর সাহেব দ্বিতীয়বার বললেন, বিউটিফুল!

সামনে খোলা মাঠ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঠে ধূলি ও শুকনো পাতায় ঘূর্ণির মতো উঠেছে। এর মধ্যেই খালি গায়ে একজনকে ছুটে যেতে দেখা গেল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে মহা উল্লসিত। মেজর সাহেব বললেন, লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ? রফিক নিস্পৃহ স্বরে বলল, ও নিজাম, পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটি করে পাগল থাকে।

এ গ্রামে সবাইকে কি তুমি এর মধ্যেই চিনে ফেলেছ?

না, কয়েকজনকে চিনি। সবাইকে না।

ঐ পাগলটা কি জঙ্গলা মাঠের দিকে যাচ্ছে না?

মনে হয় যাচ্ছে। পাগলরা বনজঙ্গল খুব পছন্দ করে। মানুষের চেয়ে গাছকে তারা বড় বন্ধু মনে করে।

রফিক!

জি স্যার।

তোমার পড়াশোনা কতদূর?

পাসকোর্সে বিএ পাশ করেছি।

মাঝে মাঝে তুমি ফিলসফারদের মতো কথা বলো।

পরিবেশের জন্যে এরকম মনে হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কথাও খুব অসাধারণ মনে হয়।

তা ঠিক।

মেজর সাহেব মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের একটা জানালা খুলে গিয়েছে। খট খট শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার যোগাড়। রফিক বলল, স্যার কি ভেতরে গিয়ে বসবেন ?

না।

পাগলা নিজাম সত্যি সত্যি কি বনের ভেতর ঢুকেছে ? মেজর সাহেব তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে।

রফিক!

জি স্যার।

জর্জ বানার্ড শ' মিলিটারি অফিসার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো ?

জানি না স্যার।

তিনি বলেছেন, দশজন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে নজনই হয় বোকা। বাকি একজন রামবোকা।

জর্জ বানার্ড শ'র রচনা আমাদের সিলেবাসে ছিল না। আমি তাঁর কোনো লেখা পড়ি নাই।

লোকটি রসিক। তবে তার কথা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে মিলিটারি অফিসারদের মধ্যেও বুদ্ধিমান লোক তাকে। যেমন আমি। ঠিক না ?

জি স্যার।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি যাকে পাগল বলছ সে পাগল নয়। সে জঙ্গলা মাঠে যাচ্ছে খবর দিতে।

নিজাম আলি পাগল। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কী কথা হয়েছে ?

পাগলদের সঙ্গে যেরকম কথা হয় সেরকম। বিশেষ কিছু না।

বুঝলে কী করে ও পাগল ?

ও মিলিটারি আসায় অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এর থেকেই বুঝেছি।

তুমি বলতে চাও মিলিটারি আসাটা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয় ?

জি-না, স্যার।

মেজর সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করে দূরের বনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, চলো যাই।

কোথায় ?

স্কুলে ফিরে যাই।

এই ঝড়ের মধ্যে ?

হ্যাঁ।

মেজর সাহেব মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে পড়লেন। ঝড়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু তিনি হাঁটছেন স্বাভাবিকভাবেই। সাপের শিসের মতো শিস দিচ্ছে বাতাস। জুম্মাঘরের কাছাকাছি আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। মেজর এজাজ আহমেদ সেই বৃষ্টি গ্রাহ্যই করলেন না।

নিজের মনে গুনগুন করতে লাগলেন। কিংস্টোন ট্রয়োর একটি গান, যার সঙ্গে বর্তমান পরিবেশ সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

Pretty girls are everywhere
And when you call me I will be there.

মেজর সাহেবের গলা বেশ সুন্দর।

১২

ঝড় স্থায়ী হলো আধঘণ্টার মতো।

ঝড়ে গ্রামের কারও তেমন কোনো ক্ষতি হলো না। শুধু বদিউজ্জামানের নতুন টিনের বাড়িটির ছাদ উড়ে গেল। মীর আলি আতঙ্কে অস্থির হয়ে চেঁচাতে লাগল। অনুফা কী করবে ভেবে পেল না। তাদের বাড়ি গ্রামের বাইরে। ছুটে গ্রামে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। গোয়ালঘরটি এখনো টিকে আছে। সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু বাতাসের বেগ এখনো কমেনি। সেই নড়বড়ে চালা কখন মাথার উপর পড়ে তার ঠিক কী ? সে পরীবানুকে কোলে নিয়ে তার শ্বশুরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মীর আলি ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগল, বদি! বদিরে, ও বদিউজ্জামান!

বদিউজ্জামানের চোখ জবাফুলের মতো লাল। এখন আর তার আগের মতো কষ্টবোধ হচ্ছে না। পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালোই লাগছে। ঝড়বৃষ্টির সময় সে নিজের মনে খানিকক্ষণ হেসেছে। কেন হেসেছে সে জানে না। কোনো কারণ ছাড়াই হাসি এসেছে। বদিউজ্জামানের ভয়ও কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে একটি শেয়াল এসে তার দিকে তাকিয়েছিল। সে বেশ শব্দ করেই বলেছে—যাহ্ যাহ্। এই শিয়ালটি আবার এসেছে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। টকটকে লাল চোখ নিয়ে বদিউজ্জামান তাকিয়ে আছে শেয়ালটির দিকে। তার ভালোই লাগছে। গিরগিটিটি দুপুরের পর থেকেই নেই। বদিউজ্জামানের খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন আর লাগছে না।

মাগরেবের নামাজ আদায় করতে চার-পাঁচজন মুসল্লি গিয়েছিল মসজিদে। আজানের পরপরই কয়েকটি গুলির শব্দ হওয়ায় তারা নামাজ না করেই ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে হলো, কাজটা ঠিক হলো না। এতে আল্লাহর গজব পড়ার সম্ভাবনা। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। নামাজ পড়ল। মসজিদ থেকে বেরুবার সময়

দেখল, রাস্তায় মিলিটারি। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। রাত কাটাল সেখানেই।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কোথাও কোনো বাতি জ্বলল না। চারদিকে অন্ধকার। সবাই বসে রইল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু কৈবর্তপাড়ায় কে যেন সুর করে কাঁদছে। সেই সুরেলা কান্না ভেসে আসছে অনেকদূর পর্যন্ত। চিত্রা বুড়ি বসে আছে কৈবর্তপাড়ায়। তাকে কেউ কিছু বলছে না। চিত্রা বুড়িও কাঁদছে। হাউমাউ কান্না।

বলাই কোনোখানেই বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। সারাক্ষণই তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাকে ধরতে আসছে। সে অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকবার জায়গা বদল করল। বেশি দূর কখনো গেল না। সেন বাড়ি। সেন বাড়ির মন্দির। এর মধ্যেই তার ঘোরাফেরা। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে চিলেকোঠার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে আধহাতের মতো পানি জমে আছে। সে বসে রইল পানির মধ্যে। কিছুক্ষণ তার ভালোই কাটল। তারপরই মনে হতে লাগল লোহার সিঁড়িতে যেন শব্দ হচ্ছে। মিলিটারিরা উঠে আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। তারপর আবার সব চুপচাপ। কেউ আসেনি—মনের ভুল। বলাইয়ের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার মনে হলো, কেউ আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। বলাই দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

ঝড়ের সময় একজন মিলিটারি সুবাদার ও তিনজন রাজাকারের একটি দল ছুটতে ছুটতে সফদরউল্লাহর চালাঘরে এসে উঠেছিল। সফদরউল্লাহ বাড়িতে ছিল না। মেয়েছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না এ নিয়ে সে আলাপ করতে গিয়েছিল জয়নাল মিয়ার সঙ্গে।

ওরা সফদরউল্লাহর ঘরে ঢুকেই টর্চ টিপল। সেই টর্চের আলো পড়ল জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও তার ছোটবোনের মুখে। ছোট বোনটির বয়স বারো। মিলিটারি সুবাদার মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, এরকম সুন্দর মেয়ে সে কাশ্মিরেই শুধু দেখেছে, বাঙালিদের মধ্যে এরকম সুন্দর দেখেনি। সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বারো বছরের মেয়েটির বুকে হাত রাখল। ঝড়ের জন্যেই এই দু'বোনের চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

মেয়েদের গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জয়নাল মিয়ার অভিমত হলো—এর কোনো দরকার নাই। হিন্দু মেয়ের কিছুটা ভয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের কোনো ভয় নাই। জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বললেন, মুসলমানদের শইলে এরা হাত দেয় না। এই গ্রামে যে তিনটা মানুষ মারা গেছে, এর মধ্যে মুসলমান কেউ আছে ? কও তোমরা, আছে ?

কথা খুবই সত্যি। জয়নাল মিয়া নিচুস্বরে বলল, মুসলমানের সঙ্গে ব্যবহারও খুব ভালা। মীর আলি চাচারে মেজর সাব সালাম দিছে। বিশ্বাস না হইলে জিগাইয়া আও।

এই কথাটিও সত্যি। তবু মতি বলল, ঘরের মেয়েছেলেরা বড় অস্থির হইয়া পড়ছে। জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বলল, রাইত দুপুরে এভাবে টানাটানি করার কোনো দরকার নাই। যাও, তোমরা বাড়িত গিয়া আল্লাহ্ খোদার নাম নেও। ফি আমানিল্লাহ্। ভয়ের কিছু নাই।

যে অল্প কজন এসেছিল তারা ঝড়ের মধ্যেই চলে গেল। ঝড় থামবার পর জয়নাল মিয়ার কাছে খবর এল—মেজর সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে যেন দেরি না করে। জয়নাল মিয়া ভীতস্বরে বলল, যাও, গিয়া বলো, আমি আসতাছি। বাঙালি রাজাকারটি বিরক্ত মুখে বলল, আমার সাথে চলেন। সাথে যাইতে বলছে।

সফদরউল্লাহর বাড়ির সামনে এসে জয়নাল মিয়ার মনে হলো ভেতর বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদছে। সফদরউল্লাহ উঠানে বসে আছে। জয়নাল মিয়া জিজ্ঞেস করল, কী হইছে ? সফদরউল্লাহ জবাব দিল না ?

কান্দে কে ?

সফদরউল্লাহ সেই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। সঙ্গের রাজাকারটি জয়নাল মিয়ার পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি হাঁটেন।

১৩

মেজর সাহেব এক মগ কফি হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সমস্ত গা ভেজা। মাথায় টুপি নেই। ভেজা চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। ইমাম সাহেব বসেই রইলেন। তাঁর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিছু সময় পরপরই তাঁর বমি হচ্ছে। ঘরময় বমির কটু গন্ধ। রফিক একটি হারিকেন টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার এগিয়ে দিল মেজর সাহেবের দিকে। তিনি বসলেন না। একটি পা রাখলেন চেয়ারে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নগুলি ইমাম সাহেবের প্রতি। রফিককে প্রতিটি প্রশ্ন ও উত্তর ইংরেজি করে দিতে হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বের গতি হলো শ্লথ, সেজন্যে মেজর সাহেবের কোনো ধৈর্যচ্যুতি হলো না।

তারপর, ইমাম ভালো আছ ?

জি।

আমি তো খবর পেলাম ভালো নেই। ক্রমাগত বমি হচ্ছে।

জি হুজুর।

শাস্তির দৃশ্যটা ভালো লাগে নাই ?

ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। বমির বেগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মেজর সাহেবের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল।

দৃশ্যটি কি খুব কঠিন কিছু ?

জি।

তুমি নিজে নিশ্চয়ই গরু-ছাগল জবাই করো। করো না ?

জি করি।

তখন খারাপ লাগে না ?

ইমাম সাহেব একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। মেজর সাহেব কফির মগে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। জবাব পাওয়া গেল না।

ইমাম!

জি স্যার!

এখন আমাকে বলো, তোমাদের ঐ জঙ্গলে মোট কতজন বাঙালি সৈন্য আছে ?

আমি জানি না স্যার।

সঠিক সংখ্যাটি না বলতে পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। অনুমান করে বলো।

আমি জানি না স্যার।

সৈন্য আছে কি না সেটা বলো।

স্যার, আমি জানি না।

আচ্ছা বেশ, সৈন্য নেই এই কথাটিই তোমার মুখ থেকে শুনি।

স্যার, আমি জানি না। কিছুই জানি না স্যার।

মেজর সাহেব কফির মগ নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। তার কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল।

তুমি কখনো ঐ বনে যাওনি ?

জি-না স্যার। আমি ধর্মকর্ম নিয়ে থাকি।

ধর্মকর্ম নিয়ে থাক ?

জি স্যার।

মসজিদে লোক হয় ?

হয় স্যার।

সেখানে তুমি কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করো ?

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। মেজর সাহেবের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল।

খুতবার শেষে পাকিস্তানের জন্যে কখনো দোয়া করোনি ?

পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্যে দোয়া খায়ের করা হয় স্যার।

তুমি আমার কথার জবাব দাও। পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করোনি ?

জি-না স্যার।

বাংলাদেশের জন্যে কখনো দোয়া করেছ ?

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। মেজর সাহেব হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন। রফিক তাঁকে উঠে বসাল। মেজর সাহেব ঠান্ডাস্বরে বললেন, ব্যথা লেগেছে ?

জি না।

এতটুকু ব্যথা লাগেনি ?

জি-না স্যার।

আমার হাত এতটা কমজুরি তা জানা ছিল না।

মেজর সাহেব হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় চড়টি দিলেন। ইমাম সাহেব গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। রফিক তাঁকে তুলতে গেল। মেজর সাহেব বললেন, ও নিজে নিজেই উঠবে। ইমাম উঠে বসো। ইমাম সাহেব উঠে বসলেন।

এখন বলো, তুমি শেখ মুজিবর রহমানের নাম শুনেছ ?

জি শুনেছি।

সে কে ?

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন।

সে কে তুমি জানো না ?

মেজর সাহেব এগিয়ে এসে তৃতীয় চড়টি বসালেন। ইমাম সাহেব শব্দ করে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। মেজর সাহেব তাকালেন আজিজ মাস্টারের দিকে।

তারপর কবি, তুমি কেমন আছ ? ভালো আছ ?

জি।

তুমি শুনলাম বেশ শক্তই ছিলে। বমি-টমি কিছু করোনি ?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

বাংলাদেশের উপর কখনো কবিতা লিখেছ ?

জি-না স্যার।

কেন, লেখো নি কেন ?

আজিজ মাস্টার চুপ করে রইল।

শেখ মুজিবের উপর লিখেছ ?

জি-না।

আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, তুমি প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্যকিছু লেখো না ?

জি-না।

তুমি দেখি দারুণ প্রেমিক মানুষ। সব কবিতা কি মালা নামের ঐ বালিকাকে নিয়ে লেখা ? জবাব দাও। বলো হ্যাঁ কিংবা না।

হ্যাঁ।

শোনো আজিজ, আমি কথা রাখি। আমি কথা দিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব। সেটা আমার মনে আছে। আমি ঐ মেয়ের বাবাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখন তুমি আমাকে বলো—ঐ বনে কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে ?

স্যার, বিশ্বাস করেন, আমি কিছুই জানি না।

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। তুমি বোধহয় জানো না আমি কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারি। তুমি জানো ?

জি স্যার, জানি।

না, তুমি জানো না। তবে এক্ষুনি দেখতে পাবে। রফিক, তুমি ওর জামাকাপড় খুলে ওকে নেংটো করে ফেলো।

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকাল। এই লোকটা বলে কী ? আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, দেরি করবে না, আমার হাতে সময় বেশি নেই। রফিক!

জি স্যার।

এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নেংটা করে সমস্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। বুঝতে পারছ ?

পারছি।

আর শোনো, একটা ইটের টুকরো ওর পুরুষাঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিউমার আসবে।

আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, আমি কিছুই জানি না, স্যার। একটা কোরান শরীফ দেন, কোরান শরীফ ছুঁয়ে বলব।

তার কোনো প্রয়োজন দেখি না। রফিক! যা করতে বলছি, করো।

রফিক থেমে থেমে বলল, মানুষকে এভাবে লজ্জা দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। মেজর সাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হতে লাগল। তিনি তাকিয়ে আছেন রফিকের দিকে। রফিক বলল, আপনি যদি একে অপরাধী মনে করেন তাহলে মেরে ফেলেন। লজ্জা দেওয়ার দরকার কী ?

তুমি একে অপরাধী মনে করো না ?

না। আমার মনে হয় সে কিছু জানে না।

সে এই গ্রামে থাকে, আর এতবড় একটা ব্যাপার জানবে না ?

জানলে বলত। কিছু জানে না, তাই বলছে না।

বলবে সে ঠিকই। ইট বেঁধে তাকে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাও—দেখবে তার মুখে কথা ফুটেছে। তখন সে প্রচুর কথা বলবে।

রফিক ঠান্ডা স্বরে বলল, স্যার, ওকে এরকম লজ্জা দেওয়াটা ঠিক না।

কেন ঠিক না ?

আপনি শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছেন না, আপনি আমাকেও লজ্জা দিচ্ছেন। আমিও ওর মতো বাঙালি।

তাই নাকি। আমি তো জানতাম তুমি পাকিস্তানি। তুমি কি সত্যি পাকিস্তানি ?

জি স্যার।

আমার মনে হয় এটা তোমার সবসময় মনে থাকে না। মনে রাখবে।

জি স্যার, রাখব।

এটা তোমার নিজের স্বার্থেই মনে রাখা উচিত।

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব বললেন, একটা মজার ব্যাপার কী জানো রফিক ? তুমি যদি আজিজ মাস্টারকে চয়েস দাও মৃত্যু অথবা লজ্জাজনক শাস্তি, তাহলে সে লজ্জাজনক শাস্তিটাই বেছে নেবে। মহানন্দে পুরুষাঙ্গে ইট বেঁধে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবে। জিজ্ঞেস করে দেখো।

রফিক কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মেজর সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, আজিজ, পরিষ্কার উত্তর দাও। মরতে চাও, না চাও না ? আমি দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করব না। ত্রিশ সেকেন্ডের ভেতরে জবাব চাই। বলো মরতে চাও, না চাও না ?

মরতে চাই না।

মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, বেশ, তাহলে কাপড় খুলে ফেলো। তোমাকে ঠিক এক মিনিট সময় দেওয়া হলো তার জন্যে। আজিজ মাস্টার কাপড় খুলতে শুরু করল।

রফিক, আমার কথা বিশ্বাস হলো ?

হলো।

বাঙালিদের মান-অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্মসম্মান থাকে, এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে বলি, যাও, ঐ ইমামের পশ্চাদ্দেশ চেটে আস ও তাই করবে।

রফিক মৃদুস্বরে বলল, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে।

তুমি করবে ?

জানি না। করতেও পারি। মৃত্যু একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে কী করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।

তাই বুঝি ?

জি স্যার। আপনার মতো একজন সাহসী মানুষও দেখা যাবে কাপুরুষের মতো কাণ্ডকারখানা করছে।

মেজর সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এবং তারও মিনিটখানেক পর জয়নাল মিয়াকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আজিজ মাস্টার দুহাতে তার লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করল। ইমাম সাহেব বেশ স্বাভাবিক গলায় বললেন, জয়নাল মিয়া, ভালো আছেন ?

জয়নাল কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল—বলতে পারল না। আজিজ মাস্টারের মতো একজন বয়স্ক মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইমাম সাহেব বললেন, বড় খারাপ সময় জয়নাল সাব, আল্লাহ খোদার নাম নেন।

জয়নাল মিয়া আবারও কিছু বলতে চেষ্টা করল। বলতে পারল না। কথা আটকে গেল।

রফিক শান্তস্বরে বলল, জয়নাল সাহেব, আপনি বসেন। স্যার যা যা জিজ্ঞেস করবেন তার সত্যি জবাব দিবেন। বুঝতেই পারছেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। ইমাম সাহেব বললেন, চেয়ারে বসেন, মাটিতে প্রস্রাব আছে।

১৪

মেঘ নেই।

আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

রাত প্রায় আটটা কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। হাওয়া থেমে গেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। সফদরউল্লাহ একটা দা হাতে মাঠে নেমে পড়ল। সে দুজনকে খুঁজছে। একজন তালগাছের মতো লম্বা। গোঁফ আছে। অন্যজন বাঙালি, তার মুখে বসন্তের দাগ। সফদরউল্লাহ কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সে যেভাবে হাঁটছে তাতে মনে হয় অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। কোনো কোনো সময় মানুষের ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সে প্রথমে গেল বিলের দিকে। কেউ নেই সেখানে। বেশকিছু কাটা ডাব পড়ে আছে চারদিকে। সফদরউল্লাহ দীর্ঘ সময় বিলের পাড়ে দা হাতে বসে রইল। বাতাস নেই কোথাও, তবু বিলের পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। ওরা আবার হয়তো আসবে। পানিতে দাঁড় করিয়ে আরও মানুষ মারবে। সফদরউল্লাহর মনে হলো কেউ একজন যেন এদিকে আসছে। সে শক্ত করে দাটি ধরে চেঁচিয়ে বলল, কেডা ?

আমি নিজাম। আপনে কী করেন ?

কিছু করি না।

অন্ধকারে বইয়া আছেন ক্যান ?

সফদরউল্লাহ ফুঁপিয়ে উঠল। নিজাম বলল, সব মিলিটারি জমা হইতেছে জঙ্গলা মাঠে। দেখবেন ? সফদরউল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

হাতে দাও ক্যান ?

আছে, কাম আছে। দাওয়ের কাম আছে।

কৈবর্তপাড়া খালি হয়ে যাচ্ছে।

এরা সরে পড়ছে নিঃশব্দে। এদের অভ্যাস আছে—অতি দ্রুত সবকিছু গুছিয়ে সরে পড়তে পারে। অন্ধকারে এরা কাজ করে। ওদের শিশুরা চোখ বড় বড় করে দেখে, হইচই করে না, কিছুই করে না। মেয়েরা জিনিসপত্র নৌকায় তুলতে থাকে। কোনো জিনিসই বাদ পড়ে না। হাঁস, মুরগি, ছাগল সবই উঠানো হয়। এরা কাজ করে নিঃশব্দে। প্রবীণরা হুঁকো হাতে বেশ অনেকটা দূরে বসে থাকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় কী হচ্ছে না হচ্ছে এরা কিছুই জানে না। এরা ঝিমুতে থাকে। ঝিমুতে ঝিমুতেই চারদিকে লক্ষ রাখে। বুড়ো বয়সেও এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

মীর আলি খুনখুন করে কাঁদে।

ভাতের জন্যে কাঁদে। বদিউজ্জামান বাড়ি ফেরেনি। সে না ফেরা পর্যন্ত অনুফা ভাত চড়াবে না। ঘরে চাল-ডাল সবই আছে। চারটা চাল ফুটাতে এমন কী ঝামেলা মীর আলি বুঝতে পারে না। অনেক রকম ঝামেলা আছে ঠিকই—মাথার উপর টিনের ছাদ নেই। গ্রামে মিলিটারি মানুষ মারছে। তাই বলে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা তো চলে যায়নি ? পরীবানুও বিরক্ত করছে না। ঘুমাচ্ছে। অসুবিধা তো কিছু নেই।

মীর আলি মৃদু স্বরে বলল, বৌ, চাইরডা ভাত রাইন্ধা ফেল। অনুফা তীব্র স্বরে বলল, আপনে মানুষ, না আর কিছু ?

মীর আলি অবাক হয়ে বলে, আমি কী করলাম ?

পনেরো-বিশজন সেপাই বসে আছে স্কুলের বারান্দায়। এরাও ক্ষুধার্ত। সমস্ত দিন কোনো খাওয়া হয়নি। ওদের জন্যে রান্না হওয়ার কথা মধুবনে। ঝড়ের জন্যে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হয়েছে। রান্না করা খাবার এসে পৌঁছায়নি। কখন এসে পৌঁছাবে কে জানে! এরা সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। কয়েকজন স্পষ্টতই ঘুমাচ্ছে। কিছু বাঙালি রাজাকার ওদের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে। গল্প জমছে না। ওরা হাল ছাড়ছে না, ওস্তাদজি ওস্তাদজি বলেই যাচ্ছে।

বদিউজ্জামানের মনে হলো জ্বর এসেছে। সে নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথায় হাত দিলে কোনো উত্তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিছুক্ষণ আগেও

তার শীত করছিল। এখন আর করছে না। খুকখুক করে কে যেন কাশল। নাকি সে নিজেই কাশছে। নাজিমের মতো তারও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একবার মনে হলো, শীতল ও লম্বা একটা কী যেন তার শার্টের ভেতর ঢুকে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চিৎকার করল না। মনের ভুল। শার্টের ভেতর কিছুই নেই। বদিউজ্জামানের মনে হলো, সে যেন অনেকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। কথাবার্তা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। এটাও কি মনের ভুল? বদিউজ্জামান উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ঠিক করে রাখল, মিলিটারিরা তাকে মেরে ফেললে সে বলবে—ভাইয়েরা, কেমন আছেন? বড় মজার ব্যাপার হবে। বদিউজ্জামান নিজের মনে খুকখুক করে হাসতে লাগল। বাঁ দিকে চারটি সবুজ চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে? শেয়াল। দিনে যে শেয়ালটা তাকে দেখে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভাবতে বেশ মজা লাগল বদিউজ্জামানের। সে আবার হাসতে শুরু করল। এবার আর নিজের মনে হাসা নয়, শব্দ করে হাসা।

১৫

রফিক বাইরে এসে দেখল, মেজর সাহেব স্কুলঘরের শেষ প্রান্তের বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। রফিককে দেখে তিনি কিছুই বললেন না। রফিক বারান্দায় নেমে গেল। অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ, তারপর হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। মেজর সাহেব ভারী গলায় ডাকলেন, রফিক!

রফিক ফিরে এল।

কোথায় যাচ্ছিলে?

তেমন কোথাও না।

তোমাকে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।

বলুন।

তুমি কি জানো আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না?

জানি।

কখন থেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি জানো?

শুরু থেকেই। কোনো বাঙালিকেই আপনি বিশ্বাস করেন না।

তা ঠিক। যারা বিশ্বাস করেছে সবাই মারা পড়েছে। আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল কী করেনি সেটা আপনি জানেন না। অনুমান করছেন।

হ্যাঁ, তাও ঠিক। আমি জানি না।

মেজর সাহেব হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঐ মাস্টারটির বিশেষ অঙ্গে ইট ঝুলিয়ে দিয়েছ ?

না।

কেন ? প্রমাণ সাইজের ইট পাওনি ?

রফিক কথা বলল না। মেজর সাহেব চাপাস্বরে বললেন, বাঙালি ভাইদের প্রতি দরদ উথলে উঠেছে ?

আমার মধ্যে দরদ-টরদ কিছু নাই মেজর সাহেব। ইট ঝুলানোটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। আমি ইট বাঁধা অবস্থায় ওকে ওর প্রেমিকার কাছে নিয়ে যাব। এবং ওকে বলব সেই প্রেমের কবিতাটি আবৃত্তি করতে।

কেন ?

রফিক!

জি স্যার।

তুমি আমাকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস কোথায় পেলে ?

আপনি একজন সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও সাহসী হয়ে উঠেছি।

আই সি।

এবং স্যার আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা বলে ফেলতে।

বলেছিলাম ?

জি স্যার।

সেই প্রিভিলেজ এখন আর তোমাকে দিতে চাই না। এখন থেকে তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না।

ঠিক আছে, স্যার।

রফিক!

জি স্যার।

আজ তোমাকে অস্বাভাবিক রকম উৎফুল্ল লাগছে।

আপনি ভুল করছেন, স্যার। আমাকে উৎফুল্ল দেখানোর কোনো কারণ নেই। এমন কিছুই ঘটেনি যে আমি উৎফুল্ল হব।

তুমি বলতে চাও যে বিমর্ষ হওয়ার মতো অনেক কিছু ঘটেছে ?

আমি তাও বলতে চাই না।

মেজর সাহেব পশতু ভাষায় কী যেন বললেন। কোনো কবিতা-টবিতা হবে হয়তো। রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, রফিক, তুমি পশতু জানো ?

জি-না, স্যার।

না চাইলেও শোনো। এর মানে হচ্ছে, বেশি রকম বুদ্ধিমানের মাঝে মাঝে বড় রকম বোকামি করতে হয়।

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব বললেন, চলো, জয়নাল লোকটির কাছে থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করি। তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কিছু বলবে ?

না স্যার, বলবে না।

কী করে বুঝলে ?

এরা কিছুই জানে না। কাজেই কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না।

চলো দেখা যাক।

তোমার নাম জয়নাল ?

জি।

এই নেংটা মানুষটাকে তুমি চেন ?

জি স্যার।

ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।

জয়নাল মিয়া হতভম্ভ হয়ে তাকাল।

কিন্তু ওর যন্ত্রপাতি বেশি ভালো মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয় ভয় পেয়ে ওটার এই অবস্থা। আমি নিশ্চিত, উত্তেজিত অবস্থায় এটা আরও ইঞ্চিখানেক বড় হবে। কী বলো জয়নাল ?

জয়নালের পা কাঁপতে লাগল—এসব কী শুনছে ?

তবে আমি ঐ যন্ত্রটার জন্যে একটা এক্সারসাইজের ব্যবস্থা করেছি। আমি ঠিক করেছি ওখানে একটা ইট ঝুলিয়ে দেব। এতে এটা আরও কিছু লম্বা হবে বলে মনে হয়।

ইমাম সাহেব অস্ফুট একটি ধ্বনি করলেন। মেজর সাহেব বললেন, কিছু বলবে ইমাম ?

জি-না স্যার।

জয়নাল, তুমি কিছু বলবে ?

জি-না।

আমি ঠিক করেছি মাস্টারকে এই অবস্থায় তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাব। জিজ্ঞেস করব, এই সাইজে ওর চলবে কি না। জয়নাল, তোমার মেয়েটি কি বাড়িতে আছে ?

জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। মেজর সাহেব হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন, যেন কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঘরে একটি শব্দও হলো না।

জয়নাল!

জি।

তোমার মেয়েটি বাড়িতেই আছে, আশা করি।

জয়নাল মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মেজর সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন— কান্না বন্ধ করো। কান্না আমার সহ্য হয় না। চলো যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো চলো।

আজিজ মাস্টার তখন কথা বলল। অত্যন্ত স্পষ্টস্বরে বলল, মেজর সাহেব, আমি মরবার জন্যে প্রস্তুত আছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।

মেজর সাহেব মনে হলো বেশ অবাক হলেন। কৌতূহলী গলায় বললেন, মরতে রাজি আছ ?

হ্যাঁ।

ভয় লাগছে না ?

লাগছে।

তবু মরতে চাও ?

আজিজ মাস্টার জবাব না দিয়ে নিচু হয়ে তার পাজামা তুলে পরতে শুরু করল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগলেন। কিছুই বললেন না।

আজিজ মাস্টার চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলল না। মেজর সাহেব গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। জয়নাল মিয়া কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুল ঘরের পেছনে কয়েকটি গুলির শব্দ হলো। ইমাম সাহেব ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন—।

মেজর সাহেব বললেন, জয়নাল, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাদ দাও। আমাকে রাগিও না। বলো, মোট কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে তোমাদের জঙ্গলা মাঠে ? মনে রাখবে আমি একই প্রশ্ন দুবার করব না। বলো কতজন ?

প্রায় একশ।

ইমাম সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকালেন। রফিক অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

এরা কবে এসেছে এই বনে ?

পরশু।

এই গ্রাম থেকে তোমরা কবার খাবার পাঠিয়েছ ?

তিনবার।

আজিজ মাস্টার এবং ইমাম এরা এ খবর জানে ?

জি-না, এরা বিদেশী মানুষ। এদের কেউ বলে নাই।

ঐ সৈন্যরা এখান থেকে কোথায় যাবে জানো ?

জি-না।

কেউ জানে ?

জি-না।

ওদের মধ্যে কতজন অফিসার আছে ?

আমি জানি না।

ওদের সঙ্গে গোলাবারুদ কী পরিমাণ আছে ?

জানি না স্যার।

ওদের মধ্যে আহত কেউ আছে ?

আছে।

কতজন ?

ছয়-সাতজন।

ওরাও বনেই আছে ?

জি-না।

ওরা কোথায় ?

কৈবর্তপাড়ায়। জেলেপাড়ায়।

বনে খাবার নিয়ে কারা যেত ?

কৈবর্তরা।

মেজর সাহেব থামলেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে হাঁপাতে লাগল। রফিক এখনো জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও।

জি স্যার।

তুমি যাও। তোমাকে যেতে বললাম।

জয়নাল মিয়া নড়ল না। উবু হয়ে বসে রইল। মেজর সাহেব বললেন, নাকি যেতে চাও না ?

যেতে চাই।

তাহলে যাও। দৌড়াও। আমি মত বদলে ফেলবার আগেই দৌড়াও।

জয়নাল মিয়া উঠে দাঁড়াল। নিচুগলায় বলল, স্যার স্লামালিকুম।

মেজর সাহেব বললেন, ইমাম, তুমি যাও।

ইমাম সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

যাও যাও। চলে যাও। কুইক।

ওরা ঘর থেকে বেরুল। স্কুল গেট পার হয়েই ছুটতে শুরু করল। মেজর সাহেব জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

রফিক!

জি স্যার?

জয়নাল কি সত্যি কথা বলল?

মনে হয় না স্যার। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অনেক সময় এ জাতীয় কথা বলা হয়।

কিন্তু আমি জানি ও সত্যি কথাই বলেছে।

রফিক চুপ করে রইল।

এবং আমার মনে হচ্ছে তুমিও তা জানো।

রফিক তাকাল জানালার দিকে। বাইরে ঘন অন্ধকার।

আমার মনে হয় তুমি আরও অনেক কিছুই জানো।

আমি তেমন কিছু জানি না।

তুমি শুধু বলো, তোমাদের সৈন্যরা এখনো কি বনে লুকিয়ে আছে?

আমি কী করে জানব?

তুমি অনেক কিছুই জানো। আমি কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি করতে চেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে প্রয়োজন নেই।

আমার ভুল হয়েছিল। সবাই ভুল করে।

ঝড়ের সময় একটা পাগল ছুটে গেল বনের ভেতর। যায়নি?

হ্যাঁ।

ওকে বনের ভেতর যেতে দেখে তুমি উল্লসিত হয়ে উঠলে।

রফিক একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

বলো, তুমি উল্লসিত হওনি?

ভুল দেখেছেন স্যার।

আমার ধারণা, ঐ পাগলটি বনে খবর নিয়ে গেছে। এবং সবাই পালিয়েছে ঝড়ের সময়।

মেজর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

বুঝতে পারছ না কোথায়? তুমি তো বুদ্ধিমান। তোমার তো বুঝতে পারা উচিত। বলো, বুঝতে পারছ?

পারছি।

ভয় লাগছে?

না?

ওরা কি ঝড়ের সময় পালিয়েছে ?

হ্যাঁ। এতক্ষণে ওরা অনেকদূর চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি মধুবনের দিকে গেলে হয়তো এখনো ওদের ধরা যাবে।

তুমি আবার আমাকে কনফিউজ করতে চেষ্টা করছ। এরা হয়তো বনেই বসে আছে।

রফিক মৃদু হাসল।

বলো, ওরা কি বনে বসে আছে ?

হয়তো আছে। গভীর রাতে বের হয়ে আসবে।

ঠিক করে বলো।

আপনি এখন আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবেন না। কাজেই কেন শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন ?

কৈবর্তপাড়ায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। চিত্রা বুড়ি অবাক হয়ে আগুন দেখছে। রাজাকাররা ছোটাছুটি করছে। তাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হয় খুব উৎসাহ বোধ করছে। আগুন জ্বালানোর জন্যে তাদের যথেষ্ট খাটাখাটনি করতে হচ্ছে। ভেজা ঘরবাড়ি। আগুন সহজে ধরতে চায় না।

মীর আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করছে। সে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের মানুষজন সব বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

১৬

মেজর এজাজ আহমেদ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে ডানদিকে, চাইনিজ রাইফেল হাতে দুজন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক নেমেছে বিলে।

বিলের পানি অসম্ভব ঠান্ডা। রফিক পানি কেটে এগুচ্ছে। কী যেন ঠেকল হাতে। মনার ছোট ভাই বিরু। উপুড় হয়ে ভাসছে। যেন ভয় পেয়ে কাছে এগিয়ে আসতে চায়। রফিক পরম স্নেহে বিরুর গায়ে হাত রেখে বলল, ভয় নাই। ভয়ের কিছুই নাই।

পাড়ে বসে থাকা মেজর সাহেব বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছ রফিক ?

নিজের সঙ্গে মেজর সাহেব।

কী বলছ নিজেকে ?

সাহস দিচ্ছি। আমি মানুষটা ভীতু।

রফিক!

বলুন।

ওরা কি বন ছেড়ে চলে গেছে ? সত্যি করে বলো।

রফিক বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। আচমকা হাসির শব্দে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন।

কৈবর্তপাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আলো হয়ে উঠছে চারদিক। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। ছোটখাটো অসহায় একটা মানুষ। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, রফিক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও ? রফিক শান্তস্বরে বলল, চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না ?

মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণস্বরে বলল, মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে।

মেজর এজাজ আহমেদ সিগারেট ধরালেন, কৈবর্তপাড়ার আগুনের দিকে তাকালেন। পশতু ভাষায় সঙ্গের জোয়ান দুটিকে কী যেন বললেন। গুলির নির্দেশ হয়তো। রফিক বুঝতে পারল না। সে পশতু জানে না।

হ্যাঁ, গুলির নির্দেশই হবে। সৈন্য দুটি বন্দুক তুলছে। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

বুক পর্যন্ত পানিতে গা ডুবিয়ে লালচে আগুনের আঁচে যে রফিক দাঁড়িয়ে আছে মেজর এজাজ আহমেদ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

ফেরা

মতি মিয়া দ্রুত পায়ে হাঁটছিল।

আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সঙ্গে ছাতা ফাতা কিছুই নেই। বৃষ্টি নামলে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হতে হবে। মতি মিয়া হনহন করে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে সোহাগীর পথ ধরল। আর তখনই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মতি মিয়ার বিরক্তির সীমা রইল না। সকাল সকাল বাড়ি ফেরা দরকার। শরিফার পা ফুলে ঢোল হয়েছে। কাল সারা রাত কোঁ কোঁ করে কাউকে ঘুমাতে দেয়নি। সন্ধ্যার পর আমিন ডাক্তারের এসে দেখে যাওয়ার কথা। এসে হয়তো বসে আছে। মতি মিয়া গম্ভীর একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। ঢালা বর্ষণ, জামগাছের ঘন পাতাতেও আর বৃষ্টি আটকাচ্ছে না, দমকা বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। দিনের যা গতিক, ঝড়-তুফান শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। দাঁড়িয়ে ভেজার কোনো অর্থ হয় না। মতি মিয়া উদ্বিগ্ন মুখে রাস্তায় নেমে পড়ল। পা চালিয়ে হাঁটা যায় না। বাতাস উল্টোদিকে উড়িয়ে নিতে চায়। নতুন পানি পেয়ে পথ হয়েছে দারুণ পিছল। ক্ষণে ক্ষণে পা হড়কাচ্ছে। সরকারবাড়ির কাছাকাছি আসতেই খুব কাছে কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। আর আশ্চর্য, বৃষ্টি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মতি মিয়া অবাক হয়ে শুনল সরকারবাড়িতে গান হচ্ছে। কানা নিবারণের গলা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—

আগে চলে দাসী বান্দি পিছে ছকিনা,
তাহার মুখটি না দেখিলে প্রাণে বাঁচতাম না
ও মনা ও মনা...

সরকারবাড়ির বাংলাঘরের দরজা জানালা বন্ধ। মতি মিয়া ধাক্কা দিতেই নাজিম সরকার মহাবিরক্ত হয়ে দরজা খুললেন। হ্যাঁ, কানা নিবারণই গাইছে। সেই গাট্টা চেহারা, পান খাওয়া হলুদ রঙের বড় বড় কুৎসিত দাঁত। কানা নিবারণ গান থামিয়ে হাসিমুখে বলল, মতি ভাই না? পেন্নাম হই। অনেকদিন পরে দেখলাম।

মতি মিয়া বড়ই অবাক হলো। কানা নিবারণের মতো লোক তার নাম মনে রেখেছে। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। কানা নিবারণ গম্ভীর হয়ে বলল, মতি ভাইরে একটা গামছা টামছা দেন।

কেউ গা করল না। নাজিম সরকার রাগী গলায় বললেন, ভিজা কাপড়ে ভিতরে আসলা যে মতি? দেখো ঘরের অবস্থা কী করছ? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর হইল না। ছিঃ ছিঃ।

কানা নিবারণ বলল, ঘরে না আইসা উপায় কী ? বাইরে ঝড় তুফান।

নাজিম বড়ই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। থেমে থেমে বললেন, তুমি গান বন্ধ করলা কেন নিবারণ ?

কানা নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করল—

দুধের বরণ সাদা সাদা কালা দিঘির জল
তাহার মনের গুপ্ত কথা আমারে তুই বল।

মনটা উদাস হয়ে গেল মতি মিয়ার। শরিফা বা আমিন ডাক্তার কারও কথাই মনে রইল না। কন্যার মনের গুপ্ত কথাটির জন্যে তারো মন কাঁদতে লাগল। আহা এত সুন্দর গান কানা নিবারণ কী করে গায় ? কী গলা!

গান থামল অনেক রাতে। ততক্ষণে মেঘ কেটে আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতায় চকচক করছে জ্যোৎস্না। মতি মিয়া উঠানে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না এমন অদ্ভুত লাগে। বিড়ি টানতে টানতে নিবারণ বাইরে আসতেই মতি মিয়া বলল, কেমন চাঁদনি রাইত দেখছেননি নিবারণ ভাই ?

'চাঁদনি রাইত' নিবারণকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। বিড়িতে টান দিয়ে সে প্রচুর কাশতে লাগল। কাশির বেগ কমে আসতেই গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িত যান মতি ভাই, রাইত মেলা হইছে।

আর 'গাওনা' হইত না ?

নাহ আইজ শেষ। ওখন বেশি গাই না। বুকের মধ্যে দরদ হয়।

ডাক্তার দেখান নিবারণ ভাই।

নিবারণ বিরক্ত মুখে একদলা থুথু ফেলে চোখ কুঁচকে বলল, বাড়িতে যান। আমার ডাক্তার লাগে না।

রাস্তায় নেমেই মতি মিয়া লক্ষ করল আবার মেঘ করেছে।

দক্ষিণ দিকে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দুই পহরের শেয়াল ডাকল। এতটা রাত হয়েছে নাকি ? চারদিক নিশুতি। চাঁদ মেঘের আড়ালে পড়ায় ঘুটঘুটি অন্ধকার। গা ছমছম করে।

কেডা, মতি নাকি ?

মতি মিয়া চমকে দেখে ছোট চৌধুরী। উঠোনে জলচৌকি পেতে খালি গায়ে বসে আছেন। ইনার মাথা পুরোপুরি খারাপ। গত বৎসর কৈবর্তপাড়ার একটা ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।

কে, একটা কথা কয় না যে ? মতি নাকি ?

জি।

এত রাইতে কই যাও ?

বাড়িত যাই।

তোমার বড় পুলাডা তোমারে খুঁজতেছে। তোমার বৌয়ের অবস্থা বেশি বালা না। নীলগঞ্জে নেওন লাগব।

জি আচ্ছা।

জি জি করো কেন মতি মিয়া ? তাড়াতাড়ি বাড়িত যাও।

মতি মিয়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট চৌধুরীর অভ্যাস হচ্ছে, ভালো মানুষের মতো কথা বলে হঠাৎ তাড়া করা। সে কারণেই হুট করে সামনে থেকে চলে যেতে ভরসা হয় না।

ছোট চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন।

কথা কানে ঢোকে না ? থাপ্পড় দিব, ছোটলোক কোথাকার। যা—বাড়িত যা।

মতি মিয়া বাড়ি ফিরে দেখে আমিন ডাক্তার বসে আছে। শরিফার জ্ঞান নেই। আজরফ চুলা ধরিয়ে কী যেন জ্বাল দিচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বলল, অবস্থা বড় সঙ্গিন। রাইত কাটে কি না সন্দেহ।

মতি মিয়া কিছু বলল না। যেন সে আমিন ডাক্তারকে দেখতেই পায়নি। আজরফের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দেয়, অত রাইতে কী জ্বাল দেস ?

চা। আমিন চাচা চায়ের পাতা আনছে।

আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলল, সারা রাইত জাগন লাগব, চা ছাড়া জুইত হইত না। বুঝছনি মতি, নীলগঞ্জ নেওন লাগব।

আমিন ডাক্তার লোকটি ভীতুপ্রকৃতির। রোগীর অবস্থা একটুখানি খারাপ দেখলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নীলগঞ্জ নেওয়ার জন্যে, বারবার বলে, রাইত কাটা সম্ভব না। রাইতের মধ্যেই ভালো মন্দ হইতে পারে।

কিন্তু আজ রোগীর অবস্থা সত্যি খারাপ। আমিন ডাক্তার চিন্তিত মুখে ক্রমাগত হুকা টানে। মতি মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, মেয়েমানুষের মতো বেআক্কেল জিনিস খোদার আলমে নাই, বুঝলা ডাক্তার ?

ডাক্তার হুকা টানা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বলে, নীলগঞ্জ নেওনের ব্যবস্থা করো মতি।

কইলেই তো ব্যবস্থা হয় না! যোগাড়যন্ত্র লাগে। সকাল হউক। টেকাপয়সার যোগাড় দেখি।

আইজ রাইতেই নেওন লাগব মতি।

মতি মিয়া কথা না বলে খেতে বসে। আজরফ ভাত বেড়ে দেয়। ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে। কাঁচামরিচে ঝালের বংশ নাই। মতি মিয়া আধপেট খেয়েই

হাত ধোয়। ছোট ছেলে নুরুদ্দীন আমিন ডাক্তারের গা ঘেঁসে বসে ছিল। সে দীর্ঘ সময় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে বলে ফেলে, আমারে নীলগঞ্জ নেওন লাগব বাজান।

বহু কষ্টে রাগ সামলায় মতি মিয়া। আমিন ডাক্তার বলে, চা খাও একটু মতি। আজরফ তর বাপরে চা দে।

আমারে দিস না।

আরে খাও। বালা চা। মোহনগঞ্জের খরিদ।

নীলগঞ্জ যাওয়ার যোগাড় যন্ত্র করতে অনেক সময় লাগে। বাঁশের যে খুঁটিতে পয়সা জমানো হতো সেটি কাটা হয়। সব মিলিয়ে সাত টাকার মতো পাওয়া যায় সেখানে। এতটা মতি মিয়া আশা করেনি। আজরফ চলে যায় নৌকার ব্যবস্থা করতে। ঠিক হয় আজরফ-নুরুদ্দীন দুজনেই সঙ্গে যাবে। আমিন ডাক্তারও যাচ্ছে। নীলগঞ্জ হাসপাতালের কম্পাউন্ডার সাহেবের সঙ্গে তার নাকি ভালো জানাশোনা। আপনি আপনি করে কথা বলে।

খালি বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে আনা হয়েছে রহিমাকে। রহিমার মেয়েটি কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। শরিফার জ্ঞান ফিরেছে। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলে ঠিক বোঝা যায় না। মতি মিয়া কড়া ধমক লাগায়, চুপ। একদম চুপ। বেআক্কেল মেয়েমানুষ।

শরিফা চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার এক ফাঁকে বলে, আমারে যে সাথে নিতাছ সেই বাবদ দুই টেকা ভিজিট—কথাডা স্মরণ রাখবা মতি।

মতি মিয়া দারুণ বিরক্ত হয়।

তোমারে সাথে নেওনের কথা তো কই নাই। নিজের ইচ্ছায় তুমি যাইতাছ।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়।

নৌকায় উঠবার মুখে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। ছইয়ের নিচে খড় বিছিয়ে শরিফার বিছানা। শরিফার গায়ের সঙ্গে সেঁটে লেগে থাকে নুরুদ্দীন। ডাক্তার বসেছে নৌকার সামনের মাথায়। এর মধ্যেই সে ভিজে চুপসে গেছে। তার সঙ্গে ছাতা আছে। কিন্তু রোগী নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় ছাতা মেলতে হয় না। খুব অলক্ষণ। নৌকাতে দুটি মুরগি এবং একটি পাকা কাঁঠাল নেওয়া হয়েছে। নীলগঞ্জ বাজারে ভালো দাম পাওয়া যাবে।

মুরগি দুটি অনবরত ডানা ঝাপটায়। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে হুক্কা ধরায়। বৃষ্টির ছাঁট থেকে কলকে আড়াল করে রাখতে তাকে অনেক কায়দা-কানুন করতে হয়। পাকা কাঁঠালের গন্ধের সঙ্গে তামাকের গন্ধ মিশে অদ্ভুত একটা মিশ্র গন্ধ তৈরি হয়। তুমুল বর্ষণের মধ্যে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আজরফ টপাটপ বৈঠা মারে। মতি মিয়ার বড় মায়া লাগে।

শীত লাগে আজরফ ?

নাহ।

মাথাডা গামছা দিয়া বাঁধ। মাথা শুকনা থাকলে সব ঠিকঠাক। বুঝছস ?

বুঝছি।

বৈশাখ মাসের বিষ্টির মজাটা কী জানসনি আজরফ ?

না।

মজাটা হইল অসুখবিসুখ হয় না। সব আল্লাহর কেরামতি।

আজরফ কথা বলে না। ছৈয়ের ভেতর থেকে শরিফা বিড়বিড় করে কী যেন বলে। অসহ্য বোধ হয় মতি মিয়ার।

কী কও ?

পুলাডা ভিজতাছে।

দুত্তেরি মেয়েমানুষ। বিষ্টির সময় ভিজত না ?

অসুখ করব।

চুপ থাক মাগি, খালি প্যানপ্যানানি।

আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলে, মেয়েজাতের সাথে এইসব গালিগালাজ করা ঠিক না মতি।

তুমি ফরফর কইরো না, চুপ থাকো।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। ছপছপ বৈঠা পড়ে। ছৈয়ের ভেতর থেকে মুরগি দুটির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আসে। দূরের সোনাপোতার হাওরের দিক থেকে হঅ হঅ শব্দ হয়। গা ছমছম করে আজরফের। নৌকা এখন বড় গাঙ্গে পড়বে। জায়গাটা খারাপ। গাঙ্গের মুখটাতেই তিনটি প্রকাণ্ড শ্যাওড়াগাছ। রাতে নাম নেওয়া যায় না এমন সব বিদেহী জিনিসের খুব আনাগোনা।

নৌকা নীলগঞ্জে পৌঁছল দুপুরের পর। মতি মিয়ার নড়বার শক্তি নেই। একনাগাড়ে নৌকা বেয়ে সমস্ত শরীর কালিয়ে গেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার চিন্তা ছাড়া তার মাথায় এখন আর কিছু ঢুকছে না। আমিন ডাক্তার একাই গেল হাসপাতালে খোঁজ নিতে। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল মুখ কালো করে। হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব গেছেন ছুটিতে। কখন আসবেন কেউ জানে না। কম্পাউন্ডার সাহেবের মেয়ের বিয়ে। তিনি গেছেন বাঁশখালী। বিষ্যুৎবার নাগাদ আসবার কথা। মতি মিয়ার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে গম্ভীর মুখে বলল, চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করি নাই, কী কও ডাক্তার ? কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। করনের তো কিছু নাই।

আমিন ডাক্তার চুপ করে থাকল। মতি মিয়া বলল, খাওয়া-খাইদ্য শেষ কইরা চলো বাড়িত যাই।

মতি ভাই, চলো মিশনারি হাসপাতালে লইয়া যাই। বেশি দূর না, একটা মুটে হাওর পরে। সোনাদিয়া হাওর।

আমিন ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগেই মতি মিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠে, এইসব খিরিস্তানীর মইধ্যে আমি নাই। এইসব কথা মুখে আইন্য না, বুঝলা।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। শরিফারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। জারুল গাছের ছায়ায় নৌকা বেঁধে ভরপেট চিড়া খেয়ে মতি মিয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার পর। নৌকা তখন সোনাদিয়ার হাওরে পড়েছে। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। পাল খাটানো হয়েছে। আমিন ডাক্তার হাল ধরে বসে আছে। ভাবখানা এরকম যেন কিছুই জানে না।

মতি ভাই, বাতাসের এই ধরনের জোর থাকলে এক পহরেই মিশনারি হাসপাতালে পৌঁছোন যাইবে।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে।

তামুক খাইবা নাকি, কী ও মতি ভাই ?

নাহ।

মিশনারি হাসপাতালে একবার নিয়া ফেলতে পারলে বুঝলা আর চিন্তা নাই। হেইখানে নিখল সাব ডাক্তার খুব এলেমদার লোক।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে। আড়চোখে দেখে আজরফ কাল রাতের পরিশ্রমে কাহিল হয়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছে। শরিফার মুখের কাছে ভনভন করে মাছি উড়ছে একটা। মরে গেছে নাকি ? মরলেই কী আর বেঁচে থাকলেই কী ? হাওরের দিগন্তবিস্তৃত কালো পানির দিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায় তার। জগতসংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সে চাপাস্বরে গুনগুন করে,

লোকে আমায় মন্দ বলে রে
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে
আমি কোথায় যাব কী করিব
দুঃখের কথা কাহারে কব রে।
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে।

আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলে, তুমি কিন্তু বড় গাতক মতি ভাই।

২

মতি মিয়া পাঁচদিন পর গয়নার নৌকায় ফিরে এল।

সঙ্গে নুরুদ্দীন। নিখল সাব ডাক্তার (রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন) বলেছেন সারতে সময় নেবে। অবস্থা ভালো না। কাটাকুটি করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাসখানেক লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমিন ডাক্তারের নাকি তেমন কাজকর্ম নেই। সে নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে আসবে। মতি মিয়া অবাক হয়ে বলেছে, একমাস যদি থাকন লাগে তুমি খাইবা কী ?

হইব একটা ব্যবস্থা। রোগী ফালাইয়া তো যাওন যায় না।

ব্যবস্থা যে কী হবে মতি মিয়ার মাথায় আসে না। আমিন ডাক্তারের কাছে আছে সর্বমোট সাড়ে ন' টাকা। কিন্তু আমিন ডাক্তারকে মোটেই বিচলিত মনে হয় না। আজরফকে অবশ্যি নিখল সাব বাসায় কাজ দিয়েছেন। নদী থেকে সে গোসলের পানি তুলে আনে। বিকালে হাসপাতালের মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। যত ঘষাঘষিই করা হোক সাহেবের পছন্দ হয় না। মাথা নেড়ে বলেন, আরও ভালো করো। জোরে ব্রাশ করো।

খাওয়াদাওয়া সাহেবের এখানেই হয়। সে খাওয়াও রাজ রাজড়ার খাওয়া। সকালবেলা পাউরুটি, চিনি, একটা কলা আর এককাপ দুধ। সন্ধ্যাবেলা বইখাতা নিয়ে বসতে হয়। কালো মোটামতো একজন মহিলা অনেককে বর্ণপরিচয় শেখান। একটি ব্ল্যাক বোর্ডে প্রকাণ্ড একটা 'অ' লিখে সুরেলা স্বরে বলেন, 'বলো অ'। সবাই সমস্বরে বলে 'অ'। 'বলো আ'...।

আজরফের খুব মজা লাগে। পড়া শেষ হওয়ার পর হয় প্রার্থনা। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত করুণ সুরে টেনে টেনে বলেন,

হে পরম করুণাময় ঈশ্বর।
তুমি তোমার মঙ্গলময় করুণার হস্ত প্রসারিত করো।...

প্রার্থনার জায়গায় এলেই আজরফের ভয় ভয় করে। কে জানে এরা হয়তো 'খিরিশ্চান' করে ফেলছে। আমিন ডাক্তার অবশ্যি বলেছে ভয়ের কিছু না, খিরিশ্চানি প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে কলেমা তৈয়্যেব পড়লেই দোষ কাটা যাবে। আমিন ডাক্তারের মতো জ্ঞানী লোককে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। আজরফের আর ভয়-টয় করে না। ভয় করে মতি মিয়ার। কোনো কারণ ছাড়াই ভয় করে।

নৌকা ছেড়ে নড়তে চায় না। আমিন ডাক্তারের ঠেলাঠেলিতে শরিফাকে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড। হাসপাতালের বারান্দায় মুখভর্তি করে বমি করে। আমিন ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বলে, হইল কী তোমার মতি ভাই ?

বদ গন্ধ। মাথার মধ্যে পাক দেয়।

তোমারে নিয়া মুশকিল। ঐটা তো ফিনাইলের গন্ধ।

কিসের গন্ধ ?

ফিনাইল। এক কিসিমের সাবান। খুব ভালো জিনিস।

ভালো জিনিস মাথায় থাকুক। মতি মিয়া বাড়ি ফিরে বাঁচে, নুরুদ্দীন বাপের সঙ্গে ফিরে যেতে কোনো আপত্তি করে না। মতি মিয়া বারবার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি মন কান্দেনি নুরু ?

নাহ।

দুই দিন পরেই দেখবি আইয়া পড়ছে।

আইচ্ছা।

খুব বেশি হইলে এক হপ্তা। এর বেশি না।

আইচ্ছা।

যাত্রা দেখতে চাস ? মোহনগঞ্জে যাত্রা আইছে। বিবেকের পাঠ করে আসলাম মিয়া। ছয়টা সোনার মেডেল। দেখবি ?

নাহ।

না বললেও মতি মিয়া একরাত মোহনগঞ্জে থেকে যায়। এত কাছে এসে আসলাম মিয়ার বিবেকের গান না-শোনা পাপের শামিল। নিত্যিদিন তো আর এমন সুযোগ হয় না। মোহনগঞ্জ বাজারে দেখা হয়ে যায় কানা নিবারণের সাথে। সেও খুবসম্ভব আসলামের গান শুনতে এসেছে। সে একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনে বসে ছিল। তার মুখ দিয়ে ভক ভক করে দেশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ও নুরা দেখছস ? হই দেখ কানা নিবারণ।

কোন জন ?

কালামতো মোটা। লম্বা বাবরি।

চউখ তো দুইটাই আছে, ইনারে কানা নিবারণ ডাকে ক্যান ?

ছেলের কথায় মতি মিয়া বড়ই খুশি হয়। ছেলে চুপচাপ থাকলে কী হবে বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিকই আছে। মতি মিয়া হাসিমুখে বলে, মাইনষের খিয়াল। মাইনষের খিয়ালের কি ঠিক ঠিকানা আছে ? ছেলেকে দাঁড়া করিয়ে মতি মিয়া চলে যায় কানা নিবারণের সামনে।

দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক না।

নিবারণ বাই, শইলডা বালা ?

কানা নিবারণ কথা বলে না। ভ্রু কুঁচকে তাকায়।

চিনছেন আমারে ? আমি মতি। সোহাগীর মতি মিয়া।

কানা নিরারণ ঘোলাটে চোখে তাকায়। উত্তর দেয় না।

আসলাম মিয়ার গাওনা হুনতে আইছেননি নিবারণ ভাই ?

কানা নিবারণ সে-কথার জবাব দেয় না।

বাড়ি ফিরেও নুরুদ্দীন কোনোরকম ঝামেলা করে না। নিজের মনেই থাকে। মতি মিয়া বারবার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি পেট পুড়ে ?

নাহ।

মুখ শুকনা ক্যান ? নিশ্চয় পেট পুড়ে ?

নাহ।

মতি মিয়ার নিজেরই খারাপ লাগে। কিছুতেই মন বসে না। নইম মাঝির বাড়ি সন্ধ্যার পর গানবাজনার আয়োজন হয়। মতি মিয়া রোজ যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সেখানেও শুধুই যাই যাই করে।

সইন্ধ্যা কালে বাড়িত গিয়া করবাটা কী মতি ভাই ?

পুলাডা একলা আছে।

হে তো ঘুমাইতেছে। বও দেহি, হুক্কাডাত একটা টান দিয়া হারমুনিডা ধরো।

বাড়ি ফিরে তার ভালো লাগে না। কেমন উদাস লাগে। রাতের খাওয়া শেষ হলে এক আধ দিন রহিমার সাথে খানিক গল্পগুজব করে। রহিমা লম্বা ঘোমটা টেনে বারান্দায় বসে। কথা বলার সময় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে। মতি মিয়া তার গ্রাম-সম্পর্কে ভাশুর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব না। রহিমার সঙ্গে কথা বলতে মতি মিয়ার খারাপ লাগে না।

নিখল সাব কেমন ডাক্তার মতি ভাই ?

জব্বর ডাক্তার।

পরিষ্কার বাংলা কথা কয় ?

তা কয়।

গেরাইম্যা কথাও কইতে পারে ?

না। বুঝতে পারে।

দুনিয়াডাত কত কিসিমের জিনিসই না আছে মতি ভাই।

কথাডা ঠিক। খুব খাডি কথা।

নিখল সাব ডাক্তাররে দেখনের বড় শখ লাগে মতি ভাই।

তা একদিন যামুনে নিয়া। দুই দিনের মামলা।

দেখতে দেখতে মাস পার হয়ে যায়, ঘোর বর্ষা নামে। শরিফাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহের কথা বলে চৌধুরীদের একটা নৌকা নেওয়া হয়েছিল। চৌধুরীবাড়ির কামলা এসে রোজ হম্বিতম্বি করে।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি। কাজ কর্ম নাই। সোহাগীতে বোরো ধান ছাড়া কিছুই হয় না। ভাটি অঞ্চলগুলিতে তাই অগ্রহায়ণ না আসা পর্যন্ত অলস মন্থর দিন কাটে। মতি মিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে। শরিফাদের ফিরতে এতটা দেরি হওয়ার কারণ খুঁজে পায় না। বড়ই মন খারাপ লাগে তার। পাড়াপড়শিও খোঁজখবর করে।

বাচ্চা বিয়াইতে বাপের বাড়িতে গেলেও তো একমাসের মধ্যে ফিরে, কিন্তু ইদিকে যে মাসের উপর হইল। খোঁজখবর করো মতি। গাছের মতো থাইকো না।

নইম মাঝি একদিন ঠাট্টার ছলে অন্যরকম একটা ইঙ্গিত করে, মতি ভাই, আমি চিন্তা করতাছি আমিন ডাক্তারের সাথে নট খট কইরা দেশান্তরী হইল কি না। পালের নৌকা তো সাথেই আছে। হা হা হা।

গা রি রি করে মতি মিয়ার। নেহায়েত বন্ধুমানুষ বলে চুপ করে থাকে। নইম মাঝি বলে, রাগ করলা নাকি ও মতি ভাই। ঠাট্টা মজাক বুঝো না তুমি ?

না, রাগ ফাগ করি নাই।

আর বিবেচনা কইরা দেখো, আমিন ডাক্তারের সাথে ভাবি সাবের খাতির প্রণয় একটু বেশিই ছিল। হা হা হা।

হাইসো না নইম, এইসব হাসি মজাকের কথা না।

এই তো রাগ হইলা। ভাবির লগে রঙ্গ-তামাশা না করলে কার লগে করমু ?

হাসিঠাট্টা বুঝতে পারার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি মতি মিয়ার আছে। কিন্তু শরিফা এবং আমিন ডাক্তারকে নিয়ে এই জাতীয় ঠাট্টা সে সহ্য করতে পারে না। কারণ ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠাট্টা নয়। আমিন ডাক্তার কাজে অকাজে তার বাড়ি এসে গলা উঁচিয়ে ডাকবে, দোস্তাইন ও দোস্তাইন। চায়ের পাতা নিয়ে আসলাম। জবর পাতা। একটু চা খাওন দরকার। ঘরে গুড় আছে ?

মতি মিয়ার অসংখ্যবার ইচ্ছা হয়েছে আমিন ডাক্তারকে ডেকে বলে দেয় যাতে সময়ে অসময়ে এইভাবে না আসে। কিন্তু কোনোদিন বলা হয় নাই। এটা অত্যন্ত ছোট কথা। আমিন ডাক্তারের মতো বন্ধুমানুষকে এমন একটা ছোট কথা বলা যায় না।

শরিফাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মতি মিয়া অনেক কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। গানবাজনা এখন আর ভালো লাগে না। নিখল সাব ডাক্তারের হাসপাতালে চলে গেলে হয়। মেলা খরচার ব্যাপার।

আবার একটু লজ্জা লজ্জাও করে। নুরুদ্দীনকে আড়ালে একবার জিজ্ঞেস করে, ও নুরা মারে আনতে যাইবি ?

নাহ।

না কী ব্যাটা ? মার লাগি পেট পুড়ে না ? কস কী হারামজাদা। মায়া মুহব্বত কিছুই দেহি তর মইধ্যে নাই।

নুরুদ্দীন মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখে মনেই হয় না মায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করেছে।

নুরুদ্দীন রহিমার মেয়ে অনুফার সাথে গম্ভীর মুখে সারা দিন খেলাধুলা করে। দুপুরের দিকে প্রায়ই দেখা যায় নুরুদ্দীন গাঙের পাড়ের একটি জলপাই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে অনুফা। দুইজনেই নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলছে। মতি মিয়া বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছে ব্যাপারটি। একদিন নুরুদ্দীনকে ডেকে ধমকেও দিল, গাছের মধ্যে বইয়া থাকস বিষয়ডা কী ?

নুরুদ্দীন নিরুত্তর।

দুপুরবেলা সময়ডা খারাপ। জিন ভূতের সময়, হেই সময় গাছে বইয়া থাকনের দরকার কী ?

নুরুদ্দীন চোখ পিটপিট করে। কথা বলে না।

খবরদার আর যাইস না।

আইচ্ছা।

তবু নুরুদ্দীন যায়। জলপাই গাছের নিচু ডালটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আপন মনে কথা বলে। গাছের গুড়িতে বসে থাকে অনুফা। ক্ষণে ক্ষণে ফিকফিক করে হাসে। মতি মিয়া ঠিক করে ফেলে নুরুদ্দীনের জন্যে একটা তাবিজ টাবিজের ব্যবস্থা করা দরকার। লক্ষণ ভালো না। রহিমার সঙ্গেও এই বিষয়ের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। মতি মিয়া আড়াল থেকে শুনেছে রহিমার সঙ্গে সে হড়বড় করে অনবরত কথা বলে। রাতেরবেলা কাঁথা বালিশ নিয়ে রহিমার সঙ্গে ঘুমোতে যায়। এতটা বাড়াবাড়ি মতি মিয়ার ভালো লাগে না।

রহিমা মেয়েটি অবশ্যই খুবই কাজের। এই কয়দিনেই সে বাড়ির চেহারা পাল্টে ফেলেছে। পুবের ঘরের সামনে আগাছার যে জঙ্গল ছিল তার চিহ্নও নেই। চার-পাঁচটা কাগজি লেবুর কলম লাগিয়েছে সারি করে। বাড়ির পেছনের রান্নার জায়গাটা দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ঘাটে যাওয়ার পথটায় সুন্দর করে ইট বসানো। ইটগুলি যোগাড় হয়েছে কোত্থেকে কে জানে ? মতি মিয়ার ইচ্ছা করে রহিমাকে এই বাড়িতেই রেখে দিতে। শরিফার ঘরের লাগোয়া একটা ছোটমতো চালাঘর তুলে দিলেই হয়। শরিফা কিন্তু রাজি হবে না। কেঁদেকেঁটে বাড়ি মাথায় করবে। কারণ রহিমার বয়স অল্প এবং সে সুন্দরী। একটি সুন্দরী এবং অল্পবয়েসী মেয়েকে জেনেশুনে কোনো বাড়ির বৌ নিজের বাড়িতে রাখবে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে উপস্থিত। তাকে আর চেনার উপায় নেই। গায়ে বড় একটা কটকটে লাল রঙের কোট। কোটটির ঝুল নেমে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। চোখে সোনালি রঙের একটি নিকেলের চশমা। কোটটি নিখল সাব আসবার সময় দিয়েছেন। চশমাটি হাসপাতালে খুঁজে পাওয়া।

চশমায় সব জিনিস কেমন যেন ঘোলাটে দেখায়। কোটের সঙ্গে চশমা না থাকলে মানায় না বলেই গ্রামে ঢুকবার মুখে আমিন ডাক্তার চোখে চশমা দিয়ে নিয়েছে।

মতি মিয়া নইম মাঝির ঘরে তাস খেলছিল। খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে। এত রাতেও আশেপাশের দুএক ঘরের মেয়েছেলেরা এসে জড়ো হয়েছে। নুরুদ্দীন কাঁচা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে আছে।

শরিফা ঘরের ভেতরে চৌকির ওপর বসেছিল। মতি মিয়াকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন কোনো কারণে লজ্জা পাচ্ছে। মতি মিয়া অবাক হয়ে দেখল, শরিফার গোল মুখটা কেমন যেন লম্বাটে লাগছে। চুল অন্যভাবে বাঁধার জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক শরিফাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, শরীলডা বালা ?

শরিফা জবাব দিল না।

কি, শরীলডা বালা ?

শরিফা থেমে থেমে বলল, পাওডা কাইট্টা বাদ দিছে।

মতি মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। সত্যি সত্যি শরিফার একটা পা নেই।

শরিফা বলল, বাঁচনের আশা আছিল না। কপালে আরও দুঃখ আছে হেই কারণে বাঁচলাম। তোমার শইলডা কেমন ?

মতি মিয়া চুপ করে রইল। সে তখনো শরিফার একটি পা যা শাড়ির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে। সেই পা-টিতে আবার টুকটুক একটা নতুন স্যান্ডেল। শরিফা থেমে থেমে বলল, রহিমা ওখনো এই বাড়িত ক্যান ? তারে বিদায় দেও নাই ক্যান ? যুবতী মাইয়া মানুষ নিয়া এক ঘরে থাকছ কাজটা ভালো করো নাই। রহিমারে কাইল সক্কালেই বিদায় দিবা, বুঝছ ?

মতি মিয়া জবাব দিল না। শরীফা চিকন সুরে বলল, আর নুরার শইলডা কেমুন খারাপ হইছে। আমি ডাক দিছি হে আসে নাই। দৌড় দিছে রহিমার দিকে। এইসব বালা লক্ষণ না। রহিমা তার কেডা ?

৩

রহিমা তার পুঁটলি গুটিয়ে মেয়ের হাত ধরে চৌধুরীবাড়ি চলে গেল। তার নিজের বাড়িঘর কিছু নেই। চৌধুরীদের দালানের শেষ মাথায় একটি অন্ধকার কুঠুরিতে সে মাঝে মধ্যে এসে থাকে। চৌধুরীরা কিছু বলে না। যতদিন এখানে থাকে ততদিন যন্ত্রের মতো এ বাড়ির কাজকর্ম করে, যেন এটিই তার বাড়িঘর।

এক নাগাড়ে অবশ্যি বেশিদিন থাকতে হয় না। গ্রামের কোনো পোয়াতি মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। কাজকর্মের লোক নেই। রহিমাকে খবর দেয়। রহিমা তার ছোট্ট পুঁটলি আর মেয়ের হাত ধরে সে বাড়িতে গিয়ে ওঠে। রান্নাবান্না করে। শামুক ভেঙে

হাঁসকে খাওয়ায়। ছাগল হারিয়ে গেলে হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজতে বের হয়। যেন নিতান্তই সে এই ঘরেরই কেউ। নতুন বাচ্চাটি একদিন শক্ত সমর্থ হয়ে ওঠে, রহিমাকে মেয়ের হাত ধরে আবার ফিরে আসতে হয় চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, এখন আর লাগে না।

দীর্ঘদিন পর আজ এই প্রথম রহিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মতি মিয়ার ঘরবাড়ি কোনো এক বিচিত্র কারণে তার কাছে আপন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এখানে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে চমৎকার হতো। তার কপালটা এরকম কেন ?

নতুন বউ হয়ে যখন আসে, অনুফার বাবা তখন কামলা মানুষ। বউ তোলার জায়গা নেই।

মানুষটা নতুন বৌকে চৌধুরীদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেছে ঘর দুয়ারের ব্যবস্থা করতে। চৌধুরী সাহেব মহা বিরক্ত, নতুন বৌয়ের সামনেই ধমকাচ্ছেন, অগ্রহায়ণ মাসে এমন কাম কাজের সময় কেউ কি বিয়া শাদি করে ? তোর মতো আহম্মক খোদার আলমে নাই রে মনু।

লোকটা দাঁত বের করে হাসে। চৌধুরী সাহেব প্রচণ্ড ধমক দেন, হারামজাদা হাসিস না! আমার পুবের একটা ঘর খালি আছে, বৌরে সেইখানে নিয়া তোল।

চদুরী সাব, নিজের একটা ঘরে নিয়া তুলনের ইচ্ছা। বাঁশ টাশ যদি দেন তো একটা ঘর বানাই।

চৌধুরী সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, ঘর তুলবি জায়গা জমি কই ? ঘর তুলবি কিসের উপর ?

আমার বসতবাড়ির লাগি একটুখানি জায়গাও যদি দেন। ধীরে ধীরে দাম শোধ করবাম।

বলতে বলতে লোকটা হাসে। যেন খুব একটা মজার কথা বলছে। চৌধুরী সাহেব অবশ্যি তাকে জায়গা দেন। মসজিদের কাছের এক টুকরো পতিত জমি। লোকটা ঘরামির কাজে খুব ওস্তাদ ছিল। দেখতে দেখতে বাঁশ কেটে চমৎকার একটা ঘর তুলে ফেলল। নতুন কাটা কাঁচা বাঁশের গন্ধে রহিমার রাতে ঘুম আসে না। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। লোকটির অবশ্যি ফুর্তির সীমা নেই। দুপুররাতে কুপি জ্বালিয়ে বাঁশের কঞ্চি কাটছে। ঘরের চারদিকে বেড়া দেবে। বিশ্রাম কী জিনিস সে জানত না।

কিন্তু সেই বৎসর খুব কাজে ফাঁকি দিল। চৌধুরীদের তখন জালা বোনা হচ্ছে। দম ফেলার সময় নেই। কাজে বিরাম দিয়ে এক দণ্ড যে হুকা টেনে শরীর গরম করবে সে অবসরটাও নেই। এর মধ্যেই দেখা গেল মনু উধাও। অন্য মনিব হলে কী হতো বলা যায় না, চৌধুরী সাহেব বলেই দেখেও দেখেন না। পুরুষমানুষ দিনেদুপুরে বাড়ি

এসে বৌয়ের সঙ্গে গল্প—কী লজ্জার কথা। রহিমা শরমে মরে যায়। কিন্তু লোকটার লাজ লজ্জার বালাই নেই। একরাত্রে রহিমাকে জোর করে নৌকায় তুলে বড় গাঙ পর্যন্ত চলে গেল। চাঁদনি রাতে নৌকা বাওয়ার মধ্যে খুব নাকি আনন্দ। আনন্দ ছিল ঠিকই। নদীর জলে ভেঙে পড়া জ্যোৎস্না, দূরের বিল থেকে ভেসে আসা হঅ হঅ শব্দ, দুই পাশে গাছগাছালির গায়ে মাখা অদ্ভুত এক জ্যোৎস্না ভেজা অন্ধকার। কী যে ভালো লেগেছিল রহিমার। এর মধ্যে ঐ লোক আবার ভাঙা গলায় গান ধরল। সুর-তাল কিছুই নেই, তবু সেই গান শুনে বারবার চোখ ভিজে উঠল রহিমার।

মানুষটি বড় শৌখিনদার ছিল। দুটাকা দিয়ে একবার এক গায়েমাখা সাবান কিনে আনল। কী বোটকা গন্ধ, গা বমি বমি করে। আরেকবার কিনল হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রবারের জুতো। এই পাঁক-কাদার দেশে কেউ জুতো কিনে ? সরকারবাড়ির নেজাম সরকার পর্যন্ত খালি পায়ে মাঠে যান ক্ষেত দেখতে। জুতো কেনার পর থেকে মচমচ শব্দে লোকটা শুধু হাঁটে। চৌধুরী সাহেব একদিন ডেকে বললেন, টেকাপয়সা জমাইবার অভ্যাসটা কর মনু। নিজের একটা বাড়িঘর কর। বিয়াশাদি করছস দায় দায়িত্ব আছে। খামাখা এই জুতাডা কিনলি ক্যান ?

জুতাডা চদুরী সাব হস্তায় পাইছি। খুব কামের। পানির মইধ্যে হারাদিন থাকলেও এক ফোঁডা পানি ডুকত না।

এইসব ধান্ধা বাদ দে মনু।

লোকটার স্বভাব তবু বদলায় না। ভাদ্র মাসে ছাতি কিনে ফেলল একটা। বাহারি ছাতি। বাঁটের মধ্যে হরিণের মুখ। বড়ই রাগ হয় রহিমার। কিন্তু কার ওপর রাগ করবে ? এই লোক কি রাগ টাগ কিছু বুঝে ? চৌধুরী সাহেব খুব বিরক্ত হন।

বৃষ্টিবাদলা কিছু নাই। শুকনা দিন। মাথার মইধ্যে ছাতি কেন রে মনু ?

নয়া কিনছি চদুরী সাব। পাইকারি দরে দিছে।

তোর কপালে দুঃখ আছে মনু।

হা হা করে হাসে মনু। যেন ভারি একটা মজার কথা শুনল।

সেই লোক কোথায় যে হারিয়ে গেল।

গয়নার নৌকায় মোহনগঞ্জ গিয়েছে পরদিন ফেরার কথা। আর ফিরে নাই। দেখতে দেখতে মাস শেষ হলো। কোনো খোঁজই নেই। কী কষ্ট কী কষ্ট! অনুফা তখন পেটে। রাতের পর রাত জেগে বসে থাকে রহিমা। খুট শব্দ হলেই লাফ দিয়ে উঠে, এল বুঝি। কত রকম উড়ো খবর আসে। একবার শুনল, বাজারের একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকে। সেই মেয়ে মানুষটা চোখে সুরমা দেয় ঘাগড়া পরে। আবার একবার শুনল আসাম গেছে। আসামে কাঠের ব্যবসা করে।

হয়তো তাই একদিন টাকাপয়সা নিয়ে গভীর রাতে রবারের জুতোয় মচমচ শব্দ করে লোকটা উপস্থিত হবে। রহিমা যত রাগই করুক লোকটা গলা ফাটিয়ে হাসবে হা হা হা।

বৈশাখ মাসে অনুফার জন্ম হলো। চৌধুরী সাহেব বললেন, বাচ্চা নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে। রহিমা রাজি নয়। হঠাৎ যদি কোনোদিন লোকটা এসে উপস্থিত হয় তখন ?

গায়ের সবাই সাহায্য করেছে। চালডাল তরিতরকারি—অভাব কিছুরই হয়নি। চৌধুরী সাহেব মেয়ের মুখ দেখে ২০টি টাকা দিলেন। আমিন ডাক্তারের মতো হতদরিদ্র লোকও পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল।

অনুফা একটু বড় হতেই অন্যরকম ঝামেলা শুরু হলো। গভীর রাত্রে ঘরের পাশে কে যেন হাঁটাহাঁটি করে। খুট খুট করে দরজায় শব্দ। ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে রহিমা।

কেডা গো, কেডা ?

আর কোনো সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত যেতে হলো সুরুজ মিয়ার বাড়ি। চৌধুরী সাহেবের ওখানে যেতে সাহসে কুলোয় না। ছোট চৌধুরী পাগল মানুষ। কোনো কোনো সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে রাখতে হয়।

সুরুজ মিয়ার স্ত্রীটি চিররুগ্ন। তার দুবছরের ছেলেটিও সেরকম । রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। রহিমার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত রইল না। ধান কাটার সময় তখন। সুরুজ মিয়া অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। তিন-চারজন উজান দেশী জিরাতি কামলা তার। সকাল থেকে দুপুররাত পর্যন্ত খাটা খাটনি করতে হয় রহিমাকে। খারাপ লাগে না। কিন্তু এক গভীর রাত্রে সুরুজ মিয়া এসে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। স্তম্ভিত রহিমা কিছু বুঝবার আগেই সুরুজ মিয়া তার মুখ চেপে ধরল, শব্দ কইরো না, মাইয়া জাগব!

মেয়ে অবশ্যি জাগল না। একসময় অন্ধকার ঘরে বিড়ি ধরাল সুরুজ মিয়া। ফিসফিস করে বলল, পাপ যা হওনের হেতো আমার হইল, তুমি কান্দ ক্যান ? শরীরের মইধ্যে কোনো দোষ লাগে না। বুঝছ ?

রহিমা চলে এল চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। ছোট চৌধুরী লাল চোখে ঘুরে বেড়ায়। রহিমার আর ভয় লাগে না। অনুফাকে মাঝে মাঝে তাড়াও করে। অনুফা খেলা মনে করে খিলখিল করে হাসে। ছোট চৌধুরী চোখ বড় বড় করে বলে, হাসিস না হারামজাদি বিচ্ছু। খবরদার হাসিস না।

একসময় সেই লোকটির চেহারাও রহিমার মনে রইল না। মাঝে মাঝে খুব যখন ঝড়বৃষ্টি হয়, বিলের দিক থেকে শাঁ শাঁ শব্দ ওঠে, তখন ভাবতে ভালো লাগে লোকটা রবারের জুতো পায়ে দিয়ে মচমচ করে যেন এসেছে। অসম্ভব তো কিছুই নয়। হারিয়ে যাওয়া মানুষ তো কতই ফিরে আসে।

কিংবা কে জানে সেই লোকটি হয়তো কোনো এক ভিন দেশে গিয়ে আমিন ডাক্তারের মতো মহাসুখে আছে। আমিন ডাক্তার যেমন একদিন গয়নার নৌকায় করে সোহাগীতে উপস্থিত হলো তারপর আর যাওয়ার নাম করল না। কে জানে সেও

উজান দেশে তার বৌ মেয়ে ফেলে এসেছে কি না। হয়তো তারাও অপেক্ষা করে আছে কবে ফিরবে আমিন ডাক্তার। রহিমার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

৪

শরিফার কিছুই ভালো লাগে না।

এটি যেন তার নিজের বাড়ি নয়। যেন সে বেড়াতে এসেছে। পাড়া প্রতিবেশী বৌঝিরাও কেমন যেন সমীহ করে কথা বলে। একটু দূরত্ব রেখে বসে। নানান কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, কাটা পাওডা কই ফালাইয়া আসছ ?

শরিফার অসহ্য বোধ হয়। সরু গলায় বলে, হাসপাতালেই রাইখ্যা আইলাম। সাথে আইনা কী করবাম ?

নইমের বৌ ভীত স্বরে বলে, পাওডারে কবর দিছে ?

শরিফার কাঁদতে ইচ্ছা করে। এক পা নিয়ে কাজকর্ম সে কিছুই করতে পারে না। সারা সকাল লেগে যায়, ভাত ফুটাতে। থালাবাসন ধোবার জন্যে আজরফকে কলসি দিয়ে পানি এনে দিতে হয়। হাসপাতালে থাকার সময় এইসব ঝামেলার কথা তার মনে হয়নি। আমিন ডাক্তার সব দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে বলল, রহিমারে খবর দিয়া আনা দরকার দোস্তাইন।

না।

কিছুদিন সে থাকুক।

কইলাম তো—না।

সুবিধার লাগিন কইতাছি।

আমার সুবিধা দেখনের দরকার নাই।

শরিফা কাঁদতে শুরু করল। তার একটি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। প্রায়ই যে-কোনো প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে শেষ পর্যায়ে কাঁদতে শুরু করবে।

দোস্তাইন কান্দনের কারণ তো কিছু নাই।

যার আছে হে বুঝে।

ইদানীং শরিফার মনে ধারণা হয়েছে মতি মিয়া তাকে এখন আর দেখতে পারে না। গত রাত্রে মতি মিয়া বারান্দায় বসেছিল। শরিফা তিনবার গিয়ে ডাকল। তিনবারই সে বিরক্ত হয়ে বলল, ঘুমাইবার সময় হউক—সইন্ধ্যা রাইতেই ডাক ক্যান ? আমি তো আর নয়া শাদি করি নাই—সইন্ধ্যা রাইতেই ঘরে খিল দেওনের যোগাড় করবাম।

কী কথার কী জবাব। শুধু মতি মিয়া ? আজরফ পর্যন্ত তার কথার জবাব দেয় না। এক কথা দশবার জিজ্ঞেস করতে হয়।

একদিন দেখা গেল আজরফ বাঁশ আর চাটাই দিয়ে ঘরের লাগোয়া নতুন একটা চালা ঘর তুলছে। নুরুদ্দীন মহা উৎসাহে এটা ওটা আগিয়ে দিচ্ছে। মতি মিয়া হুকা হাতে দাওয়ায় বসে তদারক করছে। ঘরে নতুন কাজকর্ম হলে আজকাল আর কেউ শরিফাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। শরিফা মুখ কালো করে বলল, আজরফ ঘর তুলতাছস ক্যান ?

আজরফ জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায়নি।

আজরফ, নয়া ঘর তুলনের দরকারডা কী ?

জবাব দিল মতি মিয়া, পুলাপান বড় হইতাছে একটা ঘর তো দরকার।

শরিফা লক্ষ করল নুরুদ্দীন মুখ টিপে হাসছে।

বিষয়টা কী নুরা ?

নুরুদ্দীন দাঁত বের করে হাসল।

ঘর উঠতাছে রহিমা খালার লাগি। রহিমা খালা আর অনুফা থাকবে।

শরিফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। মতি মিয়া থেমে থেমে বলল, তোমার সুবিধা হইব খুব। ঘরের কাজকাম দেখব।

আমি বাইচ্চা থাকতে এই বাড়িতে কেউ আসত না।

মতি মিয়া বলল, আইজ সইন্ধ্যায় আইব। খামাখা চিল্লাইও না।

আমি গলাত দড়ি দিয়াম কইতাছি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে ডাকল, আজরফ।

জি।

তোর মারে বালা দেইখ্যা একটা দড়ি দে দেহি।

রহিমা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়ল।

সে তার যাবতীয় সম্পত্তিও সঙ্গে এনেছে। একটি টিনের ট্রাঙ্ক, ছয়-সাতটি ছোটবড় পুঁটলি, হাঁড়ি, ডেকচি। অনুফার হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছাগল। রহিমা শরিফার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, বুজির শইলডা বালা ?

শরিফা কোনো কথা বলল না। রাতে খাওয়ার সময় বলে পাঠাল তার খিদে নেই। অনেক রাত্রে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। শরিফা শুনল নতুন চালাঘরে খুব হাসাহাসি হচ্ছে। মতি মিয়া কী একটা বলছে, সবাই হাসছে। সবচেয়ে উঁচু গলা হচ্ছে নুরুদ্দীনের।

অনেক রাত্রে মতি মিয়া যখন ঘুমাতে এল শরিফা তখনো জেগে। কুপি নিবিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শরিফা ক্ষীণস্বরে বলল, একটা কথার সত্যি জবাব দিবা ?

কী কথা ?

তুমি কি রহিমারে বিয়া করতে চাও ?

মতি মিয়া দীর্ঘসময় চুপচাপ থেকে বলল, হ।

তুমি রহিমারে এই কথা কইছ ?

না, আমিন ডাক্তার কইছে রহিমার মত নাই। তার ধারণা মনু বাইচ্চা আছে।

মতি মিয়া হুকা ধরাল। শরিফা ধরা গলায় বলল, বিয়াডা কবে ?

মত না থাকলে বিয়াডা হইব কেমনে ?

আইজ মত নাই একদিন হইব।

মতি মিয়া নির্বিকার ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে লাগল। শরিফা সারা রাত জেগে বসে রইল।

৫

গোটা জ্যৈষ্ঠ মাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি।

বৃষ্টিবাদলা না হলে জ্বরজারি হয় না। রোগী পত্র নেই, আমিন ডাক্তার মহাবিপদে পড়ে গেল। হাত একেবারে খালি। চৌধুরীবাড়িতে ত্রিশ টাকা কর্জ হয়েছে। গত বিশদিনে রোগী এসেছে মাত্র একটি। সুখান পুকুরের আছিমুদ্দীনের মেজ ছেলে। ভিজিটের টাকা দূরে থাক ওষুধের দামটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অছিমুদ্দিন নিমতলীর পীর সাহেবের নামে কিরা কেটেছে হাটবার দিন সকালবেলা এসে দিয়ে যাবে। নিমতলীর পীর জ্যান্ত পীর। তার নাম নিয়ে টালবাহানা করা যায় না। কিন্তু অছিমুদ্দীন লোকটি মহাধুরন্ধর। আজ নিয়ে তিন হাট গেল তার দেখা নেই।

আমিন ডাক্তার শুকনো মুখে সারা হাট খুঁজে বেড়ায়। হাটের দিন চাষা-ভুষার মতো থাকা যায় না। দশ গ্রামের লোকজন আসে। নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। কাজেই হাটবারগুলিতে আমিন ডাক্তার একটু বিশেষ সাজসজ্জা করে। আজকে দেখা গেল আমিন ডাক্তারের গায়ে এই গরমেও একটি লাল কোট। হাতে ডাক্তারি ব্যাগটা কায়দা করে ধরা। ব্যাগটিতে ইংরেজিতে লেখা—

ডাক্তার এ রহমান

প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার

আমিন ডাক্তারের চোখে নিকেলের চশমা। লোকজন ঠাহর হয় না। বারবার দেখতে হয়। অছিমুদ্দীনের মেছো হাটায় থাকার কথা। সেখানে পাওয়া গেল সিরাজুল ইসলামকে। সিরাজুল ইসলাম নিমতলীর ডাক্তার। সমগ্র ভাটি অঞ্চলে তার নামি ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি। লোকটি ছোটখাটো, টেনে টেনে অত্যন্ত কায়দা করে কথা বলে। সিরাজুল ইসলাম আমিন ডাক্তারকে দেখামাত্র একগাল হেসে বলল, এই গরমের মধ্যে এমন কোট ? সর্দি গর্মি হয়ে মরবেন, বুঝলেন ?

আমিন ডাক্তার হাটের দিনগুলিতে যথা সম্ভব শহুরে কথা বলতে চেষ্টা করে। চারদিকে লোকজন আছে। ডাক্তার শহুরে কথা বললে এরা খুব সমীহ করে।

শরীরটা খারাপ জ্বর জ্বর ভাব—ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে এই জন্যেই গরম কাপড় পরলাম।

চশমা নতুন নিলেন নাকি ?

হুঁ।

সিরাজুল ইসলাম খিলখিল করে হাসতে লাগল। এর মধ্যে হাসির কী আছে আমিন ডাক্তার বুঝতে পারল না।

হাসেন কেন ?

হাসি এলে হাসব না ? বলছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে কীভাবে ? আরে এখনো ইনফ্লুয়েঞ্জাই চিনলেন না ডাক্তারি করেন কীভাবে ? হা হা হা। যেমন দেশ তেমন ডাক্তার।

সিরাজুল ইসলামের হাসির শব্দে লোক জমে গেল। আমিন ডাক্তার চট করে সরে পড়ল। মেছো হাটায় অছিমুদ্দীকে পাওয়া গেল না। অথচ তার এখানেই থাকার কথা। কারণ ছাড়া এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করা যায় না। আমিন ডাক্তার এক প্রকাণ্ড রুই মাছ দাম করে ফেলল। গম্ভীর গলায় বলল, মাছ কত রে ?

মাছ বিক্রি করছিল নিমতলীর জলিল। সে দাম না বলে মাছ গেঁথে ফেলল।

আপনের সাথে দর দাম কী ডাক্তার সাব ? যা হয় দিবেন।

আরে ইয়ে এত বড় মাছ। দাম টাম বল শুনি।

হুনাহুনির কিছু নাই। বড় গাঙের মাছ, এর সুআদই আলাদা।

আমিন ডাক্তার পড়ে গেল মহাবিপদে। বহু কষ্টে মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, মুছিবত হয়ে গেল দেখি। টাকা তো আনতে মনে নেই। কী যেন বলে ভুলে বোধহয় বাড়িতে ফালাইয়া আসছি।

মুছিবত কিছু না ডাক্তার সাব, টেকা আপনে পরের হাটে দিয়েন।

আমিন ডাক্তার মাছ হাতে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে রইল। একবার মনে হলো অছিমুদ্দীনের মতো দেখতে কে যেন হুট করে তরকারি হাটার দিকে চলে গেল। এত প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে অছিমুদ্দিনকে খুঁজে বের করার আর উৎসাহ রইল না। মাছ কেনাটা অবশ্য পুরোপুরি বৃথা গেল না। সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দেখা হয়ে গেল।

মাছটা কিনলেন নাকি ডাক্তার সাব ?

তা কিনলাম।

হুঁ, রোজগার পাতি ভালোই মনে হয় ?

আমিন ডাক্তার যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলল, পাই কিছু। না পাইলে কি আর ভাটি অঞ্চলে পইড়া থাকি ?

সিরাজুল ইসলাম শুকনো মুখে চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার হৃষ্টচিত্তে সারা হাটে দুটি চক্কর দেয়। হাতে যে একটা পয়সা নেই, চৌধুরীদের কাছে ত্রিশ টাকা কর্জ সেইসব আর মনে থাকে না। মুখের উপর অতিরিক্ত একটা গাম্ভীর্য টেনে আনে। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর হয়ে বলে, কি ভালো ?

কেডা, ডাক্তার সাব না ?

হুঁ। ছিলাম না অনেক দিন। নিখল সাব ডাক্তারের কাছে ছিলাম। নতুন চিকিৎসাপাতি শিখলাম। সাহেব খুব স্নেহ করতেন আমাকে। ডাক্তার ডাক্তারের মর্যাদা বুঝে তো। অশিক্ষিত মূর্খ তো নয়। কী বলো ?

গো হাটার কাছে দেখা হলো মতি মিয়ার সঙ্গে। মতি মিয়ার কেমন যেন দিশাহারা ভাব। এতবড় একটা মাছ আমিন ডাক্তারের হাতে তা মতি মিয়ার চোখেই পড়ল না।

ডাক্তার, তোমার সাথে একটা জরুরি আলাপ আছে।

আমিন ডাক্তার ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল, তোমার কাছে সাড়ে পাঁচ টাকা পাই মতি। টাকার আমার বিশেষ দরকার।

তোমারে কখন থাইক্যা খুঁজতাছি। আছিলা কই ?

বুঝলা মতি অসুদের জন্যে তিন টাকা আর তোমার...

কথা শেষ হওয়ার আগেই মতি মিয়া আমিন ডাক্তারকে টেনে একপাশে নিয়ে আসে। গলার স্বর দুইধাপ নিচে নেমে যায়। বিষয়টি সত্যি জরুরি। 'রূপকুমারী' যাত্রাপার্টির অধিকারী খবর পাঠিয়েছে মতি মিয়া যদি বিবেকের পাঠ করতে চায় তাহলে যেন অতি অবশ্যি মোহনগঞ্জ চলে আসে। আগের বিবেক চাকরি ছেড়ে চলে গেছে বলেই এই সুযোগ।

বুঝলা ডাক্তার, বিবেকের পাঠে মোট দশ খান গান।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, আমারে কী জন্যে দরকার সেটাই তো মতি ভাই বুঝলাম না।

শরিফারে একটু বুঝাইয়া কইবা। তোমারে খুব মানে।

তুমি নিজেই কও।

আমি কই ক্যামনে ? আমার সাথে তো কথাই কয় না।

আবার হইল কী ?

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমারে বিয়া করবাম হেইডা শোনার পরে ঝামেলা।

আমিন ডাক্তার আকাশ থেকে পড়ল।

রহিমারে শাদি করবা ? এই কথা তো আগে কও নাই।

মজাক কইরা কইছি। হাসি তামাশার কথা।

তুমি লোকটা অদ্ভুত মতি ভাই।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, অদ্ভুতের কী দেখলা ? অন্যায়টা কী কইছি ? আমার বাড়িত সারা জীবনের লাগি থাকব। বউ হইয়া থাকনটা বালা না ?

আমিন ডাক্তার চুপ করে রইল। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমা রাজি আছে কি না হেইডাও তুমি একটু জাইন্যা দিবা, বুঝছ ?

কীসব কথা যে তুমি কও মতি ভাই।

মতি মিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল, আইজ রাইতেই আইবা, ঠিক তো ?

দেখি।

দেখাদেখির কিছুই নাই আইবা আইজ।

আইচ্ছা।

মাছটা কিনলা নাকি ডাক্তার ? বিষয় কী ?

বিষয় কিছু না মাছটা লইয়া যাও। দোস্তাইনরে কইও রাইত তোমরার সাথে ভাত খাইয়াম।

অতবড় মাছ কিনলা তোমার হুনছি টেকাপয়সা কিছুই নাই।

আমিন ডাক্তার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আগামী হাটবারে টাকার কী হবে কে জানে ?

বাড়ি ফিরতে দেরি হলো। মতি মিয়া জোর করে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। একআনা করে কাপ। সেই সঙ্গে দুই পয়সা করে একটা টোস্ট বিস্কুট।

দোকানের চায়ের সুআদই আলাদা, কী কও ডাক্তার ?

হুঁ।

আরেক কাপ খাইবা ?

নাহ।

আরে খাও। এই আরও দুইটা দে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মতি মিয়া অস্বাভাবিক নিচুস্বরে বলল, বাজারে তিনটা মাইয়া আইছে দেখছ ? হাটবার দেইখ্যা আইছে রঙতামাশা করতাছে।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে তাকাল।

মতি মিয়া বলল, বাজারের মেয়ে মানুষ ছাড়া কি হাট জমে কও দেহি ? এর মইধ্যে একটার নাম ফুলন। কাঁচা হলদির লাহান গায়ের চামড়া। আর চুল কী!

তুমি এত কিছু জানলা ক্যামনে ?

আহ, দেখলাম। দূর থাইক্যা দেখলাম। তুমি কি ভাবছ গেছিলাম ? মাবুদে এলাহি।

চা গলায় লেগে মতি মিয়া বিষম খেল।

মেয়ে তিনটি নৌকা নিয়ে এসেছে। সেজেগুজে নৌকার সামনে বসে আছে দুজন। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল একটি মেয়ে সত্যি অপূর্ব। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবী প্রতিমার মতো লাগছে। মতি মিয়া আমিন ডাক্তারের হাতে একটি মৃদু চাপ দিয়ে বলল, চউখ ট্যারা হইয়া যায়, কী কও ডাক্তার ? ফুলনের আরেকটা নাম হইল গিয়া তোমার পরীবানু।

তুমি জানলা ক্যামনে ?

হুনছি। হুনা কথা।

উত্তর বন্দে নেমে মতি মিয়া গুনগুন করে গান ধরল,

ও কইন্যা সোনার কইন্যা রে
ও কইন্যা রূপের কইন্যা রে

মতি মিয়ার গলা ভালো, আমিন ডাক্তারের মনটা উদাস হয়ে গেল।

৬

কাল সারা রাত শরিফার ঘুম হয়নি।

ইদানীং প্রায়ই এ রকম হচ্ছে। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করে কাটে। পাশেই মতি মিয়া গাছের মতো ঘুমায়। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাল রাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত গায়ে ধাক্কা দিয়ে মতি মিয়ার ঘুম ভাঙাল। মতি মিয়া ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, কী হইছে ?

বাংলাঘরে কী যেন শব্দ করে। মনে লয় চোর আইছে।

আছে কী আমার, চোর আইব, ঘুমাও।

দেইখ্যা আও না।

মতি মিয়া ঘুরে এল, কোথাও কিছু নেই, খাঁখাঁ করছে চারদিক। মতি মিয়া ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আবার তাকে শরিফা ডেকে তুলল, আমার পিছন বাড়িত যাওন লাগব।

যাওন লাগব—যাও।

একলা যাই ক্যামনে ?

দুত্তেরি মাগি। ঘুমাইতে যাওনের আগে সব শেষ কইরা যাইতে পারস না ?

থাউক যাওন লাগত না।

মতি মিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শরিফা খুন খুন করে কাঁদতে শুরু করল। লোকটা এই রকম কেন ? এমন ভাব করছে যেন শরিফা একটা কাঠের পুতলি। ছেলেগুলিও দূরে সরে যাচ্ছে। নুরুদ্দীন তো তাকে সহ্যই করতে পারে না। রাতদিন রহিমার পিছে পিছে ঘুরঘুর করে। একদিন সে গোসা করেছে ভাত খায় না। কত

সাধাসাধি। মতি মিয়া বলল, আজরফ বলল, এমনকি আমিন ডাক্তার পর্যন্ত সাধ্য সাধনা করল—খাবেই না। শেষটায় রহিমা গিয়ে বলল, বাপধন আও, খালার পাতে চাইরডা খাও।

অমনি সুর সুর করে খেতে বসল। যেন কিছুই হয়নি।

এইসব কথা মনে এলে চোখে পানি আসে। শরিফা ফুঁপিয়ে উঠল।

এই কান্দ ক্যান ?

কান্দি না।

ফুস ফুস করতাছ ক্যান ?

শরিফা ধরা গলায় বলল, আমি বাপের বাড়িত গিয়া কয়েকটা দিন থাকতাম চাই।

বাপের বাড়িত আছে কেডা ?

ভাই আছে।

ভাই ?

গলা ফাটিয়ে মতি মিয়া হাসল, এইসব চিন্তা ছাড়ান দেও। অত যে ঝামেলা গেছে তোমার গুণের ভাই একটা খোঁজ নিছে ? কও নিছে খোঁজ ?

শরিফা মিন মিন করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না।

চিল্লাচিল্লি বন্ধ কইরা কাজ কাম করো।

আমি চিল্লাচিল্লি করি ?

না, তুমি তো নয়া কইন্যা। মুখের মধ্যে একটা কথাও নাই।

শরিফা আজকাল অবশ্যি খুবই চেঁচামেচি করে। রহিমার সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়া করে। এইডা কী রানছ ও রহিমা। ওয়াক থু। হলুদের গন্ধে মুখে দেওয়া যায় না। হলুদ সস্তা হইছে ? বাপের বাড়ির হলুদ পাইছস ? ঝাঁটা দিয়া পিডাইয়া এইসব আপদ দূর করা লাগে।

সামান্য জিনিস থেকে কুরুক্ষেত্র ঘটে যায়। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই রহিমার মেয়েটাকে সে মারধোরও করে। মেয়েটাও মার মতো চুপচাপ। মার খেয়েও শব্দ করে না। একা একা পুকুরপাড়ে বসে থাকে। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাউকেই সহ্য করতে পারে না। আমিন ডাক্তারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে একসময় সে কাঁদতে শুরু করে। আমিন ডাক্তার বিব্রত হয়ে বলে, কান্দনের কী হইল ও দোস্তাইন ?

আমারে বিষ আইন্যা দিয়েন।

কী ধরনের কথা কন না! না দোস্তাইন, বাজে চিন্তা বাদ দেওন দরকার।

ধানকাটা শুরু হওয়ার আগে মতি মিয়া মোহনগঞ্জে চলে যাবে। রূপকুমারী যাত্রা পার্টির অধিকারী লোক পাঠিয়েছে। শরিফা আকাশ থেকে পড়ল, ওখন তুমি যাইবা ক্যামনে, ধান কাটব কেডা ?

আজরফ কাটব।

কও কী তুমি ? আজরফ দুধের পুলা।

চুপ কর, খালি চিল্লায়।

মতি মিয়া গম্ভীর মুখে কাপড় গোছায়। শরিফা নুরুদ্দীনকে পাঠায় আমিন ডাক্তারকে ধরে আনতে। আমিন ডাক্তার আসতে পারে না। দীর্ঘদিন পর তাকে নেওয়ার জন্যে সুখান পুকুর থেকে নৌকা এসেছে। রোগী মরণাপন্ন। এখনই রওনা হওয়া প্রয়োজন।

নুরুদ্দীন তর বাপরে ধইরা বাইন্ধা রাখ, আমি আইতাছি রাইতে, বুঝছস ?

বুঝছি।

লোকটার মাথাডা খারাপ—এই সময় কেউ যায় ? নৌকা ছাড়গো তোমরা।

নৌকা ছেড়ে দেওয়ার সময় আমিন ডাক্তার আরেকবার গম্ভীর হয়ে বলে, দুই টেকা ভিজিট, ওষুধ ভিন্ন। আর নৌকা দিয়া ফিরত দিয়া যাইবা।

সুখান পুকুর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত পুইয়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে মাইল পাঁচেক হাঁটতে হয়। অসম্ভব কাদা এই অঞ্চলে। বড়ই কষ্ট হয় হাঁটতে। কোথাও থেমে যে বিশ্রাম নেওয়া হবে সে উপায় নেই। রোগীর বাবা ঝড়ের মতো ছুটছে, বারবার বলছে, পা চালাইয়া হাঁটেন ডাক্তার সাব।

বাড়ির সামনে মুখ লম্বা করে সিরাজুল ইসলাম বসে ছিলেন। আমিন ডাক্তারকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, আপনাকেও এনেছে দেখি। হুঁ, আর কাকে আনবে ?

রোগীর বাবা পা ধোয়ার পানি আনতে গেছে এই ফাঁকে সিরাজুল ইসলাম গলা নিচু করে বললেন, ডাক্তার পিষে খাওয়ালেও কিছু হবে না। শেষ অবস্থা। আর এমন চামার বুঝলেন। দু'টাকা দেওয়ার কথা দিয়েছে এক টাকা। মাছের বাজার আর কী ?

রোগী দেখে আমিন ডাক্তার স্তম্ভিত। নয়-দশ বছরের একটা ছেলে। সমস্ত শরীর লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। শরীরে কোনো ব্যথা বোধ নেই। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বলছে, পেটের মইধ্যে পাক খায়।

আমিন ডাক্তার এক চামচ অ্যালকালি মিকচার খাইয়ে শুকনো মুখে বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। রোগামতো একটা মেয়ে ছেলেটির হাত ধরে বসেছিল, সে কাঁদতে শুরু করল। আমিন ডাক্তার বলল, নৌকার যোগাড় দেখেন হাসপাতালে নেওন লাগব। দিরং করণ যাইত না।

ডাক্তারদের জন্যে পান তামাক দেওয়া হয়েছে বাহির বাটিতে। সিরাজুল ইসলাম কিছুই স্পর্শ করবেন না। তিনি এক ফাঁকে আমিন ডাক্তারকে বললেন, হাসপাতালে

নেওয়ার চিন্তা বাদ দেন। এই রোগী ঘণ্টা পাঁচেকের বেশি থাকবে না। টাকাপয়সা যা দেয় নিয়ে সরে পড়েন। রোগী মরলে পয়সাও পাবেন না। আপনাকে কেউ দিয়েও আসবে না। ছোটলোকের দেশে কেউ ডাক্তারি করে ?

আমিন ডাক্তার থেমে বলল, ওর হইছে কী ?

কিছু বুঝতে পারছেন না ?

না।

হুঁ। ওর কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে পানি এসেছে, হাসপাতালেও কিছু করতে পারবে না।

কিছুই করনের নাই ?

না।

সিরাজুল ইসলাম উঠে পড়লেন। বেরুবার আগে বললেন, আমি নিজের নৌকা নিয়ে এসেছি। যদি যেতে চান যেতে পারেন।

এই রকম রোগী ফালাইয়া যাই ক্যামনে ?

থাকেন তাহলে।

সমস্ত দিন কাটল এইভাবে। রাত্রে অবস্থা খুব খারাপ হলো। আমিন ডাক্তার বিষণ্ন মুখে ঘরের দাওয়ায় বসে রইল। বেশ কয়েকবার ছেলের বাবাকে বলল, হাসপাতালে নেওন খুব দরকার। দিরং হইতাছে।

কেউ রোগী নাড়াচাড়া করতে রাজি হলো না। নিমতলীর পীর সাহেবকে আনতে নাকি লোক গিয়েছে। তিনি এসে যা বলেন তাই করা হবে। পীর সাহেব মাঝ রাত্রে পৌঁছলেন। ছোটখাটো হাসি-খুশি একজন মানুষ। রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া ঠিক হবে কি-না জানতে চাইতেই বললেন, ডাক্তার সাব যদি নিতে কন তা হইলে নেওন লাগব। ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোগী দেখে তাঁর মতো বদলাল। শান্তস্বরে বললেন, হাতে সময় বেশি নাই।

ভোররাত্রে ছেলেটি হঠাৎ সুস্থ মানুষের মতো মাথা তুলে বলল, শীত লাগে বাজান।

চার-পাঁচটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আমিন ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, শীত কমেছে ?

ছেলেটি ফিসফিস করে বলল, শীত লাগে। জব্বর শীত লাগে। ও বাজান শইলডার মইধ্যে খুব শীত।

ফজরের আজানের পরপর ছেলেটি মারা গেল। ছেলের মা খুব কাঁদছিল। কে যেন বলল, কাইন্দেন না। মউতের কান্দন হাদিসে মানা আছে।

নিমতলীর পীর সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, দুখের সময় না কাঁদলে কোন সময় কাঁদব ? কান্দুক, খুব জুরে জুরে কান্দুক।

বাড়ির সামনে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে দুপুর পর্যন্ত বসে রইল আমিন ডাক্তার। পকেটে কিছুই নেই যে একটা কেরাইয়া নৌকা নিয়ে বাড়ি ফেরে। এমন অবস্থায় কাউকে বাড়ি ফেরার কথাও বলা যায় না। পেটে অসম্ভব খিদে, মরা বাড়িতে চুলা ধরানো হবে না, কাজেই খাওয়াদাওয়া হবে কি না বলা মুশকিল।

দুপুরের রোদ একটু পড়তেই আমিন ডাক্তার হেঁটে চলে গেল নিমতলী, নিমতলী পৌঁছতে পৌঁছতে এক প্রহর রাত হলো। সেখান থেকে সোহাগী আসল জলিলের নৌকায়। তখন মাঝরাত্রি, ঘরে খাবার কিছুই নেই। একটি টিনে চিড়া সেটিও শূন্য। মতি মিয়ার বাড়িতে গেলে হতো। কিন্তু এই দুপুর রাত্রে যাওয়া ঠিক না।

খিদের জন্যে ঘুম আসে না। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। মশারিটি শত ছিদ্র। ভনভন করছে মশা। নতুন মশারি একটি না কিনলেই নয়। আমিন ডাক্তার শুয়ে শুয়ে কত কথাই না ভাবে। কত বিচিত্র কথা মনে আসে। সুখান পুকুরের এক রোগী মরবার আগে হঠাৎ খুব অবাক হয়ে বলেছিল, ঠান্ডা হাত দিয়া আমারে কে ছুঁইছে ? ও ডাক্তার বড় শীত লাগে। বড় শীত লাগে। বড় শীত।

মরবার আগে সবারই শীত লাগে কি না আমিন ডাক্তারের খুব জানতে ইচ্ছা করে।

৭

নুরুদ্দীন খুঁজে খুঁজে চমৎকার একটি মাছ মারার জায়গা বের করেছে। বাড়ি থেকে সোয়া মাইল দূরে জঙ্গলা ভিটার ভাঙা ঘাট। জায়গাটি বড় নির্জন। দুপাশ অন্ধকার করে আছে ঘন কাঁটা বন। ভাঙা ঘাটের ফাঁকে ফুঁকে সাপের আড্ডা। সে জন্যেই বড় কেউ আসে না এ দিকটায়। ঘাটের লাগোয়া প্রকাণ্ড একটা ডেফল গাছে পাকা ডেফল টুকটুক করে। নুরুদ্দীন ছিপ ফেলে ডেফল গাছে হেলান দিয়ে সারা দুপুর বসে থাকে।

তার সঙ্গে প্রায়ই আসে অনুফা। সে নুরুদ্দীনকে বিরক্ত করে না। লম্বা একটি নারিকেলের ডোগা হাতে নিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কীসব কথা বলে। নুরুদ্দীন মাঝে মাঝে ধমক দেয়, অ্যাই চুপ। অত কথা কইলে মাছ আইব ?

অনুফা অল্প কিছু সময়ের জন্যে চুপ করে আবার গুনগুন শুরু করে।

অ্যাই অনুফা, পাগলি নাহি তুই ?

অনুফা রাগ করে না। খিলখিল করে হাসে। নুরুদ্দীনের বড় মায়া লাগে।

মাছ মারার এই জায়গাটা নুরুদ্দীন খুব সাবধানে গোপন করে রাখে। ঘাস কাটার জন্যে খোন্দায় করে কৈবর্তপাড়ার মাঝিরা এই খাল দিয়ে বড় গাঙের দিকে যায়। শব্দ পেলেই ডেফল গাছের আড়ালে চট করে লুকিয়ে পড়ে নুরুদ্দীন। তবু কেউ কেউ দেখে ফেলে। তখন বড় ঝামেলা হয়।

এইডা কে ? মতি ভাইয়ের পুলানা ? এই, কী করস তুই ?

মাছ মারি।

মাছ মারস ? মাথাডা খারাপ নাহি তর ? এইডা মাছ মারনের জায়গা ? যা বাড়িত যা।

মাছ মারার জন্যে জায়গাটা কিন্তু খারাপ না। আজকেও নুরুদ্দীন দুহাত লম্বা একটা বোয়াল মেরে ফেলল।

অনুফার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ওব্বাসরে, এইডা তো জব্বর মাছ নুরু ভাই।

শক্ত কইরা মাথাডা ধর। পানিত যেন না পড়ে—সাবধান।

পাকা বর্শেলের মতো মুখ করে নুরুদ্দীন দ্বিতীয়বার ছিপ ফেলতে যায়। কিন্তু বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, এখন আর মাছে খাবে না। চল বাড়িত যাই অনুফা।

না।

না কী ? দিয়াম এক চড়, বিষ্টি পড়তাছে দেখস না ?

পড়ুক।

বলেই অনুফা মাছ হাতে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল। এই তার খেলা। দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোথাও একদণ্ডের জন্যে থামবে না।

জঙ্গলা ভিটা থেকে বেরিয়ে নুরুদ্দীন দেখে খুব মেঘ করেছে। ডেফল গাছের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ বোঝা যায়নি। নুরুদ্দীন দৌড়তে শুরু করল। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পার হতে হবে। রানীমার পুকুর পাড়ে উঠে আসার আগেই সে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে সিরাজ চাচার নতুন চালাঘর। লালচাচি ছুটোছুটি করে ধান তুলছে। শুকোতে দেওয়া ধানের বেশির ভাগই গেছে ভিজে। লালচাচি নুরুদ্দীনকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, নুরু হাত লাগা। তর চাচা আইজ খুব চেতব।

ধান তোলা শেষ হতেই বৃষ্টি থেমে গেল। লালচাচি হাসিমুখে বললেন, কাণ্ডটা কেমুন হইল নুরা ?

বিষ্টি আবার আইব চাচি।

ধান তো বেবাক ভিজছে নুরা। করি কী এখন ক দেহি ? একলা মানুষ আমি অত ধান শুকাইতে পারি ? তুই বিবেচনা কর দেহি। নুরুদ্দীন বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল লালচাচির ঘরে। লালচাচিকে সে বেশ পছন্দ করে। নুরুদ্দীনের ধারণা লালচাচির মতো সুন্দরী (এবং ভালো) মেয়ে সোহাগীতে আর একটিও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, লালচাচি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি।

ও নুরা, তোর চাচারে কইলাম আমার ছোড ভাইটারে আইন্যা রাখতে, কাজকামে সাহায্য হইব। তোর চাচা কী কয় জানস ?

কী কয় ?

কয়—চোরের গোষ্ঠী আইন্যা লাভ নাই।

কথাডা ঠিক অয় নাই চাচি, অলেহ্য হইছে।

আমার দাদা চোর আছিল এইডা অস্বীকার যাই ক্যামনে ? কিন্তুক হেইডা কোন আমলের কথা। পুরানা কথা তুইল্যা মনে কষ্ট দেওন কি ঠিক ?

না, ঠিক না চাচি।

হেইদিন তরকারির লবণ এট্টু বেশি হইছে, তোর চাচা কয় চোরের গোষ্ঠী রান্দাবাড়া শিখনের তো কথা না।

কথাডা অলেহ্য হইছে চাচি।

অত চোর চোর করলে বিয়া করল ক্যান ? আমি কি পায়ে ধইরা সাধছিলাম ?

ঠিক কথা চাচি।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লালচাচি কিছুতেই ছাড়বে না। বাপের বাড়ির পুরনো সব গল্প আবার শুনতে হলো। গুড় দিয়ে একথালা মুড়ি খেতে হলো।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দীনের মুখ শুকিয়ে গেল। আজরফ নাকি তাকে বেশ কয়েকবার খোঁজাখুঁজি করেছে। আজরফকে আজকাল সে খুব ভয় পায়। আজরফ তাকে কিছুই বলে না। তবু কেন জানি ভয় ভয় লাগে। শরিফা বলল, বৃষ্টি বাদলা না হইলে রাইতে ধান মাড়াই দিতে চায়। তরে খুঁজছিল। কী যেন কইতে চায়।

কী করতে চায় ?

জিগাই নাই। অত কথা আমি জিগাই না।

নুরুদ্দীনের মনে হলো শুধু সে একা নয়, তার মা নিজেও আজকাল আজরফকে সমীহ করে চলে।

বন্দের মইধ্যে গিয়া জিগাইতাম ?

যা, জিগা গিয়া।

উত্তর বন্দে আজ খুব কাজের ঘটা। ফিরাইল সাব বলেছেন দুএকদিনের মধ্যে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হবে। সেই শিলা ফেরাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাজেই সম্ভব হলে আজকের মধ্যেই যেন ধান তুলে ফেলা হয়। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। মশা তাড়াবার জন্যে ভেজা খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া করা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জ্বলন্ত খড়ের দড়ির কাছে হুকো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। খুব কাজের চাপ তাদের। ডাক পড়তেই হুকো নিয়ে ছুটে যেতে হচ্ছে। ধানকাটার পুরা দলটি বৃষ্টিতে ভিজে জবজব। উত্তর বন্দেও আধ হাতের মতো পানি। ঘনঘন হুকার টান দিয়ে শরীর চাঙা করে নিতে হয়। উজান দেশের বেশ কিছু কামলা এসেছে ধান কাটতে। এদের হয়েছে অসুবিধা। দিন-রাত পানিতে থাকার অভ্যাস না থাকায় হাত পা হেজে গিয়েছে। তারা ক্ষণে ক্ষণে কাজ ফেলে শুকনায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আজরফকে খুঁজে বের করতে বেশ দেরি হলো। উত্তর বন্দে আজ সবাই ধান কাটছে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় লোকজন চেনা যাচ্ছে না। তার ওপর আজরফ কার জমিতে কাজ করছে তাও ঠিক জানা নেই। তাদের নিজেদের জমির সবটাই পুব বন্দে। নুরুদ্দীন গলা উঁচিয়ে ডাকল, ও ভাইসাব। খুব কাছ থেকে উত্তর হলো, এইদিকে আয় নুরা।

আমারে নি খুঁজছিলা ?

আজরফ কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। লুঙ্গির গোঁজ থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, বাজানের চিঠি। জলিল মাঝির সাথে পাঠাইছে। ডাক্তার চাচারে দিয়া পড়াইয়া আন।

আইচ্ছা।

আর হুন আইজ ধান মাড়াই হইব।

কোন সময় ?

রাইত।

গরু পাইবা কই ?

কালাচান চাচারে কইয়া রাখছি। তুই আরেকবার গিয়া জিগা।

আইচ্ছা।

যা, বাড়িত যা।

ভাত খাইতা না ?

আইজ সরকারবাড়িত খাইয়াম। হেরার ধান কাটতাছি।

একটা বোয়াল মাছ মারছি দুই আত লম্বা।

আজরফ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জঙ্গলাবাড়ির ভিটাত আর যাইস না নুরা। জায়গাডা খারাপ। দোষ আছে। হের ওপরে আবার সাপের উপদ্দপ।

নুরুদ্দীনের মুখে কথা ফুটে না। তার গোপন জায়গার কথা আজরফ কীভাবে জানল কে জানে।

বাড়িত যা নুরা।

উত্তর বন্দ থেকে একা একা বাড়ি ফিরতে নুরুদ্দীনের বড়ই ভালো লাগে। এতবড় বন্দ এই অঞ্চলে আর নেই। দিনরাত হাওয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ তোলে। উত্তর পশ্চিমে তাকালে কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু মনে হয় দূরের আকাশ নেমে এসেছে মাটিতে। পুব দিকে তাকালে নিমতলী গ্রামের সীমানার তালগাছ দুটো আবছা চোখে পড়ে। তালগাছ দুটিতে দোষ আছে। গভীর রাত্রে মাছ মারতে এসে অনেকেই দেখেছে, একটা জাম্বুরার মতো বড় আগুনের গোলা গাছ দুটির মাথায়। এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে আবার ক্ষণে ক্ষণে মিলিয়েও যাচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বাড়ির পেছনে খোলা চুলায় রান্না চাপিয়েছে। রান্নার আয়োজন নগণ্য। ঝিঙ্গে ভাজি আর খেসারির ডাল। ভেজা কাঠের জন্যে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে চুলা থেকে। নুরুদ্দীন গিয়ে দেখে, একটা কাঠের চোঙায় মুখ দিয়ে আমিন ডাক্তার প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে। তার নিজের চোখমুখ লাল, কী রে নুরা কী চাস ? ভাত খাইবি ?

নাহ।

না কীরে ব্যাটা। ঝিঙ্গে ভাজা করলাম। গাওয়া ঘি আছে দিয়ামনে এক চামুচ।

আইজ না চাচাজি। বাজানের একটা চিডি আনছি, পইড়া দেন।

মতি মিয়া নিজেও লেখাপড়া জানে না। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে—

আজরফ মিয়া দোয়াগো,

আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহতালার কৃপায় সুস্থ শরীরে শান্তিমতো আছ। পর সমাচার এই যে, আমরা দল লইয়া অতি শীঘ্র নেত্রকোনা যাইতেছি। বিবেকের গান খুব নাম কামাইয়াছে। স্বয়ং কানা নিবারণও বলিয়াছে—গলা খুব উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরাতন বিবেক ফিরিয়া আসিয়াছে। কাজকর্ম ঠিকমতো করিবা। নতুন ধান উঠিবা মাত্র আমাকে নিম্ন ঠিকানায় বিশটি টাকা অতি অবশ্য পাঠাইবা। কিঞ্চিৎ আর্থিক অসুবিধায় আছি। আজ এই পর্যন্ত। ইতি।

আমিন ডাক্তার চিঠি শেষ করে ভ্রু কুঞ্চিত করে রইল। চিঠিতে কবে ফিরবে কোনো উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, শরিফার কোনো কথা নেই।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, তর মায়ের কথাও লেখছে কোনা দিয়া—তোমার মাতার কথাও সর্বদা স্মরণ হয়। তুমি তাহার যথাসাধ্য যত্ন করিবা। নুরা তোর মায়েরে কইছ। তার কথাও লেখা।

আইচ্ছা। আর চাচাজি আইজ আমরার ধান মাড়াই। আপনের যাওন লাগব।

দেহি।

দেহা দিহি নাই, যাওন লাগব।

রুগি-টুগি না থাকলে যাইয়ামনে এক ঘুরান।

ধান মাড়াইয়ের ব্যাপারে নুরুদ্দীনের খুব উৎসাহ।

মাঝরাতের দিকে চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে ধান মাড়াই শুরু হবে। চলবে সারা রাত। একজন পালা করে থাকবে গরুর পেছনে অন্য সবাই দল বেঁধে উঠোনে বসে গল্প শুনবে। গল্প বলার জন্যে কথক আছে। তাদের বড় দাম এই রাত্রে। পান তামাকের ডালা খোলা। শেষরাত্রে পিঠে-চিড়ার ব্যবস্থা।

নুরুদ্দীনের খুব ইচ্ছা এবারও গতবারের মতো আলাউদ্দীনকে খবর দেওয়া হয়। পেশায় সে চোর, কিন্তু তার মতো বড় কথক ভাটি অঞ্চলে আর নেই। সে যখন

কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে দুহাত নেড়ে কিচ্ছা শুরু করে তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পর্যন্ত মনে থাকে না :

শোনেন শোনেন দশজনাতে
শোনেন দিয়া মন
লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ

তারপর হেই লাল চাঁন বাদশা উজির সাবরে ডাইক্যা কইল, ও উজির একটা কথার জবাব দেও দেহি।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দীনের খুব মন খারাপ হলো। কথক আলাউদ্দীন নিমতলী গিয়েছে। সন্ধ্যায় ফেরবার কথা এখনো ফেরেনি। যদি না ফিরে ? তারচেয়ে বড় কথা শরিফা রেগে গিয়ে খড়ম ছুড়ে মেরেছে অনুফার দিকে। সেই খড়ম কপালে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। অনুফা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। রহিমা মুখ কালো করে ঘরের কাজকর্ম করছে। নুরুদ্দীন অনুফার খোঁজে বেরুল। সে কোথায় আছে তা জানা। ছোট গাঙের পারে জলপাই গাছের কাছে এসে নুরুদ্দীন ডাকল, ও অনুফা।

অনুফা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

আয় বাড়িত যাই।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না।

বড় আন্ধাইর, হাত ধর অনুফা।

অনুফা এসে হাত ধরল। নুরুদ্দীন বলল, আইজ ধান মাড়াই, জানস ?

জানি।

আলাউদ্দীন আইত না।

অনুফা মৃদুস্বরে বলল, আইব।

কী কস তুই ?

দেখবা তুমি, আইব।

তুই খুব পাগলি অনুফা।

অনুফা খিলখিল করে হাসল। কিন্তু কী আশ্চর্য বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল আলাউদ্দীন তার দল নিয়ে এসে পড়েছে। চাঁদ এখনো ওঠেনি। অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলাউদ্দীনের রোগা লম্বা শরীর। সে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হুকা টানছে।

কিচ্ছা শুরু হলো অনেক রাত্রে। গ্রামের অনেকেই এসেছে। আজরফ হচ্ছে ঘরের কর্তা। পান তামাক এগিয়ে দিচ্ছে। বৌ-ঝিরা ভেতর বাড়িতে। আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর জন্যে চেয়ার আনা হয়েছে।

আলাউদ্দীন কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে কিচ্ছা শুরু করেছে। সেই পুরনো লাল চাঁন বাদশার গল্প। কিন্তু এ গল্প কি আর সত্যি সত্যি পুরনো হয়?

(গীত)

শোনেন শোনেন দশ জনাতে
শোনেন দিয়া মন
লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ।
লাল চাঁন বাদশার মনে বড় দুক্ষ ছিল,
বার বচ্ছর পার হইল পুত্র না জন্মিল।
লাল চাঁনের দুক্ষ দেইখ্যা কান্দে গাছের পাতা...

৮

উত্তর বন্দের সমস্ত ধান কাটা হওয়ার পরপরই 'ফিরাইল সাব' চলে গেলেন। যাওয়ার পরদিন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হলো। তা তো হবেই 'মাঠ বন্ধন' নেই। শিলা আটকাবার আসল লোকই নেই। কালাচান খবর নিয়ে এল—ফিরাইল সাবের জন্যে উত্তর বন্দে যে খড়ের ছাউনি করা হয়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। শিলাবৃষ্টিতে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সোহাগীর লোকজন স্তম্ভিত।

ফিরাইলের সাবের উপরে রাগ রইছে, বুঝলা না বিষয়টা?

রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফিরাইল সাব এই বৎসর উত্তর বন্দে শিল পড়তে দেননি। সমস্ত নিয়ে ফেলেছেন নিমতলীর বন্দে। ফিরাইল সাব বিদায় নেওয়ার আগে গ্রামে এসে উঠলেন কিছুক্ষণের জন্যে। গ্রামের বউ ঝিরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে তাকায়। দেখেই বুঝা যায় বড় সহজ লোক ইনি না। তার সাথে চালাকি চলবে না। শুকনো দড়ি পাকান চেহারা। মাথার লম্বা চুলে জট বেঁধে গিয়েছে। জীয়ল গাছের শিকড়ে তৈরি একটি বাঁকা লাঠি। ফিরাইল সাব যাওয়ার আগে বারবার বলে গেলেন নিমতলীর তালাগাছের নিচে তিনটা বড় শউল মাছ পুড়িয়ে ভোগ দিতে। তালগাছে যে বিদেহী প্রাণীটি বাস করে তাকে তুষ্ট রাখা খুবই প্রয়োজন। বাজ পড়ে যদি তালগাছ দুটির একটিও পুড়ে যায় তাহলে সমূহ বিপদ। বিপদ যে কী তা তিনি ভেঙে বললেন না। পোয়াতি মেয়েছেলেদের ওপর কঠোর নির্দেশ—তারা যেন কোনোক্রমেই অমাবশ্যা এবং পূর্ণিমা এই দুই চাঁদে উত্তর বন্দে না যায়।

এ বৎসর খুব ভালো ফলন হয়েছে সোহাগীতে। লগ্নির ধান দেওয়ার পরও ধান রাখার জায়গা নেই। আবুল কালামের মতো হতদরিদ্র ভাগি চাষিরও খোরাকি ছাড়াই পঁচিশ মণ ধান হলো। এমন অবস্থায় জমকালো বাঘাই সিন্নি হবে তা বলাই বাহুল্য। ধান কাটা শেষ হওয়ার পরই প্রথম পূর্ণিমায় বাঘাই সিন্নির দল বেরুল। এইসব সাধারণত

ছেলে ছোকরার ব্যাপার। কিন্তু আমিন ডাক্তারের সে খেয়াল নেই। দলের পুরোভাগে সে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেচে কুঁদে এক হুলস্থুল ব্যাপার। মূল গায়ক একজন, অন্য সবাই ধুয়া ধরে।

(মূল গীত)

আইলাম গো

যাইলাম গো

বাঘাই সিন্নি চাইলাম

(ধোয়া) চাইলাম গো। চাইলাম গো।

এই পর্যায়ে হাত-পা ছুড়ে নাচ শুরু হয়। মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বাঘাই সিন্নির জন্যে ধামাভর্তি চাল বের করে দেয়।

আমিন ডাক্তারকে দেখে বয়স্কদের অনেকেই দলে ভিড়ে গেল। সুবহান আলীর মতো রাশভারি মাতব্বর পর্যন্ত বাঘাই সিন্নির গানের ধুয়ায় শামিল হলো।

সিন্নির আয়োজন হয়েছে উত্তর বন্দে। চারদিকে ফকফকা জ্যোৎস্না। দূরে সোহাগী গ্রাম ছবির মতো দেখা যায়। খোলা প্রান্তরে হাওয়া এসে শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ শব্দ তোলে। বাঘাই সিন্নি দলের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। একদিকে সিন্নি রান্না হয় অন্যদিকে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে বাঘাই সিন্নির গান হয়। বড়গাঙ্গ দিয়ে বিদেশী নৌকা যায়। তারা কৌতূহলী হয়ে হাঁক দেয়।

কোন গ্রাম ?

সোহাগী ?

বাঘাই সিন্নি নাকি গো ?

হ ভাই।

কেমন জমল ?

জব্বর।

হই হো হেই হো।

শুধু খোরাকির ধান রেখে বাকি সব ধান আজরফ নীলগঞ্জের হাটে বিক্রি করে দিল। শরিফা আপত্তি করছিল। কিন্তু আজরফ শক্ত সুরে বলল, ধান থাকলেই খরচ হইব। যে জিনিসের দরকার নেই সেইটিও কিনা হইব।

যুক্তি অকাট্য। ইতোমধ্যে নৌকা সাজিয়ে বেদেনীরা আসতে শুরু করেছে। শাড়ি চুড়ি থেকে শুরু করে পিঠা বানানোর ছাঁচ কী নেই তাদের কাছে ? কিনতে কারও গায়ে লাগে না। নগদ টাকা দেওয়ার ঝামেলা নেই, ধান দিলেই হয়।

আজরফ নীলগঞ্জের হাটে ধান বেচে কত টাকা পেল তা শরিফা পর্যন্ত জানতে পারল না। শরিফা খুব বিরক্ত হলো কিন্তু নিজে থেকে জানতে চাইল না।

টাকাপয়সার হিসাব পুরুষ মানুষের কাছে থাকাই ভালো। আর এই সংসারে পুরুষ বলতে তো এখন আজরফই আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই যেন ছেলেটা বড় হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে চলাফেরা করে। যন্ত্রের মতো কাজ করে। নীলগঞ্জ থেকে সে এবার অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। নুরুদ্দীনের জন্যে এসেছে লুঙ্গি আর মাছ মারার বড়শি। তার এবং রহিমার জন্যে এসেছে শাড়ি। শরিফা দুঃখিত হয়ে লক্ষ করল, দুটি শাড়ির জমিনই একরকম। দামও নিশ্চয়ই এক। রহিমা তার কে ? থাকতে দেওয়া হয়েছে দয়া করে এর বেশি আর কী ? তার জন্যে সস্তার শাড়ি কি নীলগঞ্জের হাটে ছিল না ? শুধু এখানেই শেষ না, অনুফার জন্যে সে একটা জামাও এনেছে। জামার বড়বড় ছাপার ফুল। ম্যালা দাম নিশ্চয়ই।

বর্ষা এসে গেছে।

কদিন ধরেই ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাটে একহাঁটু কাদা। আজরফ ঘরেই বসে থাকে। করার তেমন কিছু নেই। আগামী পাঁচ মাস ধরে জোয়ান মর্দ ছেলেরা ফড় খেলবে ষোলো ঘুঁটি খেলবে। কেউ কেউ ফুর্তির খোঁজে চলে যাবে উজান দেশে। এই পাঁচ বিশ্রামের মাস ফুর্তির মাস।

শরিফা খবর পেল। আজরফ যাচ্ছে উজান দেশে। কী সর্বনাশের কথা এইটুকু ছেলে সে যাবে উজানে। উজানের মেয়েগুলি ফষ্টিনষ্টিতে ওস্তাদ, কী থেকে কী হবে কে জানে। তার ওপর বাজারের খারাপ মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়লে ফতুর হয়ে আসতে হবে। কিন্তু আজরফের উদ্দেশ্য ভিন্ন। সে কাজকর্মের খোঁজে যাবে। উজানমুলুক থেকে কিছু টাকাপয়সা যদি আনা যায় তাহলে ধান বেচা টাকার সঙ্গে যোগ করে জমি রাখা যাবে। শরিফা স্তম্ভিত।

আমরারে দেখাশোনা করব কে ?

নুরা আছে। রহিমা খালা আছে। তারা দেখব।

শরিফা কাঁদে খুন খুন করে। আপন মনে বিড়বিড় করে, রক্তের মধ্যে দোষ। ঘরে মন টিকে না। রহিমাকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ছেলেডা কি বিয়া করতে চায় ?

রহিমা মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, না বুজি।

হাসস ক্যান রহিমা ? হাসির কথা কিছু কই নাই। বিয়া যখন করত চায় তখন পুলাডি এই রকম ঘর ছাড়নের ভয় দেখায়।

না বুজি, বিয়া করব কী ? বাচ্চাপুলা।

আজরফকে এখন আর বাচ্চাপুলা বলা যায় না।

গম্ভীর হয়ে দাওয়ায় যখন বসে থাকে শরিফার পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলতে ইচ্ছা করে।

এর মধ্যে হঠাৎ মতি মিয়ার একটি চিঠি এসে উপস্থিত। শম্ভুগঞ্জ থেকে লেখা। আমিন ডাক্তার এসে ঠিঠি পড়ে দিয়ে যায়।

মদন থানার রাধাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে একটি সোনার মেডেল দিয়েছেন। মেডেলটি ছয় আনি ওজন।

মেডেলের ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যা। রুপার একটি মেডেল সাড়ে তিন টাকা খরচ করে মতি মিয়া নিজেই কিনেছে। আসরে নামার সময় গায়ে কোনো মেডেল না থাকলে লোকজনের ভক্তি পাওয়া যায় না। আমিন ডাক্তারকে চিঠিটি তিন-চারবার পড়ে শোনাতে হয়। সেই রাত্রে তাকে খাওয়াদাওয়াও করতে হয়। ডাক্তার হৃষ্টচিত্তে শরিফাকে বলে, বুঝছেননি দোস্তাইন, মতি মিয়া কানা নিবারণরে ছাড়াইয়া যাইব কইয়া রাখলাম।

শরিফাকে এই সংবাদে খুব উল্লসিত মনে হয় না।

বর্ষার জন্যে অসুখবিসুখ হতে শুরু করেছে।

পেট খারাপ, জ্বর অসুখ বলতে এই দুটিই। মানুষের হাতে টাকা আছে। কিছু হতেই ডাক্তারের ডাক পড়ে। কাজেই আমিন ডাক্তারের ভালো সময় যাওয়ার কথা। কিন্তু তা যাচ্ছে না। বর্ষার আগে আগে নতুন একজন ডাক্তার এসে পড়েছে।

এই অঞ্চলের লোকদের হাতে যখন টাকাপয়সা থাকে তখন হঠাৎ করে শহুরে ডাক্তার এসে উদয় হয়। লোকদের টাকাপয়সা যখন কমে আসতে শুরু করে তখন বিদেয় হয়। আগেও এরকম হয়েছে। এতে আমিন ডাক্তারের তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। সোহাগীর লোকজন পুরান ডাক্তারকেই ডাকে। কিন্তু এই বছর অসুবিধা হচ্ছে। নতুন যে ডাক্তার এসেছেন তিনি সোহাগীর লোকজনদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন।

ডাক্তারটির নাম শেখ ফজলুল করিম।

এসেছেন মোহনগঞ্জ থেকে। সেখানে ডাক্তার সাহেবের বড় ফার্মেসি আছে, 'শেখ ফার্মেসী'। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে যে অ্যাসিসট্যান্ট এসেছে সে আরেক বিস্ময়, লোকটির বাড়ি জৌনপুরে। বাংলা বলতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার সাহেবের ঘরের উঠোনে বসে সুর করে তুলসী দাসের রামচরিত মানস পড়ে। ডাক্তার সাহেব নিজেও কম বিস্ময় সৃষ্টি করেননি। তিনি সঙ্গে একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে ঘোড়া কী কাজে লাগবে জিজ্ঞেস করলে উচ্চস্বরে হেসে বলেছেন, শীতকালের জন্যে ঘোড়া আনা হয়েছে। তার মানে লোকটি শুধু বর্ষার সময়ের জন্যে আসেনি, দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মধুর স্বভাব। কদিন হয় এসেছেন এর মধ্যেই গ্রামের সবার নাম-ধাম জানেন। দেখা হলেই খোঁজখবর করেন। ওষুধের জন্যে গেলে প্রথমেই বলেন, বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে পারি, কিন্তু ওষুধে কাজ হবে না। পয়সা দিয়ে ওষুধ নিলে তবেই ওষুধ কাজ করে। গ্রামের সবার ধারণা কথাটি খুব 'লেহ্য'।

ডাক্তার সাহেবের কাছে সপ্তাহে একটি কাগজ আসে 'দেশের ডাক'। তিনি উচ্চস্বরে সেই কাগজ পড়ে শোনান। পড়া শেষ হলে চিন্তিত মুখে বলেন, 'ইস দেশের সর্বনাশের আর বাকি নাই'। গ্রামের লোকজন সর্বনাশের কারণ ঠিক বুঝতে পারে না কিন্তু ডাক্তার সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়।

আমিন ডাক্তার মহাবিপদে পড়ে গেল। রোগী পত্তর একেবারেই নেই। পাওনা টাকাপয়সাও কেউ দিচ্ছে না। সোহাগীর লোকজন যেন ভুলেই গেছে এই গ্রামে আমিন ডাক্তার নামে পুরান একজন ডাক্তার আছে। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অনেক ফন্দিফিকির করে, কোনোটাই কোনো কাজে আসে না। যেমন, একদিন সকালে সেজেগুজে গম্ভীর মুখে তার ব্যাগ হাতে বেরুল। যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই বলল, নিমতলী থেকে 'কল' এসেছে। রোগীর অবস্থা এখন তখন। আমিন ডাক্তারকে ছাড়া ভরসা পাচ্ছে না। বিশেষ করে নিমতলীর কথা বলার কারণ হচ্ছে, নিমতলীতে সিরাজুল ইসলামের মতো নামি ডাক্তার থাকেন।

আষাঢ় মাসের গোড়াতেই আমিন ডাক্তার মহামুছিবতে পড়ল।

না খেয়ে থাকার যোগাড়। একদিন চৌধুরী সাহেব এসে দেখেন, আমিন ডাক্তার দুপুরবেলা শুকনো চিড়া চিবাচ্ছে। তিনি বড়ই অবাক হলেন। ভাটির দেশে ভাতের অভাব নাই আর এখন সময়টাই হচ্ছে ফেলে ছড়িয়ে খাবার। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোজগারপাতি কেমুন ডাক্তার ?

ইয়ে, আছে কোনো মতো।

হুঁ।

কলেরা শুরু হইলে কিছু বাড়ব। ওখন কম।

চৌধুরী সাহেব যাওয়ার আগে বলে গেল সে যেন অতি অবশ্যি আজ রাত থেকে দুবেলা তার ওখানে খায়। আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে গেল নতুন ডাক্তার শেখ ফজলুল করিম সাহেবের কাছে। 'দেশের ডাক' কাগজটি এসেছে। সেইটি পড়া হচ্ছে। প্রচুর লোকজন ঘরে। ফজলুল করিম সাহেব আমিন ডাক্তারকে খুব খাতির করলেন। আমিন ডাক্তার এক পর্যায়ে বলল, আপনের কাছে একটা পরামর্শের জইন্যে আসলাম ডাক্তার সাব।

কী পরামর্শ ?

এই গ্রামে একটা ইস্কুল দিতাম চাই।

আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি ইস্কুল কী দিবেন ?

ডাক্তারি আমি করতাম না। আমার চেয়ে ভালো ডাক্তার ওখন এই গ্রামেই আছে।

লোকজনকে অবাক করে দিয়ে আমিন ডাক্তার উঠে পড়ল। অনেক রাত্রে প্রথমবারের মতো খেতে গেল চৌধুরীবাড়ি। ছোট চৌধুরী বসে ছিল বারান্দায়।

তার গায়ে একটি সুতাও নেই। আমিন ডাক্তারকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, এই শালা আমিন তরে আজই আমি খুন করবাম। শালা, তুই আমারে দেইখ্যা হাসছস। শালা তর বাপের নাম আজই ভুলাইয়া দিয়াম।

৯

বর্ষার প্রধান প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

সোহাগীর চারপাশে বাঁশ পুঁতে চাইল্যা গাছ ঢুকিয়ে মাটি শক্ত করা হয়েছে। প্রবল হাওয়ায় যখন হাওরের পানি এসে আছড়ে পড়বে সোহাগীতে তখন যেন মাটি ভেঙে না পড়ে।

উত্তর বন্দ সবচে নিচু। সেটি ডুবল সবার আগে। তারপর একদিন সকালে সোহাগীর লোকজন দেখল যেন মন্ত্রবলে চারদিক ডুবে গেছে। থই থই করছে জল। হুম হুম শব্দ উঠছে হাওরের দিক থেকে। জঙ্গলা ভিটার বাঁশ আর বেত বনে প্রবল হাওয়া এসে সারাক্ষণ বোঁ বোঁ শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলছে। চিরদিনের চেনা জায়গা হঠাৎ করে যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে সবুজ রঙের ছোট্ট 'সোহাগী'। নাইওরীদের আসবার সময় হয়েছে।

গভীর রাত্রে হাওরের নৌকার আলোগুলি কী অদ্ভুতই না লাগে। বিদেশী মাঝিরাও সোহাগীর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। টেনে টেনে জিজ্ঞেস করে, কোন গ্রাম ? কো-ন-গ্র-া-া-ম ?

সোহাগী, গ্রামের নাম সোহাগী।

চারদিকে অথই জলের মাঝখানে ছোট্ট গ্রামটি ভেসে থাকে। চৌধুরীবাড়ির লোকজন সাদা কেরোসিন তেলের হারিকেন জ্বালিয়ে সারা রাত হিজল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। গভীর রাত্রে যখন গ্রামের সব আলো নিভে যায় তখনো সেই আলো মিটমিট করে জ্বলে। দূর থেকে সেই আলো দেখে সোহাগীর নাইওরী মেয়েরা আহ্লাদে নৌকা থেকে চেঁচিয়ে ওঠে।

ওই আমার বাপের দেশ—ওই দেখা যায় চৌধুরীবাড়ির লণ্ঠন। গাঢ় আনন্দে তাদের চোখ ভিজে ওঠে।

ছেলেপুলেদের আনন্দের সীমা নেই। এখন বড়ই সুসময়। পানিতেই তাদের সারা দিন কাটে। এখন ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না। বরং খুশিই হবে। পানির সঙ্গে পরিচয় হোক। একদিন এদেরই তো ঝড়ের রাত্রে একা একা হাওর পাড়ি দিতে হবে।

আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির একটি অন্ধকার কোঠায় তার ইস্কুল সাজিয়ে বসে থাকে। প্রথম দিনে গোটা কুড়ি ছাত্র ছিল, এখন এসে ঠেকেছে দুইজনে। কালা চানের ছোট ছেলে বাদশা মিয়া আর কৈবর্তপাড়ার গণেশ। অন্য ছাত্ররা পড়ে থাকে হাওরের

পানিতে। কার দায় পড়েছে আমিন ডাক্তারের অন্ধকার ঘরে বসে থাকার ? দুটি ছাত্রকে নিয়েই আমিন ডাক্তার মহা উৎসাহে লেগে থাকে। বাদশা মিয়া বোকার হদ্দ। আমিন ডাক্তার যখন ক'য়ের উপর আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করে, এইটা কী ? বাদশা মিয়া তখন আকাশ পাতাল চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে বলে, 'স্বরে আ'। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড চড় লাগায় কিন্তু বাদশা মিয়ার বিদ্যার্জনের স্পৃহা সীমাহীন। সে পরদিন আবার শ্লেট পেনসিল নিয়ে হাজির হয়। অন্যদিকে গণেশের পড়াশোনায় খুব মন। তাকে পড়াতে বড় ভালো লাগে। কী চমৎকার—বলামাত্রই সব শিখে ফেলে। দ্বিতীয়বার আর বলতে হয় না। কী সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা।

চৌধুরীবাড়ি খেতে যেতে এখন আর আগের মতো লজ্জা লাগে না। চৌধুরীদের পাগলা ছেলের বৌটা খুব যত্ন করে। পর্দার আড়াল থেকে মধুর স্বরে বলে, আরেকটু মাছ নেন চাচাজি।

আর না মা।

না চাচাজি, নেন। আরেক টুকরা নেন।

তাকে মাছ নিতেই হয়।

ইচা মাছ আর চোকাইয়ের তরকারি কোনোদিন খাইছেন চাচাজি ?

না মা, খাই নাই।

খুব সুআদ। আমার বাপের দেশে করে।

একদিন কইরো।

জি আইচ্ছা।

তোমার বাপের দেশ কোথায় ?

বহুত দূর। গাঁয়ের নাম বেতসি। নবিনগর ইউনিয়ন।

ভাটি অঞ্চল ?

জি-না উজান দেশ।

খাওয়ার পর পান আসে। একটা কামলা এসে তামাক সাজিয়ে দিয়ে যায়। পর্দার আড়াল থেকে বৌটি বলে, পেট ভরছে চাচাজি ?

আলহামদুলিল্লাহ, খুব খাইছি।

আপনের যেটা খাওনের ইচ্ছা হয় আমারে কইবেন।

বৌটিকে আমিন ডাক্তারের খুব দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চৌধুরীবাড়ির পর্দা বড় কঠিন পর্দা। দেখা হয় না। ভাত খেয়ে ফেরার পথে চৌধুরীর পাগল ছেলেটার সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। ছেলেটি হুঙ্কার ছাড়ে, কেডা যায় ? আমিন ডাক্তার ? এই শুওরের বাচ্চা এদিকে আয় তো।

আমিন ডাক্তার না শোনার ভান করে এগিয়ে যায়। পাগলটা দারুণ হইচই শুরু করে, এই শালা কথা কস না যে—এই শালা।

বৌটার কথা চিন্তা করে আমিন ডাক্তারের বড়ই খারাপ লাগে। রোজ ভাবে চৌধুরী সাহেবকে বলে ছেলেটাকে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বলা আর হয় না।

ভাদ্র মাস। হঠাৎ মতি মিয়া ফিরে এল। তার গায়ে দামি একটা চাদর। মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরি চুল। হলুদ রঙের একটা মটকার পাঞ্জাবিতে দুটি রুপার মেডেল ঝুলছে। মেডেল দুটির মধ্যে একটি সে সত্যি সত্যি পেয়েছে। কেরানীগঞ্জের এক বেপারি খুশি হয়ে দিয়েছে। মতি মিয়া এখন নাকি বড় গাতক।

সন্ধ্যার পর বাড়িতে লোকজন ভিড় করে।

মতি ভাই এট্টু গানবাজনা হউক। হুনলাম উজান দেশে তোমারে লইয়া কাড়াকাড়ি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে।

শইলডা আইজ যুইত নাই। আইজ না।

বলামাত্রই এখন আর গানে টান দেওয়া যায় না। বড় গাতকদের মান থাকে না তাতে। বড় গাতকদের গান সাধ্য সাধনা করে শুনতে হয়।

একখান গাও মতি ভাই।

কাইল আইও, নিজের বান্দা গান হুনাইয়াম।

নিজে গান বান্দ ? কও কী মতি ভাই ?

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে। গ্রামের লোক বড়ই চমৎকৃত হয়।

কাইল কিন্তু বেবাক রাইত গান অইব, কী কও মতি ভাই ?

চানি রাইত আছে। বেবাক রাইত গান। বুদ্ধিটা কেমুন ?

দেখি।

চেষ্টাকৃত একটা গাম্ভীর্য বহু কষ্টে মতি মিয়াকে ধরে রাখতে হয়।

পরের রাতে মতি মিয়ার বাড়িতে কিন্তু কেউ আসে না। কারণ সন্ধ্যার কিছু আগে কোনো খবর না দিয়ে কানা নিবারণ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে, আজ রাতটাই শুধু থাকবে। চৌধুরীদের বাংলায় বসেছে গানের আসর। ছেলে বুড়ো সব সন্ধ্যা থেকেই বসা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। একসময় কানা নিবারণ গানে টান দিল। গ্রাম্য দুঃখী মেয়ের চিরকালের গান। শ্রাবণ মাস চলে গিয়েছে, ভাদ্র মাসও যায় যায়। তবুও তো নৌকা সাজিয়ে বাপের দেশ থেকে আমাকে কেউ নাইওর নিতে আসল না।

গানের মাঝখানে একটি অল্পবয়েসী বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেয়েটিকে এ বছর কেউ নিতে আসেনি। তাকে কাঁদতে দেখে অনেকেই চোখে আঁচল দিল। কিন্তু কানা নিবারণকে এইসব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে সমস্ত জাগতিক ব্যথা বেদনার উর্ধ্বে। ফকফকা জ্যোৎস্নায় গ্রামের সমস্ত দুঃখী বৌ-ঝিরা কানা নিবারণের মধ্য দিয়ে তাদের চিরকালের কান্না কাঁদতে লাগল,

শ্রাবণ মাস গেছে গেছে ভাদ্র মাসও যায়
জানি না কী ভাবেতে আছে আমার বাপ ও মায়

মতি মিয়া তার বাড়ির উঠোনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আজ রাতে সোহাগীর মানুষের আর তাকে প্রয়োজন নাই। রহিমা একসময় এসে বলল, ভাত দেই মতি ভাই ?

নাহ ক্ষিধা নাই। তুমি গান শুনতে গেলা না ?

রহিমা কথা বলল না। মতি মিয়া ধরা গলায় বলল, যাও কানা নিবারণের গান হুন গিয়া। বড় ওস্তাদ লোক। তার মতো গাতক আর হইত না।

মতি মিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সে দিন দশেক থাকবে ভেবে এসেছিল কিন্তু থাকল না। পরদিন ভোরেই শম্ভুগঞ্জ চলে গেল।

১০

জঙ্গলা ভিটায় এখন আর যাওয়া যায় না।

নাবাল জায়গা। আষাঢ় মাসের গোড়াতেই পানি উঠে গেছে। দক্ষিণ কান্দা দিয়ে খুব সাবধানে হেঁটে জলমগ্ন ভিটার আশেপাশে যাওয়া গেলেও এমন আর কেউ যায় না। দক্ষিণ কান্দায় খুব সাপের উপদ্রব হয়েছে। সিরাজ মিয়ার একটি বকনা বাছুর সাপের হাতে মারা পড়েছে।

তবু নুরুদ্দীন জঙ্গলা ভিটায় যাওয়ার জন্যে এক সকালে লালচাচির বাড়ি এসে উপস্থিত। লালচাচির খোন্দা নিয়ে সে যাবে জঙ্গলা ভিটায়। তার সঙ্গে গোটা দশেক 'লার বড়শি'। বড়শি কটি পেতে দিয়েই সে চলে আসবে। লালচাচি চোখ কপালে তুলে বলল, তোর মাথাডা পুরা খারাপ নুরা। এই চিন্তা বাদ দে।

লালচাচি নুরুদ্দীনের কোনো যুক্তিই কানে তুলল না। ব্যাপারটিতে যে ভয়ের কিছুই নেই খোন্দায় বসে থাকলে সাপ খোপ যে কিছুই করতে পারবে না লালচাচিকে তা বুঝানো গেল না। লালচাচি খুব রেগে গেল, এক কথা একশবার কইস না নুরা। আমারে চেতাইস না। আমার মন মিজাজ ঠিক নেই।

তাঁর মন মেজাজ ঠিক নেই কথাটি খুব সত্যি। গুজব শোনা যাচ্ছে সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করবে। মেয়ে নিমতলীর, নফিস খাঁর ছোট মেয়ে। সিরাজ মিয়াকেও

দোষ দেওয়া যায় না। যখন বিয়ে করে তখন সে কামলা মানুষ। সরকারবাড়ি জন খাটত। ছোটঘরের মেয়ে ছাড়া কামলা মানুষের কাছে কে মেয়ে দিবে ? সেই দিন আর এখন নেই। নতুন ঘর তুলছে সিরাজ মিয়া। এই বছর টিনের ঘর দিবে। এক বান টিন কেনা হয়েছে।

এছাড়াও একটি কারণ আছে। সিরাজ মিয়ার এখনো কোনো ছেলেপুলে হয়নি। তিনটি বাচ্চা আঁতুড়ঘরে মারা গিয়েছে। অনেকের ধারণা সিরাজ মিয়ার বৌয়ের ওপর জিনের আছর আছে। লক্ষণ সব সেই রকম। প্রথমত সে অত্যন্ত রূপসী। বাছবিচারও নেই। ভর সন্ধ্যায় অনেকেই তাকে এলোচুলে ঘরে ফিরতে দেখেছে।

সিরাজ মিয়া অবশ্যি বিয়ের প্রসঙ্গে কিছুই বলে না। তবে তার হাবভাব যেন কেমন কেমন। ইদানীং সে প্রায়ই নিমতলী যায়। নৌকাবাইচের ব্যাপারেই নাকি তার যাওয়া লাগে। কিন্তু দৌড়ের নৌকা নিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কি নয়া শার্ট গায়ে দেয় ?

লালচাচি নুরুদ্দীনকে বিকাল পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। যতবারই নুরুদ্দীন উঠতে চায় ততবারই সে তাকে টেনে ধরে বসায়। নতুন এই সমস্যায় কী করণীয় সেই ব্যাপারে পরামর্শ চায়। যেন নুরুদ্দীন খুব একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। নুরুদ্দীন বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলে, চাচারে পানপড়া খাওয়াও।

পানপড়ার কথা লালচাচির অনেকবার মনে হয়েছে, কিন্তু এ গ্রামে পানপড়া দেওয়ার লোক নেই। ভিন্ন গ্রাম থেকে আনতে হবে। লোক জানাজানির ভয়ও আছে। লালচাচি হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুই আইন্যা দিতে পারবি ? সুখান পুকুরে একজন কবিরাজ হুনছি পানপড়া দেয়।

আইচ্ছা।

একলা যাওন লাগব কিন্তুক।

আইচ্ছা।

কেউরে কওন যাইত না। কাকপক্ষীও যেন না জানে।

কেউ জানত না।

নুরুদ্দীনের বড় মায়া লাগে। লালচাচির যে আবার বাচ্চা হবে তা সে জানত না। চোখমুখ সাদা হয়ে গেছে, হাত পা ভারী হয়েছে। চোখের নিচে কালি পড়ে এখন যেন আরও সুন্দর দেখায়, শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছা হয়। লালচাচি বলল, হা কইরা কী দেখস ?

তোমার বাচ্চা হইব চাচি ?

কথার ঢং দেখো। চুপ থাক।

নুরুদ্দীন একবার শেষ চেষ্টা করে—

চাচি দেও না তোমার খোন্দটা। যাইয়াম আর আইয়াম।

আইচ্ছা যা। দেইখ্যা আয় তর জঙ্গলা ভিটা। দিরং করিস না।

দিরং হইত না।

খোন্দায় উঠবার মুখে নুরুদ্দীন দেখল সোহাগীর দল তাদের বাইচের নৌকা নিয়ে মহড়া দিতে বেরিয়েছে। সিরাজ চাচা মাথায় একটি লাল গামছা বেঁধে নৌকার আগায়। নৌকা ছুটছে তুফানের মতো। গানের কথা শোনা যাচ্ছে—

ওগো ভাবিজান বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম
ওগো ভাবিজান বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।

এইবারের বাইচে দুইটি খাসি এবং একটি গরু দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের সাতটি গ্রামের মধ্যে কম্পিটিশন। ভাব সাব যা দেখা যাচ্ছে এ বৎসর সোহাগীর দল বোধহয় জিতেই যাবে।

জঙ্গলা ভিটাকে আর চেনা যায় না। পানিতে ডুবে একাকার। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ। বাঁশের ঝোপ আরও যেন ঘন হয়েছে। চারদিক দিনমানেই অন্ধকার। জঙ্গলা ভিটা ডুবিয়ে পানি ডেফল গাছের গুড়ি পর্যন্ত উঠেছে। খালের মাঝামাঝি লম্বা জলজ ঘাস জন্মেছে। সেইসব ঠেলে খোন্দা নিয়ে এগোনোই যায় না। নুরুদ্দীন ভেসে বেড়াতে লাগল। এক জায়গায় দেখা গেল চার-পাঁচটি থইরকল গাছ। এখানে থইরকল গাছ আছে তা কোনোদিন তার চোখেই পড়েনি। থোকা থোকা থইরকল পেকে লাল টুকটুক করছে। কী আশ্চর্য! নুরুদ্দীন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

এই সময় অদ্ভুত একটি কাণ্ড হলো। হঠাৎ চারদিক সচকিত করে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক এক সঙ্গে কা কা করে উঠে গেল। উত্তর দিকের ঘন বাঁশবনে হাওয়ার একটা দমকা ঝাপটা বিচিত্র একটি হা হা শব্দ তুলল। তার পরপরই নুরুদ্দীন শুনল একটি অল্পবয়েসী মেয়ে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নিশ্চুপ। গাছের পাতাটিও নড়ে না। চারদিক সুনসান।

নুরুদ্দীন ভয় কাতর স্বরে বলল, কেডা গো, কেডা ?

আর তখন তার চোখে পড়ল জঙ্গলা বাড়ির ভিটার কাছে যেখানে জল শ্যাওলায় ঘন সবুজ হয়ে আছে সেখানে মাথার চুল এলিয়ে উপুড় হয়ে মেয়েটি ভাসছে। অসম্ভব ফর্সা তার একটি হাত ছড়ান। হাত ভর্তি গাঢ় রঙের চুড়ি। এই সময় প্রবল একটা বাতাস এল। মেয়েটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতে লাগল নুরুদ্দীনের দিকে। যেন ডুবসাঁতার দিয়ে ধরতে আসছে তাকে।

আকাশপাতাল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল নুরুদ্দীন। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। চোখ গাঢ় রক্তবর্ণ। লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। আমিন ডাক্তার এসে যখন জিজ্ঞেস করল, কী হইছে নুরু ?

নুরু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

কী হইছে ক দেহি নুরু ?

ভয় পাইছি চাচা।

কী দেখছস ?

একটা মেয়েমানুষ সাঁতার দিয়া আমারে ধরতে আইছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি।

প্রচণ্ড ঝড় হলো সেই রাত্রে। ঘন ঘন বিজলি চমকাতে লাগল। কালাচান খবর আনল নিমতলীর দোষ লাগা তালগাছে বজ্রপাত হয়েছে।

পরদিন আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে সারা দুপুর জঙ্গলা বাড়ির ভিটায় ঘুরে বেড়াল। কোথায়ও কিছু নেই। থইরকল গাছগুলি দেখে সে নুরুদ্দীনের মতোই অবাক হলো। উজান দেশের গাছ। ভাটি অঞ্চলে কখনো হয় না। গাছগুলিতে গাঢ় লাল রঙের ফল টুকটুক করছে। আমিন ডাক্তার আরও একটি জিনিস লক্ষ করল জঙ্গলা বাড়ির ভিটা পানিতে ডুবে গেছে। কোনো বছর এ রকম হয় না।

সোহাগীতে রটে গেল পাগলা নুরা ভরা সন্ধ্যায় গিয়েছিল জঙ্গলা বাড়ির ভিটাতে। গিয়ে দেখে পরীর মতো একটা মেয়ে নেংটা হয়ে সাঁতার কাটছে। নুরাকে দেখে সেই মেয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডুবসাঁতার দিল।

নুরুদ্দীনের জ্বর সারতে দীর্ঘদিন লাগল। নিমতলীর পীর সাহেব নিজে এসে তাবিজ দিলেন। গৃহ বন্ধন করলেন। বারবার বলে গেলেন আর যেন কোনোদিন জঙ্গলা ভিটায় না যায়। জায়গাটাতে দোষ হয়েছে। নিমতলীর তালগাছে যে থাকত সে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। জঙ্গলা ভিটায় এসে তার আশ্রয় নেওয়া বিচিত্র না।

১১

সোহাগীতে পানি ঢুকছে এই ভয়াবহ খবরটি চৌধুরীদের পাগল ছেলে প্রথম টের পেল। তার রাতে ঘুম হয় না। বাংলা ঘরের বেঞ্চিতে বসে সিগারেট টানে এবং কোনোরকম শব্দ হলেই চেঁচায়, কেডা ? চোর নাকি ? এই চোর এই চোর। অ্যাইও। তার চেঁচামেচি চলে ভোর পর্যন্ত। ফজরের আজানের পর সে ঘুমাতে যায়। দুপুর পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

সেই রাত্রে সে উঠোনে পাটি পেতে শুয়েছিল। এবং তার স্বভাব মতো চোর চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সমস্ত উঠোনে থৈথৈ পানি। শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। শেয়াল ডাকাডাকি করছে চারদিকে। সে প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারল না। তার নিজস্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেঁচাল কেডা চোর নাকি ? এই শালা চোর ? অ্যাইও। তার পরমুহূর্তেই 'পানি আসে পানি আসে' বলে বিকট চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল। গ্রামের পশ্চিম

প্রান্তের গোয়াল ঘরগুলি থেকে গরু ডাকতে লাগল। বেশির ভাগ মানুষ জেগে উঠল এই সময়। ছোট মসজিদের ইমাম সাহেব রাত সাড়ে তিনটায় আজান দিলেন। অসময়ের আজান মহাবিপদের সংকেত দেয়। লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সরকারবাড়ি থেকে সরকার সাহেব দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোনলা বন্দুক থেকে চার বার ফাঁকা আওয়াজ করলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করল।

আমিন ডাক্তার যখন ঘর থেকে বেরুল তখন তার উঠানে প্রায় হাঁটু পানি। এইরকম অসম্ভব ব্যাপার সোহাগীর মানুষ কখনো দেখেনি। ভাটি অঞ্চলে পানি এত দ্রুত কখনো বাড়ে না। আর বাড়লেও পানি এসে বাড়ির উঠানে কখনো ঢুকে না। আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ি এসে দেখে ইতোমধ্যেই প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে। একটি হ্যাজাক লাইট উঠোনের জলচৌকির ওপর বসান। চৌধুরী সাহেব গলার শিরা ফুলিয়ে হাঁকডাক করছেন।

মেয়েছেলেগুলিরে সরকারবাড়িত লইয়া যাও। গরু ছাগলের দড়ি কাটো। জানো বাঁচানির চেষ্টা করো। ভেন্দার মতো চাইয়া থাইক্য না।

আমিন ডাক্তার দৌড়তে শুরু করল। মতি মিয়ার বাড়ি যাওয়া দরকার। পুরুষমানুষ কেউ নেই সেখানে। শরিফা সেরকম হাঁটা চলাও করতে পারে না। এতক্ষণ সে কথা মনেই হয়নি।

মতি মিয়ার বাড়ির উঠোনে অনেকখানি পানি। দক্ষিণ কান্দার একটি অংশ ভেঙে সর সর করে পানি ঢুকছে। উঠোনের বাঁদিকটা নিচু। সেখানে জলের একটা প্রবল ঘূর্ণি উঠেছে। আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে ঢুকে বেশ অবাক হলো। রহিমা সবকিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে ফেলেছে। হাঁসমুরগি গরুছাগল সমস্তই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চৌকির নিচে ইট দিয়ে অনেকখানি উঁচু করে তার ওপর ধান রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় একটি বড় পোঁটলায় রাখা হয়েছে। শরিফা চৌকির এককোনায় বসে বসে কাঁদছিল। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, ওখন কান্দনের সময় না দোস্তাইন। সরকারবাড়িত যাওন লাগব।

আমি কেমনে যাই ?

নেওনের ব্যবস্থা করতাছি। ওখন শরমের সময় না। হাতটা ধরেন দেহি।

সরকারবাড়ি কিন্তু যাওয়া গেল না। দক্ষিণ কান্দার ভাঙা অংশে জলের চাপ খুব বেশি। সরকারবাড়ি যেতে হলে ভাঙা জায়গাটা পেরুতে হয়। কৈবর্তপাড়ার জেলেরা সবাই চলে এসেছে দক্ষিণ কান্দায়। অনেকগুলি কুপি জ্বলছে সেখানে। চাটাই বিছিয়ে মেয়েরা সব উচ্চস্বরে কলরব করছে। শরিফাকে ওদের কাছে বসিয়ে রেখে আমিন ডাক্তার রহিমাকে আনতে গেল। রহিমা খুন্তি দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘরের ভেতরে কী যেন খুঁজছে। আমিন ডাক্তারকে দেখে সে শান্ত স্বরে বলল, আজরফ এইখানে ধান বেচা টেকা লুকাইয়া রাখছে। পানি উঠলে সব নষ্ট হইব।

আমিন ডাক্তার বেশ অবাক হলো, তোমারে কইছিল সে এখানে লুকাইছে ?

না।

তুমি জানলা কেমনে ?

রহিমা জবাব দিল না। এক মনে খুঁড়াখুঁড়ি করতে লাগল।

ডাক্তার ভাই।

কী ?

আপনে অনুফা আর নুরুদ্দীনরে লইয়া যান, আমার দিরং হইব।

অনুফা নুরুদ্দীনের সঙ্গে চৌকিতে বসে খোঁড়াখুঁড়ি দেখছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, হগলে মিল্যা একসঙ্গে যাইয়াম চাচা।

খুঁতিতে বাঁধা টাকা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। রহিমা বলল, আপনার কাছে রাখেন ডাক্তার ভাই।

আমার কাছে কেরে ?

মেয়ে মাইনসের হাতে টেকা থাকন নাই। দোষ হয়।

দক্ষিণ কান্দায় তারা যখন পৌঁছল তখন পুবদিক ফর্সা হতে শুরু করেছে। কান্দার পশ্চিম পাশে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে মিলে খুব হইচই করছে। কৈবর্তদের একটি ছেলে দৌড়াদৌড়ি করছিল। পা পিছলে নিচে পড়েছে। তাকে তুলে এনে শক্ত মার লাগান হচ্ছে। কৈবর্তদের প্রবীণ নরহরি দাস তামাক টানছে আর বলছে, শক্ত মাইর দেও। তামশা পাইছে।

আমিন ডাক্তার বলল, ও নুরা তোর মারে খুঁইজ্যা বাইর কর, খবরদার কান্দার কিনারাত যাইস না। এক চড় দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিয়াম।

নুরুদ্দীন অনুফার হাত ধরে চক্ষের নিমেষে ছুটে গেল। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, কারবারটা দেখছনি রহিমা, না করলাম যেটা হেইটা করন চাই।

রহিমা মৃদুস্বরে বলল, আপনের একটা কথা কইতাম চাই।

কী কথা ?

কথাডা আপনি কিন্তুক রাখবেন আমিন ভাই।

আমিন ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, বিষয়ডা কী ?

অনুফারে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে পাঠাইতাম চাই। হেইখানে ইস্কুল কলেজ আছে। লেহাপড়া শিখব।

আইজ হঠাৎ এই কথা কী কও ?

ডাক্তার ভাই পানি নামলে এই হানের অবস্থা খুব খারাপ হইব। আজরফের দুইডা পেট ভরনের ক্ষ্যামতা থাকত না।

তুমি তো অনেক দূরের কথা কও রহিমা।

নাহ, ডাক্তার ভাই দূরের কথা না।

নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে খিরিষ্টান হওন লাগে। হেই কথাডা জানত ?

জানি।

তুমি চিন্তাডা এট্টু বেশি করতাছ রহিমা। এই পানি থাকত না। যেমন হঠাৎ আইছে হেই রকম হঠাৎ যাইব।

ডাক্তার ভাই, এই পানি মেলা দিন থাকব।

কান্দার ঠিক মাঝখানে কারা যেন একটা আগুন করেছে। দুর্যোগের সময় মানুষ প্রথমে অকারণেই একটা আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করে। আজকের এই আগুনের অবশ্যি প্রয়োজন ছিল। ভেজা গা শুকোতে হবে। তাছাড়া বিলের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমিন ডাক্তার দেখল ফজলুল করিম সাহেব আগুনের কাছে এসে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এখানে আসার কথা নয়। তাঁর ঘরের কাছেই সরকারবাড়ি।

এই যে ও ভাই আমিন ডাক্তার, এ-কী অবস্থা ?

অবস্থাটা খারাপই, আপনে এতদূর আসলেন।

আমার ঘোড়ার খোঁজে আসছি। মরেই গেছে নাকি, কী বিপদ দেখেন তো ?

পাইছেন ঘোড়া ?

কই পাব বলেন ? ছিঃ ছিঃ, মানুষ থাকে এইখানে ?

নুরুদ্দীন আর অনুফা জারুল গাছের গুড়িতে চুপচাপ বসে আছে। গাছটি কান্দার ধার ঘেঁসে উঠেছে। নিচে তাকালেই পানির ঘোলা আবর্ত চোখে পড়ে। শরিফা বেশ কয়েকবার ডাকল, নুরু অত পানির ধার থাকিস না। কাছে আইসা ব।

নুরু গা করে না। ফিসফিস করে অনুফাকে কী যেন বলে। অনুফা খিলখিল করে হেসে ওঠে। শরিফা ধমকে ওঠে, হাসিস না। খবরদার। বিপদের মইধ্যে হাসি। কিছুই তোর মায় তরে শিখায় নাই ?

ভোরবেলা দেখা গেল ঘোলা পানি কান্দা ছুঁই ছুঁই করছে। নরহরি দাস মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছাব্বিশ সনের বানের লাখান লাগে গো।

কৈবর্তদের চারটি নৌকা জারুলগাছের গুড়িতে শক্ত করে বাঁধা। আমিন ডাক্তার বেশ কয়েকবার বলেছে নৌকাতে করে সবাইকে সরকারবাড়িতে নিয়ে যেতে। সরকারবাড়ি অনেকখানি উঁচুতে। তাছাড়া পাকা দোতলা বাড়ি।

মেয়েছেলেরা সবাই দোতলায় থাকতে পারবে। কৈবর্তরা রাজি না। তারা দক্ষিণ কান্দাতেই থাকতে চায়।

সারা রাত ঝড়বৃষ্টি কিছুই হয়নি। সকালবেলা দেখা গেল আকাশে ঘন কালো মেঘ। দুপুরের পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। নরহরি দাস চিন্তিত মুখে বারবার বলতে লাগল, গতিক খুব খারাপ। ভগবানের নাম নেন গো।

বিকালের দিকে বৃষ্টির চাপ কিছু কমতেই দেখা গেল ছোট ছোট খোন্দা নিয়ে সরকারবাড়ির কামলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারবাড়ির ছোট বৌ নাকি পানিতে পড়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলল। রাত প্রথম প্রহর পুহাবার আগেই কান্দার ওপর আধ হাত পানি উঠে গেল।

পানি থাকল সব মিলিয়ে ছদিন। এতেই সোহাগীর সর্বনাশ হয়ে গেল।

১২

ভাত না খেয়ে বাঁচার রহস্য সোহাগীর লোকজনের জানা নেই। চৈত্র মাসের দারুণ অভাবের সময়ও এরা ফেলে ছড়িয়ে তিন বেলা ভাত খায়। এবার কার্তিক মাসেই কারও ঘরে এক দানা চাল নেই। জমি ঠিকঠাক করার সময় এসে গেছে, বীজ ধান দরকার। হালের গরু দরকার। সিরাজ মিয়ার মতো সম্ভ্রান্ত চাষিও তার কিনে রাখা ঢেউ টিন জলের দামে বিক্রি করে দিল।

ঘরে ঘরে অভাব। ভেজা ধান শুকিয়ে যে চাল করা হয়েছে সে চালে উৎকট গন্ধ। পেটে সহ্য হয় না। মোহনগঞ্জ থেকে আটা এসেছে। আটার রুটি কারও মুখে রুচে না। কেউ খেতে চায় না। লগ্নির কারবারিরা চড়া সুদে টাকা ধার দিতে শুরু করল।

ঠিক এই সময় কলেরা দেখা দিল। প্রথম মারা গেল ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেবের কম্পাউন্ডারটি। হাতির মতো জোয়ান লোক। দুদিনের মধ্যেই শেষ। তার পরদিনই একসঙ্গে পাঁচজন অসুখে পড়ল। আমিন ডাক্তার দিশাহারা হয়ে পড়ল। ওষুধপত্র নেই। খাবার নেই। কীভাবে কী হবে?

রাতে ঘর বন্ধ করে বসে থাকে সবাই। ওলাওঠার সময় খুবই দুঃসময়। তখন বাইরে বেরুলে রাতবিরাতে বিকট কিছু চোখে পড়তে পারে। চোখে পড়লেই সর্বনাশ।

ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেব কলেরা শুরু হওয়ার চতুর্থদিনে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। আমিন ডাক্তারের কাছে ওষুধপত্র নেই। নিমতলীর সিরাজুল ইসলামের কাছে লোক গিয়েছিল। তিনি আসলেন না। নিমতলীতেও কলেরা লেগেছে। সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। তবে সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে। সোহাগীতে এখনো কেউ আসেনি। কেউ বোধহয় নামও জানে না সোহাগীর।

পঞ্চম দিনে রহিমার ভেদ বমি শুরু হলো। আমিন ডাক্তার ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। করবার কিছু নেই। রোগীর পাশে বসে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কীই-বা করা যায়?

শরিফা রহিমার মাথা কোলে নিয়ে বসে ছিল। নুরুদ্দীন অনুফার হাত ধরে বারান্দায় বসেছিল। শরিফা ডুকরে কেঁদে উঠল, এ-কী সর্বনাশ ডাক্তার!

আল্লাহর নাম নেন, আল্লাহ্ নিকাবান।

রহিমার শরীর খুবই খারাপ হলো মাঝ রাত্রে। শরিফা ধরা গলায় বলল, কিছু খাইতে মন চায় ভইন ?

নাহ।

ভইন আমার ওপরে রাগ রাইখো না।

না, আমার রাগ নাই। তোমরার সাথে আমি সুখেই আছিলাম।

শরিফা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমিন ডাক্তার উঠোনের চুলায় পানি সিদ্ধ করছিল। শরিফা বেরিয়ে এসে বলল, এরে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে বালা হইয়া যাইত।

সময় নাই দোস্তাইন। সময়ের অনটন।

রহিমা মারা গেল শেষ রাত্রে। অনুফাকে দেখে মনে হলো না সে খুব বিচলিত হয়েছে। আমিন ডাক্তার বলল, অনুফা বেটি সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল কর। সব জামা কাপড় পানির মইধ্যে সিদ্ধকরণ দরকার।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না। আমিন ডাক্তার অনুফার মাথায় পানি ঢালতে লাগল। অনুফা ফিসফিস করে বলল, চাচাজি নিখল সাব ডাক্তার আইতাছে।

কী কস তুই বেটি ?

নিখল সাব ডাক্তার এই গেরামে আসতাছে।

সেই একরাত্রে সোহাগীতে মারা গেল ছয়জন। গ্রাম বন্ধন দেওয়ার জন্যে ফকির আনতে লোক গেছে। ফকির শুধু গ্রাম বন্ধনই দিবে না ওলাওঠাকে চালান করে দিবে অন্য গ্রামে। অমাবশ্যার রাত্রি ছাড়া তা সম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে আগামীকাল অমাবশ্যা।

ফকির সাব সকালে এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন এসে পৌঁছলেন দুপুরবেলা। খবর পেয়ে আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির ভাত ফেলে ছুটে এল।

ভালো আছ আমিন ?

নিখল সাব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন। বিস্ময়ের চোটে আমিন ডাক্তারের মুখে কথা ফুটল না। ডাক্তার নিখল সাব চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আমরা নিমতলী গিয়েছিলাম সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে, কাজেই তোমাদের এখানে আসলাম। আমাদের আরেকটা টিম গেছে সুখান পুকুর। তোমাদের অবস্থা কী ?

স্যার, খুব খারাপ।

পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে তো লোকজন ?

নিখল সাব হাসতে লাগলেন যেন পিকনিক করতে এসেছেন।

নিখল সাব পৌঁছবার পর আর একটিমাত্র রোগী মারা গেল। কৈবর্তপাড়ার নিমু গোঁসাই। এত অল্প সময়ে ওলাওঠাকে আয়ত্ত করার কৃতিত্বের সিংভাগ পেল ধনু

ফকির। ফকির সাব ওলাওঠাকে পশ্চিমদিকে চালান করেছেন। সেই কারণেই শেষ রোগীটা হয়েছে পশ্চিমের কৈবর্তপাড়ায়।

নিখল সাব ডাক্তার শুক্রবার চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অনুফাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। অনুফা কোনোরকম আপত্তি করল না। নিখল সাব ডাক্তার বারবার জিজ্ঞেস করলেন, আমিন বলছে তোমার মায়ের ইচ্ছা ছিল তুমি আমার স্কুলে পড়, কি যেতে চাও ?

অনুফা মাথা নাড়ল। সে যেতে চায়।

কাঁদবে না ?

উহুঁ।

নাম কী তোমার ?

অনুফা।

এত আস্তে বলছ কেন ? আমাকে ভয় লাগছে ?

উহুঁ।

নৌকা ছাড়ার ঠিক আগে আগে আমিন ডাক্তার চৌধুরীদের পাগল ছেলেটাকে ধরে এনে হাজির করল। যদি নিখল সাব কোনো চিকিৎসা করতে পারে। নিখল সাব জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম আপনার ?

চৌধুরী জমির আলী।

কী অসুবিধা আপনার ?

জি-না, কোনো অসুবিধা নাই।

রাত্রে ভালো ঘুম হয় ?

জি হয়।

অত্যন্ত শান্ত ভদ্র কথাবার্তা। নিখল সাব ডাক্তার নৌকা ছেড়ে দিলেন। বড় গাঙের কাছাকাছি নৌকা আসতেই অনুফা বলল, নুরু ভাই খাড়াইয়া আছে ঐখানে।

নিখল সাব অবাক হয়ে দেখলেন, নুরুদ্দীন নামের শান্ত ছেলেটা সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর আসল কী করে ?

নৌকা ভিড়াব ? কথা বলবে ?

নাহ।

যে মেয়েটি সারাক্ষণের জন্যে একবার কাঁদেনি সে এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট।

নুরুদ্দীনের পেটে সারাক্ষণ ভাতের ক্ষিধে লেগে থাকে। শরিফা রোজই বলে, আজরফ টেকাপয়সা লইয়া আসুক দুইবেলা ভাত রানমু।

কোনদিন আইব ?

কবে যে আসবে তা শরিফাও ভাবে। কোনোই খোঁজ নেই। নুরুদ্দীন গয়নার নৌকায় রোজ দু বেলা খোঁজ করে। মাঝে মাঝে চলে যায় লালচাচির বাড়ি।

দুপুরে কী রানছ চাচি ? ভাত ?

না রে। জাউ। খাবি জাউ ? দেই এক বাটি ?

নাহ।

নুরুদ্দীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, রাইতে ভাত হইবনি চাচি ?

ধুর, ভাত আছে দেশটার মইধ্যে ?

ভাত খাওনের ইচ্ছা হয় চাচি।

লালচাচি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলে, চাইরডা চাউল ঘরে আছে। দিমু ফুটাইয়া ?

আইচ্ছা দেও।

লালচাচি নুরুদ্দীনের কোলে বাচ্চা দিয়ে অল্প কিছু চাল বসায়।

বাচ্চাটা অসম্ভব রুগ্ন। ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। কিছুতেই তার কান্না সামলান যায় না। লালচাচি শান্তস্বরে বলে, ভাতের কষ্ট বড় কষ্টরে নুরা।

হ।

নতুন ধান উঠলে এই কষ্ট মনে থাকত না।

নুরুদ্দীন খেতে বসে হাসিমুখে বলে, অনুফা তিনবেলা ভাত খায়। ঠিক না চাচি ?

হুঁ।

ফালাইয়া ছড়াইয়া খায়। ঠিক না চাচি ?

হুঁ। নিখল সাবের তো আর পয়সার অভাব নাই।

বিকালের দিকে নুরুদ্দীন তার মাছ মারার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হয়। বাড়ির পেছনের মজা খালটাতে গোটা দশেক লার বড়শি পাতা আছে। বড়শিগুলির মাথায় জ্যান্ত লাটি মাছ। লাটি মাছের প্রাণ বড় শক্ত প্রাণ, এই অবস্থাতেও সে দশ-বারো ঘণ্টা বেঁচে থাকে। নুরুদ্দীনের কাজ হচ্ছে লাটি মাছগুলি মরে গেল কি না তাই দেখা। মরে গেলে সেগুলো বদলে দিতে হয়। মাছ কিন্তু ধরা পড়ে না। জঙ্গলা ভিটায় এই পরিশ্রম করলে রোজ দুতিনটা মাছ ধরা পড়ত। নুরুদ্দীনের বড় ইচ্ছা করে জঙ্গলা ভিটায় যেতে, সাহসে কুলায় না। একটা ফর্সা হাতের ছবি চোখে ভাসে। হাতভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। এত লাল চুড়ি হয় নাকি ?

আমিন ডাক্তারের স্কুলে যাওয়াও নুরুদ্দীন বন্ধ করে দিয়েছে। সারা সকাল বসে বসে স্বরে অ স্বরে আ করে চেঁচাতে খুব খারাপ লাগে। এর চেয়ে সরকারবাড়ির জলমহালের কাছে ঘুরাঘুরি করলে কত কী দেখা যায়। জলমহাল এই বৎসর মাছে ভর্তি। পরপর তিন বছর পাইল করা হয়েছে। সাধারণত পানি বেশি হলে মাছ কমে যায়। এই বছর হয়েছে উল্টো। নরহরি দাস বলেছে এত মাছ সে কোনো জলমহালে দেখেনি। নুরুদ্দীন সারা সকাল জলমহালের পাশে বসে থাকে। সরকাররা মাছ ধরার খুব বড় আয়োজন করছেন এই বছর। তাদের ছোট জামাই আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ছোট জামাই গানবাজনায় খুব উৎসাহী। জামাই এলে নিশ্চয়ই কানা নিবারণকে আনা হবে। দুবছর আগে তিনি যাত্রা গান আনিয়েছিলেন, বৈকুণ্ঠের দল। পালার নাম 'মীনা কুমারী'। তিন রাত যাত্রা হয়েছিল। সেই তিন রাত সোহাগীর কারও চোখে ঘুম ছিল না। ছোট জামাই আসার খবর হলে সোহাগীতে একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। এই বার তেমন হচ্ছে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গানবাজনার কথা ভাবতে ভালো লাগে না।

আজরফ ফিরল আশ্বিন মাসে। শরিফার ধারণা আজরফ খালি হাতে আসেনি। বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে এসেছে। তার ধান বিক্রির টাকা আমিন ডাক্তারের কাছে। শরিফা চেয়ে চিন্তে কিছু এনেছে। সেই টাকার প্রায় সবটাই রয়েছে, খরচ হয়নি। শরিফা ভেবেছিল আজরফ আসামাত্র ধান টান কিনবে। খাওয়ার কষ্ট দূর হবে। আজরফ সে রকম কিছুই করছে না। অন্য সবার মতো ঘোরাঘুরি করছে জলমহালে কাজ করবার জন্যে। একদিন শরিফা বলেই ফেলল, টেকাপয়সা কিছু আনছস ?

হুঁ।

কত টেহা ?

আছে কিছু।

ধান টান কিছু কিনন দরকার। নুরা ভাত খাইত পারে না।

এই কয়দিন যখন গেছে বাকি দিনও যাইব।

জমা টেহা দিয়া তুই করবি কী ?

জমি কিনবাম। অভাবের লাগিন হস্তায় জমি বিক্রি হইতাছে।

আজরফ সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। তাকে ভরসা করে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসও করা যায় না। কখন কী করবে বাড়িতে কিছুই বলে না। আমিন ডাক্তার একদিন এসে বলল, আজরফ, নৌকাডা তো খুব বালা কিনছে দোস্তাইন।

শরিফা আকাশ থেকে পড়েছে। নৌকা কেনার কথা সে কিছুই জানে না।

আজরফ তুইনি নাও কিনছস ?

হুঁ।

কই কিছু তো কস নাই।

কওনের কী আছে ?

সরকারবাড়িতে আজরফ রোজ দুবেলা করে যাচ্ছে যেন জলমহালের কাজের ওপর তার বাঁচা মরা নির্ভর করছে। সরকারদের অনেক লোক দরকার। মাছ মোহনগঞ্জ নিয়ে পৌঁছান, নীলগঞ্জ নিয়ে যাওয়া, মাছ কাটা, মাছ শুকানো—কাজের কি অন্ত আছে ? কিন্তু কাজ পাওয়াটাই হচ্ছে সমস্যা। নিজাম সরকার সোহাগীর লোকদের কাজ না দিয়ে অন্য গ্রামের লোকদের কাজ দিচ্ছেন। এর পেছনে তাঁর একটি নিজস্ব যুক্তি আছে। অন্য গ্রামের লোকদের কাজের সময় একটা কড়া কথা বললে কিছু আসে যায় না। কিন্তু নিজ গ্রামের লোকদের বেলা তা করা যাবে না। এদের সঙ্গে নিত্যদিন দেখা হবে। এরা যদি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখে সেটা খারাপ।

নিজাম সরকার অবশ্যি আজরফকে কাজ দিলেন। মাছের নৌকা নিয়ে নীলগঞ্জ যাওয়া।

রাইতে রওনা হইবা সকালের ট্রেইনের আগে নিয়া পৌঁছাইবা। পারবা তো ?

পারবাম।

তোমারে দেইখ্যা অবশ্যি মনে হয় পারবা। তোমার বাপের বদস্বভাব তোমার মইধ্যে নাই। তোমার বাপ আছে কই ওখন ?

ঢাকা জিলায়। নরসিংদী।

বুঝলা আজরফ, গরুর যে গু তারও একটা গুণ আছে। তোমার বাপের হেইডাও নাই।

আজরফের সঙ্গে আমিন ডাক্তারেরও চাকরি হয়। হিসাবপত্র রাখা। হিসাব রাখার জন্যে মোহনগঞ্জ থেকেও একজনকে আনা হয়েছে। সেই লোক অতিরিক্ত চালাক। আমিন ডাক্তারকে চাকরি দেওয়ার সেটাও একটি কারণ। আমিন ডাক্তার এখন আর ডাক্তারি করে না। যদিও রোগী এখন প্রচুর। কিন্তু টাকাপয়সা কেউ দিতে পারে না। ওষুধ পর্যন্ত বাকিতে কিনতে হয়। আমিন ডাক্তারের ওষুধের বাক্সও খালি। ওষুধ কিনে জমিয়ে রাখবে সেই পয়সা কোথায় ?

আমিন ডাক্তার এখনো খেতে যায় চৌধুরীবাড়ি। চৌধুরীবাড়ির খাওয়া আর আগের মতো নাই। সকালবেলা রুটি হয়। রাতের বেলাতেই শুধু ভাত। বৌটি কুণ্ঠিত হয়ে থাকে।

বড় শরম লাগে এইসব খাওয়াইতে।

না মা না শরমের কিছু নাই।

এরার অবস্থা আর আগের মতো নাই। জমি বিক্রি করতাছে।

কও কী মা ? খাস জমি ?

লেচু বাগানটা বেচতাছে। কিছু খাস জমিও যাইব।

কিনে কে, সরকাররা ?

জি-না। মতি মিয়ার ছেলে আজরফ—সেইরকম শুনতাছি।

বড়ই অবাক হয় আমিন ডাক্তার। সেই রাত্রেই মতি মিয়ার বাড়ি উপস্থিত হয়।

আজরফ জমি কিনতাছস হুনলাম।

জি চাচা।

কস কী রে বেটা।

সবটি টেকা একসাথে দিতাম পারতাম না। দুই বারে দিয়াম।

কত টেকা আছে তর, হেই আজরফ ?

আজরফ যেন শরিফা শুনতে না পায় সেভাবে নিচুস্বরে টাকার অংকটা বলে। আমিন ডাক্তারের মুখ হা হয়ে যায়।

১৪

দীর্ঘদিন মতি মিয়ার কোনো খোঁজ নেই।

শরিফার কান্নাকাটিতে আমিন ডাক্তার নরসিংদীর যাত্রা পার্টির অধিকারীকে একটি চিঠি দিয়েছে। দশদিনের মধ্যে তার উত্তর এসে হাজির। কী সর্বনাশ! মতি মিয়া নাকি তিনশ টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছে। আমিন ডাক্তার চিঠির কথা চেপে গেল। শরিফার সঙ্গে দেখা হলেই মুখ কালো করে বলে, চিডির উত্তর তো অখনো আইল না। বুঝলাম না বিষয়ডা।

শম্ভুগঞ্জেও চিঠি লেখা হয়। সেখান থেকেও উত্তর আসে না। কাজকর্মে উজান দেশে যারা গিয়েছিল সবাই ফিরে এসেছে। মতি মিয়ার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। শরিফা খুব চিন্তিত। আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। রাতে ভালো ঘুম হয় না। সংসারের কাজকর্মেও মন বসে না। তবুও যন্ত্রের মতো সব কাজ করতে হয়। আজরফ ভর দিয়ে চলার জন্যে লাঠি বানিয়ে দিয়েছে। সেইটি বগলের নিচে দিয়ে সে ভালোই চলাফেরা করতে পারে। রহিমা মারা যাওয়ায় এখন সে কিছুটা নিঃসঙ্গ অনুভব করে। রাগারাগির জন্যেও হাতের কাছে একজন কেউ দরকার। আজরফ এমন ছেলে যাকে দশটা কথা বললে একটার উত্তর দেয়। তার বেশির ভাগ উত্তরই হুঁ হুঁ জাতীয়। আর নুরুদ্দীনের তো দেখাই পাওয়া যায় না। রাতের বেলাও সে মায়ের সঙ্গে ঘুমুতে আসে না। একা একা বাংলা ঘরে শোয়। এইটুকু ছেলের একা একা শোবার দরকারটা কী ? কিন্তু শরিফার কথা কে শুনবে ?

নীলগঞ্জে শনিবার হাট বসে। সেই হাটে মতি মিয়ার সঙ্গে নইম মাঝির হঠাৎ দেখা। নইম মাঝি বেশ কিছুক্ষণ চিনতেই পারেনি। হাত-পা ফোলা ফোলা। মাথার

সেই কোঁকড়ানো বাবরি চুল নেই। মুখভর্তি দাড়ি। খালি গায়ে একটা চায়ের স্টলের সামনে চুপচাপ বসে আছে।

কেডা, মতি ভাই না ?

মতি মিয়া মুখ ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, নইম বালা আছ ?

ও মতি ভাই, তুমি এইখানে করডা কী ?

চা খাইলাম। বালা চা বানায়।

শইলডা খারাপ নাকি মতি ভাই ? তুমি না শম্ভুগঞ্জে আছিলা ?

যাত্রার চাকরিডা নাই।

করো কী তুমি ওখন ?

করি না কিছু। গান বান্দি।

বাড়িত যাইতা না ? লও আমার সাথে নাও লইয়া আইছি।

না।

ওখন যাইতা না তো কোনো সময় যাইবা ?

ওখন এট্টু অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা ? বাড়িতে বেহেই চিন্তা করতাছে।

মতি মিয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে থেমে থেমে বলল, একটা শাদি করছি নইম।

নইম মাঝির মুখে কথা সরে না। বলো কী মতি মিয়া। কবে করলা ?

মাস দুই হইল।

তাজ্জব করলা তুমি মতি ভাই।

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, কেউরে হুনাইও না। তোমার আল্লার দোহাই।

নইম মাঝি কাউকে বলল না, শুধু আজরফকে বলল।

পাঁচ কান করিস না আজরফ, নিজে গিয়া দেখ আগে। তর মারে হুনাইস না। মাইয়ামানুষ বেহুদা চিল্লাইব।

আজরফের কোনো ভাবান্তর হয় না। যথানিয়মে কাজকর্ম করে। তারপর একদিন বাঁশ আর চাটাই দিয়ে রহিমার ঘর ঠিকঠাক করতে থাকে। শরিফার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি খুব রহস্যময় মনে হয়। হঠাৎ কাজকর্ম ফেলে ঘরদুয়ার ঠিক করার দরকারটা কী ? নুরুদ্দীনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ঘর ঠিকঠাক করে যে—বিষয়ডা কী ?

আমি কী জানি ?

তুই গিয়া জিগা।

তুমি জিগাও গিয়া আমার ঠেকা নাই।

শরিফার নিশ্চিত ধারণা হয় আজরফ সম্ভবত বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করতে চাওয়াটা দোষের কিছু না, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সময় অসময় আছে। চাইলেই তো আর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না ? দেশজুড়ে আকাল। ঘরের মানুষটার কোনো খোঁজ নাই। টাকাপয়সা অবশ্যি আছে। ভালোই আছে। ধান বেচা টাকা, উজান দেশ থেকে নিয়ে আসা টাকা। এদিকে সরকাররাও নিশ্চয়ই ভালো দিচ্ছে। গরুর মতো যে খাটে তাকে দিবে না ? কিন্তু টাকা থাকলেই বিয়ে করতে হবে ?

শরিফা বড়ই চিন্তিত বোধ করে। পরামর্শ করার লোক নেই। রহিমা থাকলে এই ঝামেলা হতো না। একদিন নইম মাঝির বৌ এসে বলল, আজরফরে দেহি চৌধুরীবাড়ির কোনায় কোনায় ঘুরে। এট্টু খিয়াল রাইখ্যো।

কথা সত্যি হলে খুবই ভয়ের কথা। চৌধুরীবাড়ির কোনো মেয়েকে মনে ধরলেও তা মুখ ফুটে বলা উচিত না। শরিফা কায়দা করে জানতে চায় ব্যাপারটা। আজরফকে ভাত বেড়ে দিয়ে হঠাৎ বলে বসে, চৌধুরীবাড়ির মাইয়ার লাখান মাইয়া পাইলে বউ করতাম।

আজরফ নিরুত্তর।

হলদির লাখান শইলের রঙ।

আজরফকে দেখে মনে হয় সে কিছু শুনছে।

চোধুরী বাড়ির ছোড মাইয়াডারে দেখছসনি আজরফ ?

নাহ।

শরিফার ঠিক বিশ্বাস হয় না। বড়ই অস্বস্তি বোধ হয় তার। তারপর একদিন যখন আজরফ হঠাৎ ঘোষণা করে আগামীকাল ভোরে সে নুরুদ্দীনকে নিয়ে নীলগঞ্জে যাবে তার বাবাকে আনতে, তখন সন্দেহ ঘনীভূত হয়। হঠাৎ বাপের খোঁজ বের করে আনবার জন্যে যাওয়া কেন ? আর নুরুদ্দীনের জন্যেই বা নতুন গেঞ্জি কেনা হলো কেন ?

নতুন গেঞ্জির দরকারটা কী ছিল ?

মতি মিয়ার বৌটির নাম পরী।

মেয়েটির বয়স খুবই কম এবং বড়ই রোগা। কথা বলে উজান দেশের মানুষদের মতো টেনে টেনে। নুরুদ্দীন খুব অবাক হলো। সে ভাবতেও পারেনি এরকম আশ্চর্য একটি ব্যাপার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরী নুরুদ্দীনের হাত ধরে তাকে পাশে বসাল এবং টেনে টেনে বলল, ছোড মিয়ার গালে একটা লাল তিল, দেখছনি কাণ্ড।

গালের লাল তিল যে একটি চোখে পড়ার জিনিস নুরুদ্দীন তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তার লজ্জা করতে লাগল।

চা খাইবা ছোড মিয়া ? চা বানাই ? নতুন খেজুর গুড়ের চা।

নুরুদ্দীনের মতো বাচ্চাছেলেকে চা খাওয়াবার জন্যে কেউ সাধাসাধি করে ? তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে লজ্জিত মুখে চোখ ঘুরিয়ে ঘরবাড়ি দেখতে লাগল। দেখার মতো কিছু নেই। ছোট্ট এক চিলতে ঘর। এক প্রান্তে দড়ির একটি খাটিয়ায় কাঁথা বালিশ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটি হারমোনিয়ামের ওপর একজোড়া ঘুঙুর। চা বানাতে বানাতে পরী বলল, নাচনিওয়ালি ছিলাম, বুঝছনি ছোড মিয়া। হইলাম ঘরওয়ালি।

মতি মিয়া ধমক দিল, আহ্ কী কও ?

ক্যান, তোমার দরকারডা কী ?

পরী খিলখিল করে হাসতে লাগল।

ফেরবার পথে মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে রইল। তাকে বড়ই চিন্তিত মনে হলো। কিন্তু পরীর ভাব ভঙ্গি খুব স্বাভাবিক। নৌকার অন্যপ্রান্তে নুরুদ্দীনের সঙ্গে সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে, ঐটা কোন গ্রাম ? ঘাসপোতা ? ঘাসপোতা আবর কেমুন নাম ?

ভাটি অঞ্চলে পানি কোন সময় হয় ?

তোমরার জঙ্গলা বাড়ির ভিটাতে তুমি নাকি একটা পেততুনি দেখছিলা ? হাতে লাল চুড়ি ? কথাডা সত্য ?

চৌধুরীবাড়ির একটা পুলার নাকি মাথা খারাপ ?

কে ধনী বেশি ? চৌধুরীরা না সরকাররা ?

মতি মিয়া তেমন কোনো কথাবার্তা বলল না। বড় গাঙ থেকে ছোট গাঙে নৌকা ঢুকবার সময় শুধু বলল, জমির কাজকাম শুরু করন দরকার।

আজরফ বলল, আপনে আর যাইতেন না শম্ভুগঞ্জ ?

ধুর গানবাজনা ছাড়ান দিছি। পোষায় না।

আজরফ কিছু বলল না। মতি মিয়া নিজের মনেই বলল, ঘরসংসার দেখন দরকার। গান বাজনায় কি পেট ভরে ? ভাত কাপড়ডা আগে, বুঝছস ?

নৌকা সোহাগীর কাছাকাছি আসতেই মতি মিয়া উসখুস করতে লাগল। আমরা যে আসতাছি তর মায় জানে।

নাহ।

কিছুই কস নাই ?

নাহ।

মাবুদে এলাহি! বড় চিন্তার কথা আজরফ। কামডা ঠিক হইল না। আমি ভাবছি তর মা বোধহয় নেওনের লাগি পাঠাইছে।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে তামাক টানতে লাগল। নৌকা ঘাটে আসামাত্র আজরফকে বলল, আমিন ডাক্তারের সাথে একটা জরুরি কথা আছিল। কথাডা সাইরা আইতাছি, তরা বাড়িত যা। আজরফ কিছু বলার আগেই মতি মিয়া সরকারবাড়ির আমবাগানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শরিফার স্তম্ভিত ভাব কেটে যেতেই সে চেঁচাতে শুরু করল। সন্ধ্যাবেলাটা কাজকর্মের সময়, তবু তার চিৎকারে ভিড় জমে গেল। এমন ব্যাপার সোহাগীতে বহুদিন হয়নি। মতি মিয়া কোত্থেকে এক মেয়ে নিয়ে হাজির হয়েছে। সেই মাগির লজ্জা শরম কিছু নেই, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। শরিফার চিৎকার সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে সে ভরসন্ধ্যায় ঘাটে গা ধুতে গেল। হারিকেন হাতে তার পিছুপিছু গেল নুরুদ্দীন। গাঙের পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বলল, আমারে না দেখলে চিল্লানিটা কিছু কমব, কী কও নুরুদ্দীন ?

চিৎকার অবশ্য কমল না। পরী ফিরে এসে দেখে শরিফা নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। নইম মাঝির বউ তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। পরী বলল, এমন চিল্লাইয়া তো কোনো লাভ নাই। চিল্লাইলে কী হইব কন আপনে ? আমি এই খানেই থাকবাম। আমার যাওনের জায়গা নাই।

শরিফা পরপর দুদিন না খেয়ে থাকল। ঘুন ঘুন করে কাঁদল পাঁচদিন। তারপর রাগ পড়ে গেল। এইসময় পরী সম্পর্কে তার ধারণা হলো মেয়েটি খারাপ না। মতি মিয়ার মতো একটি অপদার্থের হাতে কেন পড়ল কে জানে!

নুরুদ্দীনকে এখন আর লালচাচির কাছে ভাত খেতে যেতে হয় না। পরী শুধুমাত্র নুরুদ্দীনের জন্যেই ভাতের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্যি লালচাচি কিছুদিন হলো বাচ্চা রেখে চলে গিয়েছে বাপের বাড়ি। সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করেছে। এই বৌটি বোকাসোকা। বড় আদর করে লালচাচির ছেলেকে। ছেলেটি তবুও রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে। এই বৌটি নুরুদ্দীনকে খুব আদর করে। নুরুদ্দীনকে দেখলেই বলে, লাড্ডু খাইবা ? তিলের লাড্ডু আছে।

নুরুদ্দীন না বললেও সে এনে দেবে। কাজকর্মে সে লালচাচির চেয়েও আনাড়ি। এই বৌটিকেও নুরুদ্দীনের খুব ভালো লাগে।

১৫

সরকারবাড়ির জলমহালে মাছ মারবার জন্যে একদিন সকালে একদল কৈবর্ত এসে হাজির। সর্বমোট সাতটি নৌকার বিরাট একটি বহর। স্থানীয় কৈবর্তরা ধারণাও করতে পারেনি বাইরের জেলেদের মাছ মারার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় কৈবর্তদের প্রধান নরহরি দাস ছুটে এল। নিজাম সরকার গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমরার কাছে মাছ ধরার বড় জালই নাই। তোমরা মহালের মাছ ধরবা কী দিয়া ?

এইডা কী কথা কইলেন সরকার সাব। মাছ ধরাই আমরার কাম আর জাল থাকত না ? আসল কথাডা কী চৌধুরী সাব ?

আসল কথা নকল কথা কিছু নাই নরহরি। নিজ গেরামের লোক দিয়া আমি কাম করাইতাম না।

আমরা দোষটা কী করলাম। সারা বছর জলমহালের দেখশোন করলাম। এখন পুলাপান লইয়া কই যাই ?

নরহরি দাস হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

বিদেশী কৈবর্ত দলটি রাতারাতি জলমহালের পাশে ঘরবাড়ি তুলে ফেলল। গাবের কষে জাল ভিজিয়ে প্রকাণ্ড সব জাল রোদে শুকাতে লাগল। ওদের মেয়েরা উদোম গায়ে শিশুদের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এমনভাবে হাঁটাচলা করতে লাগল যেন এই জায়গায় তারা দীর্ঘদিন ধরে আছে। রাতারাতি নতুন বসতি তৈরি হলো। হাঁসমুরগি চড়ছে। গরু দোয়ান হচ্ছে। সন্ধ্যার পর খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে গানবাজনার আয়োজনও হলো। ঢোল বাজতে লাগল মধ্যরাত পর্যন্ত।

নরহরি দাস তাদের সঙ্গে আলাপ করে সুবিধা করতে পারল না। সরকারবাড়ির সঙ্গে নরহরির কী কথা হয়েছিল তা তারা জানতে চায় না। তাদের চার মাসের কড়ারে আনা হয়েছে। মাছের ত্রিশ ভাগ নিয়ে মাছ ধরে দিবে এইটিই একমাত্র কথা। নরহরির যদি কিছু বলবার থাকে তাহলে তা সরকারবাড়ির সঙ্গেই হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে নয়।

মঙ্গলবার সকালবেলা কৈবর্তদের কুমারী মেয়েরা এলোচুলে জলমহালে নেমে পূজা দিল। পূজার ফলস্বরূপ অসম্ভব মাছ ধরা পড়বে। মাছ মারায় কোনোরকম বিঘ্ন উপস্থিত হবে না। প্রথম যে মাছটি ধরা পড়ল সেটি একটি দৈত্যাকৃতি কাতল। ডালায় সিঁদুর, ফুল এবং কাতলটি সাজিয়ে পাঠানো হলো সরকারবাড়ি। ঘনঘন উলু পড়তে লাগল নতুন কৈবর্তপাড়ায়।

মাছ মারা শুরু হয়েছে পুরাদমে। মাছখলার পাশে একটি চালাঘর তোলা হয়েছে। আমিন ডাক্তার সেখানে খাতা-পেন্সিল নিয়ে সারা দিন বসে থাকে। কৈবর্তরা চিৎকার করে হিসাব মিলায়,

এক কুড়ি— এক
দুই কুড়ি— দুই
তিন কুড়ি— তিন
রাখ তিন। রাখ তিন। রাখ তিন।
চার কুড়ি— চার
পাঁচ কুড়ি— পাঁচ
ছয় কুড়ি— ছয়
রাখ ছয়। রাখ ছয়। রাখ ছয়।

আমিন ডাক্তারের ব্যস্ততার সীমা নেই। কত মাছ ধরা পড়ল, কত গেল, আর কত মাছ পাঠানো হলো খলায়—সহজ হিসাব নয়। নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা চৌধুরীবাড়ির মতো নয়। খাবার দেওয়া হয় বাংলাঘরে। একটি কামলা এসে ভাত দিয়ে যায়। মোটা চালের ভাত আর খেসারির ডাল। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করে না। এই ব্যবস্থা আমিন ডাক্তারের ভালো লাগে। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখছে জানলে তৃপ্তি করে খাওয়া যায় না। এখানে সে ঝামেলা নেই। নিশ্চিত মনে খাওয়া যায়। তবুও প্রতিবারেই খেতে বসার সময় চৌধুরীবাড়ির কথা মনে পড়ে।

শেষদিন যখন খেতে গেল তখন খুব ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। মাঝখানে চৌধুরী সাহেব এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন।

শেষ কয়টা দিন তোমার কষ্ট হইল ডাক্তার, সময়টা আমার খারাপ পড়ছে, কী আর করবা কও।

না না চৌধুরী সাব কী কন আপনি ?

কোনোদিন চিন্তাও করছি না আমার বাড়ির অতিথ চাইর পদের নিচে খানা খাইব।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ থেকেই চলে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার শেষে বৌটি যথারীতি মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে ডাক্তার চাচা ?

আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরা গলায় বলল, খুব খাইছি মা।

বসেন, পান আনতে গেছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অনেক ভদ্রলোক দেখছি মা এই জীবনে, কিন্তু চৌধুরীর মতো ভদ্রলোক দেখলাম না।

বৌটি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। আমিন ডাক্তার যখন চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন শান্ত গলায় বলল, ডাক্তার চাচা, আমার বিয়ার সময় এরা কিন্তু কয় নাই ছেলেটা পাগল। ছয় বৎসর বিয়া হইছে কিন্তু আমারে বাপের বাড়িত যাইতে দেয় না। আমার বাপ চাচা গরিব মানুষ। তারা কী করব কন ?

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বৌটি মনে হলো কাঁদছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, মা আমি খাস মনে দোয়া করতাছি ছেলেটা বালা হইয়া যাইব। মাথার দোষ থাকত না। তুমি দেখবা নিজেই দেখবা।

ঘর থেকে বেরুবার পরপরই পাগল ছেলেটা চেঁচাতে লাগল, এই শালা আমিন চোরা, তরে আইজ খুন কইরা ফাঁসি যাইয়াম। শালা, তর একদিন কী আমার একদিন।

আমিন ডাক্তার জলমহালে ফিরে এসে দেখে তার ঘরে আজরফ বসে আছে।

কীরে আজরফ, কোনো খবর আছে ?

জি-না চাচা। বাজান আবার গেছে গিয়া।

কস কী ? কই গেছে ?

জানি না।

আজরফ চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই আমিন ডাক্তার দেখল আজরফের চোখ ভেজা।

বিষয় কী আজরফ, কী হইছে ?

জমি কিনার লাগিন যে টেকাপয়সা আছিল বাজান সব লইয়া গেছে। পাতিলের মইধ্যে আছিল।

কান্দিস না আজরফ। বেডা মাইনষের কান্দন ঠিক না, চউখ মুছ।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল।

১৬

নুরুদ্দীনের লার বড়শিতে প্রকাণ্ড একটি রুই মাছ ধরা পড়েছে। লার বড়শিগুলিতে বোয়াল মাছ ছাড়া অন্যকিছু ধরা পড়ে না। এই রুই মাছটার মরণ দশা হয়েছিল। খালের পাশে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুনে পরী এগিয়ে দেখে এই কাণ্ড। দুজনে মিলে মাছ টেনে তুলতে পারে না। লার বড়শির টুইন সুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে না কেন সেও এক রহস্য। হইচই শুনে শরিফা বেরিয়ে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, মাছ কই পাইছস, এই নুরা ?

নুরুদ্দীন হাঁপাচ্ছে, কথা বলার শক্তি নেই।

এই ছেরা মাছ কই পাইছস ?

বড়শি দিয়া ধরলাম।

এই মাছ তুই বড়শি দিয়া ধরছস ? কী কস তুই ?

নুরুদ্দিন জবাব দিল না।

পরী হাসিমুখে বলল, আইজ খুব বালা রান্ধন করবাম। আজরফরে কইয়াম চাইরডা পোলাউয়ের চাউল আনত। কী কস নুরা ?

নুরুদ্দীন সব কয়টি দাঁত বের করে হাসে। শরিফা গলা উঁচিয়ে ডাকে, আজরফ ও আজরফ, উইঠ্যা আয়।

আজরফ সারা রাত নৌকা চালিয়ে মাছ নিয়ে যায় নীলগঞ্জে। দিনেরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমায়। ডাকাডাকি শুনে সে বাইরে এসে অবাক, অতবড় মাছ কই পাইছস নুরা ?

লার বড়শি দিয়া ধরছি।

কস কী নুরুদ্দীন!

পরী হাসতে হাসতে বলল, মাছটার কপালে মিত্যু লিখা ছিল, বুঝছ আজরফ ? ওখন যাও কিছু বালা-মন্দ রান্ধনের জোগাড় করো। চাইরডা পোলাওয়ের চাউল আনতা পারবা ?

আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, মাছটা নীলগঞ্জে লইয়া যাইয়াম। পনরো টেহা দাম হইবে মাছটার।

নুরুদ্দীন ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, এই মাছ আমি বেচতাম না ভাইসাব!

আমরা অত বড় মাছ দিয়া কী করবাম ? বেকুবের মতো কথা কস। ঘরে একটা পয়সা নাই।

কানকোয় দড়ি বেঁধে আজরফ মাছ গাঙের পানিতে ছেড়ে রাখল। নৌকা ছাড়বে আছরের ওয়াক্তে। যতক্ষণ পারা যায় মাছ জিইয়ে রাখা। নুরুদ্দীন কোনো কথা বলল না। আজরফ আবার যখন কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাবার আয়োজন করছে তখন নুরুদ্দীন চাপা স্বরে বলল, ভাইসাব মাছ আমি বেচতাম না।

আজরফ বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, এক চড় দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিয়াম— এক কথা একশবার কস।

আজরফ আছরের আগে আগে মাছ আনতে গিয়ে দেখে খুঁটিতে বাঁধা মাছ নেই। নুরুদ্দীনেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যাপারটিতে পরীর হাত আছে বোঝাই যাচ্ছে। আজরফ লক্ষ করল পরী মুখ টিপে হাসছে। আজরফ নীলগঞ্জে যাওয়ার জন্যে যখন তৈরি হচ্ছে তখন পরী বলল, কয়েকটা টেকা রাইখ্যা যাও আজরফ, পুলাপান মাইনষের শখ। গোসা হইও না।

আজরফ কথার উত্তর না দিয়ে বের হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল বালিশের ওপর পাঁচ টাকার একটি নোট।

আমিন ডাক্তার দীর্ঘদিন পর আজ ডাক্তারি করে এল। রোগী নয়া কৈবর্তপাড়ায়। উত্থান শক্তি নেই এক বুড়ি। দুদিন ধরে প্রবল জ্বর। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আমিন ডাক্তার গিয়ে দেখে বুড়ির যত্নের সীমা নেই। গোটা কৈবর্তপাড়াই বুড়িকে ঘিরে আছে। একজন পায়ের পাতায় প্রাণপণে তেল মালিশ করছে অন্য একজন তার পাখা নিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া করছে। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড ধমক দিল পাখাওয়ালা ছেলেটিকে।

নিউমোনিয়া বানাইতে চাস নাকি, অ্যাঁ ?

আমিন ডাক্তার তার ব্যাগ খুলে লাল রঙের দুটি বড়ি পানিতে গুলে খাইয়ে দিল। ওষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক বুড়ি চোখ মেলল দেখতে দেখতে।

কেডা গো ?

এইলা আমিন ডাক্তার। এই দিগরে ইনার মতো ডাক্তার নাই।

বুড়ি ক্ষীণস্বরে বলল, ডাক্তার সাবের শইলডা বালা ?

ওষুধের দাম বাবদ একটাকা ছাড়াও আরও পাঁচটা টাকা তারা রাখল আমিন ডাক্তারের সামনে। আমিন ডাক্তার অবাক।

এক টাকা ভিজিট আমার।

ডাক্তার সাব রোগীর নিজের টাকা। সে আপনেরে দিতে চায়। কাইল সকালে আরেকবার আইস্যা দেখন লাগব।

না কইলেও আসবাম। রোগীর একটা বিহিত না হইলে কি আর ডাক্তারের ছুটি আছে ? ডাক্তারি সোজা জিনিস ?

হৃষ্টচিত্তে বাড়ির পথ ধরল আমিন। পিছে পিছে একজন এল হারিকেন নিয়ে। যার যা কাজ সেটা না করলে কি আর ভালো লাগে ? না, ডাক্তারিটা আবার শুরু করতে হয়। ওষুধপত্র কেনার জন্যে মোহনগঞ্জ যেতে হবে। এবার নিখল সাবকে একটা চিঠি দিলে কেমন হয় ? ডাক্তারের সাথে ডাক্তারের যোগ তো থাকাই লাগে। অনুফার একটা খোঁজও নেওয়া দরকার—কেমন আছে মেয়েটা কে জানে ?

আমিন ডাক্তারের বাড়ির উঠোনে গুটিশুটি মেরে কে যেন বসে আছে। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কেডা এই খানে ?

আমিন চাচা, আমি।

তুই অত রাইতে কী করস ?

নুরুদ্দীন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্দস ক্যান ? কী হইছে ?

আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

কী রাইখ্যা দিছে ?

মাছ।

আমিন ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারল না। হারিকেনের আলোয় দেখল নুরুর সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়েছে। ঠোঁট কেটে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। ডান গাল ডালিমের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

এই নুরা কী হইছে ?

আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

আয়, ভিতরে আইয়া ক দেহি কী হইছে। কান্দিস না।

ঘটনাটি এরকম। নুরুদ্দীন তার রুই মাছ নিয়ে দক্ষিণ কান্দায় উঠতেই নিজাম সরকার তাকে দেখতে পান। নিজাম সরকারের ধারণা হয় মাছটা গত রাত্রে মাছ খলা থেকে চুরি করা। এত বড় একটা মাছ (তাও রুই মাছ) লার বড়শিতে ধরা পড়েছে এটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার ওপর নুরুদ্দীন সারাক্ষণই জলমহালের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরাঘুরি করে।

নিজাম সরকার নুরুদ্দীনকে ধরে নিয়ে যান মাছখলায়। মাছ চুরিতে কারা কারা আছে তা জানবার জন্যে মাত্রার বাইরে মারধোর করা হয়। মারের জন্যে নুরুদ্দীনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাছটি ফেরত পাবার আশাতেই সে বিকাল থেকে আমিন ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, যা বাড়িত যা, আমি সরকারবাড়িত যাইতাছি।

মাছটা তারা দিব আমিন চাচা ?

নিশ্চয়। না দিয়া উপায় আছে ? কান্দিস না। বাড়িত যা।

এইখানে বইয়া থাকি চাচা, আপনে মাছটা লইয়া আইয়েন।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের কথা শুনে বিরক্ত হলেন। এ-কী ঝামেলা। তামাক টানা বন্ধ রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, চোরের যে সাক্ষী হেও চোর—এইডা জানো ডাক্তার ?

সরকার সাব, নুরু চুরি করে নাই।

চুরি করছে না তুমি নিজে দেখছ ?

আমিন থেমে থেমে বলল, সরকার সাব চুরি যে নুরু করছে, হেইডাও তো আপনে দেখেন নাই।

নিজাম সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কড়া গলায় বললেন, বাড়িত যাও ডাক্তার।

সরকার সাব, একটা বড় অন্যায় হইছে অন্যায়টার বিহিত হওন দরকার।

তুমি বড় ঝামেলা করতাছ। যাও বাড়িত গিয়ে ঘুমাও। সকালে আইবা তোমার সাথে কথা আছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অন্যায়ের বিহিত না হওন পর্যন্ত আমি যাইতাম না।

কী করবা তুমি ?

আপনের বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মইধ্যে বইয়া থাকবাম।

যাও, থাক গিয়া।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। ছোট লোকরা বড় বেশি আসকারা পেয়ে যাচ্ছে। শক্ত হাতে এইসব বন্ধ করতে হবে। এশার নামাজের

পর উঠানে এসে দেখেন আমিন ডাক্তার সত্যি সত্যি বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে। চৌধুরীদের পাগলা ছেলেটাও আছে সেখানে। সে ক্ষণে ক্ষণে চেঁচাচ্ছে, চোরের গুষ্টি বিনাশ করন খুব বেশি দরকার। চৌধুরীবাড়ির কামলারা এসে পাগলটাকে ধরে নিয়ে গেল।

নইম মাঝির বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত টুয়েন্টি নাইন খেলা হয়। নইম মাঝি মাঝরাত্রে খেলা ফেলে দেখতে গেল আমিন ডাক্তারের ব্যাপারটা কতদূর সত্যি। হ্যাঁ আমিন ডাক্তার বসে আছে ঠিকই। তার গায়ে লাল রঙের কোট। কার্তিক মাসের ঠান্ডা হাওয়া বইছে বলেই মাথার উপর ছাতি মেলা হয়েছে।

সত্যি সত্যি বাড়িত যাইতা না ডাক্তার ভাই ?

নাহ।

জার পড়ছে খুব। বিড়ি খাইবা ? চান বিড়ি আছে।

দেও দেখি।

বিড়ি ধরিয়ে নইম মাঝি শান্ত স্বরে বলল, ডাক্তার ভাই বাড়িত গিয়ে ঘুমাও। শীতের মইধ্যে বইয়া থাইক্যা লাভটা কী কও ?

আমিন ডাক্তার কিছু বলল না।

হঠাৎ বিড়ির লালাভ আগুনে নইম মাঝি লক্ষ করল, আমিন ডাক্তার কাঁদছে। সে বড়ই অবাক হলো। নইম মাঝি সেই রাত্রে আর বাড়ি ফিরল না। নয়া কৈবর্তপাড়ায় প্রতি রাতেই ঢোল বাজিয়ে গানবাজনা হয়। আজ আর হলো না।

১৭

নিজাম সরকার কল্পনাও করেননি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। একটা আধা পাগলা লোক বাড়ির সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকলে কার কী যায় আসে ?

কিন্তু নিজাম সরকার ফজরের নামাজ শেষ করে বারান্দায় এসে দেখেন আমবাগানে দশ-বারোজন লোক জটলা পাকাচ্ছে। আমিন ডাক্তারের গা ঘেঁসে বসে আছে নইম মাঝি। নইম মাঝি নিজাম সরকারকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সালামালিকুম সরকার সাব।

নিজাম সরকার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। নামাজের পর তিনি উঠোনে বসে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শরীফ পড়েন। আজ পড়তে পারলেন না। হনহন করে এগিয়ে গেলেন আমিন ডাক্তারের দিকে।

নইম মাঝি সরকার সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল কিন্তু আমিন ডাক্তার বসে রইল। বহু কষ্টে রাগ সামলালেন নিজাম সরকার। থমথমে গলায় বললেন, তুমি এইখানে কী করো নইম ? বেহুদা ঝামেলা করতাছ তোমরা। আমি থানাতে খবর দিয়াম। যাও, বাড়িত যাও।

আইচ্ছা।

নইম মাঝি কিন্তু বাড়ি গেল না। আমিন ডাক্তারের পাশে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

জলমহালে গিয়ে সরকার সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে গেল। মাছ মারার কোনো আয়োজন নেই। জেলেরা ছেলেমেয়ে নিয়ে রোদ তাপাচ্ছে।

এই বিষয় কী ? আইজ কাজ কাম নাই ?

কৈবর্তদের মুরব্বি ধীরেন্দ্র হাতজোড় করে এগিয়ে এল।

এই ধীরেন কী হইছে ?

আমরারে কইছে আইজ মাছ মারা হইত না।

কে কইছে ?

ধীরেন্দ্র নিরুত্তর।

বলো কে কইছে ?

হাশেম সাব কইছেন।

হাশেম সাব ? ডাক তো হাশেম সাবরে দেখি বিষয়ডা কী ?

হাশেম সাব আমিন ডাক্তারের সঙ্গে মাছের হিসাব রাখে। লোকটি মহাধুরন্ধর। এসেই অবাক হয়ে বলল, আমি আবার কোন সময় কইলাম। ফাইজলামির জায়গা পাও না ? যত ছোটলোকের দল। যাও, কামে যাও।

কার্তিক মাসের শেষাশেষি জমি তৈরির কাজে সবার ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু সোহাগীর লোকজন সেদিন কেউ কাজে গেল না। সরকারবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। দুপুরবেলা এলেন চৌধুরী সাহেব। গম্ভীর হয়ে বললেন, ঝামেলাটা মিটাইয়া ফেল নিজাম। লোকটা না খাইয়া আছে।

কী করতে কন আমারে ?

মহাল থাইক্যা একটা বড় মাছ ধইরা মতি মিয়ার বাড়িত পাঠাইয়া দেও। একটা মাছে তোমার কিছু যাইত আইত না।

চৌধুরী সাব নরম হইলে গাঁও গেরামে থাকন যায় না। আইজ একটা মাছ দিলে কাইল দেওন লাগব দশটা।

লোকটা না খাইয়া থাকব ?

আমি কী করতাম তার ? আমি কি তারে কইছি না খাইয়া থাকতে ?

চৌধুরী সাহেব গেলেন আমিন ডাক্তারের কাছে। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ডাক্তার, আইও আমার সাথে চাইরডা ডাইল ভাত খাও। আও দেখি আমার সাথে।

একটা মীমাংসা না হইলে কেমনে খাই চৌধুরী সাব ?

কয়দিন থাকবা এইবায় ? ধরো যদি মীমাংসা না হয় ?

যতদিন না হয় ততদিন থাকবাম।

বিকালের দিকে আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। কার্তিক মাসে এ রকম বৃষ্টি হয় না কখনো। ছাতা মাথায় দিয়ে আমিন ডাক্তার উবু হয়ে বসে বসে ভিজতে লাগল। নিজাম সরকারের বিরক্তির সীমা রইল না। রাতেরবেলা তাঁর জামাই আসার কথা, সে এসে যদি দেখে এমন একটা অবস্থা সেটা মোটেই ভালো হবে না। অবশ্যি মোহনগঞ্জ থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে থানাওয়ালাদের আসবার কথা। এলে ঝামেলাটা চুকে। নিজাম সরকার তামাক টানতে লাগলেন।

সন্ধ্যার আগে আগে ধীরেন্দ্র এসে হাজির। সে নাকি কী বলতে চায়। নিজাম সরকার গম্ভীর মুখে বললেন, কী কইতে চাও ?

ধীরেন্দ্র হাত কচলাতে লাগল। সে একটি বিশেষ কথা বলতে এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী যে ত্রিশভাগ মাছ ওদের প্রাপ্য, সেখান থেকে সে পাঁচটা বড় বড় মাছ মতি মিয়ার কাছে পাঠাতে চায়।

নিজাম সরকার গলা ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাছ দিতে চাও ?

আজ্ঞে চাই।

ক্যান ? কারণটা আমারে কও।

কোনো কারণ নাই। ঝামেলাটা মিটাইতে চাই।

ঝামেলা কী ? আর ঝামেলা যদি থাকেই তুমি সেইটা মিটাইবার কে ? তুমি কোন মাতবর ?

ধীরেন্দ্র তবু যায় না। উসখুস করে।

যাও এখন তুমি বিদায় হও।

সন্ধ্যাবেলা বহু লোকজন আবার সামনে এসে জড়ো হলো। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। পশ্চিম আকাশে অল্প অল্প আলো হয়ে থাকায় অস্পষ্টভাবে সবকিছু নজরে আসে। থানাওয়ালাদের এসে পড়া উচিত। কেন এখনো আসছে না কে জানে ? জামাই রাত নটার মধ্যে এসে পড়বে। কী কুৎসিত ঝামেলা।

নিজাম সরকার হঠাৎ করে ঠিক করলেন আমিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন। আর ঠিক তখনই মাছের খলার একটি দিক আলো হয়ে উঠল। প্রচণ্ড হইচই শোনা যেতে লাগল। নিজাম সরকার দোনালা বন্দুক হাতে নিচে নেমে এসে শুনলেন স্থানীয় কৈবর্তরা লাঠি সড়কি নিয়ে মাছের খলায় চড়াও হয়েছে। খুব কম হলেও দুজনের পেটে সড়কি বিঁধেছে।

রাত বারোটায় মোহনগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসে আমিন ডাক্তার, নিমাই মাঝি এবং মাবু খাঁকে বেঁধে নিয়ে গেল। কৈবর্তপাড়ায় কোনো পুরুষমানুষ পাওয়া গেল না। সব পুরুষ রাতারাতি উধাও হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে আমিন ডাক্তারকে নৌকায় তোলা হলো। ঘাটে কোনো জনমানব ছিল না।

ময়মনসিংহের সেশন জজ দুটি খুন এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নেতৃত্বদানের অভিযোগে আমিন ডাক্তার এবং নিমাই মাঝিকে দীর্ঘদিনের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দিলেন।

সোহাগীর দিন কাটতে লাগল আগের মতোই। ঘুরেফিরে আবার বৈশাখ মাস এল। বাঘাই সিন্নির গান গেয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেঁচাতে লাগল,

আইলাম গো যাইলাম গো
বাঘাই সিন্নি চাইলাম গো।

আজরফ বিয়ে করল সুখান পুকুরে। জমিজমা করল। চৌধুরীদের আমবাগান কিনল। ডাক্তার ফজলুল করিম সুখান পুকুরে এসে আবার শেখ ফার্মেসি খুললেন। আবার চলেও গেলেন।

সোহাগীতে প্রাইমারি স্কুল হলো। ছাত্রের অভাবে সেই স্কুল চলল না।

সিরাজ মিয়া আবার আরেকটি বিয়ে করল। সে বৌটি আবার কয়েকদিন পর মরেও গেল। সিরাজ মিয়ার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। জমিজমা বিক্রি করতে লাগল। দিন কাটতে লাগল সোহাগীর। তারপর একসময় আমিন ডাক্তারের কথা কারও মনেই রইল না। এগারো বছর বড় দীর্ঘ সময়।

১৮

আবার কতকাল পরে ফেরা।

সবকিছু কেমন অচেনা লাগে। কিছুই যেন আগের মতো নেই। নতুন নতুন রাস্তাঘাট। নতুন নতুন বাড়িঘর। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে আমিন ডাক্তারের চোখ ভিজে উঠল। কত পুরনো জায়গা অথচ কত অচেনা লাগছে।

মোহনগঞ্জ থেকে এখন লঞ্চ যায় নিমতলী, সুখান পুকুর, ঘাসপোতা। গয়নার নৌকা নাকি উঠেই গেছে। লঞ্চে চেপে হুস হাস করে লোকজন চলাফেরা করে। আমিন ডাক্তার লঞ্চের ছাদে চাদর পেতে বসে থাকে চুপচাপ। এই লঞ্চে করেই হয়তো কেউ কেউ যাচ্ছে নিমতলী আর সোহাগীতে অথচ কাউকেই চিনতে পারছে না।

গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছে। আমিন ডাক্তার তৃষিতের মতো তাকিয়ে থাকে। বর্ষার পানিতে নদী ভরে গিয়েছে। ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করছে নতুন পানিতে। ঐ একটি নাইওরীদের নৌকা গেল। বৌটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। আমিন ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল পড়ে। বয়স হয়ে মন অশক্ত হয়েছে, অল্পতেই চোখ ভিজে ওঠে।

পেন্নাম হই। আপনে আমিন ডাক্তার না ?

আমিন ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়ল। কানা নিবারণ। সেই শক্তসমর্থ শরীর আর নেই। মাথার ভ্রমরকৃষ্ণ কালো চুল আজ কাশফুলের মতো সাদা।

ডাক্তার সাব, আমারে চিনছেন ?

আপনেরে চিনতাম না ? আপনেরে না চিনে কে ?

ভগবান আপনের মঙ্গল করুক। আপনে কিন্তু ভুল কইলেন। আমারে এখন কেউ চিনে না। গান গাই না আইজ সাত বচ্ছর। গলা নষ্ট। হাঁসের মতো শব্দ হয়।

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

মতি মিয়া এখন খুব বড় গাতক। চিনছেন ? সোহাগীর মতি মিয়া। নয় খান সোনার মেডেল আছে। রেডিওতে নিয়া গেছিল। মিনিস্টার সাব তার সাথে ছবি তুলছে।

আপনে এখন করেন কী ?

কিছুই করি না ভাই। পুরনো লোকদের সাথে দেখা হইলে তারা টেকাপয়সা দিয়া সাহায্য করে। খুব অচল হইলে মতি মিয়ার কাছে যাই। আমারে খুব খাতির করে।

শইল কেমন আপনের ?

বালা না। হাঁপানি হইছে। সারা জীবন শইলের ওপরে অত্যাচার করছি। শইলের আর দোষ কী ?

কানা নিবারণ হোগলা পোতায় নেমে গেল। হাত ধরে নামিয়ে দিতে গেল আমিন ডাক্তার। টিকিট করা ছিল না। লঞ্চের একটা লোক কী একটা গাল দিয়ে কানা নিবারণের শার্ট চেপে ধরতেই আমিন ডাক্তার উঁচু গলায় বলল, কার সাথে বেয়াদপি করো ? জানো এই লোক কে ? গাতক কানা নিবারণ। ইনার মতো বড় গাতক এই পৃথিবীতে হয় নাই। কয় টেকা ভাড়া হইছে ? আমার কাছ থাইক্যা নেও আর ইনার পাও ধইরা মাফ চাও।

নিমতলী পৌঁছতে পৌঁছতে বিকাল হয়ে গেল। কত পরিচিত ঘরবাড়ি। ঐতো দখিনমুখী বটগাছ। এর নিচেই হাট বসে প্রতি বুধবার। ঐ তো উত্তর বন্দ। এমন ঘন কালো পানি অন্য কোনো হাওরে নেই। বড় মায়া লাগে।

নিমতলী থেকে একটা কেরায়া নৌকা নিল আমিন ডাক্তার। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পৌঁছবে সোহাগী। শক্ত বাতাস দিচ্ছে, সন্ধ্যার আগেও পৌঁছতে পারে। নৌকার মাঝি নৌকা ছেড়েই জিজ্ঞেস করল, আপনে কেডা গো ? চিনা চিনা লাগে ?

আমি আমিন।

আমারে চিনছেন ?

না, তুমি কেডা ?

আমি কালাচানের ছোড পুলা, বাদশা মিয়া। আপনের কাছে লেহাপড়া শিখছি।

পা ছুঁয়ে সালাম করল বাদশা মিয়া। অনেক খবর পাওয়া গেল তার কাছে। আজরফ একজন সম্পন্ন চাষি এখন। দুটি মেয়ে তার। বড় মেয়ের নাম আতা বানু। ইস্কুলে যায়।

ইস্কুল হইছে নাকি ?

হ চাচা টিনের চালা।

আমিন ডাক্তার চমৎকৃত হয়।

চৌধুরীর খবর কী ?

দুই চৌধুরীই মারা গেছে। পাঁচ ছয় বচ্ছর হয়। বৌটা চৌধুরীবাড়িতেই আছে। মতি চাচার খবর কিছু হুনছেন ?

কিছু কিছু হুনছি।

খুব বড় গাতক হইছে। প্রত্যেক বছর একবার কইরা আসে এইদিকে। গানের রেকর্ড হইছে মতি চাচার—পাঁচ টেকা কইরা দাম।

চৌধুরীর অবস্থা কেমুন এখন ?

খুব খারাপ। জ্ঞাতিরা মামলা মোকদ্দমা কইরা সব শেষ কইরা দিছে।

পুত্রসন্তান তো কেউ ছিল না চৌধুরীর।

আরেকটি আশ্চর্য হওয়ার মতো খবর দিল বাদশা মিয়া। নিখল সাব ডাক্তার অনুফাকে নিয়ে বিলাত চলে গেছেন। যারার আগে অনুফাকে নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন। এক রাত ছিলেন আজরফের বাড়ি।

মাইয়াডা কী যে সুন্দর হইছে চাচা আর কী আদব লেহাজ।

তোর বাপের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে ?

নাহ।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই মিনার দেওয়া সুন্দর মসজিদ চোখে পড়ল।

পাকা মসজিদ দিছে কেরে বাদশা ?

সরকার সাবরা দিছে। মৌলভি আছে মসজিদের। জুম্মার দিন মানুষের জায়গা দেওন যায় না। সুখান পুকুর থাইকাও মাইনষে নামাজ পড়তে আইয়ে।

আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে না গিয়ে চৌধুরীবাড়ি উঠল। তাকে অবাক করে দিয়ে চৌধুরী বাড়ির বৌ তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। আগের সেই কঠিন পর্দার এখন আর প্রয়োজন নেই।

ভালো আছ মা বেটি ?

ভালো আছি ডাক্তার চাচা।

দীর্ঘ এগারো বছর পর আবার চৌধুরীবাড়ি খেতে বসল আমিন ডাক্তার। কেউ তো তাকে সারা জীবনেও এত যত্ন করে খাওয়ায়নি। বারবার চোখ ভিজে ওঠে। পান হাতে নিয়ে বৌটি আগেকার মতো মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে চাচা ?

ভরছে মা। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।

খাওয়াদাওয়ার শেষে বাইরের জ্যোৎস্নায় এসে বসে থাকে আমিন ডাক্তার।

বৌটি এসে বসে দাওয়ায়, একসময় মৃদুস্বরে বলে, আপনার কথা ঠিক হইছিল চাচা।

কোন কথা ?

আপনে যে কইছিলেন ওর মাথার দোষটা সারব। মরবার এক বচ্ছর আগে সত্যি সারছিল। খুব ভালো ছিল। আমারে নিয়া আষাঢ় মাসে আমার বাপের দেশে বেড়াইতে গেছিল।

বৌটি চোখমুখে একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল, আমারে নিয়া ময়মনসিংহ গেছিল। একটা হোটেলে আছিলাম। বাইস্কোপ দেখলাম ডাক্তার চাচা। আইজ আর চৌধুরীর উপরে আমার কোনো রাগ নাই।

বৌটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কত পরিবর্তন না হয়েছে সোহাগীর। একটা দাতব্য ডাক্তারখানা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে একদিন একজন সরকারি ডাক্তার এসে বসেন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করেই এসেছেন। খুব নাকি ভালো ডাক্তার। একফোঁটা দেমাগ নেই শরীরে। গত বছরের বাঘাই সিন্নির সময় ছেলেপুলেদের সঙ্গে মিলে খুব নাচানাচি করেছেন।

শরিফার চলৎশক্তি নেই। বিছানায় রাতদিন শুয়ে থাকতে হয়। অসম্ভব বুড়িয়ে গেছে। কথাবার্তাও অসংলগ্ন।

আমিন ডাক্তার যখন বলল, দোস্তাইন শরীলডা বালা ? শরিফা শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল।

আমি আমিন, আমিন ডাক্তার।

শরিফা চিনতে পারল না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাপা গলায় বলল, এরা আমারে ভাত দেয় না। আমারে না খাওয়াইয়া মারনের ইচ্ছা। আজরফ হারামজাদারে সালিসি ডাইক্যা জুতাপিটা করণ দরকার। আপনে আজরফ হারামজাদারে একটা ধমক দিয়া যান।

দোস্তাইন, আপনে আমারে চিনতে পারতাছেন না ?

আজরফ হারামজাদা ইন্দুরমারা বিষ কিন্যা রাখছে। পানির সাথে মিশাইয়া খাওয়াইতে চায়।

আজরফ মনে হলো আমিন ডাক্তারকে হঠাৎ উদয় হতে দেখে ঠিক সহজ হতে পারছে না। কোথায় উঠছে কোথায় খাচ্ছে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। নিজের বাড়িতে এসে উঠবার কথাও বলল না। থেমে থেমে বলল, সোহাগীতে থাকবেননি ডাক্তার চাচা ?

আর যাইয়াম কই ক ?

ডাক্তারি কইরা তো আর কামাইতে পারতেন না। সরকারি ডাক্তার আছে এখন। বালা ডাক্তার।

ওখন আর কাজ কামের বয়স নাই আজরফ। শইলডা নষ্ট হইয়া গেছে।

নুরুদ্দীন লম্বাচওড়া জোয়ান হয়েছে। বাপের মতো লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত এসেছে। আমিন ডাক্তার বলল, তুইও গান গাস নাকি নুরা ?

জি-না চাচা।

জঙ্গলা ভিটার ঘাটে যাস ?

না চাচাজি, ওখন আর যাই না।

আমারে লইয়া একদিন জঙ্গলা ভিটার ঘাটে যাইস।

ক্যান চাচা ?

দেখনের ইচ্ছা হইছে।

এই দীর্ঘ সময়েও জঙ্গলা ভিটার ঘাটের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জায়গাটির বয়স বাড়েনি। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল সেই ডেফল গাছটি এখনো আছে। নুরুদ্দীন লগি দিয়ে খুন্দা ঠেলছিল।

সে হালকা গলায় বলল, জঙ্গলা ভিটায় মাইট আছে চাচা।

কে কইছে ?

আমার মনে অয়।

খুন্দা এগুচ্ছে খুব ধীরগতিতে। ডেফল গাছের কাছের বাঁকটি পেরুতেই আমিন ডাক্তার বলল, এইখানে তুই একটা মেয়ে মানুষ দেখছিলি। পানির মইধ্যে ভাসতেছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি। তোর মনে আছে ?

নুরুদ্দীন থেমে থেমে বলল, আছে চাচা। স্বপ্ন দেখছিলাম কিংবা চউখ্যের ধান্ধা।

নুরুদ্দীনের অস্বস্তি লাগে। ফ্যাকাশেভাবে হাসে।

তুই ঠিকই দেখছিলি। স্বপ্ন টপ্ন না। আমি এই জিনিসটা নিয়া অনেক চিন্তা করছি। জেলখানাতে চিন্তার খুব সুবিধা আছিলরে নুরা।

নুরুদ্দীন চুপ করে রইল। আমিন ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগল। কাশি থামিয়ে শান্তস্বরে বলল, একটা কথা মন দিয়া শুন। মেয়েটার হাতভর্তি আছিল লাল চুড়ি। হাতভর্তি চুড়ি কোন সময় থাকে জানস নুরা ?

নাহ।

যখন নতুন চুড়ি কিনে। যত দিন যায় তত চুড়ি ভাঙে আর কমে। কিছু বুঝতাছস ?

নাহ।

সোহাগীতে সেই বৎসর চুড়িওয়ালী আইছিল শ্রাবণ মাসে। সব মেয়েরা চুড়ি কিনছে। তোর মাও কিনছিল।

নুরুদ্দীন ক্ষীণস্বরে বলল, আপনে কইতেছেন মেয়েডা সোহাগীর ?

হ্যাঁ।

কিন্তু সোহাগীর কোনো মেয়ে তো মরে নাই চাচাজি।

মরে নাই কথাটা ঠিক না নুরা। বানের সময় সরকারবাড়ির একটা বৌ নিখোঁজ হইছিল। কত খোঁজাখুজি করল তোর মনে নাই ?

আছে।

আমিন ডাক্তার চাপাস্বরে বলল, বানটা হইছিল কিন্তু জঙ্গলা ভিটার ঘটনার তিন দিন পরে।

নুরুদ্দীন লগি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুকাল আগে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক কা কা ডেকে উড়ে গিয়েছিল। আজও হঠাৎ চারদিক থেকে কাক ডাকতে লাগল। নুরুদ্দীন হাত থেকে লগি ফেলে দিল। আমিন ডাক্তার শান্তস্বরে বলল, ভয় পাইছস নুরা ?

পাইছি।

ভয়ের কিছু নাই। চল ফিরত যাই।

ফিরবার পথে আমিন ডাক্তার একটি কথাও বলল না। দক্ষিণ কান্দায় নৌকা বেঁধে দুজনে ওপরে উঠে আসল। আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলল, একটা খুব বড় অন্যায় হইছে সরকারবাড়িত। একটা মেয়েরে খুন কইরা ফালাইয়া রাখছিল জঙ্গলা ভিটাত। বুঝতাছস তুই নুরা ?

চাচা বুঝতাছি।

আমি ওখন কী করবাম জানস ?

নাহ।

সরকারবাড়ির সামনের ক্ষেতটাত গিয়া বসবাম। বলবাম আপনেরা একটা বড় অন্যায় করছেন। তার বিচার চাই।

আমিন ডাক্তার হেসে উঠল।

এক অপরাহ্নে আমিন ডাক্তার তার ধূলিধূসরিত লাল কোট গায়ে দিয়ে সরকারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটি ছোটখাটো, কিন্তু পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে বলেই হয়তো সরকারবাড়ির সামনের প্রাচীন জামগাছ থেকে অসংখ্য কাক কা কা করে ডাকতে লাগল।

৩।

মাইট — স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলসি। সাধারণত মাটির নিচে পোঁতা থাকে এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন (?) হয়ে থাকে। এরা নিজেরাই চলাচল করতে পারে

খুন্দা : ঘাস কাটা ছোট নৌকা।

দোস্তাইন : বন্ধুর স্ত্রীকে ডাকার জন্যে ব্যবহৃত সম্মানসূচক সম্বোধন।

বাঘাই সিন্নি : নবান্ন জাতীয় উৎসব।

বারাবান্দানী : যারা ঢেঁকিতে পার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

লারবর্শি — বোয়াল মাছ মারবার জন্যে ব্যবহৃত বড়শি। জ্যান্ত ব্যাং বা টাকি মাছের টোপ দিয়ে এইসব বড়শি সারা রাত পেতে রাখা হয়।

মাছখলা : মাছ শুকানোর জন্যে ব্যবহৃত উঁচু জায়গা।

ফিরাইল — শিলাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে একশ্রেণীর বিশেষ মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন (?) ফকির।

জিরাতি : ভিনদেশীয় চাষি, যারা চাষ শেষ হলে ধান নিয়ে নিজ দেশে চলে যায়।

কান্দা : বাঁধজাতীয় উঁচু জায়গা (প্রাকৃতিক)।

বন্দ : ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ। ভাটি অঞ্চলের 'বন্দ'গুলি বর্ষায় হাওরে পরিণত হয়।

পাইল করা — মাছ মারা বন্ধ রাখা। সাধারণত জলমহালগুলি দুতিন বছর পাইল করার পর মাছ মারা হয়।

কেরায়া নৌকা : ভাড়া করা নৌকা।

জার : শীত। জার পড়েছে– শীত পড়ছে।

সড়কি : বল্লম।

জালা — বীজতলার ধান।

ছোটগল্প

শীত ও অন্যান্য গল্প

অতিথি

তিন বছর পর সফুরা দেশে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে সে যে একনাগাড়ে এতদিন পার করে দিয়েছে তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। এই তো মনে হয় সেদিন মাত্র এসেছে। এক শীতে এসেছিল, মাঝখানে দু'টা শীত গিয়ে এখন আবার শীতকাল।

প্রথমদিন ভীতমুখে বারান্দায় বসে ছিল। বেগম সাহেব তাকে দেখেও না-দেখার ভান করলেন। দু'টা সুন্দর সুন্দর বাচ্চা—রূপা, লোপা; পাশেই খেলছে, অথচ তার দিকে তাকাচ্ছে না। একসময় সফুরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম তোমার ভইন ?

রূপা তার দিকে না তাকিয়েই বলল, আমাকে 'ভইন' ডাকবে না।

সফুরা চুপ করে গেল। সময় কাটতেই চায় না। এরা তাকে কাজে বহাল করবে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। তার খুব পানির পিপাসা হচ্ছে, কার কাছে পানি চাইবে ?

একসময় বেগম সাহেব চায়ের কাপ হাতে তার সামনে বসলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী নাম ?

সফুরা।

ঘরের কাজকর্ম জানো ?

সফুরা কী বলবে বুঝতে পারল না। ঘরের কাজকর্ম সে তো অবশ্যই জানে। ভাত রাঁধা, বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া... কিন্তু ঢাকার এইসব বাড়িতে কাজকর্ম কী রকম কে বলবে।

আগে কখনো বাসায় কাজ করেছ ?

জে-না।

ঢাকায় কি এই প্রথম ?

জে।

বেগম সাহেব কঠিন মুখে বললেন, হাত ধরে ধরে কাজকর্ম শেখাব, তারপর পাখা গজাবে। উড়ে চলে যাবে অন্য বাসায়। তোমাদের আমার চেনা আছে।

আমি কোনোখানে যামু না।

খামোকা এইসব বলবে না। আগে অনেকবার শুনেছি। বেতন চাও কত ?

সফুরা চুপ করে রইল। যে তাকে নিয়ে এসেছে সে বারবার বলে দিয়েছে—বেতনের কথা বললে চুপ কইরা থাকবা। আগ বাড়াইয়া কিছু বলবা না। সে চুপ করে আছে। কিছু বলছে না।

কী, কথা বলো না কেন ? কত চাও বেতন ?

আপনের যা ইচ্ছা।

কাপড়চোপড় নিয়ে এসেছ ?

সফুরা লজ্জা পেয়ে গেল। কাপড়চোপড় আনবে কী ? একটা শাড়ি ছিল, সেটাই নিয়ে এসেছে। যার কাপড়চোপড় আছে সে কি আর ছেলেপুলে স্বামী ছেড়ে ঢাকায় কাজ করতে আসে ?

বেগম সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাদের এই আরেক টেকনিক। এক কাপড়ে উপস্থিত হবে। যাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা শাড়ি কিনে দিতে হয়।

সফুরা মাথা নিচু করে রাখল।

তোমার কী নাম যেন বললে ?

সফুরা।

শোনো সফুরা, থাকো এইখানে। কাজ করো। কয়েকদিন কাজ দেখি। যদি কাজ পছন্দ হয় বেতন ঠিক করব। আমার সংসার ছোট। কাজকর্ম নেই বললেই হয়। মেয়েদের কখনো নাম ধরে ডাকবে না। আন্টি ডাকবে। একজন বড় আন্টি, একজন ছোট আন্টি। মনে থাকবে ?

জে।

আমাদের আলাদা বাথরুম। ঐ বাথরুমে কখনো ঢুকবে না। মনে থাকবে ?

জে।

তোমাকে আলাদা থালা-গ্লাস দেওয়া হবে। সবসময় সেগুলি ব্যবহার করবে। আমাদের থালা-গ্লাস কখনো ব্যবহার করবে না।

জে আইচ্ছা।

সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। গ্রাম থেকে এসেছ, পেটভর্তি কৃমি। কৃমির ওষুধ খাইয়ে দেব। মাথায় উকুন আছে ?

জে।

উকুনের ওষুধ দেব। লরেকসিন চুলে মেখে গোসল করবে।

জে আইচ্ছা।

দু'দিন পরপর দেশের বাড়িতে যাওয়া, এর অসুখ তার অসুখ, এইসব চলবে না। দেশে যাবে বৎসরে একবার। দেশের বাড়ি থেকেও প্রতি সপ্তাহে তোমাকে দেখতে লোক আসবে তাও চলবে না। বেতনের টাকা মাসের দু' তারিখে দিয়ে দেব—মনি অর্ডার করে কিংবা কারও হাতে পাঠিয়ে দেবে।

জে আইচ্ছা।

কাচের থালাবাসন ধরবে খুব সাবধানে। টেবিলের ওপর কাচের যে বাটিটা দেখছ, যেখানে ফল রাখা—ঐ বাটিটার দাম তিন হাজার টাকা।

একটা বাটির দাম তিন হাজার টাকা ? সফুরার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তিন হাজার টাকায় একটা গরু কেনা যায়! সামান্য একটা বাটি, তার দাম তিন হাজার ? বাটিটা একবার ছুঁয়ে দেখতে হবে।

সফুরা কাজে বহাল হলো। যা কিছু শেখার ছিল, সাতদিনে শিখে গেল। বেগম সাহেব যে তার কাজে খুশি তাও সে ন'দিনের দিন জেনে গেল। মেঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে মুছতে সে শুনল বেগম সাহেব টেলিফোনে কাকে যেন বলছেন, আমার কাজের মেয়েটা চটপটে আছে। কাজ ভালোই করে। শেখার আগ্রহ আছে। তবে টিকবে না। কাজ শেখা হলে অন্যবাড়িতে কাজ খুঁজবে। এদের চেনা আছে।

বেগম সাহেবের কথা সত্যি হয়নি। সে কোথাও যায়নি। এ বাড়িতে আছে। গত তিন বছরে দেশেও যায়নি। কয়েকবারই যাওয়া ঠিকঠাক হলো। তার এমনি কপাল—যখন দেশে যাওয়া ঠিকঠাক হয় তখনই এ বাড়িতে একটা কিছু ঝামেলা লেগে যায়। প্রথমবার ছোট আন্টির ফ্লু হলো। অসুস্থ মানুষকে রেখে যাওয়া যায় না। পরেরবার জাপান থেকে কারা যেন বেড়াতে এল। এ বাড়িতে থাকল এক সপ্তাহ। বাড়িতে মেহমান ফেলে সে যায় কীভাবে ? তবে ঐ মেহমানরা যাওয়ার সময় তাকে একটা ঘড়ি দিলেন। কী আশ্চর্য কাণ্ড, তার মতো মানুষকে কেউ ঘড়ি দেয় ? ঘড়ি দিয়ে সে কী করবে ? ঘড়ির সে কী বুঝে ? বকুলের বাবা যখন পরের বার টাকা নিতে এল তখন টাকার সঙ্গে ঘড়িও দিল। মানুষটা অবাক।

ঘড়ি পাইলা কই ?

আমারে খুশি হইয়া দিছে।

কও কী তুমি!

যা সত্য তাই কইলাম।

বেজায় দামি জিনিস বইল্যা মনে হয়।

হুঁ। বেইচ্যেন না।

আরে না, বেচব কী! ঘড়ির একটা প্রয়োজন আছে না ? ঘড়ির ইজ্জতই আলাদা।

বকুলের বাবা ঘড়ি হাতে পরে আনন্দে হেসে ফেলল। লোকটা বেজায় শৌখিন। টাকা নিতে যখন আসে মনে হয় ভদ্রলোক। মাথার চুল বেশির ভাগই পেকে গিয়েছিল। একবার এল—সব চুল কুচকুচে কালো। চুলে কলপ দিয়েছে। পাঁচ-দশ টাকা নিশ্চয়ই চলে গেছে। লোকটা এইসব দেখবে না। বড় শৌখিন। সফুরার বড় ইচ্ছা করে এই শৌখিন মানুষটাকে চেয়ার-টেবিলে বসিয়ে চারটা ভাত খাওয়ায়। তিন হাজার টাকা দামের বাটিতে করে সালুন এনে দেয়। তা তো সম্ভব না। বেগম সাহেব বলে দিয়েছেন, তোমার স্বামী যে দু'দিন পরপর ফুলবাবু সেজে চলে আসে খুব ভালো কথা। আসুক। তাকে ঘরে ঢুকাবে না। বাইরে থেকে বিদায় দেবে। একবার ঘরে ঢুকলে অভ্যাস হয়ে যাবে।

বেগম সাহেবের কথাগুলি শুনতে খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই। তাঁর অন্তর ভালো। তিন ঈদেই তার ছেলেমেয়ের জন্যে টাকা দিয়েছেন। গত ঈদে বেতনের বাইরেও পাঁচশ টাকা দিলেন। একটা গায়ের চাদর দিলেন। তার বেতন ছিল দেড়শ। তাকে কিছু বলতে হয়নি, বেগম সাহেব নিজেই বেতন বাড়িয়ে করেছেন দু'শ। তাছাড়া লোকজন এ বাড়িতে বেড়াতে এলে যাওয়ার সময় হাতে পঞ্চাশ, একশ টাকা সবসময়ই দেয়। প্রতিটি পাই পয়সা সফুরার কাজে লাগে। বেতনের বাইরের টাকাটা সে জমা করে রাখে। দেশে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে। ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা-সেটা নিজের হাতে কিনে নিয়ে যাবে। তার এত কষ্টের টাকা।

বকুলের বাবা এসেছে সফুরাকে নিয়ে যেতে। বাবু সেজে এসেছে। হাতে ঘড়ি। চোখে কালো চশমা। গম্ভীর মুখে বারান্দায় বসে আছে। সফুরা বেগম সাহেবের কাছে বিদায় নিল। কদমবুসি করল এবং কেঁদে ফেলল। তিন বৎসর ছিল। মায়া পড়ে গেছে। যেতেও কষ্ট হচ্ছে। বেগম সাহেব বললেন, তোমার কাজেকর্মে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার বাচ্চারাও তোমাকে পছন্দ করে। বেশিদিন থেকো না, চলে এসো। আজ থেকে তোমার বেতন আমি তিনশ করে দিলাম। ফিরে এসে এই বেতনেই কাজ করবে।

আপনের অনেক দয়া আম্মা।

বেগম সাহেব বেতন ছাড়াও যাওয়া-আসার গাড়িভাড়া বাবদ দু'শ টাকা দিলেন। একটা প্রায়-নতুন শাড়ি দিলেন। এক জোড়া পুরনো স্যান্ডেল দিলেন। উদাস গলায় বললেন, তোমার সাহেবের একটা কোট আছে। এখন আর পরে না। নিয়ে যাও, কাউকে দিয়ে দিয়ো।

বকুলের বাবা সেই কোট সঙ্গে সঙ্গে গায়ে দিয়ে বলল, ভালো ফিট করছে বউ। মাপমতো হইছে। চলো এখন গাবতলি বাস স্টেশনে গিয়া বাস ধরি।

সফুরা বিস্মিত হয়ে বলল, পুলাপানের জন্যে সদাই করমু না ? অতদিন পরে দেশে যাইতেছি।

কী সদাই করবা ?

চলো গিয়া দেখি—জামা জুতা। রিকশা লও।

বকুলের বাবা সিগারেট ধরিয়ে বাবু সাহেবের মতো টানতে টানতে খালি রিকশা দেখতে লাগল। সফুরা বলল, আপনেরে চিননের আর উপায় নাই। বাবু সায়েবের মতো লাগতেছে। চউক্ষে চশমা দিছেন। কত দাম চশমার ?

সস্তায় কিনছি। রইদের মইধ্যে চউক্ষে দিলে খুব আরাম হয়।

আপনে অখন একজোড় জুতা কিনেন।

বকুলের বাবা উদাস গলায় বলল, চলো যাই। সস্তায় পাইলে একজোড় কিনব।

রিকশায় উঠে বকুলের বাবা ক্ষীণস্বরে বলল, একটা বিষয় হইছে, বুঝলা সফুরা। তোমারে আগে না বললে বাড়িতে গিয়া হৈচৈ করবা। হৈচৈ করনের কিছু না।

সফুর আতঙ্কিত গলায় বলল, কী বিষয় ?

বকুলের বাবা নিচু গলায় বলল, তুমি ঢাকায় চইল্যা আসলা, বাড়ি হইল খালি। ঘরের শতেক কাজকর্ম। সংসার ভাইস্যা যাওনের উপক্রম। গেরামের দশজনে তখন বলল

আপনে কি বিবাহ করছেন ?

উপায়ান্তর না দেইখ্যা গত বাইস্যা মাসে

আমারে তো কিছু খবর দেন নাই।

বকুলের বাবা চুপ করে গেল। সফুরার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। লোকটা 'বাইস্যা' মাসে বিয়ে করেছে। ঈদের পরপর। বেগম সাহেব যাকাতের টাকা থেকে যে পাঁচশ টাকা বাড়তি দিয়েছেন সেই টাকাটা খরচ করেছে বিয়েতে। যাকাতের টাকাটাই তার কাল হয়েছে।

রাগ করলা নাকি সফুরা ? ভালোমতো বিবেচনা করো। মেয়েমানুষ ছাড়া সংসার চলে ? তুমি পইর‍্যা আছ ঢাকা শহরে।

নয়া বউয়ের নাম কী ?

সুলতানা।

দেখতে কেমুন ?

আছে মোটামুটি।

গায়ের রঙ কেমন ?

ধলা।

আবার সফুরার চোখে পানি এসে গেল। চিৎকার করে তার কাঁদতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করলেও তা সম্ভব না। তা ছাড়া কী হবে চিৎকার করে কাঁদলে ? কিছুই হবে না।

ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু কিনল সফুরা। ছেলেমেয়েদের জন্যে জামা-জুতা, স্নো-আলতা। একটা মশারি। চিনি, পোলাউয়ের চাল, এক ডজন কমলা। সবার জন্যেই কিছু না কিছু কেনা হয়েছে, শুধু নতুন বউয়ের জন্যে কেনা হয়নি। বেচারি মন খারাপ করবে। তার তো কোনো দোষ নাই। তাকে বিয়ে করেছে বলেই সে এই সংসারে এসেছে।

সফুরা নয়া বউয়ের জন্যে একটা লালপেড়ে শাড়ি এবং কাচের চুড়ি কিনল।

বকুলের বাবা বলল, লাল ফিতা কিনো তো বৌ। ফিতার কথা বলছিল।

সফুরা লাল ফিতাও কিনল।

দুপুরের দিকে তারা গাবতলি বাসস্টেশন থেকে বাসে উঠল। বকুলের বাবা মিষ্টি পান কিনেছে। সে বসেছে জানালার পাশে। জানালার পাশে ছাড়া সে বসতে পারে না। তার মাথা ধরে যায়। বাস ছাড়ার মুহূর্তে সে ঘড়িতে সময় দেখে গম্ভীর গলায় বলল, রাইত আটটা বাজব। শীতের দিন বইল্যা রক্ষা। আরামে যাইবা। গরমের সময় হইলে খুব কষ্ট হইত। এইটা খিয়াল রাখবা বৌ, শীতকাল ছাড়া দেশে আসবা না। বেড়াইবার সময় হইল তোমার শীতকাল।

সফুরা জবাব দিল না। শীতকালের পড়ন্ত রোদে সে দেশে বেড়াতে যাচ্ছে। পাশে স্বামী। কতদিন পর দেখবে ছেলেমেয়েদের। আনন্দে তারা চিৎকার করে কাঁদবে। সারারাত হয়তো ঘুমাবে না। নয়া বউ লালপেড়ে শাড়ি পরে তাকে এসে কদমবুসি করবে। সে নয়া বউকে বলবে, আমার অনেক কষ্টের এই সংসার। তুমি এরে দেখেশুনে রাখো। বলতে বলতে সে হয়তো কেঁদে ফেলবে। আজকাল অকারণেই তার চোখে জল আসে। কত আনন্দ করে সে বাড়ি যাচ্ছে। এখন কাঁদার কোনো কারণ নেই। অথচ কী কাণ্ড! সে কেঁদেই যাচ্ছে। অনেককাল আগে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়ও সে এভাবেই কাঁদছিল।

সাদা গাড়ি

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরেফিরে দেখা হয়। হয়তো খুব জমিয়ে গল্প করছি—কাজের ছেলেটি এসে বলল, 'কে জানি আইছে, আপনারে বুলায়।' বাইরে উঁকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে একসময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, আরে আরে, কী খবর? তারপর কেমন চলছে? একসময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই-তোকারি করতাম। এখন দূরত্ব রাখার জন্যে ভাববাচ্যে কথা বলতে হয়। বাংলা ভাষায় ভাববাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আড্ডা জমে উঠেছে। বাংলা বানান নিয়ে খুব তর্ক বেঁধে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বলল আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাব্বির। আমি হাসিমুখেই বললাম, বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

আসুন ভেতরে।

না না, ঠিক আছে।

আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। গল্পগুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।

অন্য আরেকদিন আসব।

আজ অসুবিধা কিসের ? আসুন ভেতরে।

সাব্বির চোখমুখ লাল করে ভেতরে ঢুকল। পুরুষমানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখিনি। নাকের পাতায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, ধূলি বানান কর দেখি ? হ্রস্বউকার না দীর্ঘউকার ? রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে থুথু পড়ছে। বিশ্রী অবস্থা।

সাব্বির নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং মৃদুস্বরে বলল, আজ যাই, অন্য আরেক দিন আসব ?

বসুন না। তাস হবে। তাস খেলতে পারেন তো ?

জি-না। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে।

আমি সাব্বিরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। সেখানে সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুশকো জোয়ান এক ড্রাইভার সাব্বিরকে দেখে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে বের হলো এবং দ্রুত দরজা খুলে মূর্তির মতো হয়ে গেল। আমাদের বয়সী একটা ছেলের জন্যে এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি তীব্র একটা ঈর্ষা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মতো জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে বুকে খচখচ করতে লাগল।

সাব্বিরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এরকম—পুরানা পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিনতে। পয়সা দিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম ঘটাঘট শব্দে সব দোকানের ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কী হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকওয়ালাদের সঙ্গে বাসওয়ালাদের কী নাকি একটা ঝামেলা। একদল লোক নাকি রাম দা নিয়ে বের হয়েছে। ব্যাপারটা গুজব হওয়ারই কথা। এ যুগে রাম দা নিয়ে কেউ বের হয় না। তবে সাবধানের মার নেই। দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে দেখি গলির মাথায় একটা পাঞ্জাবি গায়ে দারুণ ফর্সা ছেলে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি গিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বিড়বিড় করে বলল, চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়োপিয়া, চোখের পাওয়ার সিক্স ডাইওপটার। চশমার একটা কাচ খুলে পড়ে গিয়েছিল। এক কাচের চশমা পরে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখল। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব।

কোনো পুরুষমানুষের এমন মেয়েদের মতো চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মতো ছোট্ট চিবুক। আমি বললাম, আপনি কী করেন ?

ইংরেজিতে এমএ পরীক্ষা দেব।

তাই নাকি ? ভালো।

গত বৎসর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। দেইনি। আমার হার্টের অসুখ, হার্টবিটের রিদমে গণ্ডগোল আছে।

চিকিৎসা করছেন তো ?

এর কোনো চিকিৎসা নেই।

এই বলেই সে ফ্যাকাসেভাবে হাসতে লাগল। আমি সিগারেট বের করলাম, নেন, সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হার্টের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবারগুলি শক্ত করে দেয়।

এতসব জানলেন কীভাবে ?

আমার মা ডাক্তার।

নিউ ইস্কাটনের যে বাড়ির সামনে রিকশা থামল সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা একটা হুলস্থুল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছোটাছুটি পড়ে গেল। সাব্বিরের মতো দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে ? আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলে না ?

সাব্বির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ভদ্রমহিলা অভিমানী স্বরে বললেন, কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও ?

আর যাব না মা।

তোমার দুবল হার্ট। যে-কোনো সময় কিছু-একটা যদি হয়ে যেত! তখন ?

মা, আর যাব না।

এ ছেলেটাই সাব্বির।

রাত আটটার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেরুতে পারলাম না। সাব্বিরের বাবা এবং মা এমন একটা ভাব করতে লাগলেন যেন আমি সাব্বিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এরকম বড় একটা কাজের যোগ্য পুরস্কার দিতে না পেরে তারা দু'জনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসার জন্যে একজন লোক চলল আমার সঙ্গে। ছোট গলিতে বড় গাড়ি ঢুকবে না—এইজন্যে টেলিফোন করে একটা ছোট গাড়ি আনানো হলো।

সাব্বির মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এল গেট পর্যন্ত। নিচুস্বরে বলল, বাবা-মা আমার জন্যে খুব ব্যস্ত। একটা মাত্র ছেলে তো।

আপনি একাই নাকি ?

জি। পাঁচ ভাইবোন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।

বাকিরা কোথায় ?

সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশিদিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন। তাঁরও চার ছেলেমেয়ে ছিল। সবাই ত্রিশ হওয়ার আগেই মারা গেছে।

বলেন কী!

জি। আমিও বাঁচব না।

আরে, এসব কী বলছেন ?

জি, সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হার্টের অসুখ হয়ে গেল।

আমার বন্ধুবান্ধবরা সব আমার মতো। পাস করবার পর সবাই কিছু-একটাতে ঢুকে পড়েছি। ব্যাংক, ট্রাভেল এজেন্সি, নাইট কলেজের পার্টটাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু না পেয়ে ল'তে ভর্তি হয়েছে। ছুটিছাটার দিনে তাস-টাস খেলি। মাঝে-মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভিসিআর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আড্ডাটা শেষ হয় একটা ঝগড়ার মধ্যে। কোনো কোনো সময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। আবার যখন দেখা হয় পুরনো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত এই সময়টা বেশ ভালো। চায়ের দোকানে বসে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেওয়ামাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুদের ভাড়াটেদের ছোট মেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশ আহত করে।

এরকম সুখের সময় উপদ্রবের মতো মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় সাব্বির। তাদের গাড়ির মুশকো ড্রাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সাব্বির লজ্জায় লাল হয়ে বলে, চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে ?

হুঁ, আড্ডা দিচ্ছি, আসুন না।

জি-না, আমি চা খাই না।

চা না খেলে না খাবেন, বসে গল্প করুন।

আরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তা না। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়। তবু ভদ্রতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কী নিয়ে এত গল্প করেন ?

গল্প করার টপিকের অভাব আছে নাকি ? রাজনীতি, মেয়েমানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনুন না। শুনতে না চাইলে বলুন।

কী বলব ?

প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

সাব্বির টমেটোর মতো লাল হয়ে বলল, মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে সামনাসামনি বসে কথা বলিনি।

বলেন কী ?

জি সত্যি। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হার্টের অসুখ।

তাতে কী ?

মানে ইয়ে—সামান্যতম এক্সাইটমেন্টে রিদমে গণ্ডগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।

আমি ঝামেলামুক্ত হওয়ার জন্যে বলি, আজ তাহলে যান। রোদ লাগছে। সাব্বির তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কুৎসিত ব্যাপার।

মেয়েলি চেহারার এই যুবকের সুখ-দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখের কোনো মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আমি সাব্বিরকে এড়িয়ে চলবার জন্যে নানারকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলেটিকে বলে পাঠাই—বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারও ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন নিজেই গিয়ে বলি, আমি এক্ষুণি বেরুব। হাসপাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাওয়ার কথা। আজ তো কথা বলতে পারছি না।

আসুন, হাসপাতালে পৌঁছে দেই। কোন হাসপাতাল ?

না না, তার দরকার নেই।

আমার কোনো অসুবিধা হবে না, আসুন না।

মহাবিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোনো সাদা রঙের গাড়ি দেখলেই মনে হয়—এই বুঝি গাড়ি থামিয়ে ফর্সা পাঞ্জাবি-পরা সাব্বির বেরিয়ে আসবে। মোটা কাচের আড়ালে যার চোখ ঢাকা বলে মনের ভাব বোঝা যাবে না। কথা বলবে এমন ভালো মানুষের মতো যে রাগ করা যাবে না, আবার সহ্যও করা যাবে না।

রাস্তায় বেরুলেই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি লেগে থাকে। এই বুঝি দেখা হলো! অস্বস্তিটা সবচেয়ে বেশি হয় নীলু সঙ্গে থাকলে। নীলু তার কারণ বুঝতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, এরকম করো কেন ? দেখা হলে কী হবে ? আমার তো ভদ্রলোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে। একদিন অবশ্যি দেখা হলো। গ্রিন রোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি। হঠাৎ রাস্তার পাশে সাদা গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে সাব্বির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি না দেখার ভান করলাম। এবং অতি দ্রুত একটা রিকশা ঠিক করে নীলুকে নিয়ে উঠে পড়লাম। সারাক্ষণই ভয় করতে লাগল এক্ষুণি হয়তো সে গাড়ি নিয়ে সামনে এসে থামবে। লাজুক গলায় বলবে, কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি। সেরকম কিছু ঘটল না। নীলু

বিরক্ত হয়ে বলল, হুট করে রিকশা নিলে কেন ? আমি কতবার বলেছি পাশাপাশি রিকশায় চড়তে আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না কেন ?

হুড তুলতে হয়। হুড তুললেই আমার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।

হুড না তুললেই হয়।

পাগল! হুড না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব ?

বিকালটা আমার চমৎকার কাটল। দু'জনে খুব ঘুরলাম। সন্ধ্যাবেলা ঢুকে পড়লাম একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। নীলু সারাক্ষণই বলল, ইস, বাসার সবাই দুশ্চিন্তা করছে। তবু উঠবার কোনো তাড়া দেখাল না।

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাব্বির আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার ?

কোনো ব্যাপার না, এমনি এলাম। দিনে এলে তো আপনাকে পাওয়া যায় না।

কোনো বিশেষ কাজে এসেছেন, না শুধু গল্প করবার জন্যে ?

না, কোনো কাজে না, এমনি। সাব্বির রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। আমি বললাম, চা খান। চা দিতে বলি ?

জি-না, চা-টা না। আমি এখন যাব। মা চিন্তা করছেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে কখনো থাকি না।

আজই বা থাকলেন কেন ?

আপনাদের দু'জনকে আজ দেখলাম। বড় ভালো লাগল। সেইটা বলবার জন্যে।

সাব্বির লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি ?

জি। বড় ভালো লাগল। আমি একবার ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে বলি, কোথায় যাবেন বলুন পৌঁছে দেই। আপনারা কী মনে করেন, এই ভেবে গেলাম না।

আমি নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালাম। সাব্বির মৃদুস্বরে বলল, আমি অবশ্যি আপনাদের পেছনে পেছনে গিয়েছি।

তাই নাকি ?

জি, ড্রাইভারকে বললাম দূর থেকে ঐ রিকশাটাকে ফলো করো।

তারপর ফলো করলেন ?

জি। শাহবাগ পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভার আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন ?

না।

আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দু'জনকে এত সুন্দর লাগছিল। কী সুখী-সুখী লাগছিল! আমার মনে হলো এটা বলা উচিত। আপনি রাগ করেননি তো ?

আমি ঠান্ডাস্বরে বললাম, না, রাগ করিনি। রাত অনেক হয় গেছে, এখন বাসায় যান। নয়তো আপনার মা আবার রাগ করবেন।

জি, তা ঠিক।

সাব্বির চলে গেল, কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রইল না। লোকটি কি নির্বোধ, না অন্যকিছু ? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হলো। এরকম ঘটনা আবার ঘটবে, ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে আবার তার সাদা গাড়ি আসবে পেছনে পেছনে। কী অসহ্য অবস্থা!

ঘটলও তাই। দিন সাতেক পর সাব্বির এসে হাসিমুখে বলল, আপনারা কি বুধবার বিকালে শিশুপার্কের সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন ?

মনে নেই।

আপনার পরনে ছিল একটা চেকচেক শার্ট, আর আপনার বান্ধবীর গায়ে লাল রঙের চাদর। হাতে একটা চটের ব্যাগ। মনে পড়েছে ?

হ্যাঁ, পড়েছে।

আমি কিন্তু ফুচকা খাবার পর থেকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় একঘণ্টা আপনাদের ফলো করেছি।

তাই নাকি ?

জি। এত ভালো লাগছিল আমার। ড্রাইভারকে বললাম, তারা দেখতে পায় না এমনভাবে তাদের ফলো করো। আপনি অবশ্যি একবার পেছনে তাকিয়েছেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেননি।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, নীলুর সঙ্গে থাকলে আমি একটু অন্যমনস্ক থাকি।

সাব্বির গভীর আগ্রহে বলল, আচ্ছা এলিফেন্ট রোডের ঐ দোকান থেকে কী কিনলেন আপনারা ?

আমি তার জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুর পরিচয় করিয়ে দেই।

না না, তার কোনো দরকার নেই। আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতেই আমার ভালো লাগে। কীরকম অদ্ভুত সুখী-সুখী চেহারা! জানেন আমি মা'কে আপনাদের কথা বলেছি ?

ভালো করেছেন।

আমি যে মাঝে মাঝে আপনাদের পেছনে পেছনে যাই আপনি রাগ করেন না তো ?

আমি উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালাম। একটা সাদা গাড়ি সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করছে, এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

সাব্বির বসে আছে আমার সামনে। তার ফর্সা কিশোরীদের মতো মুখে উত্তেজনার ছাপ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ চকচক করছে। বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। সে অনেকখানি ঝুঁকে এসে বলল, পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুন তো ?

সাব্বিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে আসেনি। হয়তো শরীর খুব বেশি খারাপ। ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। কিংবা গিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্যকিছু। গিয়ে খোঁজ নেওয়ার মতো ইচ্ছা কখনো হয়নি।

সাব্বির আর কখনো আসেনি, কিন্তু তার সাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে আমাদের। যখনই নীলু মজার একটা-কিছু বলছে কিংবা যখনই আমার নীলুর হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছি বিশাল সাদা গাড়িটা আশেপাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মতো নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয়, আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনই মনে হয় কাছেই কোথাও সাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা অসুস্থ যুবক ভুরু কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুখী কেন ?

গোপন কথা

আজ আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। এখনো অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ আলো-আঁধারিতে মন অন্যরকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

আমি পৃথিবীর সবাইকে ভালোবেসে ফেললাম। আমার পাশের চৌকিতে বাকের সাহেব ঘুমিয়ে। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি নিশ্চিত জানি তিনি একটি কুৎসিত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছেন। মুখের লালায় তার বালিশ ভিজে গেছে। লুঙ্গি উঠে গেছে কোমরে। তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না, বাকের সাহেবকেও আমি ভালোবাসব।

বৎসরের অন্যদিনগুলি আজকের মতো হয় না কেন ?—ভাবতে ভাবতে আমি সিগারেট ধরালাম। হিটার জ্বালিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল নিঃশব্দে। তবু বাকের সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, চা হচ্ছে নাকি ?

হ্যাঁ।

আজ এত ভোরে উঠলেন যে! ব্যাপার কী ? শরীর খারাপ নাকি ?

জি-না। চা খাবেন বাকের সাহেব ?

দেন এক কাপ।

এই বলেই মাথা বের করে তিনি নাক ঝাড়লেন। নাক মুছলেন মশারিতে। কী কুৎসিত ছবি! আজ চমৎকার সব ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম বাকের সাহেব নামে এ ঘরে কেউ থাকে না। এবং এটা যেনতেন কোনো ঘরও নয়। এটা হচ্ছে মহিমগড়ের রাজবাড়ি। এবং আমি এসেছি মহিমগড়ের রাজকন্যার অতিথি হয়ে। এবং আমিও কোনো হেজিপেজি লোক নই। আমি একজন কবি। আজ সন্ধ্যায় মহিমগড়ের রাজকন্যাকে আমি কবিতা শোনাব।

মঞ্জু সাহেব।

জি বলুন।

এরকম লাগছে কেন আপনাকে ? কিছু হয়েছে নাকি ?

না। কী হবে ?

দেখি, একটা সিগারেট দেন দেখি।

বাকের সাহেব তার সাপের মতো কালো রোগা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা সিগারেট দিলাম। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, বালিশের নিচে তার নিজের সিগারেট আছে। বাকের সাহেব নিজের সিগারেট কমই খান। আহ্, কী সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবছি ? আজ আমি একজন অতিথি-কবি। আমার চিন্তাভাবনা হবে কবির মতো। আমি নরম স্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

জি।

আজ আমার কেন জানি বড় ভালো লাগছে।

ভালো লাগার কী হলো আবার ?

বাকের সাহেব বড়ই অবাক হলেন। তার কাছে আজকের দিনটি অন্য সব দিনের মতোই। সাধারণ। ক্লান্তিকর। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

বলেন।

আজ আমার জন্মদিন।

তাই নাকি ?

জি। এগারোই বৈশাখ।

আম-কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন রে ভাই।

এই বলেই বাকের সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আজ আমি রাগ করব না। চমৎকার একটি সকালকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। সন্ধ্যাবেলা যাব নীলুদের বাড়ি। সন্ধ্যা হওয়ার আগে পর্যন্ত শুধু ওর কথাই ভাবব।

বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললেন, পাইখানা কষা হয়ে গেছে ভাই।

আমি শুনেও না-শোনার ভান করলাম। আজ আমি অসুন্দর কিছুই শুনব না। আজ আমার জন্মদিন। আজ নীলুদের বাসায় যাব এবং তাকে গোপন কথাটি বলব।

ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, কিংবা প্রচণ্ড টর্নেডো হোক—কিছুই আসে যায় না। আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিকই যাব নীলুদের বাসায়। নীলুর বাবা হয়তো বসে থাকবেন বারান্দায়। তিনি আজকাল বেশিরভাগ সময় বারান্দাতেই থাকেন। অপরিচিত কাউকে দেখলে কপালের চামড়ায় ভাঁজ ফেলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকান। আমার দিকেও তাকাবেন। আমি হাসিমুখে বলব, নীলুফার কি বাসায় আছে? ওর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। আমি উত্তেজিত অবস্থায় ঠিকমতো কথা বলতে পারি না। কথা গলায় আটকে যায়। কিন্তু আজ আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আজ কথা বলব অভিনেতাদের মতো।

চা শেষ করেই বাকের সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। গলা টেনে টনে বললেন, ন'টা পর্যন্ত ঘুমাব। তারপর উঠে নাশতা খেয়ে আবার ঘুম। ছুটির দিনের ঘুম কাকে বলে দেখবেন। ম্যারাথন ঘুম। হা হা হা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখি আলো ফুটেছে। আকাশ হালকা নীল। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। গোপন কথা বলার জন্যে এরচেয়ে সুন্দর দিন আর হবে না।

সকাল এগারোটায় টেলিফোন করলাম। নীলুকে টেলিফোনে কখনো পাওয়া যায় না। আজ পাওয়া গেল। নীলু কিশোরীদের মতো গলায় বলল, কে কথা বলছেন?

আমি মঞ্জু।

ও, মঞ্জু ভাই। আপনি কেমন আছেন?

ভালো। তুমি কেমন আছ, নীলু?

আমিও ভালো।

কী করেছিলে?

পড়ছিলাম। আবার কী করব? আমার অনার্স ফাইন্যাল না!

ও, তাই তো। আচ্ছা শোনো নীলু, তুমি কি আজ সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে?

থাকব না কেন?

আমি একটু আসব তোমাদের ওখানে।

বেশ তো, আসুন।

একটা কথা বলব তোমাকে।

কী কথা ?

গোপন কথা।

আপনার আবার গোপন কথা কী ?

নীলু খিলখিল করে হাসতে লাগল। কী সুন্দর সুরেলা হাসি। কী অদ্ভুত লাগছে শুনতে।

হ্যালো নীলু।

বলুন শুনছি।

আজ সন্ধ্যায় আসব।

বেশ তো, আসুন। রাখলাম এখন। নাকি আরও কিছু বলবেন ?

না, এখন আর কিছু বলব না।

নীলু রিসিভার নামিয়ে রাখার পরও আমি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে লাগিয়ে রইলাম।

মাত্র এগারোটা বাজে। আরও আট ঘণ্টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায় ? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিউ মার্কেটে কিছুক্ষণ হাঁটলাম একা একা। এবং একসময় দামি একটা শার্ট কিনে ফেললাম। অন্যদিন হলে শার্টের দাম আমার বুকে বিঁধে থাকত। আজ থাকল না। দামের কথা মনেই রইল না।

দশটি ফাইভ ফাইভ কিনলাম এলিফ্যান্ট রোড থেকে। অন্তত আজকের দিনটিতে দামি সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। নীলুর জন্যে কিছু-একটা উপহার নিয়ে গেলে হয় না ? কী নেওয়া যায় ? সুন্দর মলাটের একটা কবিতার বই। সেখানে খুব গুছিয়ে একটা কিছু লিখতে হবে; যেমন, 'নীলুকে—দেখা হবে চন্দনের বনে।' বইটি দেওয়া হবে ফিরে আসার সময়। নীলু নিশ্চয়ই আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে। তখন বলব, নীলু, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন। নীলু বলবে, ওমা, আগে বলবেন তো!

আগে বললে কী করতে ?

কোনো উপহার-টুপহার কিনে রাখতাম।

কী উপহার ?

কবিতার বই-টই।

আমি তো কবিতা পড়ি না।

না পড়লেও বই উপহার দেওয়া যায়।

ঠিক এই সময় আমি মোড়ক খুলে বইটি হাতে দিয়ে অল্প হাসব। হাসতে হাসতেই বলব, আমি তোমার জন্যে একটা কবিতার বই এনেছি নীলু।

সন্ধ্যাবেলা আকাশে খুব মেঘ করল। এবং একসময় শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। নীলুদের বারান্দায় পা রাখামাত্র সত্যি সত্যি ঝড় শুরু হলো। কারেন্ট চলে গেল। সমস্ত অঞ্চল ডুবে গেল অন্ধকারে। নীলু আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন ? ভিজে গেছেন দেখি। আসুন, ভেতরে আসুন। কী যে কাণ্ড করেন ? কাল এলেই হতো।

বসার ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর পাশে বিলু। বিলু আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, স্যার ভূতের গল্প বলছেন। উফ্, যা ভয়ের! তারপর স্যার বলুন।

নীলু বলল, দাঁড়ান স্যার, আমি এসে নেই। চায়ের কথা বলে আসি।

নীলু চায়ের কথা বলে এল। একটা তোয়ালে আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, মাথা মুছে ফেলুন। তারপর স্যারের গল্প শুনুন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। বানানো গল্প না।

তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল নীলু।

দাঁড়ান, গল্প শুনে নেই।

আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি ?

কৃষি ব্যাংকে একটা চাকরি হয়েছে। ফিফথ গ্রেড অফিসার।

বাহ্, বেশ তো। আসুন, এখন গল্প শুনুন।

নীলু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। স্যার, ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু। যে ভাই ওয়াশিংটন ডি.সি-তে থাকেন তাঁর। নীলুর স্যার বললেন, বসুন। আমি বসলাম। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলেন।

পথঘাট অন্ধকার। শ্রাবণ মাস। আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমি আর আমার বন্ধু তারাদাস পাশাপাশি যাচ্ছি। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। যেন কেউ-একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। তারাদাস বলল, কে ? কে ? তখন শব্দটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক ভালোই গল্প করতে পারেন। নীলু-বিলু মুগ্ধ হয়ে শুনছে। নীলু একটা শাড়ি পরেছে। পরার ভঙ্গিটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তাকে বিলুর চেয়েও কম বয়স্ক লাগছে। যেন সিক্স-সেভেনে পড়া বালিকা শখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।

গল্প শেষ হতে অনেক সময় লাগল। নীলু উঠে গিয়ে চা নিয়ে এল। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নীলু অবাক হয়ে বলল, একবার তো বলেছেন!

কী বললাম ?

কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।

এ কথা না। অন্য একটা কথা।

ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান, স্যারের কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনি। স্যার, আরেকটা গল্প বলুন।

ভদ্রলোক গল্প বলার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। গল্প হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে। নীলু ব্যস্ত হয়ে তাদের ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল।

আমি স্যারের পাশে বসলাম। নীলু হালকা গলায় বলল, আবার আসবেন মঞ্জু ভাই।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বিলুর স্যার বললেন, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন? আমি তার জবাব দিলাম না। ভূতে বিশ্বাস করি কি না করি তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি পরশুদিন চলে যাব। অনেক দিন আর ঢাকায় আসা হবে না। আর এলেও গোপন কথা বলার ইচ্ছা হবে না হয়তো। বিলুর স্যার বললেন, পৃথিবীতে অনেক স্ট্রেঞ্জ ঘটনা ঘটে বুঝলেন মঞ্জু সাহেব, নাইনটিন সিক্সটিতে একবার কী হয়েছে শোনেন।

আরেক দিন শুনব। আজ আমার মাথা ধরেছে।

আমাদের এদিকেও বাতি নেই। অন্ধকার ঘরে বাকের সাহেব শুয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখেই ক্লান্তস্বরে বললেন, শরীরটা খারাপ করেছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।

সব পরিষ্কার করে ঘুমুতে যেতে আমাদের অনেক রাত হলো। বাইরে আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাকের সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ঘুমালেন নাকি ভাই?

জি-না।

আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। গরিব মানুষ, কী আর দিব বলেন? বাকের সাহেব অন্ধকারে এগিয়ে দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটি। আমি নিচুস্বরে বললাম, একটা কথা শুনবেন?

কী কথা?

গোপন কথা। কাউকে বলতে পারবেন না।

বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বোধহয় পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয়নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগল।

একজন সুখী মানুষ

জাকের সাহেবের বয়স ছাপ্পান্ন।

কিছুদিন আগেও তাঁর বয়স ছাপ্পান্নই মনে হতো। এখন হঠাৎ যেন তাঁর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। আয়নার দিকে তাকালেই মনে হয় সত্তর বছরের এক অচেনা বুড়ো। অথচ তিনি একজন সুখী মানুষ। অসম্ভব সুখী। সুখী মানুষের বয়স বাড়ে না। কিন্তু তাঁর বেলায় এরকম হচ্ছে কেন ?

তিনি দাড়ি কামাতে কামাতে এইসব ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ঘ্যাস করে তাঁর গাল কেটে গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা রক্ত পড়ল বেসিনে। অনেকখানি কেটেছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ব্যথা লাগছে না। বয়সের লক্ষণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু অসাড় হয়ে আসে। ব্যথাবোধের তীব্রতা কমে আসে।

জাকের সাহেব ডান হাতের আঙুলে গাল চেপে ধরে অভ্যাসের বসেই বলেন, উহ্! বলে তিনি নিজে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। উহ্ বলার কোনো দরকারই ছিল না। কেন বললেন ?

নাশতার টেবিলে মিলির সঙ্গে দেখা হলো। মিলি তাঁর বড় মেয়ে। নাশতার সময়টাতে সে বাবার সামনে বসে পরপর দু'কাপ চা খায়। অল্পকিছু কথাবার্তা হয়। আজ মিলি অস্বাভাবিক গম্ভীর। অনেকক্ষণ সে বাবার দিকে তাকালই না।

জাকের সাহেব এক চুমুকে কমলার রসটা খেয়ে ফেললেন। সিরিয়েলের বাটিতে দুধ ঢাললেন। চিনি মেশালেন। শুকনো চোখে তাকালেন রুটি-মাখনের প্লেটের দিকে। আরেকটি বাটিতে গাঢ় লাল রঙের কী একটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। টমেটোর স্যুপ নাকি ? স্যুপ আগে খাওয়া দরকার ছিল। কোনো কিছুই মুখে নিতে ইচ্ছা করছে না। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। বয়সের লক্ষণ। একটা বয়সে ভালো কিছু আর খেতে ইচ্ছা করে না।

বাবা, তোমার গালে কী হয়েছে ?

কিছু না।

কিছু না মানে ? গাল তো অনেকখানি কেটেছে।

হঠাৎ করে শেভ করতে গিয়ে ...।

ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করোনি ?

জাকের সাহেব চুপ করে রইলেন। এই যন্ত্রটি তাঁর পছন্দ নয়। চালু করলেই বিজবিজ শব্দ হয়। গালে ছোঁয়ালেই সমস্ত শরীর শিরশির করতে থাকে।

বাবা, কাটা জায়গায় কিছু দিয়েছ ?

না।

স্যাভলন-ট্যাভলন কিছুই না ?

না।

মিলির মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। জাকের সাহেব খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

এ-কী বাবা! তুমি ডিমটা খাচ্ছ না কেন?

ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলে তো হবে না। দু'দিন পরপর তোমাকে একটা ডিম খেতে হবে। এই বয়সে তোমার ডায়েট ঠিক রাখা খুবই জরুরি।

তা তো ঠিকই।

আজ ডাক্তার সাহেব আসবেন না?

হুঁ, আসবেন।

গালটা তাঁকে দেখাবে।

ঠিক আছে।

কোনো জিনিস অবহেলা করতে নেই।

তা তো ঠিকই।

তিনি সিদ্ধ ডিমে গোলমরিচের গুঁড়া ঢালতে ঢালতে সেটাকে কালো বানিয়ে ফেললেন। ডিমটা শেষ করতে তাঁর অনেক সময় লাগল। কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চাচ্ছে না। দু'একবার বমির মতো হলো। চমৎকার সব সুখাদ্য, কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না। বয়স দ্রুত বাড়ছে। আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় রেলিং ধরে ধরে উঠতে হয়। অথচ তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন।

জাকের সাহেব হাঁটতে বেরুলেন। গালের কাটাটায় চিনচিনে একটা ব্যথা হচ্ছে। কেন হচ্ছে কে জানে। বেরুবার সময় তাঁর জামাই তাঁকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। চিন্তিত মুখে বলেছে, গাল হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে সেনসেটিভ পার্ট, একে মোটেই অবহেলা করা উচিত না। সামান্য ক্ষতেই সেপটিক হয়ে সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে।

জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বিশেষ হয় না। শরীর খারাপ হলে বা অসুখ-বিসুখ হলেই সে শুধু খোঁজ নিতে আসে। আজ যেমন নিয়েছে। রাতেও একবার খোঁজ নেবে।

জাকের সাহেব রাস্তার মোড়ের এক পানওয়ালার দোকান থেকে একটা ফাইভ ফাইভ কিনলেন। তখন মিহির বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। মিহির বাবু পাশের বাড়িতে থাকেন। অল্পদিন হলো রিটায়ার করেছেন। মিহির বাবু অবাক হয়ে বললেন, সিগারেট কিনলেন নাকি?

জি।

আপনি সিগারেট খান জানতাম না তো!

খাই না। এই আজ একটা কিনলাম।

কোনো উপলক্ষ-টুপলক্ষ নাকি ?

না না, উপলক্ষ কিছু না, এমনি।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মিহির বাবু বললেন, কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?

জি-না, একটু হাঁটছি। মর্নিং ওয়াক।

সকাল দশটায় মর্নিং ওয়াক ?

না, মানে এই হাঁটা আর কী!

আপনার ছেলেরা ভালো আছে ?

জি ভালো।

তারা যেন কোথায় আছে ?

জাকের সাহেব অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, দু'জনই আমেরিকাতে। একজন নর্থ ডাকোটায়, অন্যজন সিয়াটলে।

আরেক মেয়েজামাই জাপান না কোথায় আছে বলেছিলেন যেন ?

হনলুলু।

আপনি তো ভাই সুখী মানুষ।

তা ঠিক।

চিন্তাভাবনা কিছু নাই। এখন শুধু দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো। আজ জাপান, কাল আমেরিকা, পরশু হনলুলু।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। সিগারেট টানার জন্যেই বোধহয় তাঁর মাথা হালকা হালকা লাগছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। একটা পান খেতে পারলে হতো। মিহির বাবু বিমর্ষ ভঙ্গিতে বললেন, আমার অবস্থাটা দেখুন, দু'টা মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নাই। এর মধ্যে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেল। যাই কোথায় এখন বলুন ? জীবনে একটা বাড়ি-টাড়ি করতে পারলাম না। এখন যাচ্ছি গোরান। পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছি। কারণ কী জানেন ?

না।

বেশি নিলে যদি খরচ হয়ে যায় সেই ভয়ে। আচ্ছা ভাই, গেলাম। বাস ধরতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, জাকের সাহেবও পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছেন। নগদ টাকা তাঁর কাছে থাকে না। অবশ্যি থাকার প্রয়োজনও তেমন নেই। নগদ টাকা দিয়ে তিনি কী করবেন ? প্রতিদিন বাজারে যাওয়ার আগে তোতা মিয়া এসে জিজ্ঞেস করে, আপনার কিছু লাগবে ? লাগলে কন।

মিলি সবসময়ই বলে, বাবা, তোমার প্রচুর টাকা আছে। তোমার দুই ছেলে প্রতিমাসে যত টাকা পাঠায় সেটা তুমি এই জীবনে খরচ করে শেষ করতে পারবে না। সব আলাদা করা আছে, যখন যা লাগবে বলবে।

তা তো বলবই।

কোনো লজ্জা করবে না।

না, লজ্জা কী জন্যে ?

যদি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে বলবে।

নিশ্চয়ই বলব।

যখন যত টাকা লাগে চাইবে আমার কাছে। ক্যাশ টাকা তোমার ঘরে রাখতে চাই না। পাঁচ ছ'জন কাজের লোক। নগদ টাকা দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না। শেষে স্বভাব নষ্ট হবে।

তা ঠিক।

তোমার যখন যা ইচ্ছা করে আমাকে বলবে।

হুঁ, বলব।

জাকের সাহেব বলার মতো তেমন কিছু কখনো খুঁজে পাননি। যে-ঘরে তিনি থাকেন সে-ঘরে লাল রঙের ছোট একটা ফ্রিজ আছে। বারো ইঞ্চি একটি রঙিন টিভি আছে। যে-খাটে তিনি ঘুমান তার গদিটি আট ইঞ্চি ফোমের।

বিছানার পাশেই বেতের একটা ইজি চেয়ার। হাতের কাছে বইয়ের শেলফ। নিউজ উইক এবং টাইম এই দু'টি পত্রিকা শুধু তাঁর জন্যেই রাখা হয়। একজন ডাক্তার আছেন যিনি সপ্তাহে একবার (বুধবার সন্ধ্যা) এসে তাঁর ব্লাডপ্রেসার মেপে যান। মিলি ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রতি রাত দশটায় এসে বাতি নিভিয়ে যায়। রাত জাগলে তাঁর শরীর খারাপ করবে, তাই। তাঁর খাটের পাশে একটা সুইচ আছে যা টিপলেই রান্নাঘরে কলিং বেল বেজে ওঠে। তোতা মিয়া ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে কিছু লাগবে কি না।

গত সপ্তাহেই ছোট মেয়ের চিঠি পেলেন। সে লিখেছে,

> বাবা,
>
> তুমি কি হনলুলু বেড়াতে আসতে চাও ? তিন মাসের ভিজিটার্স ভিসা নিয়ে চলে এসো না। তোমার খারাপ লাগবে না। বড় আপার চিঠিতে দেখলাম তুমি সারাক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাক। এর কারণ কী ? তোমার কি কোনো কিছুর অভাব আছে ? মিলি কি তোমার যত্ন-টত্ন ঠিকমতো করছে না ? কোনোরকম সংকোচ না করে লিখবে।

তাঁর কোনো অসুবিধা নেই। মিলি তাঁর খুব ভালো যত্ন করছে। তিনি যথেষ্ট সুখে আছেন। তাঁর এখন মনেই পড়ে না এককালে তিনি দরিদ্র ছিলেন। চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে মাথা খারাপের জোগাড় হয়েছিল। একসময় এও ভেবেছিলেন— ফয়সল আইএসসি পাস করামাত্র তাকে কোনো একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। ভাগ্যিস সেরকম কিছু করেননি। অমানুষিক কষ্ট করেছেন ছেলেদের জন্যে। তারাও মনে রেখেছে সেসব।

যেবার তাঁর রক্ত-আমাশা হলে, কী ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। প্রতিরাতে টেলিফোন। এতদূর থেকে টেলিফোন, নিশ্চয়ই ছ'সাত শ' টাকা করে লাগত। বড় ছেলে মাসিক বরাদ্দের টাকা ছাড়াও বাড়তি এক হাজার ডলার পাঠিয়েছিল চিকিৎসা খরচের জন্যে। মিলিকে লিখেছে—বাবার সেবাযত্নের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার একজন নার্স রেখে দেবে। খরচের জন্যে চিন্তা করবে না।

তাঁর দু'ছেলেরই হাত খুব দরাজ। তাদের কথা মনে হলেই একটা তৃপ্তির ভাব আসে, মন ভালো হয়ে যায়। তারা অনেক কিছু করেছে তাঁর জন্যে, কিন্তু তিনি নিজের বাবা-মা'র জন্যে কিছুই করতে পারেননি। তাঁর বাবা শেষ বয়সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন। বড় ভাই ঘনঘন চিঠি লিখতেন।

> বাবাকে আমার ঘাড়ে ফেলিয়া তোমরা সকলে কী প্রকারে নিশ্চিন্ত আছ তাহা আমি বুঝতে পারি না। বৃদ্ধ পিতামাতাকে পালন করিবার দায়িত্ব কি আমার একার ? তোমার কি কিছুই করিবার নাই ? এই পত্র পাওয়ামাত্র বাবার খরচ হিসাবে অতি অবশ্যই পঞ্চাশ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। আমি বিশেষ অসুবিধায় আছি।

এ জাতীয় চিঠি তিনি সবসময় উপেক্ষা করেছেন। সেজন্যে অবশ্যি তাঁর মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। তিনি দরিদ্র ছিলেন। খুবই দরিদ্র। বাবাকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জাকের সাহেব দুপুর এগারোটার দিকে বাসায় ফিরলেন। মিলি বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় কোথায় ঘুরছিলে রোদের মধ্যে ? তিনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসলেন।

কিছু খাবে এখন ?

না।

ঠান্ডা কিছু খাও। বেলের শরবত করে দিক ?

ঠিক আছে, দিতে বল।

তুমি ঘর থেকে বেরুবার পরপর ফয়সল টেলিফোন করেছিল। গাল কাটার খবর বললাম। সে খুব বিরক্ত হয়েছে। বারবার বলছিল, বাবা এত অসাবধান কেন ?

তিনি লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন। মিলি বলল, এখন থেকে তোতা মিয়া তোমার শেভ করে দেবে, বুঝলে ?

আচ্ছা।

জাকের সাহেব বরফ-দেওয়া ঠান্ডা বেলের শরবত খুব তৃপ্তি করে খেলেন। জিনিসটা ভালোই। মিলি বলল, সিদ্দিক আজ আবার এসেছিল।

তিনি শঙ্কিত বোধ করলেন। সিদ্দিক তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে। কিছুদিন পরপরই সাহায্যের জন্যে আসে। মিলি বিরক্ত হয়।

আজ এসেই সে একটা মিথ্যা কথা ফেঁদেছে। বলেছে, তুমি নাকি তাকে আসতে বলেছ। তুমি নাকি সেলাই মেশিন কিনবার টাকা দেবে। বলেছ নাকি ?

জাকের সাহেব মাথা নাড়লেন, তিনি কিছু বলেননি। মিলি কঠিন স্বরে বলল, ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না।

তা তো বটেই।

আমি আজ কড়া এক ধমক দিয়েছি।

ধমক দেওয়ার কী দরকার ছিল ?

ধমক দেব না ? আমার সামনে অ্যাশট্রের মধ্যে কাশ ফেলল। রাগে আমার গা জ্বলে গেছে। তুমি যাও, গরম পানি করা হচ্ছে। গোসল সার। গালে পানি লাগিয়ো না।

রাত আটটায় বড় ছেলে সিয়াটল থেকে টেলিফোন করল।

বাবা, তোমার গাল কেমন ?

ভালো।

মিলি বলল তুমি নাকি ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করো না ?

এখন থেকে করব।

আমরা খুব চিন্তিত, বুঝলে বাবা ?

বুঝেছি।

নাও, টুকুনের সঙ্গে কথা বলো।

টুকুন বাংলা বলতে পারে না। সে একগাদা কথা বলে গেল। জাকের সাহেব শুধু ঘনঘন মাথা নাড়লেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বললেন, ইয়েস ইয়েস।

রাত দশটার কিছু পরে ছোট মেয়ের টেলিফোন এল হনলুলু থেকে। কানেকশন ভালো নয়। কিছুই প্রায় শোনা যায় না।

বাবা, তুমি এত অসাবধান কেন ?

এখন থেকে সাবধান হব।

ভাইয়া টেলিফোন করে আমাকে জানাল। আমি চিন্তায় অস্থির। খুব বেশি কেটেছে ?

না, খুব বেশি না।

বিদেশে থাকি। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন কী খবর এসে পড়ে।

ভয় নাই। আমি অনেকদিন বাঁচব।

কথাটা হয়তো ঠিক। তাঁদের দীর্ঘজীবী বংশ। তাঁর বাবা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন। চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না, তবু

বেঁচে আছেন। তাঁর এত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বেঁচে থেকে তিনি বড় ভাইকে প্রায় পাগল করে দিলেন। আর কিছুদিন বাঁচলে বড় ভাই সত্যি সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে যেতেন।

তিনিও কি তাই করবেন ? দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে সবাইকে পাগল করে তুলবেন ?

জাকের সাহেব বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন। রাত বারোটায় তাঁকে ডেকে তোলা হলো। ছোট ছেলে কায়সার টেলিফোন করেছে নর্থ ডাকোটা থেকে। জাকের সাহেব ঘুমঘুম চোখে উঠে বসলেন। মিলি চমকে উঠে বলল, কী সর্বনাশ! তোমার গালের এ অবস্থা কেন ? সমস্ত মুখ ফুলে উঠেছে, বাম গাল এমন ফুলেছে যে একটা চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মিলি এসে বাবার হাত ধরল।

ইস, এ তো অসম্ভব জ্বর। বাবা, তুমি শুয়ে থাকো।

জাকের সাহেব শুয়ে থাকলেন না। টেলিফোন ধরতে নিচে নেমে গেলেন।

হ্যালো কায়সার ?

হ্যাঁ। বাবা, তুমি কেমন আছ ?

ভালো, খুব ভালো। খুব চমৎকার আছি।

এ পর্যন্ত বলে তিনি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, এত সহজে আমি মরছি না। বুঝলি ? আমি দীর্ঘদিন বাঁচব। একসময় চোখে-টোখে দেখব না। কানে শুনব না। বিছানায় উঠে বসতেও পারব না। তবু বেঁচে থাকব।

এইসব তুমি কী বলছ বাবা ?

জাকের সাহেব হাসতে লাগলেন। একজন সুখী মানুষের হাসি। আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।

জলিল সাহেবের পিটিশন

তিনি হাসিমুখে বললেন, আমি দু'জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। সেভেন্টিওয়ানে আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোকের চেহারা বিশেষত্বহীন। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। সে তুলনায় বেশ শক্তসমর্থ। বসেছেন মেরুদণ্ড সোজা করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চশমা-টশমা নেই। তার মানে চোখে ভালোই দেখতে পান। আমি বললাম, আমার কাছে কী ব্যাপার ? ভদ্রলোক যেভাবে বসে ছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। সহজ সুরে বললেন, একজনের ডেডবডি পেয়েছিলাম। মালিবাগে কবর দিয়েছি। আমার ছোট মেয়ের বাড়ি আছে মালিবাগে।

তাই নাকি ?

জি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া।

আমার কাছে কেন এসেছেন ?

গল্পগুজব করতে আসলাম। নতুন এসেছেন এ পাড়ায়। খোঁজখবর করা দরকার। আপনি আমার প্রতিবেশী।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বসে রইলেন। আমার সন্দেহ হলো, তিনি হয়তো সত্যি সত্যি হাসছেন না। তাঁর মুখের কাটাটাই হাসি হাসি। ভদ্রলোক শান্তস্বরে বললেন, আমি আপনার পাশের গলিতেই থাকি।

তাই বুঝি ?

জি। ১৩/২, বাসার সামনে একটা নারিকেল গাছ আছে। দেখেছেন তো ?

আমি দেখিনি। তবু মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোকের চরিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সম্ভবত অবসর জীবন যাপন করছেন। কিছু করবার নেই। সময় কাটানোটাই বোধহয় তার এখন একমাত্র সমস্যা। যার জন্যে ছুটির দিনে প্রতিবেশী খুঁজতে হয়।

আমার নাম আবদুল জলিল।

আমি নিজের নাম বলতে গেলাম, ভদ্রলোক বলতে দিলেন না। উঁচুগলায় বললেন, চিনি, আপনাকে চিনি।

চা খাবেন ? চায়ের কথা বলি ?

জি-না। আমি চা খাই না। চা সিগারেট কিছুই খাই না। নেশার মধ্যে পান খাই।

পান তো দিতে পারব না, এখানে কেউ পান খায় না।

পান আমার সঙ্গেই থাকে।

ভদ্রলোক কাঁধের ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে পানের কৌটা বের করলেন। বেশ বাহারি কৌটা। টিফিন কেরিয়ারের মতো তিন-চারটা আলাদা বাটি আছে। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করলাম। ভদ্রলোক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। সারা সকালটা হয়তো এখানে কাটাবেন। নিজের ছেলে দু'টির কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন। দুঃখকষ্টের গল্প অন্যকে শোনাতে সবাই খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে এসে বললেন, প্রফেসার সাহেব, আপনি একটা পান খাবেন ?

জি-না।

পান কিন্তু শরীরের জন্যে ভালো। পিত্ত ঠান্ডা রাখে। যারা পান খায় তাদের পিত্তে দোষ হয় না।

তাই নাকি ?

জি। পানের রস আর মধু হলো গিয়ে পিত্তের খুব বড় ওষুধ।

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। আজ ইউনিভার্সিটি নেই। থাকলে সুবিধা হতো। বলা যেত—কিছু মনে করবেন না। এগারোটার সময় একটা ক্লাস আছে।

আপনি অন্য আরেকদিন সময় হাতে নিয়ে আসুন। ছুটির দিনে এরকম কিছু বলা যায় না।

ভদ্রলোক তাঁর পানের কৌটা খুলে নানান রকম মসলা বের করলেন। প্রতিটি মসলা শুঁকে শুঁকে দেখলেন। পান বানালেন অত্যন্ত যত্নে। যিনি পান বানানোর মতো তুচ্ছ ব্যাপারে এতটা সময় নষ্ট করেন তিনি যে আজ দুপুরের আগে নড়বেন না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ! ভদ্রলোক পান মুখে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, যাই, আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।

বিস্ময় সামলে আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, বসুন, এত তাড়া কিসের ?

তিনি বসলেন না। আমি তাঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ফেরার পথে দেখি, বাড়িওয়ালা বারান্দায় ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রফেসার সাহেবকে ধরেছে ঝুঝি ? সিগনেচার করেছেন ?

কী সিগনেচার ?

জলিল সাহেবের পিটিশনে সিগনেচার করেননি ?

পিটিশনটা কিসের ?

আমাকে বলতে হবে না। নিজেই টের পাবেন। হাড় ভাজা-ভাজা করে দিবে। কোনো প্রশ্রয় দিবেন না।

অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। নতুন পাড়ায় আসার অনেক বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। নতুন নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সে পরিচয় অনেক সময়ই সুখকর হয় না। তবে জলিল সাহেব প্রসঙ্গে ভয়টা বোধহয় অমূলক। এরপর তাঁর সঙ্গে দু'বার দেখা হলো। বেশ সহজ স্বাভাবিক মানুষ। একবার দেখা গ্রিন ফার্মেসির সামনে। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, প্রফেসর সাহেব না ? ভালো আছেন ?

জি ভালো। আপনি ভালো আছেন ? কই আর তো এলেন না!

সময়ই পাই না। খুব ব্যস্ত। পিটিশনটার ব্যাপারে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ক্লাসের দোহাই দিয়ে রিকশায় উঠে পড়লাম। দ্বিতীয়বার দেখা হলো নিউ মার্কেটের একটা নিউজ পেপার স্ট্যান্ডের সামনে। দেখি, তিনি উবু হয়ে বসে একটির পর একটি পত্রিকা দ্রুত পড়ে শেষ করছেন। হকার ছেলেটি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে।

কী জলিল সাহেব, কী পড়ছেন এত মন দিয়ে ?

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো ঠিক চিনতে পারলেন না। তাঁর চোখে চশমা।

চশমা নিয়েছেন নাকি ?

জি। সন্ধ্যা হলে মাথা ধরে। প্লাস পাওয়ার। ভালো আছেন প্রফেসার সাহেব ?

জি ভালো।

যাব একদিন আপনার বাসায়। পিটিশনটা দেখাব আপনাকে। চৌদ্দ হাজার তিনশ' সিগনেচার জোগাড় হয়েছে।

কিসের পিটিশন ?

পড়লেই বুঝবেন। আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না।

আমার ধারণা ছিল সরকারের কাছে কোনো সাহায্য-টাহায্য চেয়ে পিটিশন করা হয়েছে। সেখানে চৌদ্দ হাজার সিগনেচারের ব্যাপারটা বোঝা গেল না। আমি নিজে থেকেও কোনো আগ্রহ দেখালাম না। জগতে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কম নয়। সিগনেচার সংগ্রহ করা যদি তাঁর নেশা হয়, তা নিয়ে আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে হলো। জলিল সাহেব এক সন্ধ্যায় তাঁর চৌদ্দ হাজার তিনশ' সিগনেচারের ফাইলপত্র নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, ভালো করে পড়েন প্রফেসার সাহেব।

আমি পড়লাম। পিটিশনের বিষয়বস্তু হচ্ছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদি মারা গিয়েছিল। সেই অপরাধে অপরাধীদের প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু এদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে অপরাধীরা কী করে পার পেয়ে গেল ? কেন এ নিয়ে আজ কেউ কোনো কথা বলছে না ? জলিল সাহেব তাঁর দীর্ঘ পিটিশনে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যেন এদের বিচার করা হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি শান্তস্বরে বললেন, আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে, সেইজন্যেই যে আমি এটা করছি তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্যে আমি কোনো বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্যে যাদের ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

জানি পারবেন। আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অনেকেই পারে না। বুঝলেন ভাই, অনেকেই মানবতার দোহাই দেয়। বলে, বাদ দেন। ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা এত সস্তা ? এ্যাঁ, বলেন সস্তা ?

আমি কিছু বললাম না। জলিল সাহেব পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে বসলেন। শান্তস্বরে বলেন, আপনি কি মনে করেছেন আমি ছেড়ে দেব ? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দেব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল, আর কেউ কোনো শব্দ করল না ? আমরা মানুষ না অন্যকিছু বলেন দেখি ?

আমি সিগনেচার ফাইল উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব গোছানো কাজকর্ম। সিগনেচারের পাশে বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা। স্বাধীনতাযুদ্ধে নিহত আত্মীয়স্বজনের নাম-ধাম।

অনেকেই মনে করে আমার মাথার ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মতো একটা ছেলে বলল, কেন পুরানা কাসুন্দি ঘাঁটছেন ? বাদ দেন ভাই। আমি তার দাদার বয়সী লোক, আমাকে বলে ভাই।

আপনি কী বললেন ?

আমি বললাম, তুমি চাও না এদের বিচার হোক ?

ছেলেটি কিছু বলে না। সরাসরি না বলারও সাহস নাই। অথচ এইসব ছেলে কত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। করে নাই ?

জি করেছে।

আপনার বাড়িওয়ালার কথাই ধরেন। তাঁর এক শালাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। অথচ এই লোক সিগনেচার করেনি। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেল। কোনো বিচার হলো না। মনে হলেই বুকের মধ্যে চিনচিন ব্যথা হয়।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি পান মুখে পুরে বললেন, সরকারি লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমি কী বলতে চাই সেটাই ভালো করে শুনতে চায় না। একজন আমাকে বলল, আপনি একটা পরিত্যক্ত বাড়ির জন্যে দরখাস্ত করেন। আপনার দু'টি ছেলে মারা গেছে। বাড়ি পাওয়ার হক আছে আপনার।

আপনি কী বললেন ?

আমি আবার বলব কী ? বাড়ির জন্যে আমি পিটিশন করছি নাকি ? বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কী ? আমার দুই ছেলের জীবন কি এত সস্তা ? একটা বাড়ি দিয়ে দাম দিতে চায় ? কত বড় স্পর্ধা চিন্তা করেন। আমি চাই একটা বিচার হবে। বিচার চাই। আর কিছুই না। সভ্য সমাজের নিয়মমতো বিচার হবে। বুঝলেন ?

জি বুঝলাম।

আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। অন্যেরা বুঝতে চায় না। একেকটা সিগনেচারের জন্যে তিনবার করে যেতে হয়। তাতে অসুবিধা নাই। আমি ছাড়বার লোক না।

আমার সিগনেচার নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। একটা কৌতূহল জেগে রইল। রাস্তাঘাটে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি, কী ভাই, কতদূর করলেন ?

চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেসার সাহেব। দোয়া রাখবেন।

লোকজন দস্তখত দিচ্ছে তো ?

সবাই দেয় না। ভয় পায়।

কিসের ভয় ?

ভয়ের কি কোনো মা-বাপ আছে ? ভয় পাওয়া যাদের স্বভাব তারা ভয় পাবেই। বুঝলেন না ? আমি আছি লেগে। আদালতে হাজির করে ছাড়ব। কী বলেন প্রফেসার সাব ?

তা তো ঠিকই।

ডিসট্রিক্ট ভাগ করে ফেলেছি। এখন সব ডিসট্রিক্টে যাব। কষ্ট হবে। উপায় তো নাই। আপনি কী বলেন ?

ভালোই তো।

তাছাড়া শুধু দস্তখত জোগাড় করলেও হবে না। কেইস চালানোর মতো এভিডেন্স থাকতে হবে। বিনা কারণে নিরপরাধ লোকজন ধরে ধরে মেরেছে—এটা প্রমাণ করতে হবে না ? ওরা ঘাগু ঘাগু সব ল'ইয়ার দেবে। দেবে না ?

তা তো দেবেই।

আপনার জানামতো ভালো ল'ইয়ার আছে ?

আমি খোঁজ করব।

তা তো করবেন। আপনি তো অন্ধ না। অন্যায়টা বুঝতে পারছেন। বেশিরভাগ লোকই পারে না। মূর্খের দেশ।

অনেকদিন আর জলিল সাহেবের দেখা পাই না। হয়তো সত্যি সত্যি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। বগলে ভারী ভারী ফাইল। দস্তখতের সংখ্যা হয়তো বাড়ছে। বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার। পনেরো থেকে বিশ। এমনকি সত্যি হতে পারে যে, চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ দস্তখত জোগাড় করে ফেলবেন তিনি ? পঞ্চাশ লাখ লোকের দাবি অত্যন্ত জোরালো দাবি।

বর্ষার শুরুতে খবর পেলাম জলিল সাহেব অসুখে পড়েছেন। হাঁপানি, সেইসঙ্গে রিউমেটিক ফিভার। বাড়িওয়ালা বললেন, পাগল মানুষ। শরীরের যত্ন তো কোনোদিন করে নাই। এ যাত্রা টিকবে না।

বলেন কী ?

হ্যাঁ। গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার সাহেব বললেন। আমি নিজেও গিয়েছিলাম দেখতে।

অবস্থা কি বেশি খারাপ ?

বর্ষাটা টিকে কি না সন্দেহ।

বলেন কী ?

খুবই খারাপ অবস্থা।

বর্ষাটা অবশ্যি টিকে গেলেন। ফাইলপত্র বগলে নিয়ে আবার ঘুরতে বেরুলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলো এক দুপুরে। আমি চিনতে পারি না এমন অবস্থা। তিনি এগিয়ে এলেন, প্রফেসার সাহেব না?

আরে! কী ব্যাপার ভাই? এ-কী অবস্থা আপনার!

বাঁচব না বেশিদিন।

না বাঁচলে চলবে? এত বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন।

ঐটার জন্যেই টিকে আছি।

সিগনেচার কতদূর জোগাড় হয়েছে?

পনেরো হাজার। মাসে তিন চারশ'র বেশি পারি না। বয়স হয়েছে তো। তবে ছাড়বার লোক না আমি।

না, ছাড়বেন কেন?

কাঠগড়ায় দাঁড় করাব শালাদের। ইহুদিরা পেরেছে, আমরা পারব না কেন? কী বলেন?

তা তো ঠিকই।

ত্রিশ লাখ লোক মেরেছে বুঝলেন—একটা দু'টা না। বাংলাদেশের মানুষ সস্তা না। মজা টের পাইয়ে দেব।

আজিমপুরের ঐ পাড়ায় আমি প্রায় দু'বছর কাটালাম। এই দু'বছরে জলিল সাহেবের সঙ্গে ভালোই ঘনিষ্ঠতা হলো। মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর বাসায়। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ি। দোতলাটি ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। স্ত্রী নেই। বড় ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে থাকে। ফুটফুটে দু'টি মেয়ে আছে সেই বউটির। যমজ মেয়ে বোধ করি। খুব হাসিখুশি। ভালোই লাগে ও-বাড়িতে গেলে। বউটি বেশ যত্ন করে।

পিটিশন সম্পর্কে বাচ্চা দু'টির ধারণাও দেখলাম খুব স্পষ্ট। একটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, দাদার খাতা লেখা শেষ হলে যারা আমার বাবাকে মেরেছে তাদের বিচার হবে।

এইটুকু মেয়ে এতসব বোঝার কথা নয়। জলিল সাহেব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন।

ঐ পাড়া ছেড়ে চলে আসার পরও মাঝে-মধ্যে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে গেল। এবং একসময় দীর্ঘদিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গেলাম।

যাওয়ার আগে দেখা করতে গিয়েছি। শুনলাম তিনি ফরিদপুরে গিয়েছেন সিগনেচার জোগাড় করতে। কবে ফিরে আসবেন কেউ বলতে পারে না। তাঁর ছেলের বউ অনেক দুঃখ করল। দুঃখ করার সঙ্গত কারণ আছে। একমাত্র পুরুষ যদি ঘর-সংসার ছেড়ে দেয় তাহলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

বাইরে থাকলে দেশের জন্যে অন্যরকম একটা মমতা হয়। সেই কারণেই বোধহয় জলিল সাহেবের কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হতো, ঠিকই তো, ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করছেন ঠিকই করছেন। এটা মধ্যযুগ না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য করা যায় না।

উইকএন্ডগুলিতে বাঙালিরা এসে জড়ো হতো আমার বাসায়। কিছু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছেলে, মুরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির অংকের প্রফেসার আফসার উদ্দিন সাহেব। সবাই একমত—জলিল সাহেবের প্রজেক্টে সবরকম সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। বিদেশী পত্রিকায় জনমতের জন্যে লেখালেখি করা হবে। আমেরিকার ফার্গো শহরে আমরা এক সন্ধ্যাবেলায় 'আবদুল জলিল সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে ফেললাম। আমি তার আহ্বায়ক। আফসার উদ্দিন সাহেব সভাপতি। বিদেশে বসে দেশের কথা ভাবতে বড় ভালো লাগে। সবসময়ই ইচ্ছা করে একটা কিছু করি।

দেশে ফিরলাম ছ'বছর পর।

ঢাকা শহর অনেকখানি বদলে গেলেও জলিল সাহেবের বাড়ির চেহারা বদলায়নি। সেই ভাঙা পলেস্তারা ওঠা বাড়ি। সেই নারিকেল গাছ। কড়া নাড়তেই চৌদ্দ-পনেরো বছরের ভারি মিষ্টি একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

তুমি কি জলিল সাহেবের নাতনি ?

জি।

তিনি বাড়ি আছেন ?

না। দাদু তো মারা গেছেন দু'বছর আগে।

ও। আমি তোমার দাদার একজন বন্ধু।

আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

আমি বসলাম কিছুক্ষণ। মেয়েটির মা'র সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। ভদ্রমহিলা বাসায় ছিলেন না। কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। উঠে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদু যে মানুষের সিগনেচার জোগাড় করতেন সেইসব আছে ?

জি আছে। কেন ?

তোমার দাদু যে কাজটা শুরু করেছিলেন সেটা শেষ করা উচিত। তাই না ?

মেয়েটি খুবই অবাক হলো। আমি হাসিমুখে বললাম, আমি আবার আসব, কেমন ?

জি আচ্ছা।

মেয়েটি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে নরম গলায় বলল, দাদু বলেছিলেন একদিন কেউ-না-কেউ এই ফাইল নিতে আসবে।

আর যাওয়া হলো না।

উৎসাহ মরে গেল। দেশের এখন নানান রকম সমস্যা। যেখানে-সেখানে বোমা ফাটে। মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। এর মধ্যে পুরনো একটি সমস্যা টেনে আনতে ইচ্ছা করে না।

আমি জলিল সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। মিরপুরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্যে নানা ধরনের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল সাহেবের বত্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় বেরুনোর আমার সময় কোথায়?

জলিল সাহেবের নাতনিটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর পিটিশনের ফাইলটি ধুলো ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখে। এই বয়েসী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।

যন্ত্র

[গল্পটি এই শতকের নয়। আগামী শতকের শেষের দিকের। এই জাতীয় রচনার একটি বিশেষ নাম আছে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। কেন যে দেন না তা সাহিত্যের ছাত্র নই বলেই হয়তো বুঝি না। আমি নিজে এই জাতীয় রচনা আগ্রহ নিয়ে পড়ি। লেখার সময়ও আগ্রহ নিয়ে লিখি—পাঠকদের এই তথ্যটি খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে গল্প শুরু করছি।]

তিনি নরম গলায় বললেন, ভাই, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো?

সেল্‌সম্যান জবাব দিল না, বিরক্ত চোখে তাকাল। তিনি আবার বললেন, ভাই, এই যন্ত্রটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো? সেল্‌সম্যানের বিরক্তি চোখ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে গেল, নিচের ঠোঁট টানটান হয়ে গেল। সে শুকনো গলায় বলল, সাইড এফেক্ট বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন?

মানে নেশা ধরে যায় কিনা। শুনেছি একবার ব্যবহার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। রাতদিন যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকে ...।

আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কিনবেন না। আপনাকে কিনতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। এতগুলি টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনবেন অথচ লোকটা তার প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না। এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন তিনি...

আপনি কি যন্ত্রটা কিনবেন, না দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

তিনি পকেট থেকে চেক বই বের করলেন। খসখস করে টাকার অংক বসালেন। হাতের লেখাটা ভালো হলো না। কারণ এত বড় অংকের চেক তিনি এর আগে কাটেননি। মাত্র আটশ' গ্রাম ওজনের কালো চৌকোণা একটা বক্স। অথচ কী অসম্ভব দাম! টাকার অংক লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে।

সেল্‌সম্যান বলল, আপনার কোনো ক্রেডিট কার্ড নেই ?

জি-না।

আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আপনার ব্যাংক একাউন্ট চেক করব। কম্পুটারটা ট্রাবল দিচ্ছে—একটু সময় লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে পাশের রুমে বসতে পারেন।

আমি বরং এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। অবশ্য আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।

সেল্‌সম্যান জবাব দিল না। তাঁর কাছে মনে হলো সেল্‌সম্যানের মুখের বিরক্ত ভাব একটু যেন কমেছে। কমাই উচিত। তিনি তো শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা কিনেছেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনের সঞ্চিত অর্থের সবটাই চলে গেছে। এর পরেও কি লোকটা তাঁর সঙ্গে সহজভাবে দু'একটা কথা বলবে না ? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আবার বললেন, ভাই, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো ?

এবার জবাব পাওয়া গেল। সেলসম্যান রোবটদের মতো ধাতব গলায় বলল, না নেই।

নেশা হয় না ?

না, হয় না। তবে আপনি ইচ্ছা করে যদি নেশা ধরান তাহলে তো করার কিছু নেই। যন্ত্রটির সঙ্গে ইন্সট্রাক্‌শান ম্যানুয়েল আছে। ম্যানুয়েল মেনে যদি ব্যবহার করেন তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। প্রতিদিন একঘণ্টার বেশি ব্যবহার করবেন না। সপ্তাহে অন্তত একদিন যন্ত্রটায় হাত দেবেন না।

তিনি এবার আনন্দের একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। লোকটি শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, যন্ত্রটা নিয়ে নানান কথাবার্তা হয় তো। তাই...

আমাদের স্বভাবই হচ্ছে নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলা। পি থার্টি টু হচ্ছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই বিষয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?

জি-না।

তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয় পাচ্ছি না তো।

পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আরও আধঘণ্টার মতো লাগবে।

জি আচ্ছা।

একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার পি থার্টি টু। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার যেমন টেলিভিশন। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?

জি একমত।

তিনি মোটেই একমত না। বিংশ শতাব্দীতে টেলিভিশন ছাড়াও আরও অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। এই শতাব্দীতেও দশটি বড় আবিষ্কার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে 'ডেথ হরমোন'। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান প্রমাণ করেছেন, একটা নির্দিষ্ট বয়সে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে 'ডেথ হরমোন' শরীরে চলে আসে। শরীর তখন মৃত্যুর জন্যে নিজেকে তৈরি করে। শুরু হয় বার্ধক্য প্রক্রিয়া। যে হারে জীবকোষ মরে যায় সেই হারে তৈরি হয় না। জরা শরীরকে গ্রাস করে। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান দেখালেন, সালফার এবং অক্সিজেনঘটিত একটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ যৌগ অণু এই কাজটি করে। তিনি যৌগটি শরীর থেকে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াও বের করলেন। এই অসম্ভব ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পৃথিবীর কিছু ভাগ্যবান মানুষ তাদের শরীর থেকে ডেথ হরমোন বের করে দিয়েছে। জরা আর তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

তিনি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। এই ঘরে একটি 'কফি ডিসপেনসিং' রোবট আছে। সে তাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে হাসিমুখে বলেছে, আশা করি এক পেয়ালা উষ্ণ কফি আপনার হৃদয়ের শৈত্য দূর করে দেবে।

তিনি রোবটের কথার কোনো জবাব দিলেন না। এদের তৈরিই করা হয় বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে মানুষকে চমৎকৃত করার জন্যে। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই মানুষ হিসাবে নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হয়। তিনি সামনের গোল টেবিলের ওপর রাখা চকচকে কিছু ম্যাগাজিন থেকে একটি তুলে নিলেন। পাতা উল্টিয়ে তার মুখ বিকৃত হলো। ভুল ম্যাগাজিন বেছে নিয়েছেন—'জেনো কোড নিউজ'। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে রগরগে সব খবরে ভর্তি। এইসব খবরের কোনোটির প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। প্রাণীর জিনের সঙ্গে উদ্ভিদের জিন লাগিয়ে কতসব অদ্ভুত জিনিস তৈরি হচ্ছে তার রগরগে বর্ণনা—পড়তে তাঁর ভালো লাগে না। টমেটো

জিনের সঙ্গে গোলাপ গাছের জিন লাগানো হচ্ছে—সাফল্য দোরগোড়ায়। এর শেষ কোথায় কে জানে ? মানুষ এবং উদ্ভিদের এক শংকর প্রজাতি তৈরি হবে ? আগামী পৃথিবীতে কারা বাস করবে ? মানব-উদ্ভিদ ?

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির মিলনে তৈরি হলো নতুন প্রজাতি। তারা মানুষ না, আবার শিম্পাঞ্জিও না। গাধা ও ঘোড়ার সংকর যেমন খচ্চর, এ-ও তেমনি। তবে সেই পরীক্ষা হয়েছিল গোপনে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন—নতুন প্রজাতি গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিন এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীর সাজা দেওয়া হয়েছিল। আজ আর সেই দিন নেই। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা আজকের পৃথিবীর সবচে' সম্মানিত মানুষ। তাঁদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবরকম সুযোগ এবং অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীকে তাঁরা ক্ষুধামুক্ত করেছেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের কারণে আজকের পৃথিবীতে কোনো খাদ্যাভাব নেই। সমুদ্রের শৈবালকে তাঁরা স্বাদু স্টার্চে রূপান্তরিত করেছেন। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের জিনের সংযোগে তৈরি করেছেন সুস্বাদু প্রোটিনসর্বস্ব উদ্ভিদ। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা আজকের পৃথিবীর দেবতা।

আপনার চেক ওকে হয়েছে। আপনি যন্ত্রটি নিতে পারেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

আশা করি এই যন্ত্রের কল্যাণে আপনার সময় আনন্দময় হবে।

শুভ কামনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি কালো বাক্সটি বুকের কাছে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রাত বেশি হয়নি, তবু পথঘাট নির্জন। টাউন সার্ভিসের হলুদ বাসগুলি প্রায় ফাঁকা যাচ্ছে—তার যে-কোনো একটিতে উঠে গেলেই হয়। উঠতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভালো লাগছে। আবহাওয়া চমৎকার, তবে একটু শীতভাব আছে।

বেশ কিছু সময় হাঁটার পর তিনি একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়লেন। বাসের ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনার নৈশভ্রমণ আনন্দময় হোক! তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রোবট ড্রাইভার। পৃথিবী রোবটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এইসব রোবট চমৎকার কথা বলে। এদের প্রোগ্রামিং অসাধারণ।

রোবট ড্রাইভার বলল, আপনি কতদূর যাবেন ?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, কাছেই।

আপনি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

না।

কেন বলুন তো ?

তিনি চুপ করে রইলেন। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এইসব রোবটদের সঙ্গে কথা বলা মানেই হচ্ছে নিজেকে ছোট করা। রোবট গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে বলল, আমি রোবট বলেই কি আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন না ?

জানি না।

আমি লক্ষ করেছি বেশির ভাগ মানুষ রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। সারাক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাকে। যেন তার সমস্যার অন্ত নেই। আমি কি ঠিক বলছি ?

হ্যাঁ।

আপনারা কী নিয়ে এত চিন্তা করেন ?

তিনি জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ি রেসিডেনশিয়েল এলাকায় ঢুকেছে। রাস্তার দু'পাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। কত লক্ষ মানুষই না এইসব বাড়িতে বাস করে! তবু কেন জানি বাড়িগুলিকে প্রাণহীন মনে হয়।

রোবট ড্রাইভার গাড়ির বেগ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। রেসিডেনশিয়েল এলাকায় গাড়ির গতি অনেক কম রাখতে হয়। ফাঁকা রাস্তা, ইচ্ছা করলেই ঝড়ের গতিতে চালানো যায়। রোবট ড্রাইভার কখনো তা করবে না। লাল বাতিতে গাড়ি থামাল। রোবট বলল, এই শতকে আপনারা, মানুষেরা, এত অসুখী হয়ে গেলেন কীভাবে ?

জানি না।

আপনাদের তো অসুখী হওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষ ক্ষুধা জয় করেছে, রোগব্যাধি জয় করেছে। অমরত্ব তার হাতের মুঠোয়। তবু এত দুঃখ কেন ?

তিনি বললেন, সামনের ব্লকে আমি নামব।

অবশ্যই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনারা মানুষরা এই শতকে সবই পেয়েছেন। হাইড্রোজেন ফুয়েল আসায় শক্তির সমস্যা মিটেছে, বাসস্থানের সমস্যা মিটেছে। আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। আছে না ?

হুঁ।

আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন না। আপনার স্ত্রী আছে।

হুঁ।

তার পরেও পি থার্টি টু কিনে এনেছেন। অনেক টাকা গেল, তাই না ?

হুঁ।

আপনি কি হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না ?

আমি এইখানে নামব।

স্টপেজের মাঝখানে গাড়ি থামানোর নিয়ম নেই। রোবট ড্রাইভার নিয়ম ভঙ্গ করে গাড়ি থামাল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে উঁচুগলায় বলল, আপনার পি থার্টি টু আনন্দময় হোক!

তিনি রোবটদের মতো গলায় বললেন, ধন্যবাদ।

তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। আজ তাঁর নাইট ডিউটি। কাজেই তিনি অ্যাপার্টমেন্টে নেই। টেলিফোনের কাছে ছোট চিরকুট লিখে রেখে গেছেন, 'খাবার তৈরি করা আছে, খেয়ে নিয়ো।'

তিনি খেয়ে নিলেন। অত্যন্ত স্বাদু খাবার। খাবারের সঙ্গে চমৎকার পানীয়। এই পানীয়টি এই শতকের মাঝামাঝি তৈরি করা হয়েছে। ঝাঁঝালো টক ধরনের স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ করে দেয়—বড় ভালো লাগে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন, আনন্দের কত উপকরণ চারদিকে ছাড়ানো। ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্যে একটি হলোরামা, যা চালু করামাত্র অনুষ্ঠানের পাত্রপাত্রীরা মনে হয় সশরীরে ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যাবে।

মস্তিষ্কের আনন্দকেন্দ্র উত্তেজিত করবার জন্যে আছে নানান ব্যবস্থা। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণের আনন্দ থেকে শুরু করে নারীসঙ্গের আনন্দের মতো তীব্র আনন্দ মস্তিস্ক উত্তেজিত করেই পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মানুষ কেন আনন্দ পায়, কোত্থেকে আনন্দ পায় তা জেনেছেন। তাঁরা জানেন বাগানের একটি ফুল দেখার আনন্দের সঙ্গে পিঠ চুলকানোর আনন্দের বেশ কিছু মিল আছে, আবার অমিলও আছে। ফুল না দেখেও এবং পিঠ না চুলকিয়েও অবিকল সেই আনন্দ মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তেজিত করে পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে সেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ তা থেকে আর আনন্দ পাচ্ছে না। মানুষ ঝুঁকেছে পি থার্টি টু-এর দিকে। কে জানে একসময় হয়তো এই যন্ত্রটিও তার ভালো লাগবে না!

তিনি তাঁর স্ত্রীকে পি থার্টি টু কেনার খবর দেওয়ার জন্যে ফোন করলেন। রোবটদের ভাবলেশহীন গলায় বললেন, আমি আজ একটি পি থার্টি টু কিনেছি।

সে-কী! সত্যি ?

হ্যাঁ।

বিরাট ভুল করেছ।

কেন ?

আমাদের মতো দম্পতিদের সরকার থেকে একটি করে এই যন্ত্র দেওয়া হবে বলে কথা হচ্ছে। তুমি কি জানতে না ?

জানতাম।

তাহলে ?

কবে না কবে দেয়—আগেভাগেই কিনে ফেললাম। তুমি কি রাগ করেছ ?

না। যন্ত্রটা কি ব্যবহার করেছ ?

এখনো করিনি। এখন করব।

আচ্ছা। তোমার যন্ত্র তোমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক। আমাদের মতো দম্পতিদের যন্ত্রের আনন্দের প্রয়োজন আছে।

তোমাকে ধন্যবাদ।

তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। কাগজের মোড়ক খুলে কালো বাক্সটি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে মনে মনে বললেন, 'আমাদের মতো দম্পতি'—এই বাক্যটি আমার ভালো লাগে না।

ভালো না লাগলেও তাঁর স্ত্রী এই বাক্যটি তাঁকে দিনের মধ্যে কয়েকবার বলেন। হয়তো এই নিয়ে তাঁর মনে গোপন ক্ষোভ আছে। ক্ষোভ থাকার কোনোই কারণ নেই। তাঁদের মতো দম্পতি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে যাঁরা সন্তান জন্মাবার অধিকার পাননি। মানব জাতির স্বার্থেই তা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শর্তই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পতি।

মানুষ মৃত্যুকে যদি সত্যি সত্যি জয় করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা আরও কমাতে হবে। তাঁদের মতো দম্পতির সংখ্যা আরও বাড়বে।

তিনি যন্ত্র হাতে নিয়ে সোফায় এসে বসলেন। ইন্সট্রাকশান ম্যানুয়েল মন দিয়ে পড়লেন। যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুব সহজ। যন্ত্র থেকে বের হওয়া ঋণাত্মক ইলেকট্রোড ঘাড়ের ঠিক মাঝামাঝি লাগাতে হয়। ধনাত্মক ইলেকট্রোড থাকবে বাঁ কপালে। স্ট্যান্ড বাই বোতাম টিপে কারেন্ট ফ্লো অ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এক মাইক্রো অ্যাম্পায়ারেরও কম বিদ্যুৎপ্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারেন্ট অ্যাডজাস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নীল আলো জ্বলে উঠবে। তখন চোখ বন্ধ করে স্টার্ট বাটন টিপতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছুই হবে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে।

পি থার্টি টু যন্ত্রটি বেশকিছু শ্বাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই স্মৃতি বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় সঞ্চারিত করা হয়।

তিনি যন্ত্রটি চালু করে বসে আছেন। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে। অল্প পিপাসাও বোধ হচ্ছে। হঠাৎ সেই পিপাসা হাজার গুণে বেড়ে গেল। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। এই তৃষ্ণার কারণেই বোধহয় তার ঘ্রাণশক্তি লক্ষ গুণ বেড়ে গেল। তিনি এখন সবকিছুর ঘ্রাণ পাচ্ছেন। মাটির ঘ্রাণ, ফুলের ঘ্রাণ, গাছের শেকড়ের ঘ্রাণ। তাঁর জগৎটি ঘ্রাণময় হয়ে গেছে। এবং তিনি বুঝতে পারছেন তিনি শহরের

সাতানব্বুই তলার সাজানো-গোছানো কোনো অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন না। তিনি বাস করেন বনে। গহীন বনে। তিনি কে ? তিনি কী...

বোঝা যাচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি একটি চিতাবাঘ। বাঘ নয়, বাঘিনী। তাঁর তিনটি শিশু শাবক আছে। গত দু'দিন এদের তিনি আগলে রেখেছেন। আজ প্রবল তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে এদের ছেড়ে পানির সন্ধানে বের হয়েছেন। পানি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। পানিরও গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মাটির গন্ধের মতোই তীব্র। পানি আছে, কাছেই আছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পানির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারেন, কিন্তু যেতে পারছেন না। কাছেই কোথায় যেন পুরুষ বাঘটা ঘুরঘুর করছে। এর মতলব ভালো না। বাচ্চাটাকে এ হয়তো মেরে ফেলবে। এদের একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না। অথচ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

আকাশে বিরাট চাঁদ। তার আলোয় বনভূমি ঝলমল করছে। কনকন করে বইছে শীতের বাতাস। বাতাসে কী অদ্ভুত শব্দেই না গাছের পাতা নড়ছে! যে সব পাতা নড়ছে তার থেকে একধরনের গন্ধ আসছে। আবার স্থির পাতা থেকে অন্যধরনের গন্ধ। কী বিচিত্র, কী বিচিত্র চারপাশের জগৎ! কোন স্তরেই না পৌঁছে গেছে অনুভূতির তীব্রতা।

তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ কী আনন্দই না তিনি রক্তের ভেতর অনুভব করছেন! তিনি জলের সন্ধানে এগুচ্ছেন, অথচ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর শাবকদের দিকে।

তারও অনেক পরের কথা।

ডেথ হরমোন রক্তের ভেতরই ভেঙে ফেলার অতি সহজ পদ্ধতি বের হয়েছে। মানুষ জরা রোধ করেছে। মানুষকে এখন অমর বলা যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত কারণে তার আর মৃত্যু হবে না। জীবাণু এবং ভাইরাসঘটিত কোনো অসুখও পৃথিবীতে নেই। মানুষকে এখন কি তাহলে অমর বলা যাবে ? হয়তোবা।

অমর মানুষরা এখন দিনরাত ঘরেই বসে থাকে। তাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। কাজের জন্যে আছে রোবটশ্রেণী। চিন্তাভাবনারও কিছু নেই। অমরত্বের বেশি আর কিছু তো মানুষের চাইবারও নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশবিশেষ যাপন করতে তাদের বড় ভালো লাগে। এই তাদের একমাত্র আনন্দ।

শীত

মাঝরাতে মতি মিয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

বুকে একটা চাপা ব্যথা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসের কষ্টটা শুরু হলো বোধহয়। সে কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কী অসম্ভব ঠান্ডা! বুড়োমারা শীত পড়েছে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে বরফশীতল হাওয়া আসছে। হাতে-পায়ে কোনো সাড়া নেই। ঠান্ডায় জমে গেছে নাকি ?

মতি মিয়া বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কিছুতেই ফুসফুস ভরানো যায় না। কেউ একটু হাওয়া করলে আরাম হতো। ডাকবে নাকি ফরিদের মাকে ? মতি মিয়া উঠে বসবার চেষ্টা করল। আশ্চর্যের ব্যাপার—ব্যথাটা কমে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। ঠিক তখনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মতি মিয়ার মনে হলো কেউ যেন তার কাঁথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অশরীরী কেউ। সে হাত রাখল মতি মিয়ার পেটে। অসম্ভব শীতল হাত। সেই হাতে বড় বড় আঙুল। একবার হাত রেখেই সে হাত সরিয়ে নিল। মতি মিয়া ভয় পেয়ে ডাকল, বৌমা! ও ফরিদের মা!

ফুলজান ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমায়। শ্বশুরের বেশির ভাগ কথারই সে কোনো জবাবা দেয় না। আজ দিল। বিরক্ত স্বরে বলল, কী হইছে ?

কুপিটা ধরাও গো মা। বড় ভয় লাগতাছে।

ঘুমান দেহি।

কে জানি আমার পেটের মইধ্যে হাত দিল।

স্বপ্ন দেখছেন। কার ঠেকা পরছে আপনের পেটে হাত দিব।

ফরিদরে এট্টু দিয়া যাও আমার সাথে। দিয়া যাও গো মা। ও ময়না।

খামাখা চিল্লাইয়েন না, ঘুমান।

ও ফরিদের মা! ও বেটি!

ফুলজান সাড়া দিল না। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। জমাট অন্ধকার চারদিকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবিন্দু আলোও আসছে না। বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ। তার ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। বুড়োকালে মানুষের ভয় বেড়ে যায়। অকারণেই গা ছমছম করে। বুড়োকাল বড় অদ্ভুত কাল।

রান্নাঘরে খচমচ শব্দ হচ্ছে। ফুলজান কি জেগে আছে ? নাকি ইঁদুর ? ইঁদুরের বড় উৎপাত হয়েছে। ফুলজান বিড়বিড় করে কথা বলছে। কে জানে হয়তো বা শেষটায় কুপি জ্বালাবে। দেখতে আসবে তাকে। যতটা খারাপ মনে হয় মেয়েটা তত খারাপ না। মায়া-মহব্বত আছে। মতি মিয়া কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কী ভয়ানক ঠান্ডা পড়েছে। এই শীতটা বোধহয় কাটানো যাবে না। ভালোমন্দ কিছু এবারই হবে।

বৌমা, ঘুমাইলা নাহি ? ও ফরিদের মা!

কিতা ?

দুই কেঁথায় শীত মানে না।

না মানলে আমি কী করমু, কন ?

বুড়াকালে শীতটা বেশি লাগে। ফরিদরে দিয়া যাও আমার কাছে। ও ফরিদের মা!

ফুলজান জবাব দেয় না।

ও ফরিদের মা! ও ময়না!

লাভ হয় না কোনো। মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুতে চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। বুড়োকালের এই এক যন্ত্রণা, একবার ঘুম ছুটে গেলে আর ঘুম আসে না। শীতের রাত জেগে পার করা বড় কষ্ট। ফুলজানের দুটো বাচ্চা থাকলে ভালো হতো। একটাকে রাখতেন নিজের কাছে। পুলাপানের গায়ে জবর ওম। লেপের চেয়ে বেশি ওম। মেছের আলি বেঁচে থাকলেও হতো। একটা জোয়ান ছেলে আশেপাশে থাকলেই ঘরবাড়ি গরম থাকে। মতি মিয়ার বুক হু-হু করতে লাগল। বুড়োকালে আশেপাশে একটা জোয়ান ছেলে দরকার। মেছের আলির কথা তার বেশিক্ষণ মনে রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্ষিধে লেগে গেল। অথচ ক্ষিধে লাগার কোনোই কারণ নেই। শীতের শুরুতেই ভাতের কষ্ট দূর হয়েছে। ফুলজান রোজ দারোগা বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসছে। একজনের ভাত, কিন্তু তিনজনেরই ভরপেট হচ্ছে।

আজ খাওয়া হয়েছে টেংরা মাছের তরকারি ও ডাল দিয়ে। এইসব ছোটখাটো জিনিস তার মনে থাকে না। কিন্তু আজকেরটা মনে আছে। কারণ টেংরা মাছের কাঁটা বিঁধে গিয়েছিল। বড় কষ্ট হয়েছে। শরীরের কষ্টটা এখন বেড়ে গেছে, অল্পতেই কষ্ট হয়।

রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। ব্যাপারটা কী ? ঘুম ভাঙল নাকি ফরিদের ? মাঝে মাঝে ফরিদ চুপি চুপি চলে আসে তার কাছে। বুকের কাছে গুটিসুটি মেরে ঘুমায়। বড় আরাম লাগে। মতি মিয়া উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে। এবং একসময় অবাক হয়ে লক্ষ করে রান্নাঘরে কুপি জ্বালানো হয়েছে। বিজবিজ শব্দ শোনা যায়। ফরিদের মা নিজের মনেই কথা বলছে নাকি ?

বৌমা, কী হইছে ?

কিছু অয় নাই।

বাত্তি জ্বালাইলা, বিষয়ডা কী ?

ফরিদ বিছানা ভিজাইছে।

কও কী, শীতের মইধ্যে কামডা কী করল ?

একটা চড়ের শব্দ শোনা যায়। ফরিদ অবশ্যি কাঁদে না। মতি মিয়া উল্লসিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে, এরে দিয়া যাও আমার কাছে। মাইরধুইর করার কাম নাই। পুলাপান মানুষ।

ফুলজানের তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এখানে আনবে না নিশ্চয়ই।

ও বৌমা! ও ফরিদের মা!

কী ?

ভিজা কেঁথার মইধ্যে রাখন ঠিক না। বুকে কফ জমলে মুশকিলে পড়বা। দিয়া যাও আমার কাছে।

ফুলজানের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। ফরিদ খুনখুন করে কাঁদতে শুরু করেছে। মতি মিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর তখনি ফুলজান ফরিদকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক হাতে ধরে থাকা কুপির সবটা আলো পড়েছে তার মুখে। মুখ থমথম করছে তার। বোধহয় কেঁদেছে খানিকক্ষণ আগে। ফুলজান মাঝে মাঝে রাত জেগে কাঁদে। মতি মিয়া সরে নাতির জন্যে জায়গা করে দিল। ফরিদ চোখ বন্ধ করে আছে। ঘুমের ভান। এমন বজ্জাত হয়েছে। ফুলজান দাঁড়িয়ে আছে কুপি হাতে। কিছু বলবে বোধহয়।

কিছু বলবা নাকি মা ?

না।

শীতটা পড়ছে মারাত্মক। রশীদ সাবের কাছে কাইল একবার যাইবা নাকি ? কম্বল যদি দেয় একটা।

ফুলজান কিছু বলল না। কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল। ফরিদের মা যাবে না। যে-কোনো কারণেই হোক রশীদ সাহেবের কাছে সে যেতে চায় না। রিলিফের গম এল একবার। সবাই গেল, ফুলজান গেল না। পা টেনে টেনে যেতে হলো মতি মিয়াকেই।

ও ফরিদের মা!

কী কইবেন কন ?

যাইবা নাকি কাইল একবার রশীদ সাবের কাছে ?

কম্বলের আমার দরকার নাই। শীত লাগে না আমার।

তোমার না লাগলে কী, আমার তো লাগে।

আপনের লাগলে আপনে যান।

মতি মিয়া উঠে বসার চেষ্টা করে। ফরিদ শুয়ে আছে তার গা ঘেঁসে। সে অন্যরকম একটা উত্তেজনা অনুভব করে। তার চেঁচিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে করে—

বুঝলা ফরিদের মা, আমার হক আছে। আমার ছেলে মরে নাই যুদ্ধে ? কও তুমি, যুদ্ধে মরে নাই ?

হে তো কতই মরছে।

সবের হক আছে। বুঝলা ? কম্বল আমার হকের জিনিস।

ফুলজান হাই তুলে কুপি হাতে রান্নাঘরে ঢুকল। বাতি নিভে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রাত কতটা বাকি কে জানে ? মতি মিয়ার প্রস্রাবের চাপ হয়েছে। শীতের মধ্যে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রস্রাবের চাপ এমন এক জিনিস যা ক্ষিধের মতো হু-হু করে বাড়তে থাকে।

ফরিদ, ঘুমাইছস ?

হুঁ।

ঘুমাইলে কতা কস ক্যামনেরে ছাগল ?

ফরিদ খুকখুক করে হাসে। মতি মিয়াও হাসে। বড় ভালো লাগে তার। বড় মায়া লাগে।

কাইল কম্বল আনতে যামু, বুঝলি ফরিদ ?

আইচ্ছা।

তুইও যাইবি আমার সাথে। হকের কম্বল। ঠিক না ?

হুঁ।

ফরিদ, ঘুমাইছস ?

ঘুমাইছি।

পেসাব করন দরকার।

মতি মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে উঠা সম্ভব না। কিন্তু ইতোমধ্যে তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। মাবুদে এলাহি, বুড়ো হওয়ার বড় কষ্ট।

ফরিদ ঘুমাইছস ?

ফরিদ জবাব দেয় না। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। মতি মিয়া ঘুমন্ত ফরিদের সঙ্গেই কথাবার্তা চালাতে থাকে। কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলে মনটা অন্যদিকে থাকে। তলপেটের চাপের কথাটা মনে থাকে না।

বুঝলি ফরিদ, কাইল যামু রশীদ সাবের কাছে। তোর বাপের নাম কইলে না দিয়া উপায় নাই। বুঝছস ? তুইও যাবি আমার সাথে। চুপ কইরা বইসা থাকবি। ফাইজলামি বাদরামি করলে চড় খাইবি। বুঝছস ?

মতি মিয়া অনবরত কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বড় ভালো লাগে তার।

সকালটা শুরু হয়েছে খুব চমৎকারভাবে। চনমনে রোদ উঠেছে। কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে মাঘ মাসের সকাল। মতি মিয়া আয়েশ করে রোদে বসে আছে। বড় আরাম লাগছে।

ফুলজান ফরিদকে টিনের থালায় মুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে ঘরে পান্তা নেই। যেদিন পান্তা থাকে না সেদিন দুপুরে ফরিদের মা গরম ভাতের ব্যবস্থা করে। আজও করবে। দুই-এক গাল মুড়ি খেলে হতো। ফরিদ থালা নিয়ে ঘুরছে দূরে দূরে। মুড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাছে ভিড়বে না। মতি মিয়া ডাকল, ওই ফরিদ, ওই। এদিক আয় দাদা। ফরিদ না-শোনার ভান করল। মহা বজ্জাত হয়েছে ছোকরা।

ফুলজান দারোগাবাড়ি যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দুপুরবেলা মনে করে এলে হয়। আসবে ঠিকই। মায়া-মহব্বত আছে মেয়েটার। ভালো মেয়ে।

দারোগা বাড়ি যাও নাকি গো মা ?

হুঁ।

আইচ্ছা ঠিক আছে। যাও। রইদটা একটু তেজি হউক, আমিও যাইতাছি রশীদ সাবের কাছে।

ফুলজান কোনো জবাব দিল না। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলেই ফেলল, চিড়া-মুড়ি কিছু আছে ? শইলডা যেন কেমন কেমন লাগে।

চিড়া-মুড়ি কিছু নাই।

ঠিক আছে। অসুবিধা নাই। তুমি যাও।

রোদটা এত আরামের যে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না। তবু মতি মিয়া উঠল। রশীদ সাহেবের কাছে যাওয়া দরকার। মতি মিয়ার মন বলছে আজ গেলে কিছু-একটা হবে। না হয়েই পারে না।

আয়রে ফরিদ।

ফরিদ তার থালার মুড়ির শেষ দানাটি মুখে ফেলে দাদার হাত ধরল। চিকন গলায় বলল, কোলে নাও। কাউকে কোলে নেওয়ার বয়স কি আছে মতি মিয়ার ? তবু সে ফরিদকে কোলে নিল। কিছুদূর নিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। পুলাপান মানুষ, একটা শখ হয়েছে।

রশীদ সাহেব সোহাগীর সিও রেভিন্যু।

লোকটি ছোটখাটো। তাঁকে দেখেই মনে হয় সবার ওপর বিরক্ত হয়ে আছেন। ভুরু না কুঁচকে তিনি কারও দিকে তাকাতে পারেন না। কম্বলের প্রসঙ্গে তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না। তিনি অফিসের উঠোনে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি সরালেন না। মতি মিয়া দ্বিতীয়বার বলল, শীতে বড় কষ্ট পাইতাছি।

রশীদ সাহেব সে-কথারও কোনো জবাব দিলেন না। শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন। মতি মিয়া ভেবে পেল না কথাগুলি কীভাবে বললে শীতের কষ্টটা পরিষ্কার বোঝানো যাবে। রশীদ সাহেব কম্বলের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অন্যপ্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, নিরাসক্ত গলায় বললেন, এই ছেলে কে ?

জি, আমার নাতি। মেছের আলির ছেলে।

কার ছেলে ?

মেছের আলির। মেছের আলিরে চিনলেন না ? যুদ্ধ করল যে মেছের আলি।

রশীদ সাহেব বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তিনি চিনেছেন। মতি মিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। এই লোকটা বিরক্ত হচ্ছে কেন ? তার ছেলের কথায় বিরক্ত হওয়ার কী আছে ?

গত বছর রিলিফের গম এল। মতি মিয়া গম আনতে গিয়ে বলল, চিনছেন তো আমারে ? আমি মেছের আলির বাপ। যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেল যে মেছের আলি। চ্যাংড়া মতো একটি অপরিচিত ছেলে গম দিচ্ছিল। সে চোখমুখ শক্ত করে বলল, মেছের আলির জন্যেও গম দেওয়া লাগবে ? সেও রুটি খাবে ? লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হেসে উঠল। যেন এরকম মজার কথা তারা বহুদিন শোনেনি।

রশীদ সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন। কিংবা কে জানে হয়তো রেগেও যাচ্ছেন। অফিসার মানুষ। রেগে গেলে প্রথমদিকে বোঝা যায় না। তাঁরা রাগ চেপে রাখেন। চেঁচামেচি হৈচৈ শুরু করে ছোটলোকেরা। মতি মিয়ার মতো মানুষরা।

মতি মিয়া গলা পরিষ্কার করে বলল, জবর যুদ্ধ করেছিল মেছের আলি। নীলগঞ্জে একটা সড়কের তারা নাম দিছে 'শহীদ মেছের আলি সড়ক'। নীলগঞ্জ হইল গিয়া আপনার এইখান থাইক্যা

চিনি, নীলগঞ্জ কোথায় চিনি।

রশীদ সাহেব ভুরু কুঁচকালেন। মতি মিয়া চুপ করে গেল। বেলা অনেক হয়েছে। পেটের ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। মুখ ভর্তি করে থুথু জমা হচ্ছে। রশীদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, দাঁড়ান আপনি, একটা কম্বলের ব্যবস্থা করছি। চা খাবেন ?

মতি মিয়ার চোখে পানি এসে গেল। বলে কী এই লোক ? মতি মিয়া চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, গত বৎসর বড় কষ্ট করেছি জনাব। দানাপানি নাই। শেষে ফরিদের মা কইল, বুধবারের বাজারে একটা থালা লইয়া বসেন। বসলাম গিয়া। নিজ গেরামের বাজারে ভিক্ষা করা শরমের কথা। বড় শরমের মধ্যে পড়েছিলাম জনাব।

মতি মিয়া ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। ফরিদ তাকিয়ে আছে। সে বড়ই অবাক হয়েছে।

রশীদ সাহেব শুধু যে কম্বল দিয়েছেন তাই না, পঞ্চাশটি টাকাও দিয়েছেন। সেই টাকার খানিকটা ভাঙিয়ে মতি মিয়া চা ও চিনি কিনে ফেলল। ফরিদকে বলল, বুড়াকালে চা-টা খুব দরকার। বুকে কফ জমে না। ভালো ঘুম হয়। বুঝলিরে বেকুব। বুড়াকালে চা হইল গিয়া ওষুধ।

তারা দু'জন সারা দুপুর বাজারে ঘুরল। মতি মিয়া পরিচিত সবাইকেই নতুন কম্বল দেখাল। তার গালভর্তি হাসি। মেছের আলির কারণে পাইলাম, বুঝলা না? মেছেরের নাম কইতেই মন্ত্রের মতো কাম হইল। বিলাতি জিনিস, হাত দিয়া দেখো। জবর ওম। চাইর পাঁচশ' টেকা দাম হইব, কী কও?

মতি মিয়ার মনে ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল ফরিদের মা কম্বলটা হয়তো নিজের জন্যে দাবি করবে। মেছের আলির কম্বলে ওদের দাবিই তো বেশি। কিন্তু তা সে করল না। চকচকে নতুন কম্বলের প্রতি তার কোনোরকম আগ্রহ দেখা গেল না। সে যথারীতি ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমুতে গেল।

দীর্ঘদিন পর আরাম করে ঘুমুতে গেল মতি মিয়া। এত আরাম যে চট করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে না। জেগে গল্প করতে ইচ্ছা করে।

ফরিদের মা, ঘুমাইলা নাকি?

না।

জবর ওম কম্বলটার মইধ্যে। বিলাতি জিনিস তো। বিলাতি জিনিসের ওম অন্যরকম। ভালো ঘুম হইব।

ঘুমান ভালো কইরা।

ফরিদের মা!

কন কী।

মেছেরের কথা কইতেই রশীদ সাব খুব ইজ্জত করল। চা খাওয়াইল। শরিফ আদমি। খুব শরিফ আদমি।

ফুলজান জবাব দিল না। মতি মিয়া বলল, ফরিদরে দিয়া যাও, আমার সাথে বাপের কম্বলের নিচে ঘুমাউক। ফুলজান সে-কথারও জবাব দিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

গভীর তৃপ্তিতে ঘুমুবার আয়োজন করল মতি মিয়া। ছেলের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যাচ্ছে। বড় শান্তি লাগছে। ঘুমের মধ্যেই সে শুনল, ফুলজান কাঁদছে। সে প্রায়ই কাঁদে। তার কান্না শুনতে মতি মিয়ার কোনোকালেই ভালো লাগে না। কিন্তু আজ ভালো লাগছে। কেমন যেন গানের সুরের মতো সুর।

আরাম করে ঘুমায় মতি মিয়া। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়ছে। উত্তর দিক থেকে বইছে ঠান্ডা হিমেল হাওয়া।

সুখ অসুখ

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে।

সুরমা আসছে। দশটা বেজে গেল নাকি ? রহমান সাহেব দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। তাকাতে কষ্ট হয়। ঘাড় অনেকখানি বাঁকা করতে হয়। না দশটা বাজেনি, এখনো দশ মিনিট বাকি আছে। সুরমা আজ সকাল সকাল চলে আসছে কেন ? তার সব কাজ তো ঘড়ি ধরা। রহমান সাহেব বিস্ময় বোধ করলেন।

বাবা, কিছু লাগবে ?

রহমান সাহেব উত্তর দেওয়ার আগে সুরমার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিছু কিছু মুখ আছে যেখানে মনের কোনো ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেব সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনোদিনই কিছু বুঝতে পারেননি। আজও পারলেন না। সুরমা দ্বিতীয়বার বলল, কিছু লাগবে আপনার ?

না বৌমা। কিছু লাগবে না।

দুধ খেয়েছেন ?

হুঁ।

তোতা মিয়া আপনাকে বাথরুম করিয়ে গেছে ?

এই প্রশ্নটি সুরমা প্রতি রাতেই এসে জিজ্ঞেস করে এবং প্রতি রাতেই তিনি দারুণ লজ্জিত বোধ করেন। আজও হ্যাঁ বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে গেল।

আবার যদি বাথরুমের দরকার হয় তাহলে তোতা মিয়াকে ডাকবেন। কলিং বেলটা টেপেন।

না দরকার নাই।

বাতি নিভিয়ে দেই ?

দাও।

সুরমা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অবশ্যি অন্ধকার হলো না। সুরমা জিরো পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালাল। এই কাজ দু'টি শুয়ে শুয়ে রহমান সাহেব নিজেও করতে পারেন। তাঁর হাতের কাছে বেড সুইচ আছে। প্যারালাইসিস হওয়ার পর থেকে শেষ বাতি নেভানোর জন্যে সুরমা আসছে। তিনি এই বাড়তি যত্নটুকু পাচ্ছেন। বড় ভালো মেয়ে।

বাতি নেভাবার পরও সুরমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে কি কিছু বলতে চায় ? রহমান সাহেব উঠে বসার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তিনি যে এখন আর ইচ্ছামতো উঠে বসতে পারেন না, তা মনে থাকে না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, বৌমা, লিলি কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

হ্যাঁ। ও ন'টার সময় ঘুমুতে যায়।

তুমি কি কিছু বলবে ?

না, কিছু বলব না। আপনি ঘুমান। মাথার পাশের জানালাটা বন্ধ করে দেই ? শেষরাতের দিকে ঠান্ডা পড়ে।

দাও।

আপনার পায়ের কাছে চাদর আছে। ঠান্ডা লাগলেই চাদর টেনে দেবেন।

ঠিক আছে।

আর কোনোরকম দরকার হলেই তোতা মিয়াকে বলবেন আমাকে ডেকে তুলতে।

ঠিক আছে মা, বলব।

সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে নিচে নেমে গেল। রহমান সাহেব মনে করতে চেষ্টা করলেন—সুরমার চোখে-মুখে ঠিক কী পরিমাণ ঘৃণা ছিল। ভালো মেয়েদের মধ্যেও ঘৃণা থাকতে পারে এবং থাকে।

বালিশের নিচ থেকে তিনি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। হাত দু'টি সচল আছে। সিগারেট ধরাতে কোনো অসুবিধা হয় না। ভাগ্যিস কোমরের নিচ থেকে প্যারালাইসিস হয়েছে।

সিগারেটে টান দিয়ে নিজের মনে তিনি খানিকক্ষণ হাসলেন। মনে মনে বললেন, আমার খুব ভালো এবং খুব লক্ষ্মী বৌমাকে আমি প্যাঁচে ফেলেছি। আমাকে এই অবস্থায় ফেলে তার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। এইখানেই তাকে থাকতে হবে।

আফজাল নিশ্চয়ই নর্থ ডাকোটা থেকে প্রতি সপ্তাহেই লিখছে—সুরমা, বাবাকে এই অবস্থায় দেশে ফেলে তোমাদের আমেরিকায় আসার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। বাবার শরীর সুস্থ হোক। বাবার শরীর না সারা পর্যন্ত এই নিয়ে আর কিছুই করা যাবে না...।

রহমান সাহেব অন্ধকারেই হাসলেন, এটা সুস্থ হওয়ার অসুখ না। তিনি খাটের কাছে লাগানো সুইচ টিপলেন। দু'বার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই তোতা মিয়া বিরক্ত মুখে ঢুকল।

বেড প্যান দাও। পেসাব করব।

তোতা মিয়া বাতি জ্বালাল। তার মুখ অন্ধকার। হারামজাদা নবাব, বেড প্যান দিতে তার কষ্ট হচ্ছে। মুখ একেবারে আঁধার হয়ে গেল।

তোতা মিয়া শুকনো গলায় বলল, সিগারেট খাইতে আম্মা নিষেধ করছে না ?

চুপ থাক তুই।

আম্মা আমরারে গাইল মন্দ করে।

করলে করুক। তুই টেবিল ল্যাম্পটা মাথার কাছে দিয়ে যা।

এত রাইতে টেবিল ল্যাম্প দিয়া কী করবেন ?

যা-ই করি, তোকে দিতে বলছি, দে।

তোতা মিয়া টেবিল ল্যাম্প এগিয়ে আনল। রাত এগারোটার দিকে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। রাত জাগার রুটিন তাঁর নতুন নয়। সুরমা বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পরপরই তিনি বাতি জ্বালেন। প্রায় রাতে দেড়টা দু'টা পর্যন্ত জাগেন। এই বয়সে ঘুম কমে যায়। শুধু জেগে থাকতে ইচ্ছা করে।

রহমান সাহেবের হাতের লেখা পরিষ্কার। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখলেন—

প্রিয় আফজাল,

আমার শরীর ক্রমশই খারাপ হইতেছে। এখন আর কিছুই ভালো লাগে না। রাতদিন পাক পরওয়ারদেগারের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাকে তোমার মা'র কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আমার কারণে বৌমার যাওয়া স্থগিত আছে মনে হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করি। লিলির দিকে তাকাইলে চোখে পানি আসে। বাবা, তোমার প্রতি আমার আদেশ—তুমি আমার কথা চিন্তা না করিয়া বৌমাকে নিজের কাছে নেওয়ার ব্যবস্থা করো। এইখানে একা একা থাকিতে আমার কোনো অসুবিধা হইবে না। ইনশাআল্লাহ। তোতা মিয়া আছে। মনোয়ারের মা আছে। পাশের বাড়ির ডাক্তার সাহেব আছেন। তুমি বাবা, আমার জন্যে চিন্তা করিবে না। আমার কোনোই অসুবিধা নাই...।

চিঠিটা প্রায় তিন পৃষ্ঠা হলো। অসুখের পর রহমান সাহেব ছোট চিঠি লিখতে পারেন না। চিঠি লম্বাই হতে থাকে। শুধু লিখতেই ইচ্ছা করে।

তিনি চিঠি শেষ করে বাতি নেভালেন। ঘুমঘুম ভাব আসছে। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ঘুম হয়তো এসে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন, আফজাল চিঠির জবাবে কী লিখবে ? সে নিশ্চয়ই রেগেমেগে লিখবে—কী করে আপনি ভাবলেন আপনার বৌমা আপনাকে ফেলে আমার কাছে আসবে ? এরকম চিন্তা করাই বাতুলতা। এ নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আমি খুব শিগগিরই দেশে এসে আপনাকে দেখে যাব।

রহমান সাহেব আবার কলিং বেল টিপলেন। বৌমা এই বুদ্ধিটি ভালো করেছে। খাটের সঙ্গে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছে। তোতা মিয়াকে আনবার জন্যে বেশ কয়েকবার সুইচ টিপতে হলো। হারামজাদা নবাব, বারোটা বাজতেই ঘুম। তাকে রাখাই হয়েছে রোগী দেখাশোনার জন্যে। রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, বেড প্যান দে।

আবার ?

হ্যাঁ, আবার।

তোতা মিয়া বেড প্যান দিল। খাবার পানি দিল। টেবিল ল্যাম্প সরিয়ে রাখল। মাথার কাছের যে জানালাটা বন্ধ করা হয়েছিল সেটি খুলল। রহমান সাহেবের ফরমায়েশ তখনো শেষ হলো না। তিনি হঠাৎ বললেন, পান বানিয়ে আন। পান খাব।

পান ঘরে নাই। এই বাড়িতে পান তো কেউ খায় না।

খায় না কী রে ব্যাটা ? আমি খাই না ? আমি তো খাই, যা নিয়ে আয়।

কোনথে আনমু ?

দোকান থেকে আন।

এই দুপুররাইতে ?

হ্যাঁ।

দোকান তো সব বন্ধ।

চুপ, ব্যাটা বেশি কথা বলে। ঢাকা শহরে বারোটার সময় পানের দোকান বন্ধ হয় ? আবার মুখে মুখে কথা।

অখন গেট খুললে আম্মার ঘুম ভাঙব।

আর একটি কথা বললে চড় খাবি। পান নিয়ে আসতে বলেছি, নিয়ে আয়।

তোতা মিয়া পান আনতে যায় এবং ইচ্ছা করেই গেটে ঝনঝন শব্দ করতে থাকে। দোতলা থেকে রহমান সাহেব গেটের ঝনঝনানি শুনতে পান। এবং তার খানিকক্ষণ পর সিঁড়িতে খুটখুট শব্দ হয়। সুরমা উঠে আসছে। রহমান সাহেব চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা এলিয়ে দেন।

কী হয়েছে বাবা ?

কিছু হয় নাই মা। বমি বমি লাগছে। তোতা মিয়াকে পান আনতে পাঠিয়েছি। বড় খারাপ লাগছে মা।

রহমান সাহেব ওয়াক করে বমির একটা ভঙ্গি করেন।

আপনি এখনো ঘুমাননি ?

ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। তোমার শাশুড়িকে স্বপ্নে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম, হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছে। মরা মানুষের হাত ইশারা করে ডাকার স্বপ্ন খুব খারাপ।

রহমান সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন সুরমার দিকে। সুরমাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিশ্বাস করছে। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। এই মেয়ে তাঁর বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করে না। রহমান সাহেব মনে মনে একটা কুৎসিত গাল দিলেন। সুরমা বলল, ঘুমুতে চেষ্টা করুন। বাতি নিভিয়ে দিন।

পান আনুক। আগে পান খেয়ে নেই।

সুরমা আর কোনো কথা না বলে নিচে নেমে গেল। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন, আদরের বৌমাকে আমি ভালো প্যাঁচে ফেলেছি। এখন যাও দেখি আমেরিকা ? সব তো ঠিকঠাক করা ছিল। বুড়ো শ্বশুর এখানে একা একা থেকে বাড়ি পাহারা দিবে। আর তোমরা মহাসুখে থাকবে আমেরিকা। সেখানে বাড়িটারিও কেনা হয়েছে। লেকের পাড়ে বাড়ি। উইক এন্ডে লেকে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে স্পিড বোট পর্যন্ত কেনা হয়েছে। এখন ঘুরো দেখি স্পিড বোটে ? এখন আর বুড়ো বাপের কথা মনে থাকে না ? বুড়ো দেশে থেকে পচুক। কিছুই যায় আসে না। ছ'মাস দশ মাস পরপর একখানা চিঠি ছাড়লেই হবে—বাবা, তুমি কেমন আছ ? তুমি একা একা দেশে পড়ে আছ ভাবতেই খুব কষ্ট হয়...।

তোতা মিয়া পান নিয়ে এল। রহমান সাহেব একসঙ্গে দুটো পান মুখে দিয়ে হৃষ্টচিত্তে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন খুব কায়দা করে। মশারির ভেতর সিগারেটের ধোঁয়া মেঘের মতো জমে জমে যাচ্ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

তোতা মিয়া বলল, আর কিছু লাগব ?

না।

পেসাব করবেন আরেকবার ?

না।

ঘুমাইতে যাই ?

যা।

বেশ লাগছে তাঁর। তবে ঘুম চটে গেছে। বাকি রাতটা বোধহয় জেগেই কাটাতে হবে। তিনি মনে মনে আফজালের কাছে দ্বিতীয় একটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। এই চিঠিটি তিনি আগামী সপ্তাহে পাঠাবেন।

> বাবা,
>
> শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হইতেছে। বাঁচিয়া থাকা বড় কষ্ট। তবে আমার লক্ষ্মী বৌমা বড় যত্ন করিতেছে। আমার নিজের মেয়ে থাকিলে সেও এত কষ্ট করিত কি না সন্দেহ। আল্লাহ তার হায়াত দরাজ করুক। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্যে খাস দিলে দোয়া করিতেছি।

ভাবতে ভাবতে রহমান সাহেব খুকখুক করে হাসলেন। ভালো প্যাঁচে আটকে দিয়েছি। প্যারালাইসিস-এর রোগী সহজে মরে না। এরা শকুনের মতো বেঁচে থাকে। আমিও থাকব। দেখি, আমাকে ফেলে রেখে তোমরা যাও কোথায় ?

তাঁর ডান পায়ের পাতা চুলকাচ্ছে। কোনোমতেই চুলকানা সম্ভব নয়। তাঁর বড় অস্বস্তি লাগছে। তিনি কলিং বেলের সুইচ টিপলেন। হারামজাদা তোতা মিয়া আসছে

না। ইচ্ছা করে আসছে না। জেগে মটকা মেরে পড়ে আছে। রহমান সাহেব টিপতেই থাকলেন।

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। সুরমা উঠে আসছে না-কি ? রহমান সাহেবের পায়ের চুলকানি সেরে গেল।

কী হয়েছে বাবা ?

পায়ের পাতা চুলকাচ্ছিল ?

কোন পায়ের পাতা ?

ডানটা।

সুরমা মশারি তুলে মাথা ভেতরে ঢুকাল। রহমান সাহেব দেখলেন তার ফর্সা হাত এগিয়ে আসছে পায়ের দিকে।

চুলকাতে হবে না। এখন আর নাই।

আহ্, কী ফর্সা হাত মেয়েটার!

বাবা, এখন কি আরাম হয়েছে ?

হ্যাঁ, তুমি যাও মা। আর লাগবে না।

সুরমা গেল না। বিছানার পাশে বসল। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ে। রহমান সাহেব ক্ষীণস্বরে বললেন, বুঝলে বৌমা, তোমার সাথে তোমার শাশুড়ির খুব মিল আছে।

সুরমা কিছু বলল না।

সেও তোমার মতো সুন্দর ছিল। তোমার মতোই গায়ের রঙ।

রহমান সাহেবের হয়তো আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুরমা উঠে দাঁড়াল। মশারি গুঁজে দিয়ে হালকা সুরে বলল, মশারির ভেতর সিগারেট খাবেন না বাবা। হঠাৎ আগুনটাগুন ধরে যাবে।

আচ্ছা আর খাব না।

সিগারেট খাবার সময় কাউকে রাখবেন আশেপাশে। এখন কি আপনার সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে ? ইচ্ছা হলে একটা খান, আমি বসছি।

তিনি যন্ত্রের মতো বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সুরমা চেয়ারে বসল। তার গায়ে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন, বড় সুন্দর মেয়ে, তবে খুব অহঙ্কারী। এত অহঙ্কার ভালো না।

সুরমা তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। সময় দেখছে হয়তো। দেড়টা বাজে, অনেক রাত। একসময় সে মৃদুস্বরে বলল, বাবা, বাইরের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা সাবধানে বলা উচিত। কেউ পেটে কথা রাখে না। চারদিকে ছড়ায়।

কাকে আমি কী বললাম ?

ডাক্তার সাহেবকে আপনি বলেছেন আপনার মনে সন্দেহ কোনোদিন না কোনোদিন আমি বিষ-টিষ খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলব। এসব বলা ঠিক না।

ঠাট্টা করে বলেছিলাম মা।

ঠাট্টা করে বলাও ঠিক না। সবাই তো আর ঠাট্টা বুঝতে পারে না। মনে করে সত্যি।

সুরমা বসে আছে শান্তভঙ্গিতে। তার মুখে মনের ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেবের ইচ্ছা হলো জ্বলন্ত সিগারেট হাত থেকে বিছানায় ফেলে দেন। আগুন জ্বলে উঠুক। মেয়েটি দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু তার সাহস হয় না। তাঁর বড় বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

বেঁচে থাকতে তাঁর খুব ভালো লাগে।

রহস্য

রহস্যজাতীয় ব্যাপারগুলিতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। তবু প্রায়ই এরকম কিছু গল্পটল্প শুনতে হয়। গত মাসে ঝিকাতলার এক ভদ্রলোক আমাকে এসে বললেন, তার ঘরে একটি তক্ষক আছে, সেটি রোজ রাত ১টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকে। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম। এরকম সময়নিষ্ঠ তক্ষক আছে নাকি এ যুগে ? ভদ্রলোক আমার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বললেন, কি ভাই, বিশ্বাস করলেন না ?

জি-না।

এক রাত থাকেন আমার বাসায়। নিজের চোখে দেখেন তক্ষকটা। ঘড়ি ধরে বসে থাকবেন। দেখবেন ঠিক ১টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকবে।

আরে ধুর, কী যে বলেন!

ভদ্রলোক মুখ কালো করে উঠে গেলেন। চারদিন পর তার সঙ্গে আবার দেখা। পৃথিবীটা এরকম যার সঙ্গে দেখা হওয়ার তার সঙ্গে দেখা হয় না। ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি কি দৈনিক বাংলার সালেহ সাহেবকে চেনেন ?

হ্যাঁ চিনি।

তাঁকে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের কানে শুনেছেন। বলেছেন একটা নিউজ করবেন।

ভালোই তো। নিউজ হওয়ার মতোই খবর।

আপনি আসেন না ভাই, থাকেন এক রাত। নিজের কানে শুনবেন।

আমাকে শোনালে কী হবে ?

আরে ভাই, আপনারা ইউনিভার্সিটির টিচার। আপনাদের কথার একটা আলাদা দাম।

তাই নাকি ?

আপনারা একটা কথা বললে কেউ ফেলবে না।

এই জিনিসটা নিয়ে খুব হৈচৈ করছেন মনে হচ্ছে ?

না, হৈচৈ কোথায় ? অনেকেই অবশ্যি শুনে গেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান নজমুল হুদাকে চেনেন ?

জি-না।

উনিও এসেছিলেন। খুব মাইডিয়ার লোক। আপনি আসুন না।

আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন যাওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মুখভর্তি করে হাসলেন। টেনে-টেনে বললেন, চলেন চা খাই।

না, চা খাব না।

আরে ভাই, আসেন না। প্রফেসর মানুষ, আপনাদের সঙ্গে থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার।

ভদ্রলোক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। যেতে হলো চায়ের দোকানে।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন ? চপ ?

না।

আরে ভাই খান না। এই, এদিকে দু'টো চপ দে তো। এখন ভাই বলেন, কবে যাবেন ?

আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। বলে দেব একদিন।

চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি রহস্যের কথা শুরু করলেন। নাইনটিন সিক্সটিতে তিনি বরিশালের পিরোজপুরে থাকতেন। তার বাসার কাছে একটা বিরাট কাঁঠাল গাছ ছিল। অমাবস্যার রাতে নাকি সেই কাঁঠাল গাছ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসত। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, সেই কান্নারও কি কোনো টাইম ছিল ? নির্দিষ্ট সময়ে কাঁদত ? আপনার তক্ষকের মতো ?

ভদ্রলোক আহত স্বরে বললেন, আমার কথা বিশ্বাস করলেন না ?

বিশ্বাস করব না কেন ?

আমি কান্নার শব্দ গোটাটা টেপ করে রেখেছি। একদিন শোনাব আপনাকে।

ঠিক আছে।

বরিশালের ডিসি সাহেবও শুনেছেন। চেনেন উনাকে ? আসগর সাহেব। সিএসপি। খুব খান্দানি ফ্যামিলি।

না, চিনি না।

ডিসি সাহেবের এক ভাই আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বিরাট অফিসার।

তাই বুঝি ?

জি। উনার বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। খুব খাতির-যত্ন করলেন। গুলশানে বাসা। তিনতলা। উনি থাকেন একতলায়। ওপরের দু'টো তলা ভাড়া দিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমার প্রায় একঘণ্টা সময় নষ্ট করে বিদায় হলেন। আমার মায়াই লাগল। ইন্ডেনটিং ফার্মে সামান্য একটা চাকরি করেন। দেখেই বোঝা যায় অভাবে পর্যুদস্ত। চোখের দৃষ্টি ভরসাহারা। বয়স এখনো হয়তো ত্রিশ হয়নি, কিন্তু বুড়োটে দেখায়। বিচিত্র চরিত্র।

মাসখানেক তার সঙ্গে আমার দেখা হলো না। তার প্রধান কারণ, যেসব জায়গায় তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সেসব জায়গা আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করেছি। নিউ মার্কেটে আড্ডার জায়গাটিতে যাই না। কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে ? এই লোকটি পিচ্ছিল পদার্থ, সে গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাবে। আর ছাড়ানো যাবে না। কিন্তু তবু দেখা হলো। একদিন শুনলাম সে ইউনিভার্সিটি ক্লাবে এসে খোঁজ নিচ্ছে। ক্লাবের বেয়ারা বলল, গত কিছুদিন ধরে নাকি সে নিয়মিতই আসছে। কী মুসিবত।

একদিন আর এড়ানো গেল না। ভদ্রলোক বাসায় এসে হাজির।

কী ভাই, আপনি তো আর এলেন না ?

কাজের ব্যস্ততা...

আজ আপনাকে নিতে এসেছি।

সে-কী!

কবি শামসুল আলম সাহেবও আসবেন।

তাই বুঝি ?

জি। চিনেন তো শামসুল আলম সাহেবকে ? দু'টো কবিতার বই বেরিয়েছে। 'পাখির পালক' আর 'অন্ধকার জ্যোৎস্না'।

তাই বুঝি ?

জি। আমাকে দু'টো বই-ই দিয়েছেন। খুবই বন্ধু মানুষ। বাড়ি হচ্ছে আপনার ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা।

ও।

উনার ছোটভাইও গল্প-টল্প লেখেন। আরিফুল আলম।

গেলাম তার বাসায়। ঝিকাতলার এক গলিতে ঘুপসি মতো দু'কামরার বাড়ি। আমার মেজাজ খুবই খারাপ। রাত দেড়টা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে সময়নিষ্ঠ তক্ষকের ডাক শোনার জন্যে। কতরকম যন্ত্রণা যে আছে পৃথিবীতে!

ভদ্রলোক আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। মহিলার হাতের সযত্ন স্পর্শ আছে। ভদ্রলোক বিবাহিত জানতাম না। এ নিয়ে তার সঙ্গে কখনো কথা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। অল্পবয়েসী তরুণী এবং অসম্ভব রূপসী। আমি প্রায় হকচকিয়ে গেলাম।

আমার স্ত্রী। লীনা। আর লীনা, উনি হুমায়ূন আহমেদ। এঁর কথা তো তোমাকে বলেছি। উনি লেখেন-টেখেন। ছাপা হয়।

লীনা হাসিমুখে বলল, জি, আপনার কথা প্রায়ই বলে।

লীনা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করো।

লীনা চলে গেল ভেতরে। ভদ্রলোক নিচুগলায় বললেন, লীনার গল্প-উপন্যাস লেখার শখ আছে। কয়েকদিন আগে সাপ নিয়েও একটা গল্প লিখেছে। মারাত্মক গল্প ভাই। আপনাকে পড়ে শোনাতে বলব। আমি বললে পড়বে না। আপনি কাইন্ডলি একটু বলবেন। রিকোয়েস্ট করবেন।

আমি বললাম, গুণী মহিলা তো।

ভদ্রলোকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা ভাই, কথাটা অস্বীকার করব না। গানও জানে। নজরুল গীতি। ভালো গায়। বাড়িতে টিচার রেখে শিখেছে।

তাই নাকি ?

জি, শোনাবে আপনাকে। একটু প্রেসার দিতে হবে আর কী। আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলেই শোনাবে। কাইন্ডলি একটু রিকোয়েস্ট করবেন।

ঠিক আছে, করব।

চা এসে পড়ল। চায়ের সঙ্গে বড়া জাতীয় জিনিস। বেশ খেতে। আমি বললাম, কিসের বড়া এগুলি ? ডালের নাকি ?

ভদ্রলোক উচ্চস্বরে হাসলেন, নারে ভাই, ফুলের বড়া। হা-হা-হা। কতরকম অদ্ভুত রান্না যে লীনা জানে। মাঝে মাঝে এত সারপ্রাইজড্ হই। খেতে কেমন হয়েছে বলেন ? চমৎকার না ?

ভালো, বেশ ভালো।

আরেক দিন আসবেন, চাইনিজ স্যুপ খাওয়াব। চিকেন কর্ন স্যুপ। চাইনিজ রেস্তোরাঁর চেয়ে যদি ভালো না হয় তাহলে কান কেটে ফেলবেন। হা-হা-হা। থাই স্যুপও জানে।

আমি মেয়েটির লেখা একটি ছোটগল্প শুনলাম। দু'টি কবিতা শুনলাম। তিনটি নজরুল গীতি শুনলাম। ভদ্রলোক মুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। বারবার বললেন, ইশ শামসুল আলম সাহেব আসলেন না। দারুণ মিস্ করলেন, কী বলেন ভাই ?

রাত এগারোটার দিকে বললাম, তাহলে আজ উঠি ?

তক্ষকের ডাক শুনবেন না ?

আরেক দিন শুনব।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ভুলবেন না যেন ভাই। আসতেই হবে।

ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। রাস্তায় নেমেই বললেন, আমার স্ত্রীকে কেমন দেখলেন ভাই ?

খুব গুণী মহিলা।

ভদ্রলোকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধরা গলায় বললেন, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। ঠিক না ভাই ?

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলেক কাঁপা গলায় বললেন, গরিব মানুষ, স্ত্রীর জন্যে কিছুই করতে পারি না। কিন্তু এইসব নিয়ে লীনা মোটেই মাথা ঘামায় না। বড় ফ্যামিলির মেয়ে তো। ওদের চালচলনই অন্যরকম। আমরা খুব সুখী।

আমি রিকশায় উঠতে উঠতে বললাম, খুব ভাগ্যবান আপনি।

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আবেগে কেঁদে ফেলবেন।

ভাই, আরেকদিন কিন্তু আসতে হবে। তক্ষকের ডাক শুনতে হবে। আসবেন তো ? প্লিজ। লোকজন এলে লীনা খুব খুশি হয়।

তক্ষকের ডাকের মতো কত রহস্যময় ব্যাপারই না আছে পৃথিবীতে।

অপরাহ্ণ

রিকশাওয়ালাটাকে ইসহাক সাহেবের পছন্দ হলো না।

কেমন উদ্ধত ভাবভঙ্গি। ঘামে ভেজা চকচকে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। দেখেই মনে হচ্ছে, এ নির্বিকার ভঙ্গিতে ট্রাকের সামনে রিকশা নিয়ে চলে যাবে। লালবাতির দিকে ফিরেও তাকাবে না এবং ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে। ভাড়া দেওয়া মাত্র তেড়িয়া হয়ে বলবে, সাত টেকা ঠিক কইরা পাঁচ টেকা দেন ক্যান ?

অবশ্যি এই লোক এরকম নাও করতে পারে। মানুষের চেহারা দেখে তার মনের ভাব টের পাওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু এই লোকটির চুল লম্বা। লম্বা চুল মানেই একটা ফ্যাশনের ব্যাপার। একজন রিকশাওয়ালা যখন ফ্যাশন করে, তখন বুঝতে হবে তার ভেতরে কোনো ঝামেলা আছে।

ইসহাক সাহেব বললেন, ঝিকাতলা কত নিবে ? রিকশাওয়ালা পিচ করে তার ঠিক সামনেই থুথু ফেলে বলল, যা ন্যায্য ভাড়া হয় দিবেন।

ন্যায্য ভাড়াটা কত, শুনি ?

রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে তাকাল। কোনো উত্তর দিল না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে ঝামেলাটা করবে ন্যায্য ভাড়া নিয়ে। যখন তাকে ন্যায্য ভাড়া দেওয়া হবে সে থমথমে গলায় বলবে, এইটা কী দিলেন ? এমন হৈচৈ শুরু করবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে।

ইসহাক সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা দেব—যাবে ? রিকশাওয়ালা হ্যাঁ না কিছুই বলল না। পিচ করে আবার থুথু ফেলল। মনে হচ্ছে তার যাওয়ার ইচ্ছা নেই।

আকাশে জুন মাসের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। আগে এই রোদে রাস্তার পিচ গলে যেত। এখন গলে না। এরা বোধহয় রাস্তায় নতুন ধরনের কোনো পিচ ব্যবহার করে।

কী যাবে নাকি ?

উঠেন।

পাঁচ টাকায় রাজি হওয়া একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। এই কড়া রোদে ভাড়া পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যাটা রাজি হয়ে গেল কেন ? অন্য কোনো মতলব আছে নাকি ? একবার তিনি গুলিস্তান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন, রিকশাওয়ালা তিন টাকায় রাজি হয়ে গেল। রহস্যটা টের পেলেন কিছুদূর যাওয়ার পর। রিকশাওয়ালা বিরাট এক কাহিনী ফেঁদে বসল। যে কাহিনী বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আজই নাকি তার মেয়ের বিয়ে। সন্ধ্যাবেলা বরযাত্রী আসবে। তাদের দু'টা ডালভাত খাওয়াতে হবে। কিন্তু সেই পয়সা এখনো জোগাড় হয়নি। রিকশার জমার টাকা উঠতে এখনো বাকি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত ফালতু কথা। তবু ইসহাস সাহেব তাকে একটা চকচকে দশ টাকার নোট দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে যারা কম ভাড়ায় যেতে চায় তাদের রিকশায় উঠবেন না।

এই ব্যাটাও কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে। এর কারণটা কী ? ইসহাক সাহেব মনে মনে এর গল্পের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গল্পটা শুরু হবে কখন ? কিন্তু শুরু হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা মাথা নিচু করে, মাথার বাবড়ি চুল হাওয়ায় উড়িয়ে একমনে চালাচ্ছে। লোকটা হয়তো খারাপ নয়। ইসহাক সাহেব বললেন, এই, তোমার নাম কী ?

রিকশাওয়ালা মাথা ঘুরাল।

আমারে কন ?

হ্যাঁ। কী নাম ?

ইসহাক।

বলে কী এ ? এর নামও ইসহাক ? ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি হতে লাগল। যদিও অস্বস্তি বোধ করার কোনোই কারণ নেই। মুসলমানদের নামের সংখ্যা অল্প। অল্পকিছু নামই ঘুরেফিরে আসে। একবার এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখেন বাবুর্চির নাম ইসহাক। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই ইসহাকের সঙ্গে তার চেহারারও খানিকটা মিল ছিল। বড়ই অস্বস্তির ব্যাপার। অবশ্যি এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে তার আর কোনো মিল নেই।

বাড়ি কোথায় তোমার ?

আমারে কন ?

হ্যাঁ। কোথায় তোমার বাড়ি ?

বাড়িঘর কিছু নাই। বাড়িঘর থাকলে কি রিকশা চালাই ?

ঘুমাও কোথায় ? রিকশার উপর তো নিশ্চয়ই ঘুমাও না।

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। এই ব্যাটার থুথু ফেলার রোগ আছে। অসম্ভব রোদ। ব্যাটার রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে। ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি বাড়তে লাগল। অস্বস্তির কারণ কি দু'জনের একই নাম ? নামের প্রতি আমাদের কি অন্য একধরনের মমতা আছে ? হয়তোবা।

তোমার ছেলেপুলে আছে নাকি ইসহাক মিয়া ?

আছে।

কয়জন ?

দুই মাইয়া।

কী সর্বনাশ, বলে কী এই লোক ? তারও দুই মেয়ে, লোপা এবং ইন্দ্রাণী। তিনি দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এদের নাম কী ?

নাম দিয়া কী করবেন ?

আহ্, বলো না।

একজনের নাম হইল গিয়া...

বলতে বলতে সে রাস্তার পাশে হঠাৎ রিকশা দাঁড় করিয়ে দিল। প্রায় টলতে টলতে নেমে পড়ল রিকশা থেকে।

এই, কী হয়েছে ?

শইলটা খারাপ। পেটে ব্যথা।

নতুন ধরনের কোনো চাল কি ? শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়তি কিছু লাভের চেষ্টা ? হয়তো এই রোদে তার আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ইসহাক সাহেবকে এখানেই নেমে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচ টাকাই দিতে হবে। বিচিত্র কিছু না। এরা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

ইসহাক সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে রিকশাওয়ালার দিকে লক্ষ রাখতে লাগলেন। শরীর খারাপের কতটা ভান কতটা সত্যি এটা ধরতে চান। তিনি দেখলেন, সে ফুটপাতে শুয়ে পড়েছে। দু'হাতে খামচি দিয়ে তার পেট ধরে রেখেছে। কোনোরকম শব্দ বা চিৎকার করছে না। কাজেই সম্ভবত ভান নয়। ভান হলে উঃ আঃ করে লোক জমিয়ে ফেলত। এখানে কোনো লোকজন জমছে না। পাঁচ ছ'বছর বয়সের একটি টোকাইশ্রেণীর বালিকা কৌতূহলী চোখে দেখছে। বালিকাটির মুখ হাসি হাসি, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে।

ইসহাক সাহেব রিকশা থেকে নামলেন। কী যন্ত্রণায় পড়া গেল। পাঁচটা টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবেন কি ? এরকম হৃদয়হীন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

তোমার অসুবিধাটা কী ?

পেটে ব্যথা।

এরকম আগেও হয়েছে ?

জি, হইছে।

এমন অসুখ নিয়ে রিকশা চালাও কেন ? পাগল নাকি ?

রিকশাওয়ালা লাল চোখে তাকাল। চোখ দুটি এখন লাল হয়েছে, না আগেই লাল ছিল—তিনি লক্ষ করেননি।

সাব, আপনে আমার রিকশাটা দেখবেন। গরিব মানুষ, রিকশা গেলে সর্বনাশ।

রিকশা যাবে কেন ?

সাব একটু দেখবেন। রিকশাটা দেখবেন সাব। আপনার পায়ে ধরি।

বলতে বলতে সত্যি সত্যি তার পায়ে ধরবার জন্যে রিকশাওয়ালা এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। তিনি চমকে পেছনে সরে গেলেন। ঠিক তখন লোকটি একগাদা রক্তবমি করল। ভয়াবহ ব্যাপার। ইসহাক সাহেব কপালের ঘাম মুছে কাঁপা গলায় ডাকলেন, এই, এই। এই ইসহাক মিয়া।

সাব, আমার রিকশা। আমার রিকশা।

দেখতে দেখতে চারদিকে ভিড় জমল। মানুষের হৃদয় থেকে মমতা বোধহয় পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি। দু'টি যুবক ছেলে তাকে ধরাধরি করে বেবিটেক্সিতে তুলল। নিয়ে যাবে পিজিতে। তার রিকশার দায়িত্ব নিতে অনেককেই আগ্রহী দেখা গেল। ইসহাক সাহেব কাউকে সে দায়িত্ব দিতে রাজি হলেন না। জুন মাসের প্রচণ্ড রোদে নিজেই রিকশা টেনে টেনে নিয়ে গেলেন সায়েন্স ল্যাবরেটরির পুলিশ ফাঁড়িতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ? রিকশা জমা দিয়ে যে বাসায় চলে যাবেন সে উপায় নেই। যেতে হবে পিজিতে। ইসহাক মিয়াকে বলতে হবে—রিকশা জায়গামতো আছে। সে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তার রিকশা ফেরত পাবে। অথচ আজ

তার সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার। ইন্দ্রাণীর দাঁত ব্যথা। ছ'টার সময় তাকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে।

মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা। ইসহাক সাহেব পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত যেতেই ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তার বড় বড় নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। খালি রিকশা এত ভারি হয় তার ধারণা ছিল না। কৌতূহলী লোকজন দু'পাশ থেকে তাকে দেখছে। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। একটা গর্ত খুঁড়ে রাখলেও তার চারদিকে ভিড় জমে যায়। কর্মহীন লোকজন গভীর আগ্রহে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এই মুহূর্তে গর্তের ভেতর থেকে অদ্ভুত কোনো জন্তু লাফিয়ে বের হবে। ইসহাক সাহেবের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। বুক খা-খা করতে লাগল। আহ, কী যন্ত্রণা! পরিচিত কেউ না দেখলে বাঁচা যায়। চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হলে খুব কম করে হলেও এক লক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অফিসের নিজামুদ্দিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় সে নির্ঘাৎ বলবে, আপনি অফ টাইমে রিকশা চালান তা তো জানতাম না। হা হা হা। এখান থেকে আজিমপুর যেতে কত নেবেন ? নিজামুদ্দিনের স্বভাবই হচ্ছে বদ রসিকতা করা। ছোটলোক কোথাকার! ইসহাক সাহেব পিচ করে থুথু ফেললেন এবং দারুণ চমকে উঠলেন। তিনিও রিকশাওয়ালার মতো থুথু ফেলতে শুরু করেছেন। কী সর্বনাশের কথা!

পিজিতে ইসহাক মিয়াকে খুঁজে বের করতে দেরি হলো না। ইমার্জেন্সিতে একটি বেঞ্চের ওপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার ওপর একটা ফ্যান। ফ্যান প্রবল বেগে ঘুরছে এবং বাতাসে ইসহাক মিয়ার লম্বা চুল উড়ছে। দীর্ঘ সময় তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গেলেন অল্পবয়সী এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ছেলেটি ক্লান্ত এবং কোনোকিছু নিয়ে খুবই চিন্তিত। তার বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবু তিনি বললেন, ঐ রিকশাওয়ালা কখন মারা গেছে ?

ডাক্তার ছেলেটি ঠান্ডা গলায় বলল, জানি না কখন।

ওর রিকশাটি আমি থানায় জমা দিয়েছি। এখন কী করব ? কাকে খবর দেব ?

আমাকে এইসব বলেছেন কেন ?

তিনি বারান্দায় সরে এলেন। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলেন একা একা। রোদ মরে আসছে। আকাশে মেঘ। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঠান্ডা এক বোতল পেপসি খেলেন। ছ'টা বাজতে দেরি নেই। ইন্দ্রাণীকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে। তিনি একটা রিকশায় উঠে পড়লেন।

এই রিকশাওয়ালাটির বয়স খুব কম। উৎসাহ বেশি। সে রিকশা নিয়ে ছুটছে। অকারণে বেল বাজাচ্ছে। খুব কায়দা করে সে দু'টি রিকশা ওভারটেক করে দাঁত বের করে হাসল। ইসহাক সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, নাম কী তোমার ?

সামসু।

ইসহাক সাহেব কোমল স্বরে বললেন, তুমি কেমন আছ সামসু ?

সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেকক্ষণ সবুজবাতি জ্বলছে। ওটি লাল হওয়ার আগেই তাকে পার হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার তার সময় নেই।

রূপা

ভাই, আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান ?

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তাও এমন কোনো আলাপ না। আমি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি কিনা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। এবং ভদ্রতা করে জানতে চাইলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার স্ত্রীকে রিসিভ করতে এসেছি। ও চিটাগাং থেকে আসছে। ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট। ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় যাব আবার আসব, ভাবলাম অপেক্ষা করি।

তার সঙ্গে এইটুকুই আমার আলাপ। এই আলাপের সূত্র ধরে কেউ যখন বলে, ভাই, আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান ?—তখন খানিকটা হলেও বিস্মিত হতে হয়। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে গল্প শোনার আগ্রহ আমার কম। তাছাড়া আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করেছি, ইন্টারেস্টিং গল্প বলে যে গল্প শুরু হয় সে-গল্প কখনোই ইন্টারেস্টিং হয় না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান হলে আমার চুপ করে থাকার অর্থ বুঝতে পারবেন। বুদ্ধিমান না হলে এই গল্প আমার শুনতেই হবে।

দেখা গেল ভদ্রলোক মোটেই বুদ্ধিমান নন। পকেট থেকে পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে সাজাতে গল্প বলা শুরু করলেন।

আপনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়ে আমার কথা শুনছেন। নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ হড়বড় করে গল্প বলা শুরু করেছে। বিরক্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন ? আজ আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনে আমার মজার গল্পটা কাউকে না কাউকে বলতে ইচ্ছা করে। যদি অনুমতি দেন, গল্পটা বলি।

বলুন।

আপনি কি পান খান ?

জি-না।

একটা খেয়ে দেখুন, মিষ্টি পান। খারাপ লাগবে না।

আপনি কি বিশেষ দিনে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে পানও খাওয়ান ?

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আন্তরিক ভঙ্গিতেই হাসলেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মতো হবে। অত্যন্ত সুপুরুষ। ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবিতে তাকে চমৎকার মানিয়েছে। মনে হচ্ছে তিনি স্ত্রীর জন্যে খুব সেজেগুজেই এসেছেন।

প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছি— পদার্থবিদ্যায়। এখানে অন্ধকার বলে আপনি সম্ভবত আমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। আলো থাকলে বুঝতেন আমি বেশ সুপুরুষ। কুড়ি বছর আগে দেখতে রাজপুত্রের মতো ছিলাম। ছাত্রমহলে আমার নাম ছিল 'দ্য প্রিন্স'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েমহলে আমার কোনো পাত্তা ছিল না। আপনি ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি না জানি না— পুরুষদের রূপের প্রতি মেয়েরা কখনো আকৃষ্ট হয় না। পুরুষদের সবকিছুই তাদের চোখে পড়ে, রূপ চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে ভাব করার জন্যে কিংবা কথা বলার জন্যে এগিয়ে আসেনি। আমিও নিজ থেকে এগিয়ে যাইনি। কারণ আমার তোতলামি আছে। কথা আটকে যায়।

আমি ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি তো কোনো তোতলামি দেখছি না। আপনি চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন।

বিয়ের পর আমার তোতলামি সেরে যায়। বিয়ের আগে প্রচণ্ড রকম ছিল। অনেক চিকিৎসাও করেছি। মার্বেল মুখে নিয়ে কথা বলা থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ, পীর সাহেবের তাবিজ, কিছুই বাদ দেইনি। যাই হোক, গল্পে ফিরে যাই, আমার সাবসিডিয়ারি ছিল ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি সাবসিডিয়ারিতে একটি মেয়েকে দেখে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। কী মিষ্টি চেহারা! দীর্ঘ পল্লব, ছায়াময় চোখ। সেই চোখ সবসময় হাসছে। ভাই, আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েছেন ?

জি-না।

প্রেমে না পড়লে আমার সেই সময়কার মানসিকতা আপনাকে বুঝাতে পারব না। আমি প্রথমদিন মেয়েটিকে দেখেই পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুম হলো না। প্রচণ্ড পানির পিপাসায় একটু পরপর গলা শুকিয়ে যায়। পানি খাই আর মহসিন হলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি।

সপ্তাহে আমাদের দু'টা মাত্র সাবসিডিয়ারি ক্লাস। রাগে-দুঃখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে। প্রতিদিন একটা করে সাবসিডিয়ারি ক্লাস থাকলে কী ক্ষতি হতো ? সপ্তাহের দু'টা ক্লাস মানে পঞ্চাশ মিনিট করে একশ' মিনিট। এই একশ' মিনিট

চোখের পলকে শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া মেয়েটা খুব ক্লাস ফাঁকি দেয়। এমনও হয়েছে সে পরপর দু'সপ্তাহ কোনো ক্লাস করল না। তখন আমার ইচ্ছা করত লাফ দিয়ে মহসিন হলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাই। সে যে কী ভয়াবহ কষ্ট আপনি বুঝবেন না। কারণ আপনি কখনো প্রেমে পড়েননি।

মেয়েটার নাম তো বললেন না, তার নাম কী ?

তার নাম রূপা। সেই সময় আমি অবশ্যি তার নাম জানতাম না। নাম কেন—কিছুই জানতাম না। কোন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী তাও জানতাম না। শুধু জানতাম তার সাবসিডিয়ারি ম্যাথ আছে, এবং সে কালো রঙের একটা মরিস মাইনর গাড়িতে করে আসে। গাড়ির নাম্বার—ভ ৮৭৮১।

আপনি তার সম্পর্কে কোনোরকম খোঁজ নেননি ?

না। খোঁজ নেইনি। কারণ আমার সবসময় ভয় হতো খোঁজ নিতে গেলেই জানব—মেয়েটার হয়তো কারও সঙ্গে ভাব আছে। একদিনের একটা ঘটনা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন। সাবসিডিয়ারি ক্লাসের শেষে আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম মেয়েটা হেসে হেসে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। সব ক্লাস বাদ দিয়ে হলে চলে এলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেল।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্য তা বটেই। পুরো দু'বছর আমার এইভাবেই কাটল। পড়াশোনা মাথায় উঠল। তারপর একদিন অসীম সাহসের কাজ করে ফেললাম। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম। তারপর মেয়েটিকে সম্বোধনহীন একটা চিঠি লিখলাম। কী লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। তবে চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে—আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তাকে রাজি হতেই হবে। রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বাড়ির সামনে না খেয়ে পড়ে থাকব। যাকে পত্রিকার ভাষায় বলে আমরণ অনশন। গল্পটা কি আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ হচ্ছে। তারপর কী হলো বলুন। চিঠি ডাকে পাঠিয় দিলেন ?

না। নিজেই হাতে করে নিয়ে গেলাম। ওদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম, এ বাড়ির একজন আপা আছেন না, ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, তার হাতে দিয়ে এসো। দারোয়ান লক্ষ্মী ছেলের মতো চিঠি নিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, আপা বলেছেন তিনি আপনেরে চিনেন না। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমি তাকে চিনি। এটাই যথেষ্ট।

এই বলে আমি গেটের বাইরে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন—নিতান্তই পাগলের কাণ্ড। সেই সময় মাথা আসলেই বেঠিক ছিল। লজিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনোরকম ঘটনা ছাড়াই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ করলাম দোতলার জানালা থেকে মাঝে

মধ্যে কিছু কৌতূহলী চোখ আমাকে দেখছে। বিকেল চারটায় এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বের হয়ে কঠিন গলায় বললেন, যথেষ্ট পাগলামি করা হয়েছে। এখন বাড়ি যাও।

আমি তার চেয়েও কঠিন গলায় বললাম, যাব না।

পুলিশে খবর দিচ্ছি। পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

কোনো অসুবিধা নেই, খবর দিন।

ইউ রাস্কেল, মাতলামি করার জায়গা পাও না ?

গালাগালি করছেন কেন ? আমি তো আপনাকে গালি দিচ্ছি না।

ভদ্রলোক রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। তার পরপরই শুরু হলো বৃষ্টি। ঢালাও বর্ষণ। আমি ভিজছি নির্বিকার ভঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝছি যে জ্বর এসে যাচ্ছে। সারাদিন রোদে পোড়ার পর এই ঠান্ডা বৃষ্টি সহ্য হবে না। তখন একটা বেপরোয়া ভাব চলে এসেছে—যা হওয়ার হবে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

ইতোমধ্যে আমি আশেপাশের মানুষদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ? এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন ? আমি তাদের সবাইকে বলেছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি একজন পাগল মানুষ।

মেয়েটির বাড়ি থেকেও হয়তো টেলিফোনে এই বিচিত্র ঘটনার কথা কাউকে কাউকে জানানো হয়েছে। তিনটি গাড়ি তাদের বাড়িতে এল। গাড়ির আরোহীরা রাগী ভঙ্গিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন।

রাত ন'টা বাজল। বৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যেও থামল না। জ্বরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। দারোয়ান এসে আমাকে ফিসফিস করে বলল, সাহেব পুলিশ আনতে চাইতেছে, বড় আপা রাজি না। বড় আপা আপনের অবস্থা দেইখ্যা খুব কানতাছে। টাইট হইয়া থাকেন।

আমি টাইট হয়ে বসে রইলাম।

রাত এগারোটা বাজল। ওদের বাড়ির বারান্দায় বাতি জ্বলে উঠল। বসার ঘরের দরজা খুলে মেয়েটি বের হয়ে এল। মেয়েটির পেছনে পেছনে ওদের বাড়ির সব ক'জন মানুষ। ওরা কেউ বারান্দা থেকে নামল না। মেয়েটি একা এগিয়ে এল। আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং অসম্ভব কোমল গলায় বলল, কেন এমন পাগলামি করছেন ?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। অন্য একটি মেয়ে। একে আমি কোনোদিন দেখিনি। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভার আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। হয়তো ইচ্ছা করেই দিয়েছে।

মেয়েটি নরম গলায় বলল, আসুন, ভেতরে আসুন। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। আসুন তো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বলতে চেষ্টা করলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি সেই মেয়ে নন। আপনি অন্য একজন। মেয়েটির মমতায় ডুবানো চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলা সম্ভব হলো না। এত মমতা নিয়ে কোনো নারী আমার দিকে তাকায়নি।

জ্বরের ঘোরে আমি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিলাম না। মেয়েটি বলল, আপনার বোধহয় শরীর খারাপ। আপনি আমার হাত ধরে হাঁটুন। কোনো অসুবিধা নেই।

বাসার সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠিন চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সবার কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিল। যে গভীর ভালোবাসায় হাত বাড়াল সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। আমি তার হাত ধরলাম। এই কুড়ি বছর ধরেই ধরে আছি। মাঝে মাঝে একধরনের অস্থিরতা বোধ করি। ভ্রান্তির এই গল্প আমার স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছা করে। বলতে পারি না। তখন আপনার মতো অপরিচিত একজন কাউকে খুঁজে বের করি। গল্পটা বলি। কারণ, আমি জানি— এই গল্প কোনোদিন আমার স্ত্রীর কানে পৌঁছাবে না। আচ্ছা ভাই, উঠি। আমার ট্রেন এসে গেল।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেললাইনে ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। ট্রেন সত্যি সত্যি এসে গেল।

সায়েন্স ফিকশন

ইরিনা

লোকটির মুখ লম্বাটে।

চোখ দু'টি তক্ষকের চোখের মতো। কোটর থেকে অনেকখানি বেরিয়ে আছে। অত্যন্ত রোগা শরীর। সরু সরু হাত। হাতের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা। কাঁধে ঝুলছে নীলরঙা চকচকে ব্যাগ। তার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি বিনীত ভঙ্গি আছে। নিশ্চয়ই কিছু-একটা গছাতে এসেছে।

দুপুরের দিকে এরকম উটকো লোকজন আসে। এরা কলিংবেল টিপে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে হাত কচলায়। লাজুক গলায় বলে, আমি নিতান্তই একজন দরিদ্র ব্যক্তি, কাটা কাপড়ের টুকরো বিক্রি করি। আপনি কি অনুগ্রহ করে কিছু কিনবেন ? কিনলে আমার খুব উপকার হয়।

এই লোক নিশ্চয়ই সেরকম কিছু বলবে। ইরিনা তাকে সে সুযোগ দিল না। লোকটি মুখ খুলবার আগেই সে বলল, আমাদের কিছু লাগবে না। আপনি যান।

লোকটি কিছু বলল না। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। ইরিনা কড়া গলায় বলল, বলেছি তো আমাদের কিছু লাগবে না।

আমি কিছু বিক্রি করতে আসিনি।

আপনি কে ? কাকে চান আপনি ?

আমি কে, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?

ইরিনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লোকটির দিকে। লোকটির দাঁড়িয়ে থাকার যে ভঙ্গিটিকে একটু আগেই বিনীত ভঙ্গি মনে হচ্ছিল, এখন সেরকম মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে লোকটি ভয়ঙ্কর উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনার কী দরকার বলুন!

বাইরে দাঁড়িয়ে কি আর সবকিছু বলা যায় ?

বাবা-মা কেউ ঘরে নেই, আপনাকে আমি ভেতরে আসতে বলব না।

লোকটি মেয়েদের রুমালের মতো ছোট্ট ফুল আঁকা একটি রুমাল বের করে কপাল মুছল। ইরিনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি কোনো খবর না দিয়ে এসেছেন।

লোকটি বলল, খবর না দিয়ে অনেকেই আসে। জরা আসে, মৃত্যু আসে এবং মাঝে মাঝে গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন।

তাহলে আপনি কি... ?

লোকটি হাসল। নিঃশব্দ হাসি নয়, বেশ শব্দ করে হাসি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, হাসির শব্দ অত্যন্ত সুরেলা। শুনতে ভালো লাগে। ইরিনা বলল, আসুন, ভেতরে আসুন।

শুভ দুপুর ইরিনা।

আপনি আমার নাম জানেন ?

গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন যখন কারও বাড়ি যায়, তখন বাড়ির লোকজনের নাম জেনেই যায়। সেটাই স্বাভাবিক, তাই না ?

ইরিনা কথা বলল না। সে একদৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি বলল, তুমি কি আমার কার্ড দেখতে চাও ? স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।

আমি কিছুই দেখতে চাই না। আপনি কেন এসেছেন ? আমার কাছ থেকে কী জানতে চান ?

লোকটি কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমি কিছুই জানতে চাই না।

তাহলে এসেছেন কী জন্যে ?

তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

তার মানে ? আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন ?

ইরিনা, তুমি কি জানো না ইন্টেলিজেন্সের লোকজনদের কোনো প্রশ্ন করা যায় না ? বিধি নং চ-২১১/২, তুমি কি এই বিধি জানো না ? তোমাকে স্কুলে শেখানো হয়নি ?

হয়েছে।

তাহলে তুমি হয়তো চ-২১১/৩ বিধিটিও জানো।

হ্যাঁ, জানি।

বলো তো বিধিটি কী ?

ইরিনা যন্ত্রের মতো বলল, আপনি যদি আমাকে কোথাও যেতে বলেন তাহলে যেতে হবে।

যদি যেতে অস্বীকার করো, তাহলে কী হবে বলো তো ?

প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করা হবে।

এই অপরাধের শাস্তি কী জানো ?

জানি। কিন্তু আমি যাব না। আমার বাবা-মা না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।

লোকটি ছোট ছোট পা ফেলে ঘরের মধ্যেই হাঁটছিল। হাঁটা বন্ধ করে চেয়ারে বসল। খুব আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেন এই বাড়িঘর তার দীর্ঘদিনের চেনা। সে যেন নিতান্ত পরিচিত কেউ। অনেকদিন পর বেড়াতে এসেছে।

ইরিনা আবার বলল, বাবা-মা না ফেরা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তাই। বাবা-মা না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।

এই কথাগুলো তুমি পরপর তিনবার বললে। একই কথা বারবার বললে কথা জোরালো হয় না।

লোকটি সিগারেট ধরাল। ছাই ফেলবার জন্যে নিজেই উঠে গিয়ে একটা অ্যাশট্রে আনল। ইরিনার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন দেখল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে খুব সহজ গলায় বলল, তোমার বাবা-মা আর এ বাড়িতে ফিরে আসবেন না।

ইরিনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী বলছে এই লোকটি! সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলতে চান।

ঠিক এই মুহূর্তে তোমার বাবা-মা দুজনেই আছেন খাদ্য দপ্তরে। বেলা তিনটে পর্যন্ত তাঁরা সেখানে থাকবেন। তারপর তাঁদের পাঠানো হবে প্রথম নিয়ন্ত্রণকক্ষে। সেখান থেকে তাঁদের ঠিক পাঁচটায় নেওয়া হবে সেন্ট্রাল কমিউনে। আরও শুনতে চাও ?

না।

তুমি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করছ না ?

না। ইন্টেলিজেন্সের লোকজন কখনো সত্যি কথা বলে না।

এটা তুমি ভুল বললে ইরিনা। শুধু মিথ্যা বললে মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। মিথ্যা বলতে হয় সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে। আমরা এক হাজার সত্যি কথার সঙ্গে একটা মিথ্যে কথা ঢুকিয়ে দিই। কারও সাধ্য নেই সেই মিথ্যা ধরে। হা হা হা।

লোকটি সুরেলা গলায় হেসে উঠল। এমন একজন কু-দর্শন লোক এত চমৎকার করে হাসে কী করে!

ইরিনা, তুমি কি আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াবে ? সেই সঙ্গে কিছু খাবার। আশা করি ঘরে কিছু খাবার আছে।

খাবার নেই। কফি খাওয়াতে পারি।

ইরিনা হিটারে পানি গরম করতে লাগল। তার একবার ইচ্ছা হলো রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চুপিসারে চলে যায় কোথাও। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এরকম কিছু চিন্তা করাও বোকামি।

টেলিফোন বাজছে। ইরিনা তাকাল লোকটির দিকে। ঠান্ডা গলায় বলল, আমি কি টেলিফোন ধরতে পারি ?

হ্যাঁ, পারো।

টেলিফোন করেছেন ইরিনার বাবা। তাঁর গলায় বারবার কথা আটকে যাচ্ছে। যেন কোনো কারণে তিনি অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় করে শ্বাস ফেলছেন।

তুমি কোত্থেকে কথা বলছ বাবা ?

খাদ্য দপ্তর থেকে।

তুমি কিছু বলবে ?

না।

শুধু শুধু টেলিফোন করেছ ?

ইয়ে মা শোন, আমাকে কোথায় যেন পাঠাচ্ছে।

কোথায় পাঠাচ্ছে ?

তা তো জানি না। অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসিয়ে রাখল। এখন বলছে ...

কী বলছে ?

ইরিনার বাবা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। যেন কাউকে দেখে ভয় পেয়েছেন। অনেক কিছু বলার ছিল, বলা হলো না। ইরিনা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে হালকা স্বরে বলল, কোনো লাভ নেই, কেউ টেলিফোন ধরবে না। সত্যি কেউ ধরল না। ইরিনার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু এই কুৎসিত লোকটিকে চোখের জল দেখাতে ইচ্ছা করছে না। কান্না চেপে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। এই কঠিন ব্যাপারটি সে কী করে পারছে কে জানে। কতক্ষণ পারবে তাও জানা নেই।

পানি ফুটছে। কফি বানিয়ে ফেল। চিনি বেশি করে দেবে। আমি প্রচুর চিনি খাই। বুদ্ধিমান লোকেরা চিনি বেশি খায়, এই তথ্য কি তুমি জানো ?

ইরিনা জবাব দিল না।

লোকটি কফি খেল নিঃশব্দে। তার ধরন-ধারণ দেখে মনে হয়, কোনো তাড়া নেই। দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারবে। কফি শেষ করেই সে তার নীল ব্যাগ থেকে কী-একটা বই বের করে পড়তে শুরু করল। বইয়ের লেখাগুলো অদ্ভুত, নিশ্চয়ই কোনো অপরিচিত ভাষা। লোকটি পড়তে পড়তে মুচকি মুচকি হাসছে। নিশ্চয়ই মজার কোনো বই। একটা লোহার রড হাতে নিয়ে চুপিচুপি লোকটির পেছনে চলে গেলে কেমন হয়। আচমকা প্রচণ্ড বেগে লোহার রডটি তার মাথায় বসিয়ে দেবে। ইরিনা মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এই রকম কল্পনার কোনো মানে হয় না।

লোকটি হাতের ঘড়িতে সময় দেখল। বইটি বন্ধ করে নীল ব্যাগে রেখে বলল, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আমাদের ট্রেন। কাজেই অনেকখানি সময় আছে। রাতের খাওয়া-

দাওয়া আমরা ট্রেনেই সারব। কাজেই রান্নাবান্নার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি যদি সঙ্গে কিছু নিতে চাও, নিতে পারো। একটা মাঝারি ধরনের স্যুটকেস গুছিয়ে নাও।

আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

বিধি চ ২১১/২; আমাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।

ইরিনা চুপ করে গেল। একবার ইচ্ছা হলো গলা ফাটিয়ে কাঁদে। কিন্তু কী হবে কেঁদে ? কে শুনবে ?

তুমি কি সঙ্গে কিছুই নেবে না ?

না।

খুব ভালো কথা। ভ্রমণের সময় মালপত্র যত কম থাকে, ততই ভালো। সবচেয়ে ভালো যদি কিছুই না থাকে। হা হা হা।

ইরিনা বলল, আমি কোনো অন্যায় করিনি। দুই শ' পঞ্চাশটি বিধির প্রতিটি মেনে চলি। শৃঙ্খলা বোর্ড একবারও আমাকে সাবধান কার্ড পাঠায়নি। আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন ?

তুমি প্রতিটি বিধি মেনে চলো, এটা ঠিক বললে না। এই মুহূর্তে তুমি বিধি ভঙ্গ করেছ। আমাকে প্রশ্ন করেছ।

আর করব না।

এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কথা। কাঁদছ কেন তুমি ?

আমি কাঁদতেও পারব না ? বিধিতে কিন্তু কাঁদতে পারব না, এমন কথা নেই।

তা নেই। তবে কাঁদলেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। আমি তা চাই না। আমি চাই খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তুমি আমার সঙ্গে হাঁটবে। আমি চমৎকার সব হাসির গল্প জানি। সেইসব গল্প তোমাকে পথে যেতে যেতে বলব। শুনে হাসতে হাসতে তুমি আমার হাত ধরে হাঁটবে।

ইরিনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, দয়া করে বলুন, আমি কী করেছি।

লোকটি শান্ত গলায় বলল, আমি জানি না তুমি কী করেছ। সত্যি আমি জানি না। আমাকে শুধু বলা হয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে।

কোথায় ?

সেটা তোমাকে বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। সহজ কথায় তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।

কী করে বুঝলেন ?

তোমাকে নেওয়ার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেই কারণেই অনুমান করছি। আমি কোনো হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নই, আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

আমাকে এইসব কেন বলছেন ?

যাতে অকারণে তুমি ভয় না পাও, সেজন্যে বলছি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ঠিক তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে। তার চোখও নীল। সে-ও তোমার মতো সুন্দর।

আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনার কোনো মেয়ে নেই। কেউ মিথ্যা বললে আমি বুঝতে পারি। মিথ্যা বলার সময় মানুষের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়।

তুমি ঠিকই বলেছ। আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আমি অবিবাহিত।

ইরিনা শান্তস্বরে বলল, আপনি কি দয়া করে বলবেন, আমার বাবা-মা এই বাড়িতে ফিরে আসবেন কি না ?

আমার মনে হয়, তারা ফিরে আসবে না।

ঘরে তালা লাগানোর তাহলে আর কোনো প্রয়োজন নেই, তাই না ?

আমার মনে হয়, নেই।

আমি নিজেও বোধহয় আর কোনোদিন এ বাড়িতে ফিরে আসব না।

সেই সম্ভাবনাই বেশি।

চলুন আমরা রওনা হই।

আমার হাত ধরো।

ইরিনা তার হাত ধরল। লোকটি বিনা ভূমিকায় একটা হাসির গল্প শুরু করল। লোকটির গল্প বলার ঢং অত্যন্ত চমৎকার। ইচ্ছা না করলেও শুনতে হয়। একজন মানুষ কী করে হঠাৎ একদিন ছোট হতে শুরু করল সেই গল্প। ছোট হতে হতে মানুষটা একটা পিঁপড়ের মতো হয়ে গেল। তার চিন্তাভাবনাও হয়ে গেল পিঁপড়ের মতো। বড় কিছু এখন সে আর ভাবতে পারে না।

বাইরে বেশ ঠান্ডা। কনকনে বাতাস বইছে। একটা ভারি জ্যাকেট ইরিনার গায়ে। লাল রঙের মাফলারে কান ঢাকা, তবু তার শীত করছে। রাস্তাঘাটে লোকজন দ্রুত কমছে। রাত আটটার ভেতর একটি লোকও থাকবে না। থাকার নিয়ম নেই। ফেডারেল আইন। বেরুতে হলে কমিউন থেকে পাস নিতে হয়। সেই পাস কখনো পাওয়া যায় না। রাতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ডাক্তার এসে চিকিৎসা করেন, তাকে হাসপাতালে যেতে হয় না। তবু মাঝেমধ্যে কেউ কেউ বের হয়। তারা আর ফিরে আসে না। কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে!

তোমার শীত লাগছে ইরিনা ?

না।

তুমি কিন্তু কাঁপছ ?

আমার শীত লাগছে না।

তুমি কিন্তু এখনো আমার নাম জানতে চাওনি।

আপনার নাম দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

তা খুবই ঠিক। তোমার বয়স কত ইরিনা ?

ইন্টেলিজেন্সের লোক যখন কারও কাছে আসে, তখন তার নাম এবং বয়স জেনেই আসে।

ঠিক। খুবই সত্যি কথা। তোমার বয়স এপ্রিলের তিন তারিখে আঠার হবে।

ইরিনা হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, আপনি আর কী কী জানেন আমার সম্বন্ধে ?

তুমি লাল ও বেগুনি—এই দুটি রঙ খুব পছন্দ করো। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। তোমার পছন্দের বিষয় হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস। তুমি এই বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছ। তুমি খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে এবং তুমি...

থাক, আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না।

লোকটি হাসতে লাগল। যেন বেশ মজা পেয়েছে। সিকিউরিটির একটি গাড়ি তাদের সামনে এসে থামল, কিন্তু লোকটির হাসি বন্ধ হলো না। গাড়ি থেকে দুজন অফিসার লাফিয়ে নামল। দুজনের চেহারাই সুন্দর। চকলেট রঙের ইউনিফর্মেও তাদের ভালো লাগছে।

আপনাদের সান্ধ্য পাস দেখতে চাই।

এখনই সান্ধ্য পাস দেখতে চান ? আটটা এখনো বাজেনি। আটটা বাজতে দিন।

অফিসার দুজনের মুখ কঠোর হয়ে গেল। একজন তাকাল তার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গী তীক্ষ্ণগলায় বলল, যা করতে বলা হয়েছে, করুন।

ইরিনা দেখল ইন্টেলিজেন্সের লোকটি ওদের দুজনকে কী যেন দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসার দুজনেই হকচকিয়ে গেল। একজনের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে পড়ল। সে টেনে টেনে বলল, স্যার, আপনারা কোথায় যাবেন বলুন, আমরা পৌঁছে দেব।

আমার হাঁটতে ভালো লাগছে।

তাহলে আমরা কি আপনার পেছনে পেছনে আসব ?

তারও কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

ইরিনা লক্ষ করল, লোক দুটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যেন তারা চোখের সামনে ভূত দেখছে। একজন পকেট থেকে রুমাল বের করে এই শীতেও কপালের ঘাম মুছল। ইরিনা অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার পর পেছন ফিরে দেখল, অফিসার দুজন তখনো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাদের দেখছে। একজন ওয়াকিটকি বের করে কী যেন বলছে। সম্ভবত তাদের কথাই বলছে। কারণ এরপর বেশ কিছু সিকিউরিটির লোকজনের সঙ্গে দেখা হলো। তারা কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। স্যালিউট দিয়ে

মূর্তির মতো হয়ে গেল। ইরিনার সঙ্গের লোকটি প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলল। যেমন—

কি, তোমরা ভালো ? আজ বেশ শীত পড়েছে মনে হয়। আবহাওয়ার প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে, তাই না ?

এরা এইসব কথাবার্তার উত্তরে কিছু বলছে না। শুধু মাথা নাড়ছে। যেন কথা বলাই একটা ধৃষ্টতা। ইরিনা একসময় বলল, ওরা আপনাকে দেখে এরকম করছে কেন ?

তোমাকে তো বলেছি আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

আপনার কী নাম ?

তুমি একটু আগেই বলেছ, আমার নাম জানতে তুমি আগ্রহী নও। কি, বলোনি এমন কথা ?

বলেছি।

এখন নাম জানতে চাও ?

আপনার যদি ইচ্ছা হয় বলতে পারেন।

ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়, তুমি জানতে চাও কিনা সেটা বলো।

না থাক, আমি জানতে চাই না।

আমার নাম অরচ লীওন।

ইরিনা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। অরচ লীওন হচ্ছেন গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। তাঁর নাম না জানার কোনো কারণ নেই। এরকম একজন মানুষ তার মতো সাধারণ একটি মেয়েকে নিতে এসেছেন, কেন ?

ইরিনা, তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?

না, কষ্ট হচ্ছে না।

শীত লাগছে, তাই না ?

জি লাগছে।

এই তো এসে পড়েছি। ট্রেনে উঠলেই দেখবে ভালো লাগছে।

ভালো লাগলেই ভালো।

আর একটা গল্প বলব, শুনবে ?

বলুন।

তারা শহরের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। স্টেশনের লাল বাতি দেখা যাচ্ছে। বাতি জ্বলছে ও নিভছে। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। কুয়াশা ঘন হয়ে পড়ছে। ইরিনা ফিসফিস করে বলল, আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনোদিন ফিরে আসব না।

২

ট্রেন ছুটে চলেছে।

গতি একশ কিলোমিটারের কাছাকাছি। আলট্রা-ভায়োলেট প্রতিরোধী স্বচ্ছ কাচের জানালার পাশে ইরিনা বসে আছে। বাইরের পৃথিবীর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অরচ লীওন বললেন, তুমি বোধহয় এই জীবনের প্রথম ট্রেনে চড়লে।

হ্যাঁ। আমি প্রথম শহরের মানুষ। ট্রেনে চড়ার সৌভাগ্য আমার হবে কেন?

তা ঠিক। কেমন লাগছে তোমার?

কোনোরকম লাগছে না।

জানালার পাশে বসে কিছুই দেখতে পাবে না। বাইরে আলো নেই। এখন কৃষ্ণপক্ষ। অবশ্য চাঁদ থাকলেও কিছু দেখতে পেতে না, আমরা যাচ্ছি ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সেটা খুব সুখকর দৃশ্য নয়। এইজন্যেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে যেসব ট্রেন চলাচল করে, তা করে রাতে, যাতে আমাদের কিছু দেখতে না হয়।

আপনি শুধু শুধু কথা বলবেন না। আপনার কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

খাবার দিতে বলি?

না।

কিছু খাবে না?

না, আমার খিদে নেই।

আমার খিদে পেয়েছে। আমি খাবার গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি যদি মত বদলাও, তাহলে চলে এসো। করিডর ধরে আসবে, সবচেয়ে শেষের কামরাটি খাবার ঘর। রোবট অ্যাটেনডেন্ট আছে। ওদের বললে ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।

ইরিনা যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। তাদের কামরায় টিভি স্ক্রিনে ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা দিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। অন্যসময় হলে খুব আগ্রহ নিয়ে সে শুনত, আজ শুনতে ইচ্ছা করছে না। কীভাবে টিভি সেটটি বন্ধ করা যায়, তাও তার জানা নেই। বাধ্য হয়ে শুনতে হচ্ছে। কী হবে শুনে। এর সবই তার জানা। ইতিহাসের ক্লাসে সে পড়েছে। খুব আগ্রহ নিয়েই পড়েছে। টিভির এই লোকটি বলছে খুব সুন্দর করে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠ। যেন ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটি সে প্রত্যক্ষ করছে।

বন্ধুগণ! ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে আজ আপনারা যারা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছেন, তাঁদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজ থেকে চারশ বছর আগে এখানে কোলাহলমুখর জনপদ ছিল। অঞ্চলটিকে বলা হতো এশিয়া মাইনর।

আজ থেকে চারশ বছর আগে দু'হাজার পাঁচ সালে পৃথিবী নামের আমাদের এই সুন্দর গ্রহটিতে নেমে এল ভয়াবহ দুর্যোগ, আণবিক যুগের শুরুতেই যে দুর্যোগের আশঙ্কা সবাই করছিল। শান্তিকামী মানুষ ভাবত, একসময় না একসময় আণবিক যুদ্ধ শুরু হবে। সেটিই হবে মানবজাতির শেষ দিন। দু'হাজার পাঁচ সালে তাঁদের আশঙ্কাই

সত্যি হলো। তবে তাঁরা যেভাবে ভেবেছিলেন, সেভাবে নয়। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ হলো না। কোনো এক অজানা কারণে জমা করে রাখা আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ শুরু হলো। হাজার হাজার বছরের সভ্যতা ধ্বংস হতে সময় লাগল মাত্র এগার মিনিট।

ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তী বছরকে বলা হয় অন্ধকার বছর। কারণ সে-বছর সূর্যের কোনো আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাল না। ধুলাবালি, আণবিক ভস্ম সূর্যকে আড়াল করে রাখল। কাজেই ধ্বংস হলো সবুজ গাছপালা। সবুজ গাছপালার ওপর নির্ভরশীল জীবজন্তু। পরবর্তী একশ বছরের তেমন কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি অসম্ভব জীবনীশক্তি নিয়ে কিছু কিছু মানুষ বেঁচে রইল। তারা শুরু করল নতুন ধরনের জীবনব্যবস্থা। প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর ও তৃতীয় শহরভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। মানুষের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করতে, সীমিত সম্পদের মধ্যেও তাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্যে এই ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার কোনো উপায় ছিল না।

প্রিয় বন্ধুগণ, এখন আপনাদের দু'হাজার পাঁচ সালে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলো সম্পর্কে বলছি। এই কারণগুলোর কোনোটিই প্রমাণিত নয়। সবই অনুমান। প্রথম বলছি মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বিস্ফোরণসংক্রান্ত হাইপোথিসিস।...

এই পর্যায়ে টিভি পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল। পরক্ষণেই সেখানে ভেসে উঠল অরচ লীওনের মুখ।

ইরিনা। এই ইরিনা।

বলুন।

একা-একা খেতে ভালো লাগছে না, তুমি চলে এসো।

বললাম তো আমার খিদে নেই।

খিদে না লাগলে খাবে না। বসবে আমার সামনে। কিছু জরুরি কথা তোমাকে বলব।

বলুন, আমি শুনছি।

সামনাসামনি বসে বলতে চাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ, এই সম্পর্কে তোমাকে কিছু ধারণা দেব।

অনেকবার আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তো কিছু বলেননি।

এখন বলব। সবসময় সব কথা বলা যায় না। চলে এসো। দেরি করো না।

টিভি পর্দায় আবার সেই আগের লোকটির মুখ ভেসে উঠল। সে একটি বোর্ডে কী-সব আঁকছে এবং একঘেয়ে স্বরে বলছে—মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে পৃথিবীতে আসে ওজনস্তর ভেদ করে। ওজনস্তর হচ্ছে মূলত অক্সিজেনের একটি রূপান্তরিত অণুর হালকা আস্তর। এই অণুগুলোর প্রতিটিতে আছে তিনটি করে অক্সিজেন পরমাণু...।

লোকটির কথা খুব একঘেয়ে লাগছে। ইরিনা উঠে পড়ল। সে খাবার গাড়িতেই যাবে। করিডরে অ্যাটেনডেন্ট রোবট বলল, ইরিনা, তুমি কোথায় যাবে ?

ইরিনা মোটেই চমকাল না। এই রোবটের কাজই হচ্ছে, ট্রেনের সব কজন যাত্রীর খোঁজখবর রাখা। ইরিনা বলল, খাবার গাড়িতে যাব।

আমি কি তোমার সঙ্গে যাব ?

দরকার নেই।

তুমি মনে হচ্ছে ট্রেনভ্রমণ ঠিক উপভোগ করছ না।

না, করছি না।

খুবই দুঃখিত হলাম। ট্রেনভ্রমণকে আনন্দদায়ক করবার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি ?

না।

রোবটটি সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ইরিনার অস্বস্তি লাগছে। একটা যন্ত্র যখন মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতো ভাবে, তখন অস্বস্তি লাগে।

ইরিনা, তুমি কি প্রথম শহরের নাগরিক ?

হ্যাঁ, আমি প্রথম শহরের।

তোমাকে অভিনন্দন। খুব অল্পবয়সেই তুমি দ্বিতীয় শহরে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছ।

অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ কেন ?

একটি কথা বলবার জন্যে আসছি। আমার মনে হয়, কথাটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে।

বলো শুনছি।

তুমি অত্যন্ত রূপবতী।

ইরিনা শান্তস্বরে বলল, তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি তোমাকে নিয়ে চার লাইনের একটা কবিতা লিখেছি। আমি খুব খুশি হব, কবিতাটি তুমি যদি গ্রহণ করো।

বেশ তো, দাও।

রোবটটি একটি কার্ড বাড়িয়ে দিল ইরিনার দিকে। তারপর বেশ লাজুক ভঙ্গিতেই তার জায়গায় ফিরে গেল। ইরিনা কবিতায় চোখ বোলাল—

আদৌ প্রেমের প্রয়োজন আছে কি না
নিশ্চিত আজও হয়নি আমার মন।
প্রেম থেকে তবু পৃথক করিয়া ঘৃণা
ভালোবাসিতেই চেয়েছি সর্বক্ষণ॥

ইরিনা লক্ষ করল, তার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। একটু যেন খিদেও পাচ্ছে। হালকা ধরনের কোনো খাবার খাওয়া যেতে পারে।

ইরিনা নিঃশব্দে খাচ্ছে।

অরচ লীওন হাসিমুখে তা লক্ষ করছেন। তাঁর হাতে এক মগ ঝাঁঝালো ধরনের পানীয়, অবসাদ দূর করতে যার তুলনা নেই।

ইরিনা।

বলুন।

এখানকার খাবারগুলো কেমন ?

ভালো।

তোমাকে এখন খানিকটা প্রফুল্ল লাগছে। তার কারণ জানতে পারি কি ?

কোনো কারণ নেই।

কারণ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না ইরিনা। আমার মনে হয় ওই রোবটটার সঙ্গে তোমার প্রফুল্লতার একটা সম্পর্ক আছে। ওর দায়িত্ব হচ্ছে ট্রেনযাত্রীদের সবাইকে প্রফুল্ল রাখা। ও প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। ওর নানান কায়দাকানুন আছে। তোমার বেলা নিশ্চয়ই সব কায়দাকানুনের কোনো একটা খাটিয়েছে। তোমার বেলা কী করেছে ? গান গেয়েছে না কবিতা লিখে দিয়েছে ?

ইরিনা তার জবাব না দিয়ে বলল, আমি কোথায় যাচ্ছি ?

খাওয়া শেষ করো, তারপর বলব।

আমি এখনই শুনতে চাই।

তুমি যাচ্ছ নিষিদ্ধ নগরীতে।

ইরিনার গা দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। তার মনে হলো, সে ভুল শুনছে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। অরচ লীওন বললেন, তুমি যাচ্ছ নিষিদ্ধ নগরীতে। আমি তোমাকে তৃতীয় নগরী পর্যন্ত নিয়ে যাব। সেখান থেকে রোবটবাহী বিশেষ বিমানে করে তুমি নিষিদ্ধ নগরীতে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, কারণ নিষিদ্ধ নগরীতে যাওয়ার অনুমতি আমার নেই। ইরিনা, তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কত ভাগ্যবতী ?

না, আমি বুঝতে পারছি না।

গত চারশ বছরে দশ থেকে বারোজন মানুষের এই সৌভাগ্য হয়েছে।

তারা কেউ ফিরে আসেনি। কাজেই আমরা জানি না, তা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য।

এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে যারা আবার ঠিক করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় শাসনব্যবস্থা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁদের চোখের সামনে দেখবে। হয়তো তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে। এটা কি একটা বিরল সৌভাগ্য নয় ?

এত মানুষ থাকতে আমি কেন ?

তা তো জানি না। তবে বিশেষ কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। নিষিদ্ধ নগরীতে যাঁরা আছেন তাঁরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে জানেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার ভেতর কিছু দেখেছেন।

আমার মধ্যে কিছুই নেই।

তুমি কি পানীয় কিছু খাবে ?

না।

তোমাকে সাহস দেওয়ার জন্যে আরেকটি খবর দিতে পারি।

দিতে পারলে দিন।

নিষিদ্ধ নগরীতে তুমি একা যাচ্ছ না, তোমার একজন সঙ্গী আছে। এই প্রথম একসঙ্গে তোমরা দুজন যাচ্ছ। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তোমার সেই সঙ্গী এই মুহূর্তে এই ট্রেনেই আছে। তুমি কি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাও ?

চাই।

সে আছে ছয় নম্বর কামরায়। সে একা-একাই আছে। তুমি একাই যাও।

আপনি কি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন না ?

না। নিজেই পরিচয় করে নাও।

ইরিনা উঠে দাঁড়াল। অরচ লীওন বললেন, আমি কি কোনো ধন্যবাদ পেতে পারি ?

আপনাকে ধন্যবাদ অরচ লীওন।

আরেকটি খবর তোমাকে দিতে পারি। এই খবরে তুমি আরও খুশি হবে।

ইরিনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এই কথায় আবার বসল। অরচ লীওন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার বাবা-মা ভালো আছেন। তাঁদের দ্বিতীয় শহরের নাগরিক করা হয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি টেলিফোন করে খোঁজ নিতে পারো। ট্রেন থেকেই তা করা যাবে।

ইরিনা তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না। অরচ লীওন বললেন, তুমি কি খুশি ?

হ্যাঁ, আমি খুশি। এই খবরটি আপনি আমাকে শুরুতে বললেন না কেন ?

শুরুতে তোমাকে আমি ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি যাতে ভয়ে, দুঃখে, কষ্টে তুমি অস্থির হয়ে যাও।

তাতে আপনার লাভ ?

লাভ অবশ্যই আছে। বিনা লাভে আমি কিছু করি না। শুরুতে প্রচণ্ড ভয় পেলে শেষের আনন্দের খবরগুলো খুব ভালো লাগে। তোমার এখন তাই লাগছে। তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছ। এখন আমি যদি তোমাকে কোনো অনুরোধ করি, তুমি তা রাখবে।

কী অনুরোধ করবেন ?

নিষিদ্ধ নগরীতে তুমি কী দেখলে, তা আমি জানতে চাই। কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে তুমি আমাকে তা জানাবে।

কেন জানতে চান ?

কৌতূহল। শুধুই কৌতূহল, আর কিছুই না। এসো তোমার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলা যাক।

টেলিফোনে খুব সহজেই যোগাযোগ করা গেল। ইরিনার বাবা কথা বললেন। তাঁর গলায় বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। তিনি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন, খুব বড় একটা খবর আছে মা, আমি এবং তোমার মা দুজনই দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হয়েছি। কাগজপত্র পেয়ে গেছি।

খুবই আনন্দের কথা বাবা।

তোর মা তো বিশ্বাসই করতে পারছে না। আনন্দে কাঁদছে।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

আগামীকাল বাসায় একটা উৎসবের মতো হবে। পরিচিতরা সব আসবে। উৎসবের জন্যে পঞ্চাশ মুদ্রা পাওয়া গেছে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। ঘর সাজাচ্ছি, আজ রাতে আর ঘুমাব না।

ইরিনা ক্ষীণস্বরে বলল, আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না ? আমি কোথায় আছি, কী করছি।

এ তো আমরা জানি। জিজ্ঞেস করব কী ?

কী জানো ?

বিশেষ কাজে তোকে নেওয়া হচ্ছে। কাজ শেষ হলে তোকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে দেবে।

ইরিনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবা রেখে দিই।

তোর মার সঙ্গে কথা বলবি না ?

না। বেচারি আনন্দে কাঁদছে, কাঁদুক। ভালো থেকো তোমরা। শুভ রাত্রি।

ইরিনা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। বাবার ওপর সে কিছুতেই রাগ করতে পারছে না। প্রথম নাগরিক থেকে দ্বিতীয় নাগরিকের এই সৌভাগ্যে তাঁর বোধহয় মাথাই এলোমেলো হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

নাগরিকত্বের তিনটি পর্যায় আছে। সবাইকেই এই তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথম শহরের নাগরিকত্ব। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ। মাঝখানে চল্লিশ মিনিটের ছুটি। সীমিত খাবারদাবার। ছুটির দিনে সপ্তাহের রেশন নিয়ে আসতে হয়। এক সপ্তাহ আর কোনো খাবার নেই।

সপ্তাহের রেশন কৃপণের মতো খরচ করতে হয়। খাবারের কষ্টই সবচেয়ে বড় কষ্ট। তারপর আছে নিয়মকানুন মেনে চলার কষ্ট। একটু এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। কার্ডে লাল দাগ পড়ে যাবে। পনেরটি লাল দাগ পড়ে গেলে এ জীবনে আর দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হওয়া যাবে না। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে কার্ডটি পরিষ্কার রাখতে। সম্ভব হয় না। যেসব ভাগ্যবান ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তা পারেন, তাঁরা দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হিসেবে নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় শহরে প্রচুর খাবারদাবার। ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও শেষ করা যায় না। রেশনের ব্যবস্থা নেই। যার যা প্রয়োজন, বাজার থেকে কিনে আনবে। কাজ করতে হবে মাত্র ছয় ঘণ্টা। নিয়মকানুনের কড়াকড়ি এখানে নেই। বড় রকমের অপরাধের শাস্তি জরিমানা। বছরে এক মাস দেওয়া হয় ভ্রমণ পাস। সেই পাস নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ানো যায়। একটি টাকাও খরচ হয় না। আর উৎসব তো লেগেই আছে। দ্বিতীয় শহরের জীবনে ক্লান্তি বা অবসাদ বলে কিছু নেই। এই শহরের নাগরিকরা দুঃখ ব্যাপারটা কী জানেই না, এরা শুধু স্বপ্ন দেখে তৃতীয় শহরের। কুড়ি বছর দ্বিতীয় শহরে বাস করতে পারলেই তৃতীয় শহরে যাওয়ার যোগ্যতা হয়। কিন্তু সবাই যেতে পারে না। ভাগ্যবানদের ঠিক করা হয় লটারির মাধ্যমে। লটারিটা হয় বছরের শেষ দিনে। প্রচণ্ড আনন্দ ও উত্তেজনার একটি দিন। এক দল নির্বাচিত হন তৃতীয় শহরের জন্যে, তাঁদের ঘিরে সারারাত আনন্দ-উল্লাস চলে।

যাঁরা নির্বাচিত হন না, তাঁরাও খুব-একটা মন খারাপ করেন না। পরের বছর আবার লটারি হবে। সেই আশায় বুক বাঁধেন।

তৃতীয় শহরের সুখ-সুবিধা কেমন, সে-সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দ্বিতীয় শহরের নাগরিকদেরও নেই। তাঁরা শুধু জানেন, তৃতীয় শহর হচ্ছে স্বর্গপুরী। চির অবসর ও চির আনন্দের স্থান। সবাই ভাবেন—মৃত্যুর আগে একবার যেন তৃতীয় শহরে ঢুকতে পারি।

ইরিনা ছয় নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। কলিংবেল থাকা সত্ত্বেও সে দরজায় মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে একজন কে শিশুর মতো গলায় বলল, কে ?

আমি ইরিনা। আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।

এখন তো কথা বলতে পারব না। আমি এখন ঘুমুব।

প্লিজ, একটু দরজা খুলুন। আমার খুব দরকার।

দরজা খুলে গেল। অসম্ভব রোগা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মোটা কাচের চশমা। লোকটি রুক্ষ গলায় বলল, তুমি কী চাও ?

ইরিনা তার জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। লোকটি অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

ট্রেনের গতিবেগ ক্রমেই বাড়ছে। বাতাসে শিসের মতো শব্দ হচ্ছে। এমন প্রচণ্ড গতি, যেন এই ট্রেন এক্ষুনি মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে। ইরিনা বলল, আমি কি বসতে পারি ?

৩

ছেলেটি হাবাগোবার মতো। কিছু কিছু বয়স্ক মানুষ আছে, যাদের দেখলেই মনে হয় এরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা হাস্যকর কিছু করবে। এবং এটা যে হাস্যকর, তা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাবে। একেও সেরকম লাগছে। মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই চশমা নাকের ডগায় চলে এসেছে। দেখতে অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে চশমা এই বুঝি খুলে পড়ল।

আমি কি আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি ?

ছেলেটি বিরক্ত স্বরে বলল, একবার তো বললাম আমি ঘুমুব।

আপনার ঘুম কি এতই জরুরি ?

ঘুম জরুরি না! ঠিক সময়ে ঘুমুতে যাওয়া উচিত এবং ঠিক সময় ঘুম থকে ওঠা উচিত।

আজ না হয় একটু ব্যতিক্রম হলো। বসব ?

আমি না বললে কি তুমি শুনবে ?

ছেলেটির মুখে 'তুমি' শব্দটি খুব স্বাভাবিক শোনাল। খট করে কানে বাজল না। যেন এ অনেকদিন থেকেই ইরিনাকে চেনে, তুমি করে ডাকে।

জরুরি কথাটি কী ?

আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমিও সেখানে যাচ্ছি। আমি নিষিদ্ধ নগরীতে যাচ্ছি।

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, এটা এমন কী জরুরি কথা!

আপনার কাছে খুব জরুরি মনে হচ্ছে না ?

না তো!

আপনি খুবই বোকা।

তা ঠিক না। আমি বোকা হব কেন ? আমার অনেক বুদ্ধি। এইজন্যেই তো আমাকে নিষিদ্ধ নগরীতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বোকা হলে আমাকে নিয়ে যেত ?

ইরিনার ইচ্ছা হলো উঠে চলে যেতে। যাওয়ার আগে এই হাঁদারামের গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে।

ছেলেটি বেশ অবাক হয়েই বলল, এই খুকি, আমার যে বুদ্ধি আছে, এটা তুমি বিশ্বাস করছ না কেন ?

কোনো বুদ্ধিমান লোক কখনো বলে না, আমার খুব বুদ্ধি। শুধুমাত্র হাঁদারাই সেরকম বলে।

একজন বুদ্ধিমান লোক যদি বলে আমার খুব বুদ্ধি, তাতে দোষের কী ?

না, কোনো দোষ নেই, আপনি যত ইচ্ছা বলুন। আর দয়া করে আমাকে তুমি তুমি করে বলবেন না।

ইরিনা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি দুঃখিত স্বরে বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ, এইজন্যে আমার খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করোনি। আমি প্রমাণ করে দেব যে আমার বুদ্ধি আছে ?

আপনাকে কিছু প্রমাণ করতে হবে না।

না না শোনো, শুনে যাও। আমার সম্পর্কে তোমার একটা ভুল ধারণা থাকবে, এটা ঠিক না। আমি এই ঘণ্টাখানেক আগে কী করে একটা বুদ্ধিমান রোবটকে বোকা বানালাম এটা শোনো।

ইরিনা কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ছেলেটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছে, ট্রেনে একটা রোবট আছে দেখোনি ? ব্যাটা আমার সাথে রসিকতা করবার চেষ্টা করছিল, আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করল।

আর আপনি চট করে জবাব দিয়ে দিলেন ?

না। আমি উল্টো তাকে একটা ধাঁধা দিলাম, ব্যাটার প্রায় মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

কী ধাঁধা ?

আমি বললাম, একটা সাপ হঠাৎ তার নিজের লেজটা গিলতে শুরু করল। পুরোপুরি যখন গিলে ফেলবে, তখন কী হবে ? রোবটটার আক্কেল গুড়ুম। ভেবে পাচ্ছে না কী হবে। একবার বলছে সাপটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলছে, তা কী করে হয় ?

এই আপনার বুদ্ধির নমুনা ?

হ্যাঁ। দ্বৈত সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছি মাথায়। একটা রোবটকে বোকা বানাবার এই বুদ্ধি কি তোমার মাথায় আসত ?

না, আসত না।

তাহলে তোমার কি মনে হয়, আমি বুদ্ধিমান ?

ইরিনা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। ইচ্ছা হলো বলে, আপনি এর কোনোটাই না, আপনি পাগল। তা বলা গেল না।

তোমার নামটা যেন কী ? আমাকে কি আগে বলেছিলে, না বলোনি ?

আমার নাম ইরিনা। শুরুতেই একবার বলেছি।

আমার নাম জানতে চাও ?

আপনি শুতে চাচ্ছিলেন—ঘুমান। আমি এখন যাব।

আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। একবার ঘুম নষ্ট হলে অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। শোনো, আমার নাম অখুন-মীর। তুমি আমাকে মীর ডাকবে। আমার বন্ধুরা আমাকে মীর ডাকে। মীর উচ্চারণটা হবে একটু টেনে টেনে। ম-ী-ী-ী-র—এরকম, বুঝতে পারলে ?

পারলাম।

বসো এখানে।

ইরিনা বসল। কেন বসল নিজেই জানে না। বসার তার কোনোরকম ইচ্ছা ছিল না।

শোনো ইরিনা, নিষিদ্ধ নগরীতে যেতে হচ্ছে বলে তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ? আমাদের ওদের প্রয়োজন বলেই নিয়ে যাচ্ছে। শাস্তি দেওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই নিচ্ছে না। শাস্তি দেওয়ার হলে প্রথম শহরেই দিতে পারত। পারত না ?

হ্যাঁ, পারত।

আমাদের যে-কোনো কারণেই হোক ওদের প্রয়োজন।

ইরিনা বলল, ওরা মানে কারা ?

মীর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল। যেন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবছে, উত্তরটা মাথায় এলেই বলবে। বসে আছে তো বসেই আছে। ইরিনার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, লোকটি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ির ঢুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষটাকে। কুঁজো হয়ে বসেছে। থুতনিটা ওপরের দিকে তোলা। হাত দুটি এলিয়ে দিয়েছে।

আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

না। ভাবছি।

ভেবে কিছু বের করতে পারলেন ?

না। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি, আমরা আসলে কিছুই জানি না। আমাদের যখন অসুখ হয়, একজন রোবট ডাক্তার এসে আমাদের চিকিৎসা করে। কেন আমাদের অসুখ হয়, কীভাবে আমাদের অসুখ সারানো হয়—তার কিছুই আমরা জানি না। কোনো যন্ত্রপাতি যখন নষ্ট হয়, একজন রোবট এসে তা ঠিক করে। যন্ত্রপাতিগুলো কী, কীভাবে কাজ করে, তাও আমরা জানি না। এখন কথা হলো, কেন জানি না।

কেন ?

কারণ আমাদের জানতে দেওয়া হয় না। আমরা স্কুলে পড়াশোনা করি। কী পড়ি ? লিখতে পড়তে শিখি। সামান্য অঙ্ক শিখি। প্রথম শহরের বিধিগুলো মুখস্থ করি। ব্যস, এই পর্যন্তই। তাই না ?

হ্যাঁ তাই।

বুঝলে ইরিনা, আমি একবার আমার স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার টেলিফোন কীভাবে কাজ করে ? স্যার অবাক হয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, টেলিফোন তৈরি করা হয়েছে মানুষের সেবার জন্যে। তৈরি হয়েছে নিষিদ্ধ নগরে। নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কৌতূহল সপ্তম বিধি অনুসারে একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ। তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করেছ। এই বলে তিনি আমার কার্ডে একটা দাগ দিয়ে দিলেন। হা হা হা।

ইরিনা বিরক্ত হয়ে বলল, হাসছেন কেন ? এটা কি হাসার মতো কোনো ঘটনা ? কার্ডে দাগ পড়া তো খুবই কষ্টের ব্যাপার। পনেরটার বেশি দাগ পড়লে আপনি কখনো দ্বিতীয় শহরে যেতে পারবেন না।

এইজন্যেই তো হাসছি। আমার কার্ডে মোট দাগ পড়েছে তেতাল্লিশটি। স্কুলে সবাই আমাকে কী বলে জানো ? সবাই বলে মিস্টার তেতাল্লিশ।

বিধি ভাঙাই বুঝি আপনার স্বভাব ?

না, তা না। আমার স্বভাবের মধ্যে আছে কৌতূহল। আমি কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করি। একবার কী করেছিলাম জানো ? পানি গরম করার একটা যন্ত্র খুলে ফেলেছিলাম।

কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ, সত্যি। প্রথম খুব ভয় লাগল। কত বিচিত্র সব জিনিস। একটা চাকতি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে। তিনবার ঘুরবার পর অন্য একটা বলের মতো জিনিস চলে আসে। সেটা খুব গরম।

আপনি হাত দিয়েছিলেন ?

হাত না দিলে বুঝব কী করে এটা গরম না ঠান্ডা!

এর জন্যে আপনার কী শাস্তি হলো ?

কোনো শাস্তি হলো না।

শাস্তি হলো না কেন ?

শাস্তি হলো না কারণ আমি আবার তা লাগিয়ে ফেলেছিলাম।

ইরিনা বিস্মিত হয়ে বলল, কীভাবে লাগালেন ?

যেভাবে খুলেছিলাম সেভাবে লাগালাম।

বলেন কী আপনি!

এইসব কাজ শুধু রোবটরা পারবে, আমরা পারব না, তা ঠিক না। আমাদের শেখালে আমরাও পারব। কিন্তু আমাদের কেউ শেখাচ্ছে না। এবং নানারকম বিধিনিষেধ দিয়ে দিয়েছে যাতে আমরা শিখতে না পারি। যেন আমরা এসব শিখে ফেললে কোনো বড় সমস্যা হবে।

এই হাবাগোবা ধরনের মানুষটির প্রতি ইরিনার শ্রদ্ধা হচ্ছে। এ আসলেই বুদ্ধিমান। সবাই যেভাবে একটা জিনিসকে দেখে, এ সেইভাবে দেখছে না। অন্যরকম করে দেখছে। সেই দেখার সবটাই যে ভুল, তাও না।

ইরিনা।

জি, বলুন।

তুমি কি লক্ষ করেছ এই রোবটগুলো শুধু দিনে কাজ করে, রাতে কিছু করে না?

না, আমি সেভাবে লক্ষ করিনি।

এরা দিনে কাজ করে। যখন এদের কোনো কাজ থাকে না, তখন রোদে দাঁড়িয়ে থাকে। এর মানে কী বলো তো?

জানি না।

কাজ করবার জন্যে যে শক্তি লাগে তা তারা রোদ থেকে নেয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তাই। একবার পরপর চারদিন ধরে খুব ঝড়বৃষ্টি হলো। সূর্যের মুখ দেখা গেল না। তখন অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, রোবটগুলো কোনো কাজ করতে পারছে না।

কিন্তু কিছু কিছু রোবট তো রাতেও কাজ করে। যেমন ডাক্তার রোবট।

হ্যাঁ, তা অবশ্য করে।

অখুন-মীর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। যেন এই কথাটা তার খুব মনে লেগেছে। ডাক্তার রোবটরা রাতে কাজ না করলেই যেন সে বেশি খুশি হতো। ইরিনা মানুষটিকে খুশি করবার জন্যে বলল, হয়তো আপনি আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব নিষিদ্ধ নগরীতে পেয়ে যাবেন। মীর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, জানি না। পাব বলে মনে হয় না। প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে চায় না। এবং মজার ব্যাপার কী জানো ইরিনা, মানুষের মাথায় যেন এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন না আসে, সেই চেষ্টা করা হয়।

কীভাবে করা হয়?

কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে তাদের রাখা হয়। কোনোরকম অবসর নেই। মানুষ চিন্তাটা করবে কখন? খাবার টিকিট জোগাড় করার দুশ্চিন্তাতেই মানুষের সব সময় কেটে যায়। জীবন কাটিয়ে দিতে চায় কার্ডে কোনো দাগ না ফেলে। চিন্তার সময় কোথায়?

তবুও কেউ কেউ তো এর মধ্যেই চিন্তা করে।

হ্যাঁ তা করে। আমি করি। আমার মতো আরও কেউ কেউ হয়তো করে। এমন কাউকে যদি পেতাম, কত ভালো হতো। কত কিছু জানার আছে।

মীর হাই তুলল। ইরিনা বলল, আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?

হ্যাঁ পাচ্ছে।

আমি কি তাহলে চলে যাব ?

মীর হেসে ফেলে বলল, তোমার মনে হয় যেতে ইচ্ছা করছে না।

ইরিনা লজ্জা পেয়ে গেল। তার সত্যি সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে না। এই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে আরও কিছু সময় থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু এই লোকটা তা টের পাওয়ায় খুব অস্বস্তি লাগছে।

ইরিনা।

জি বলুন।

তুমি কি বিয়ের পারমিট পেয়েছ ?

না, পাইনি। আমার বয়স উনিশ, একুশের আগে তো পারমিট পাব না।

আমার তেত্রিশ। আমিও পাইনি। সম্ভবত আমাকে পারমিট দেবে না। এই ব্যাপারটাও কিন্তু রহস্যময়। ওরা যাকে ঠিক করে দেবে, তাকেই বিয়ে করতে হবে। এতে নাকি সুস্থ সুন্দর নীরোগ মানুষ তৈরি হবে। সুখী পৃথিবী।

আপনি তা বিশ্বাস করেন না ?

না, করি না। ওদের বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করি না। আমি নিজের মতো চলতে চাই, নিজের মতো ভাবতে চাই। নিজের পছন্দের মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।

এরকম কোনো পছন্দের মেয়ে কি আপনার আছে ?

না, নেই। তোমাকে কিছুটা পছন্দ হয়। তবে তোমার মুখ গোলাকার। এরকম মুখ আমার পছন্দ না।

আর আপনি বুঝি রাজপুত্র ?

কী মুশকিল, তুমি রাগ করছ কেন ? তোমাকে আমার কিছুটা পছন্দ হয়েছে, এ খবরটা বললাম। এতে তো খুশি হওয়ার কথা।

আপনাকেও তো আমার পছন্দ হতে হবে ? আপনার নিজের চেহারাটা কেমন আপনি জানেন ? আয়নায় কখনো নিজের মুখ দেখেছেন ?

খুব খারাপ ?

না, খুব ভালো। একেবারে রাজপুত্র।

এত রাগছ কেন তুমি ? তোমাকে আমার কিছুটা পছন্দ হয়েছে, এটা বললাম। আমাকে তোমার অপছন্দ হয়েছে, এটা তুমি বললে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

এখন আমি যাচ্ছি।

খুব ভালো কথা, যাও। শুভ রাত্রি।

শুভ রাত্রি।

শোনো ইরিনা, এরকম রাগ করে চলে যাওয়াটা ঠিক না। যাওয়ার আগে মিটমাট করে ফেলা যাক।

কীভাবে মিটমাট করবেন ?

চলো খাবার গাড়িতে যাই। চা-কফি বা অন্য কোনো পানীয় খাওয়া যাক। যাবে ?

আমার ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলে থাক।

আচ্ছা ঠিক আছে চলুন।

ইচ্ছা করছে না, তবু যেতে চাচ্ছ কেন ?

ইচ্ছা না করলেও তো আমরা অনেক কিছু করি। যাকে সহ্য হয় না সরকারি নির্দেশে তাকে বিয়ে করি। ভালোবাসতে চেষ্টা করি।

তা করি। চলো যাওয়া যাক।

অ্যাটেনডেন্ট রোবটটির সঙ্গে করিডোরে দেখা হলো। মীর হাসিমুখে বলল, কি ধাঁধাঁটি পারলে ?

চেষ্টা করছি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি অবাস্তব সমস্যা দিয়েছেন। একটা সাপ নিজেকে পুরোপুরি গিলে ফেলবে কী করে ?

বেশ, তাহলে একটা বাস্তব সমস্যা দিচ্ছি। একটি বস্তু এক সেকেন্ডে চার ফুট যায়। পরবর্তী সেকেন্ডে যায় দুই ফুট, তার পরবর্তী সেকেন্ডে এক ফুট। এইভাবে অর্ধেক করে দূরত্ব কমতে থাকে। বিশ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে তার কত সময় লাগবে ?

রোবটটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মীর বলল, তুমি একটি মহাগর্দভ। এই ধাঁধার সমাধান করা তোমার কর্ম না। যাও ভাগো। ইরিনা খিলখিল করে হেসে উঠল। রোবটটির মনে হচ্ছে আত্মসম্মানে লেগেছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, চট করে তো আর সমস্যার সমাধান করা যায় না। আমাকে ভাববার সময় দিন।

সময় দেওয়া হলো। অনন্তকাল সময়। বসে বসে ভাবো।

দুজন মুখোমুখি বসেছে।

মীর কোনো কথা বলছে না। কপাল কুঁচকে কী জানি ভাবছে। গাড়ির গতি আগের চেয়ে কম। বাইরে নিকষ অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় ধ্বংসস্তূপ মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে। বীভৎস দৃশ্য, তাকানো যায় না।

ইরিনা লক্ষ করল অরচ লীওন ঠিক আগের জায়গায় বসে। তাঁর হাতে পানীয়ের গ্লাস। গ্লাসে গাঢ় সবুজ রঙের কী-একটা জিনিস, ক্রমাগত বুদবুদ উঠছে। অরচ

লীওন তাকিয়ে আছেন তাঁর গ্লাসের দিকে। একবার ইরিনার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। তিনি এমনভাবে তাকালেন, যেন চিনতে পারছেন না।

ইরিনা মৃদু স্বরে মীরকে বলল, ওই লোকটিকে কি আপনি চেনেন ?

কোন লোকটি ?

ওই যে কোণার দিকে বসে আছে। তক্ষকের মতো চোখ।

চিনব না কেন ? উনি আমার বাবা।

কী বলছেন! আমি তো জানতাম উনি অবিবাহিত।

উনি আমার বাবা। ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে বড় অফিসার। এরা হাসিমুখে রাতকে দিন করে। চেহারার মধ্যে তুমি মিল দেখছ না ? অবিবাহিত হবে কেন ?

ইরিনা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মীর খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, বাবার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

নেই কেন ?

আমার জন্মের দ্বিতীয় বছরে বাবাকে প্রথম শহর থেকে দ্বিতীয় শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার যখন আঠার বছর বয়স, তখন জানলাম তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। তৃতীয় শহরের নাগরিক হয়ে বসেছেন।

আপনার খোঁজখবর করেন না ?

কী করে করবে, তৃতীয় শহরের নাগরিক না ? তৃতীয় শহরের নাগরিকরা কি আর প্রথম শহরের কাউকে খুঁজতে পারে, আইনের বাধা আছে না ? তাছাড়া সে নিজেই হচ্ছে আইনের লোক।

আইনের লোক বলেই তো আইন ভাঙা সহজ।

তা ঠিক। সে আইন ভেঙেছে। আমার কার্ডে তেতাল্লিশটি দাগ পড়ার পরও কিন্তু আমি বেঁচে আছি। চল্লিশটি দাগ পড়ার পর সরকারি নিয়মে দোষী লোকটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। অবাঞ্ছিত কেউ বেঁচে থাকে না, অথচ আমি আছি। হা হা হা।

মীর এত শব্দ করে হেসে উঠল যে, লীওন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। তিনি বিরক্ত হয়েছেন কিনা তা বোঝা গেল না। তাঁর গ্লাসের পানীয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুইচ টিপে তিনি আরও পানীয় আনতে বললেন।

ট্রেনের গতি আবার বাড়তে শুরু করেছে। বাইরে রীতিমতো ঝড় হচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে। বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। ইরিনা লক্ষ করল মীর চোখ বন্ধ করে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে কিংবা কোনোকিছু নিয়ে ভাবছে। কী ভাবছে কে জানে।

ইরিনার এখন আর কেন জানি লোকটির চেহারা খারাপ লাগছে না। হয়তো চোখে সয়ে গেছে। ইরিনারও ঘুম পেয়ে গেল।

৪

চমৎকার সকাল।

সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। আকাশের রঙ ঘন নীল। ছবির মতো সুন্দর একটি শহরে ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেন থেকে নেমে তারা একটি ছোট্ট কাচের ঘরে ঢুকল। এখান থেকে চারদিক দেখা যায়। ইরিনা মুগ্ধ হয়ে গেল। কেউ তাকে বলে দেয়নি, কিন্তু সে বুঝতে পারছে এটা হচ্ছে তৃতীয় শহর। সুখের শহর, দুঃখ এখান থেকে নির্বাসিত। এর আকাশ-বাতাস পর্যন্ত অন্যরকম। সে মুগ্ধকণ্ঠে বলল, কী সুন্দর, কী সুন্দর!

মীর তার পাশেই, সে কিছু বলল না। হাই তুলল। রাতে তার ঘুম ভালো হয়নি। ঘুমঘুম লাগছে। তৃতীয় নগরীর সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করছে না।

ইরিনা বলল, এখন আমরা কোথায় যাব ?

মীর হাই চাপতে চাপতে বলল, তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন ? ওরা ব্যবস্থা করে রেখেছে। যথাসময়ে কোথাও চাপাবে। যথাসময়ে পৌঁছবে।

হাতে কিছু সময় থাকলে শহরটা ঘুরে দেখতাম।

আমি দেখাদেখির মধ্যে নেই, তোমাকে যেতে হবে একা। আমি ঘুমাবার চেষ্টা করছি। কোথাও যেতে চাইলে যাবে, আমাকে জাগাবে না।

মীর সত্যি সত্যি ঘুমুবার আয়োজন করল। তারা বসে আছে ছোট্ট একটা ঘরে। এত ছোট যে হাত বাড়ালে দেয়াল এবং ছাদ দুই-ই ছোঁয়া যায়। এতটুকু ঘরেও চার-পাঁচটা চেয়ার সাজানো। তেমন কোনো আরামদায়ক কিছু নয়। ঘরের দেয়াল অতি স্বচ্ছ কাচজাতীয় পদার্থে তৈরি। বাইরের সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। অরচ লীওন তাদের এখানে বসিয়ে রেখে উধাও হয়েছেন, আর কোনো খোঁজ নেই। ইরিনা একবার বেরুতে চেষ্টা করল। বেরুবার পথ পেল না। দরজা-টরজা এখন কিছুই নেই বলে মনে হচ্ছে। অথচ এই ঘরে ঢোকার সময় কোনো বাধা পাওয়া যায়নি।

মীর, আপনি কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

চেষ্টা করছি।

এটাকে কেমন যেন খাঁচার মতো মনে হচ্ছে। বেরুতে পারছি না।

বেরুবার দরকারটা কী ?

ইরিনার অস্বস্তি লাগছে, এমন নির্জন জায়গা। আশপাশে একটিও মানুষ নেই, অথচ বাইরের কত চমৎকার সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

মীর, আপনি এরকম চোখ বন্ধ করে থাকবেন ? আমার ভয় ভয় লাগছে।

ভয় ভয় লাগার কারণ কী ?

মানুষজন কিচ্ছু নেই।

মানুষজন ঠিকই আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। কাচের এই ঘরটায় বসে তুমি বাইরের যে সব দৃশ্য দেখছ, তা সত্যি নয়। বানানো, মেকি।

তার মানে!

তার মানে আমি জানি না। টেলিভিশনে যেমন ছবি দেখো, এখানেও তাই দেখছ। একটাও সত্যি নয়।

কী করে বুঝলেন ?

খুব সহজেই বুঝলাম। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছি ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে। রোবটটি আমাকে বলল সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে ট্রেন পৌঁছাবে। অথচ এই ঘরে বসে আমরা দেখছি সূর্য মাথার ওপরে।

তাই তো।

ইরিনা, পরিষ্কার চোখে দেখার চেষ্টা করো, এবং আমার মনে হয় এখন থেকে যা দেখবে তা-ই বিশ্বাস করার অভ্যাসটা ত্যাগ করলে ভালো হবে। এই দেখো আমাদের চারপাশের দৃশ্য এখন বদলে গেল।

ইরিনা মুগ্ধ হয়ে দেখল সত্যি সত্যি সব বদলে গেছে। তাদের চারপাশে এখন ঘন নীল সমুদ্র, ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্রসারস উড়ছে। সমুদ্রের নীল পানিতে সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। সে মুগ্ধকণ্ঠে বলল, অপূর্ব!

মীর বলল, আমার মনে হচ্ছে এটা যাত্রীদের বিশ্রামের কোনো জায়গা। অনেকক্ষণ যাদের অপেক্ষা করতে হয় তারা যাতে বিরক্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

সুন্দর ব্যবস্থা। আপনার কাছে সুন্দর লাগছে না ?

না। এরচেয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আমি দেখি।

এটা তো আর স্বপ্ন নয়।

স্বপ্ন নয় তোমাকে বলল কে ? পুরোটাই স্বপ্ন। সুন্দর সুন্দর ছবি দেখছ, যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

ঘরের চারপাশের দৃশ্য আবার বদলে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে চারপাশেই উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ জমেছে। সূর্যের আলোয় সেই বরফ ঝিকমিক করছে। ইরিনা মুগ্ধ গলায় বলল, এবারের দৃশ্য আরও সুন্দর!

বলতে বলতেই ছবি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। ইরিনার মনে হলো ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। কানে ঝিঁঝি শব্দ। সে কোনোমতে বলল, এসব কী হচ্ছে ?

মীর ক্লান্ত গলায় বলল, আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের যেখানে নেওয়ার, সেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় নেবে। যেন

গভীর গাঢ় ঘুমে দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে। ইরিনা প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেগে থাকতে। কিছুতেই পারছে না, চোখের সামনে আলো কমে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। দূরে তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজের মতো আওয়াজ। ইরিনা তার মাকে ডাকতে চেষ্টা করল। পারল না। তার দুচোখে অতলান্তিক ঘুম।

৫

ইরিনা জেগে উঠে দেখল একটি প্রকাণ্ড গোলাকৃতি ঘরের ঠিক মাঝখানে সে শুয়ে আছে। ঘরটি অদ্ভুত। চারদিকের দেয়াল থেকে অস্পষ্ট নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে, তাকালেই মন শান্ত হয়ে আসে। হালকা, প্রায় অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে। খুব করুণ কোনো সুর। ইরিনার মনে হলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন খুব বাস্তব মনে হয়। স্বপ্ন দেখার সময় মনেই হয় না এটা স্বপ্ন।

ইরিনা, তোমার ঘুম ভেঙেছে ?

ইরিনা তাকাল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সাত ফুট উঁচু দৈত্যাকৃতির একটি এনারয়েড রোবট। এনারয়েড রোবট ইরিনা এর আগে দেখেনি। স্কুলে যান্ত্রিক মানব অংশে এনারয়েড রবটিক্স-এর ওপরে একটা চ্যাপ্টার ছিল। সেখানে বলা হয়েছে, 'এনারয়েড রোবট তৈরি হয় রিবো ত্রি সার্কিটে। আই সি পি পি ৩০০২৫। আই সি টেনার জংশন মুক্ত। সেই কারণেই এরা শুধু চিন্তাই করতে পারে না, উচ্চস্তরের লজিকও দেখাতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তির এরা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে যেহেতু এরা কর্মী রোবট নয়, সেহেতু এদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।' এইটুকু পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। রিবো ত্রি সার্কিট কী, টেনার জংশনই বা কী ? কেউ জানে না। কে জানে হয়তো এককালে জানত। স্কুলের বইতে এনারয়েড রোবটের বেশ কিছু ছবি আছে। ইরিনার মনে আছে তারা এদের নাম দিয়েছিল 'দৈত্য রোবট'। কী বিশাল শরীর, ছবি দেখলেই ভয় লাগে। কিন্তু আশ্চর্য, একে দেখে ভয় লাগছে না। এর গলার স্বর কোমল, মমতা মাখা।

ইরিনা, তোমার ঘুম ভেঙেছে ?

দেখতেই তো পাচ্ছ ভেঙেছে, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ?

রোবটটি ঠিক মানুষের মতো হাসল। চট করে হাসি থামিয়ে বলল, কিছু একটা নিয়ে কথা শুরু করতে হবে তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি এখন কেমন আছ ?

ভালো।

আমি কে তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

তুমি একটি এনারয়েড রোবট।

চমৎকার। আমাকে দেখে ভয় লাগছে না তো আবার ?

না, ভয় লাগছে না। আমি কোথায় ?

তুমি আছ নিষিদ্ধ নগরীতে। তোমাকে কৃত্রিম উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে।

ভালো কথা।

কী জন্যে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হলো তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

তোমাদের ইচ্ছে হয়েছে এনেছ।

তা কিন্তু নয়। তুমি এসেছ আকাশপথে। আকাশপথের বিমানগুলোর একটা সমস্যা আছে। অতিরিক্ত রকম দুলুনি হয়। চৌম্বক জ্বালানির এই একটা বড় অসুবিধা। উচ্চ কম্পনাঙ্কে প্লেন কাঁপে। মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা মুশকিল। সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

ঠিক আছে। এনেছ ভালো করেছ।

তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি।

আমি কিছুই খাব না।

তার কারণ জানতে পারি ?

খেতে ইচ্ছা করছে না।

রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে রাখার ব্যাপারটা হাস্যকর। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য প্রয়োজন। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

রোবটটি নিঃশব্দে চলে গেল। ইরিনা এই প্রথমবারের মতো লক্ষ করল রোবটটি গিয়েছে দেয়াল ভেদ করে। তার মানে এই অস্বচ্ছ দেয়াল কোনো কঠিন পদার্থের তৈরি নয়। বায়বীয় কোনো বস্তুর তৈরি। এ বস্তুর কথা ইরিনার জানা নেই। শুধু দেয়াল নয়, এই গোলাকার ঘরে এরকম আরও জিনিস আছে, যা ইরিনা আগে কখনো দেখেনি বা বইপত্রে পড়েনি। যেমন, ঠিক তার মাথার ওপর বলের মতো একটা জিনিস ঘুরছে। ইরিনা বুঝতে পারছে, এই জিনিসটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে। সে যখন নড়াচড়া করে, এটিও নড়াচড়া করে। সে যখন একদৃষ্টিতে তাকায় তখন বস্তুটির ঘূর্ণন পুরোপুরি থেমে যায়। একবার ইরিনা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল, অমনি জিনিসটা অনেকখানি নিচে নেমে প্রবল বেগে ঘুরতে লাগল। নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করতেই সেটি আবার উঠে গেল আগের জায়গায়।

ইরিনা, তোমার জন্যে খাবার এনেছি।

রোবটটির চলাফেরা নিঃশব্দ, কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কে জানে। ইরিনা বলল, আমি তো বলেছি কিছু খাব না।

খাবে বৈকি। প্রথমে কফির কাপে চুমুক দাও। সত্যিকার কফি, বীনের কফি। সিনথেটিক কফি নয়। তোমার ভালো লাগবে। লক্ষ্মীমেয়ের মতো চুমুক দাও।

ইরিনা নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে কফি নিল। তার কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু জিজ্ঞেস করল, আমার মাথার ওপর যে যন্ত্রটা ঘুরছে, সেটা কী ?

এটা একটা মনিটর। তোমার যাবতীয় শারীরিক ব্যাপার মনিটর করা হচ্ছে। রক্তচাপ, রক্তে শর্করার পরিমাণ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, নিও ফ্রিকোয়েন্সি—সবকিছুই মাপা হচ্ছে।

কফি এমন কিছু আহামরি নয়। কেউ বলে না দিলে বোঝাই মুশকিল এটা সিনথেটিক কফি নয়। এই কফির একমাত্র বিশেষত্ব হচ্ছে, এর মধ্যে একধরনের আঠাল ভাব আছে, সিনথেটিক কফিতে যা নেই।

এই কফি কি তোমার ভালো লাগছে ইরিনা ?

না, ভালো লাগছে না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, মীর, উনি কোথায় ?

সে-ও ঠিক এরকম অন্য একটি ঘরে আছে। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে আমার মতোই একটি এনারোবিক রোবট।

এখান থেকে আমরা কোথায় যাব ?

কোথাও যাবে না। এখানেই থাকবে।

তার মানে কতদিন থাকব এখানে ?

যতদিন তোমার ডাক না পড়ে।

কে ডাকবে আমাকে ?

নিষিদ্ধ নগরীর প্রধানরা। যাঁরা নিষিদ্ধ নগরী চালাচ্ছেন। যাঁরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তাঁরা কারা ?

তাঁরা তোমার মতোই মানুষ। এই পৃথিবীতে তাঁদের জন্ম।

ইরিনা বিস্মিত হয়ে বলল, মানুষ!

হ্যাঁ, মানুষ। তুমি কি ভেবেছিলে অন্যকিছু ? এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান কোনো প্রাণের সৃষ্টি হয়নি।

তাহলে মানুষরাই নিষিদ্ধ নগরীর পরিচালক ?

হ্যাঁ, তবে তাঁদের সঙ্গে তোমাদের সামান্য প্রভেদ আছে। তাঁরা অমর। তোমাদের মৃত্যু আছে, তাঁদের মৃত্যু নেই।

তুমি এসব কী বলছ!

আমি ঠিকই বলছি। মৃত্যু এইসব মানুষকে কখনো স্পর্শ করে না। করবেও না।

তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিশ্বাস করার চেষ্টা করাই ভালো। তুমি কি তোমার স্কুলের বইতে পড়োনি রোবটরা মিথ্যা বলতে পারে না। তাদের সেরকম করে তৈরি করা হয়নি।

ইরিনা কফির কাপ নামিয়ে রেখে আগ্রহের সঙ্গে খাবার খেতে শুরু করল। সবই তরল এবং জেলি জাতীয় খাবার। ঝাঁঝালো ভাব আছে, তবে খেতে চমৎকার।

রোবটটি বলল, খেতে ভালো লাগছে ?

হ্যাঁ, লাগছে।

তোমার শরীরের প্রয়োজন এবং রুচি—এই দুটি জিনিসের ওপর লক্ষ রেখে খাবার তৈরি হয়েছে। তোমার খারাপ লাগবে না।

ইরিনা বলল, নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করছি, তুমি তার জবাব দিচ্ছ।

জবাব দিচ্ছি, কারণ তুমি নিষিদ্ধ নগরীতেই আছ। তোমার জন্যে নিষিদ্ধ নয়। কারণ তুমি এইসব প্রশ্নের জবাব কখনো প্রথম শহরে পৌঁছে দিতে পারবে না। বাকি জীবনটা তোমার এই জায়গাতেই কাটবে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ তাই।

নিষিদ্ধ নগরীর মানুষরা কতদিন ধরে বেঁচে আছেন ?

পাঁচশ বছরের মতো। তাঁদের জন্ম হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের আগে।

তাঁরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন ?

হ্যাঁ, থাকবেন।

তাঁরা আমাকে কখন ডেকে পাঠাবেন ?

তা তো বলতে পারছি না। হয়তো আগামীকালই ডেকে পাঠাবেন। হয়তো দশ বছর পর ডাকবেন। সময় তাঁদের কাছে কোনো সমস্যা নয়, বুঝতেই পারছ।

তাঁরা যদি দশ বছর পর ডাকেন, এই দশ বছর আমি কী করব ?

অপেক্ষা করবে।

কোথায় অপেক্ষা করব ?

এইখানে। এই ঘরে।

তুমি কী পাগলের মতো কথা বলছ! আমি এই জায়গায় দশ বছর অপেক্ষা করব ?

আরও বেশিও হতে পারে। সময় তোমার কাছে একটা সমস্যা, তাঁদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। তবে ভয় পেও না, তোমার সময় কাটানোর ব্যবস্থা আমি করব। খেলাধুলা, গানবাজনা, বইপত্র—সব ব্যবস্থা থাকবে।

ইরিনার শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কী বলছে ও! এ তো অসম্ভব কথা। রোবটটি তার যান্ত্রিক মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, তোমার যখন নেহায়েত অসহ্য বোধ হবে, তখন আমরা তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। আরামের ঘুম। ছয়, সাত বা আট বছর কাটিয়ে দেবে শান্তির ঘুমে।

ইরিনা বলল, এরকম কি হয়েছে কখনো ? কাউকে আনা হয়েছে প্রথম শহর থেকে, নিষিদ্ধ নগরীর কেউ তার সঙ্গে দেখা করেনি ? সে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে আমার মতো এরকম ঘরে ?

তা তো হয়েছেই। ঠিক এই মুহূর্তেই তোমার মতো আরও চারজন অপেক্ষা করছে। এই চারজনের দুজন অপেক্ষা করছে কুড়ি বছর ধরে। এখনো দেখা হয়নি। ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেই ওরা একসময় মারা যাবে।

আর বাকি দুজন ?

ওরা এসেছে ছয় বছর আগে। এখন পর্যন্ত তারা ভালোই আছে। ঘুমেই আছে।

আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

না।

আমি কি মীরের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

না।

মীর কেমন আছে তা কি জানতে পারি ?

না।

ইরিনা চিৎকার করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল দেয়ালে। যে দেয়াল তার কাছে বায়বীয় মনে হচ্ছিল, দেখা গেল তা মোটেই বায়বীয় নয়। ইস্পাতের মতো কঠিন। বরফের মতো শীতল।

৬

মীর মহাসুখী।

বছরের পর বছর তাকে এই ঘরে কাটাতে হতে পারে এই সম্ভাবনায় সে রীতিমতো উল্লসিত। সে হাসিমুখে রোবটকে বলল, সময় কাটানো নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হবে না ?

না, তা হবে না।

পড়াশোনার জন্যে প্রচুর বইপত্র নিশ্চয়ই আছে ?

তা আছে।

পড়াশোনার বিষয়ের ওপর কি কোনো বিধিনিষেধ আছে ?

না, নেই।

বাতি কী করে জ্বলে, বা হিটারে পানি কী করে গরম হয় যদি জানতে চাই জানতে পারব ?

নিশ্চয়ই পারবে। তুমি কি এখনই জানতে চাও ?

হ্যাঁ, চাই।

তাহলে তোমাকে প্রথম জানতে হবে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে। ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে ইলেকট্রন নামের ঋণাত্মক কণার প্রবাহ।

ঋণাত্মক কণা ব্যাপারটা কী ?

তোমাকে তাহলে আরও গোড়ায় যেতে হবে। জানতে হবে বস্তু কী ? অণু এবং পরমাণুর মূল বিষয়টি কী ?

বলো আমি শুনছি।

তুমি কি সত্যি সত্যি পদ্ধতিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও ?

হ্যাঁ, চাই। পদ্ধতি-ফদ্ধতি জানি না, আমি সবকিছু শিখতে চাই। সময় নষ্ট করতে চাই না।

তোমাকে আগ্রহ নিয়েই আমি শেখাব। তুমি কি নিষিদ্ধ নগরীর অমর মানুষদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাও না ?

না।

এরা কী করে অমর হলেন, মৃত্যুকে জয় করলেন—সেই সম্পর্কে তোমার কৌতূহল হয় না ?

না।

তোমার বান্ধবীর প্রসঙ্গেও কি তোমার কৌতূহল হচ্ছে না ? ইরিনা যার নাম ?

সে আমার বান্ধবী, তোমাকে বলল কে ? বান্ধবী-ফান্ধবী নয়।

সে কিন্তু খুব মন খারাপ করেছে। দীর্ঘদিন এই ছোট্ট ঘরে তাকে কাটাতে হতে পারে শুনে সে প্রায় মাথা খারাপের মতো আচরণ করছে। শেষ পর্যন্ত তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়েছে।

ভালো করেছ। মেয়েটা নার্ভাস ধরনের এবং বোকা। সব জিনিস জানার এমন চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েও কেউ এমন করে ?

রোবটটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, মানুষ বড়ই বিচিত্র প্রাণী। একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনোই মিল নেই, অথচ এক মডেলের প্রতিটি রোবট একরকম। তারা একই পদ্ধতিতে ভাবে, একই পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

মীর রোবটের কথায় কোনো কান দিচ্ছে না। সে হাসি-হাসি মুখে পা নাচাচ্ছে। শিসের মতো শব্দ করছে। এইসব তার মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সে হঠাৎ পা নাচানো বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, আচ্ছা শোনো, আমাকে অমর করে ফেলার কোনোরকম সম্ভাবনা কি আছে ?

কেন বলো তো ?

তাহলে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যেত। যা কিছু শেখার সব শিখে ফেলতাম। অমর না হলে তো সেটা সম্ভব হবে না। কতদিনই বা আমি আর বাঁচব বলো ?

তুমি বেশ অদ্ভুত মানুষ!

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে যে তথ্য আমাদের মেমোরি সেলে আছে তার কোনোটিতেই তোমাকে ফেলা যাচ্ছে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তাই। বরং তোমার মিল আছে Q23 মডেলের রোবটদের সঙ্গে।

ওরা কী করে ?

Q23 হচ্ছে পরীক্ষামূলক জ্ঞান-সংগ্রহী রোবট। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা। প্রাণীবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, সমুদ্রবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা—সব।

আমি তাহলে একজন Q23 রোবট ?

খানিকটা সেরকমই।

আমি একজন Q23 রোবটের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেই ব্যবস্থা কি করা যাবে ?

নিশ্চয়ই করা যাবে।

তাহলে ব্যবস্থা করো। আমি যা শেখার তার কাছেই শিখতে চাই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই। তুমি একজন গবেট ধরনের রোবট।

রোবটটির মারকারি চোখ একটু বুঝি স্তিমিত হলো। গলার স্বর ক্লান্ত শোনাল। সে থেমে থেমে বলল, আমি কি বোকার মতো কোনো আচরণ করেছি ?

না, এখনো করোনি, তবে মনে হচ্ছে করবে। দেরি করছ কেন, যাও একটি Q23 নিয়ে এসো।

এক্ষুনি আনতে হবে ?

হ্যাঁ, এক্ষুনি। আমি তো আর অমর নই। আমার সময় সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই যা পারি জানতে চাই। দাঁড়িয়ে বকবক করার চেয়ে Q23 নিয়ে এসো।

রোবটটির আকৃতি ছোট। লম্বায় তিন ফুটের মতো। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। মানুষের কাঠামোর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। দেখায় ছোটখাটো একটা লম্বাটে বাক্সের মতো। অন্যান্য রোবটদের যেমন আশপাশের দৃশ্য দেখার মারকারি চোখ কিংবা লেজার চোখ থাকে, এর তা-ও নেই। মীর বলল, তুমি কেমন আছ ?

Q23 উত্তর দিল না। মনে হচ্ছে সে এ জাতীয় সামাজিক প্রশ্ন বিশেষ পছন্দ করছে না।

তুমি কি আমাকে একজন ছাত্র হিসেবে নেবে ?

আমি নিজেই ছাত্র, এখনো শিখছি।

খুব ভালো কথা, আমাকেও কি তার ফাঁকে ফাঁকে কিছু শেখাবে ?

নিশ্চয়ই। তুমি যদি চাও শেখাব। কেন শেখাব না! তুমি কী জানতে চাও ?

আমি সব জানতে চাই। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে চাই। অ আ থেকে।

দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

তা তো বটেই। আমি তো আর অমর না। মরণশীল মানুষ। সময় তেমন নেই, তবুও এর মধ্যেই যা পারা যায়। ভালো কথা, অমর ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো।

তোমার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না।

মানুষ অমর হয় কীভাবে ? নিষিদ্ধ নগরীতে কিছু অমর মানুষ থাকেন বলে শুনেছি, তাঁরা অমর হলেন কী ভাবে ? অবশ্য তোমার যদি বলতে বাধা থাকে, তাহলে বলার দরকার নেই।

কোনোই বাধা নেই। অনেক দিন থেকেই মানুষ অমর হওয়ার চেষ্টা করছিল। শারীরিকভাবে অমর—মৃত্যুকে জয় করা। শুরুতে এটাকে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে করা হতো। জীবনের একটি লক্ষণ হিসেবে মৃত্যুকে ধরা হতো। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জরাকে জয় করার গবেষণা জোরেসোরে শুরু হলো। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানীরা জরার কারণ বের করলেন। তাঁরা মানুষের শরীরে একটি বিশেষ বয়সে এক ধরনের হরমোন আবিষ্কার করলেন। এটা একটা ভয়াবহ হরমোন। যেই মুহূর্তে এটি রক্তে এসে মেশে, সেই মুহূর্ত থেকেই মানুষ এগিয়ে যেতে থাকে মৃত্যুর দিকে। যতগুলো জীবকোষ শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণ করে, ঠিক ততগুলো জীবকোষ আর তৈরি হয় না। শরীর অশক্ত হয়। শরীরের যন্ত্রগুলো দুর্বল হতে থাকে। কালক্রমে মৃত্যু। বিজ্ঞানীরা সেই ঘাতক হরমোনের নাম দিলেন 'মৃত্যু হরমোন'।

মৃত্যু হরমোন আবিষ্কারের পর বাকি কাজ খুব সহজ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা মৃত্যু হরমোনকে অকেজো করার ব্যবস্থা করলেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে পৃথিবীতে অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটল—চল্লিশজন অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানী মৃত্যু হরমোন অকেজো করে এমন একটি রাসায়নিক বস্তু নিজেদের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন! তাঁরাই এ পৃথিবীতে প্রথম এবং শেষ অমর মানুষ। নিষিদ্ধ নগরীতে তাঁরাই থাকেন।

মীর বলল, শুধু ওই চল্লিশজন অমর হলো কেন ? পৃথিবীর সবাই অমর হয়ে গেল না কেন ? অমর হওয়ার ওষুধ তো তারাও খেতে পারত।

না, তা পারত না। তাতে নানান রকম অসুবিধা হতো, নানান সমস্যা দেখা দিত।

কী সমস্যা ?

আমি তা জানি না। সমাজবিজ্ঞানীরা জানবেন। আমি ভৌত জ্ঞান সংগ্রহ করি। সমাজবিদ্যা সম্পর্কে কিছু জানি না।

এমন কোনো রোবট কি আছে, যে সমাজবিদ্যা জানে ?

না নেই। নিষিদ্ধ নগরীর বিজ্ঞানীরা সমাজবিদ্যায় উৎসাহী নন। তুমি এখন কী জানতে চাও ?

বিজ্ঞান ভালোমতো শিখতে হলে প্রথমে কোন জিনিসটি জানতে হবে ?

প্রথম জানতে হবে অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক হচ্ছে বিজ্ঞানকে বোঝবার একটি বিদ্যা।

তাহলে অঙ্কই শুরু করা যাক। তুমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করবে।

বেশ, মৌলিক সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যাক। কিছু কিছু সংখ্যা আছে যাদের শুধুমাত্র সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় না। এদের বলে মৌলিক সংখ্যা; যেমন— ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩

মীর মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

আনন্দ ও উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার চেয়ে সুখী মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

৭

তিনি বসে আছেন একটি দাবা সেটের সামনে।

দাবা সেটটি অন্যগুলোর মতো নয়। এখানে স্কয়ারের সংখ্যা একাশিটি। তিনটি নতুন 'পিস' যুক্ত করা হয়েছে। এই পিসগুলোর কর্মপদ্ধতি কী হলে খেলাটাকে যথেষ্ট জটিল করা যায়, তা-ই তিনি ভাবছিলেন। মাঝে মাঝে কথা বলছেন সিডিসির সঙ্গে। সিডিসি হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীর মূল কম্পিউটার। সিডিসির শব্দ তৈরির অংশটি অসাধারণ। সে যখন যেমন স্বর প্রয়োজন, তখন সেরকম স্বর বের করে। তিনি যখন ঘুমুতে যান, তখন সিডিসি কিশোরী কণ্ঠে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এখন কথা বলছে বৃদ্ধের গলায়। ভারী, ভাঙা ভাঙা, খানিকটা যেন শ্লেষ্মাজড়িত। তিনি দাবার বোর্ড থেকে চোখ না সরিয়েই ডাকলেন, সিডিসি।

বলুন।

খেলাটা তো কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না।

আমার কাছে ছেড়ে দিন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তাতে আমার লাভটা কী হলো ? আমি চাচ্ছি নিজে একটা খেলা বের করতে।

আপনি যা চাচ্ছেন তা তো হচ্ছে না। এই খেলা বহু প্রাচীন, আপনি শুধু তার ভেতর নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করছেন।

সেটাই কম কী ?

সেটা তেমন কিছু নয়। আপনার আগেও অনেকে চেষ্টা করেছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আপনি চাইলে কারা কারা পরিবর্তন করেছেন, কী ধরনের পরিবর্তন, তা বলতে পারি।

আমি কিছুই জানতে চাই না।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতের এক ঝটকায় দাবার বোর্ড উল্টে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিশাল আয়না। সেই আয়নায় তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখছেন। তাঁর চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

সিডিসি।

বলুন।

আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো ?

ভালো দেখাচ্ছে।

শুধু ভালো ? এর বেশি কিছু নয় ?

আপনি আমার কাছ থেকে কী ধরনের কথা শুনতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।

আমি যা শুনতে চাই তা-ই তুমি বলবে ?

যদি সম্ভব হয় বলব। আপনি তো জানেন, আমি মিথ্যা বলতে পারি না।

আমার বয়স কত ?

আপনার বয়স পাঁচশ এগার বছর তিন মাস দুদিন ছ ঘণ্টা বত্রিশ মিনিট।

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মুখ কুঁচকে বললেন, আমাকে দেখে কী মনে হয় তাই জানতে চাচ্ছি। আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার বয়স পাঁচশ ?

না, তা মনে হয় না। ত্রিশের মতো মনে হয়, তবে

আবার তবে কী ?

আপনার মধ্যে বিশেষ এক ধরনের অস্থিরতা দেখছি, যা সাধারণ একজন ত্রিশ বছরের যুবকের থাকে না।

তুমি নিতান্তই মূর্খের মতো কথা বলছ।

হতে পারে।

তুমি আমার সঙ্গে এরকম বুড়োদের মতো গলায় কথা বলছ কেন ? তুমি কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাও যে আমি একজন বুড়ো ?

তা নয়।

তা নয় মানে ? অবশ্যই তোমার মনে এই জিনিস আছে।

আপনি আজ বিশেষ উত্তেজিত, তাই এরকম ভাবছেন।

এবং তুমি কথাও বেশি বলো। অপ্রয়োজনে এখন থেকে একটি কথাও বলবে না।

ঠিক আছে, বলব না।

আমি নিজ থেকে কোনো প্রশ্ন করলে তবেই উত্তর দেবে। বুঝতে পারছ ?

পারছি।

তিনি আয়নার সামনে থেকে সরে এলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে লাথি দিয়ে আয়নাটা ভেঙে ফেলতে। বহু কষ্টে তিনি নিজেকে সামলালেন। তাও পুরোপুরি সামলাতে পারছেন না। থরথর করে তাঁর শরীর কাঁপছে।

সিডিসি।

বলুন।

কী করা যায় বলো তো ?

কোন প্রসঙ্গে বলছেন ?

কী প্রসঙ্গে বলছি বুঝতে পারছ না ? মূর্খ।

আপনি অতিরিক্ত রকম উত্তেজিত। আপনি চাইলে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।

এইমাত্রই তো জাগলাম।

আপনি অনেকক্ষণ আগেই জেগেছেন।

তাই নাকি ?

প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে দাবা নিয়ে চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় এখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করে ঘুমুতে যাওয়া উচিত।

ঘুম পাচ্ছে না।

আপনি শুয়ে থাকুন, আমি নিও ফ্রিকোয়েন্সি বদলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে মধুর কোনো সঙ্গীতের ব্যবস্থাও করছি।

মধুর সঙ্গীত বলেও কিছু নেই।

তিনি লক্ষ করলেন তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। হয়তো ইতোমধ্যেই সিডিসি নিও ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে শুরু করেছে। দূরাগত বিষাদময় সঙ্গীতও তিনি শুনতে পাচ্ছেন। এই সঙ্গীত বিষাদময় হলেও কোনো এক অদ্ভুত কারণে মন শান্ত করে। গানের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে কানে আসছে।

হে প্রিয়তম,
তুমি কি দূর থেকেই আমাকে দেখবে ?
আজ বাইরে কী অপূর্ব জোছনা!
সেই আলোয় তুমি এবং আমি কখনো কি
নিজেদের দেখব না ?

তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, সিডিসি!

শুনছি।

জীবন খুব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে সিডিসি।

দীর্ঘ জীবন কিছুটা ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। মধুর সঙ্গীত, মহান শিল্পকর্মও একসময় অর্থহীন মনে হয়।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সিডিসি বলল, আপনার জীবনে কিছুটা উত্তেজনা আনার ব্যবস্থা করেছি।

কী রকম ?

প্রথম শহরের দুজন নাগরিককে নিয়ে আসা হয়েছে। ওদের সঙ্গে কথা বললে কিছুটা বৈচিত্র্য আপনি পেতে পারেন।

আমার বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে। সম্পূর্ণ দুধরনের দুজন মানুষকে আনা হয়েছে। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে আপনার ভালো লাগবে।

তোমার কথা শুনেই আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। ওদের এই মুহূর্তে ফেরত পাঠাও।

নিষিদ্ধ নগরী থেকে কাউকে ফেরত পাঠাবার নিয়ম নেই।

তাহলে মেরে ফেলো।

মেরে ফেলব ?

হ্যাঁ, মেরে ফেলবে। এবং মৃত্যুর সময় ওদের ফিল্ম করে রাখবে। পরে একসময় দেখব। আমার মনে হয় দেখতে ভালো লাগবে।

ঠিক আছে। মৃত্যুর আগে ওদের একবার দেখতে চান না ?

না, মেরে ফেলো। ওদের মেরে ফেলো।

ঠিক আছে।

কষ্ট দিয়ে মারবে। খুব কষ্ট দিয়ে মারবে।

তাই করব।

আমি এখন ঘুমুব। ঘুম পাচ্ছে।

তিনি মেঝেতেই এলিয়ে পড়লেন। অপূর্ব সঙ্গীত হতে থাকল—

হে প্রিয়তম,
আজ এই বসন্তের দিনে আকাশ এমন মেঘলা কেন ?
আকাশ কি আমার মনের কষ্ট বুঝে ফেলল ?
তা কেমন করে হয় ?
আমার যে কষ্ট তা তো আমি নিজেই জানি না।
আকাশ কী করে জানবে ?

তিনি গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘরের আলো কমে এল। সঙ্গীত অস্পষ্ট হয়ে আসছে। তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখছেন। সেই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই, তবু মনে হচ্ছে অর্থ আছে।

তাঁর ঘুম ভাঙল।

ঘর অন্ধকার। তাঁর চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর আলো হতে শুরু করল। তিনি বুঝতে পারলেন যতক্ষণ তাঁর ঘুমানোর কথা, তিনি তার চেয়েও বেশি সময় ঘুমিয়েছেন। হয়তো অনেক বেশি সময়। কারণ তাঁর পাশে একটি চিকিৎসক রোবট। রোবটটি আন্তরিক স্বরে বলল, কেমন আছেন ?

তিনি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ফেললেন। চিকিৎসক রোবট জিজ্ঞেস করছে, কেমন আছেন ? এই প্রশ্নের জবাব তারই দেওয়া উচিত। তা দিচ্ছে না, জিজ্ঞেস করছে—কেমন আছেন ? ব্যাটা ফাজিল।

আজ আপনি দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।

ঘুমিয়েছি, ভালো করেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করে জাগতে হবে ?

মোটেই নয়। আপনার যতক্ষণ প্রয়োজন আপনি ঘুমুবেন। তবে...

তবে কী ?

আপনার রক্তে LC2 হরমোনের পরিমাণ একটু বেশি, এইজন্যে...

বকবক করবে না, চুপ করে থাক।

বেশ, চুপ করেই থাকব। আপনি নিজে কেমন বোধ করছেন এইটুকু শুধু বলুন। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

যা ব্যাটা ভাগ।

আপনি কী বললেন ?

আমি বললাম এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদেয় হতে।

আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

আমি আরও উত্তেজিত হব এবং তুমি যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদায় না হও তাহলে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তোমার মারকারি চোখের বারোটা বাজিয়ে দেব।

রোবটটি পায়ে পায়ে সরে গেল। তাঁর খিদে পাচ্ছে। আগে খিদে পেলে খাবার চলে আসত। তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন, এখন আর আসে না। আজ এলে ভালো হতো। খাবারের কথা কাউকে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

সিডিসি।

আমি আছি।

তা তো থাকবেই। তুমি আবার যাবে কোথায় ? আমি যেমন অমর, তুমিও তেমনি। অজর অমর অক্ষয়। হা হা হা।

আপনাকে কি খাবার দিতে বলব ? আমার মনে হচ্ছে আপনি ক্ষুধার্ত।

তোমার আর কী মনে হচ্ছে ?

মনে হচ্ছে আপনি বেশ উত্তেজিত। রক্তে LC2 হরমোনের পরিমাণটা কমানোর চেষ্টা করা উচিত।

সিডিসি।

বলুন।

তোমাকে কী-একটা কথা যেন বলব ভাবছিলাম, এখন মনে পড়ছে না।

আমি কি মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ?

বেশ করো।

আমার মনে হয় প্রথম শহর থেকে আসা মানুষ দুজন সম্পর্কে কিছু বলতে চান।

ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক।

কী বলতে চাচ্ছেন বলুন।

ওদের মেরে ফেলার দরকার নেই।

ওরা বেঁচেই আছে। মারা হয়নি।

আমি লক্ষ করছি আমি তোমাকে যে হুকুম দিই, তা তুমি সঙ্গে সঙ্গে পালন করো না। এর কারণ কী ?

কারণ আপনি হুকুম খুব ঘনঘন বদলান। ওদের মারবার কথা যখন বললেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল, এই আদেশ আপনি পাল্টে দেবেন।

আমার খাবার ব্যবস্থা করো।

খাবার চলে এল। প্রচুর আয়োজন, সবই তরল। চুমুক দিয়ে খাবার ব্যাপার। তিনি মুখ বিকৃত করে এলোমেলোভাবে দু-একটা গ্লাসে চুমুক দিলেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কোনোটাই তার মনে লাগছে না। নিতান্তই অভ্যাসের বশে চুমুক দিচ্ছেন। যেন এক্ষুনি বমি করে সব বের করে দেবেন।

সিডিসি।

বলুন।

চিকিৎসক ব্যাটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

কেন জানতে পারি ?

আপনার ঘুম ভাঙছিল না। আমি চিন্তিত বোধ করছিলাম।

এখন চিন্তা দূর হয়েছে ?

পুরোপুরি দূর হয়নি। আপনার একটি কাউন্সিল মিটিং আছে। সেই মিটিং-এ সুস্থ শরীরে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

কাউন্সিল মিটিংটা কখন শুরু হবে ?

একঘণ্টার মধ্যেই শুরু হবে।

কজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন ?

আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আটজন উপস্থিত থাকবেন।

আমরা আছি ন'জন, আটজন উপস্থিত থাকবে—এর মানে কী ? নবম ব্যক্তিটি কে ?

আপনিই নবম ব্যক্তি। আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল মিটিং-এ আপনি থাকবেন না।

তোমার এই রকম মনে হচ্ছে ?

জি।

তিনি বেশ কিছু সময় চুপ করে রইলেন। কড়া লাল রঙের একটা পানীয় এক চুমুকে শেষ করলেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। সেখানেও বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না, উঠে এলেন আয়নার সামনে। নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন গভীর বিস্ময়ে, যেন নিজেকেই নিজে চিনতে পারছেন না।

সিডিসি।

বলুন।

আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?

খুব চমৎকার লাগছে আপনাকে। রাজপুত্রের মতো।

রাজপুত্র দেখেছ কখনো ?

জি-না দেখিনি, তবে জানি যে প্রাচীন পৃথিবীতে একদল মানুষ ছিলেন, যাঁরা রাজ্য শাসন করতেন। যেহেতু তারা দেশের সেরা সুন্দরীদের বিয়ে করতেন, তাদের ছেলেমেয়েরা হতো রূপবান।

অনেক কুৎসিত রাজপুত্রও নিশ্চয়ই ছিল ?

হ্যাঁ, তা ছিল।

আমি কুৎসিত রাজপুত্রদের একটা তালিকা চাই এবং সম্ভব হলে তাদের ছবি দেখতে চাই।

এক্ষুনি চান ?

হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি চাই। তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্নের জবাব দাও।

প্রশ্ন করুন।

আমরা সব মিলে ছিলাম চল্লিশজন। চল্লিশজন অমর মানুষ। আজ ন'জন টিকে আছি, এর মানে কী ?

বেঁচে থাকাটা একসময় আপনাদের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। জীবনধারণ অর্থহীন মনে হয়। তখন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে নষ্ট করে দেন।

বোকার মতো কথা বলবে না। তুমি যা বললে তা আমি জানি। যে জিনিস আমি জানি, তা অন্যের কাছ থেকে জানতে চাইব কেন?

অনেক সময় জানা জিনিসও অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালো লাগে।

ঠিক ঠিক ঠিক। চল্লিশজনের মধ্যে ন'জন আছি। এই সংখ্যা আরও কমবে, তাই না?

হ্যাঁ, কমবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা আসলে অমর নই।

শারীরিক দিক দিয়ে অমর, তবে মানসিক মৃত্যু ঘটে যায়। তখন শরীরও যায়।

আমার বেলায় এই ব্যাপারটা কবে ঘটবে বলতে পারো?

ঠিক কবে ঘটবে তা বলতে পারছি না। আমি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। ছয় মাসের মধ্যে ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে সাতষট্টি দশমিক দুই তিন ভাগ।

তিনি স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলেন। পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘরে লাল আলো জ্বলছে ও নিভছে। কাউন্সিল মিটিং শুরু হওয়ার সংকেত। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কাটা কাটা গলায় বললেন, সিডিসি, আমি কাউন্সিল মিটিং-এ যাচ্ছি।

খুবই আনন্দের কথা।

কাজেই বুঝতে পারছ, আমার প্রসঙ্গে তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়। তুমি বলেছিলে আমি কাউন্সিল মিটিং-এ যাব না। দেখো এখন যাচ্ছি।

আপনি যাবেন না এ-কথা আমি কখনো বলিনি। আমি বলেছি সম্ভাবনার কথা। শতকরা একভাগ সম্ভাবনা থাকলেও কিন্তু থেকেই যায়।

তুমি মহামূর্খ।

হতে পারে। সেই সম্ভাবনাও আছে।

৮

অধিবেশন শুরু হয়েছে।

হলঘরের মতো একটি গোলাকার কক্ষ। চক্রাকারে চল্লিশটি গদিআঁটা চেয়ার সাজানো। একটা সময় ছিল যখন চল্লিশজন বৃত্তের মতো বসতেন। আজ এসেছেন নয়জন। এঁদের সবার একসময় একটা করে নাম ছিল। এখন এঁদের কোনো নাম নেই। কারণ দীর্ঘ জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে তাঁরা নাম বদল করতেন। কুড়ি-পঁচিশ বছর পরপর দেখা গেল সবাই নাম বদল করছেন। কাউন্সিল অধিবেশনগুলোতে তাই নামের প্রচলন উঠে গেছে। এখন সংখ্যা দিয়ে এঁদের পরিচয়।

অধিবেশনের শুরুতেই অনুষ্ঠান পরিচালনার সভাপতি নির্বাচিত করা হলো। সভাপতি হলেন তৃতীয় মানব, একসময় যার নাম ছিল রুহুট। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন—

মানব সম্প্রদায়কে রক্ষা করা আমাদের প্রথম কর্তব্য।
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালনা করা
আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য।

শপথবাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আটজনের সবাই ডান হাত তুললেন। এর মানে হচ্ছে শপথবাক্যের প্রতি এঁরা আনুগত্য প্রকাশ করছেন। সভাপতি বললেন, এবার আমি মূল কম্পিউটার সিডিসিকে অনুরোধ করব তার প্রতিবেদনটি পেশ করবার জন্যে।

সিডিসির গলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল।

আমি সিডিসি বলছি। অমর মানবগোষ্ঠীর সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছি। সমগ্র বিশ্বের মোট মানবসংখ্যা হচ্ছে নয় কোটি একত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয় শত ছয় জন। এদের মাঝ থেকে দু'জনকে আলাদা ধরতে হবে। কারণ এই দু'জন আছে নিষিদ্ধ নগরে।

প্রথম শহরে আছে আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। দ্বিতীয় শহরে পঞ্চাশ লক্ষ। বাকিরা তৃতীয় শহরে। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন যে-স্তরে আছে তাতে প্রথম শহরে আরও পাঁচ লক্ষ মানুষ বাড়ানো যেতে পারে। আমি সুপারিশ করছি আরও পাঁচ লক্ষ বাড়ানো হোক।

সিডিসি থামতেই প্রস্তাবটি ভোটে পাঠানো হলো। কোনোরকম সিদ্ধান্ত হলো না। তিনজন মানুষ বাড়াবার পক্ষে মত দিলেন। দুজন বিপক্ষে মত দিলেন। বাকিদের কেউ ভোট দিলেন না। সিডিসি আবার তার রিপোর্ট শুরু করল—

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিকিরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আমি এ বিষয়ে এর আগেও সর্বমোট চল্লিশটি অধিবেশনে বলেছি এবং প্রস্তাব করেছি, যেসব স্থানে বিকিরণের পরিমাণ 'দুই আর'-এর কম, সেসব স্থানে মানব-বসতি স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রস্তাবটি ভোটে পাঠানো হলো। সবাই এর বিপক্ষে ভোট দিলেন। সিডিসি আবার শুরু করল—

আমাদের বেশ কিছু জটিল যন্ত্রপাতি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বে অনেকবার করা হয়েছে। আমি আবারও করছি। আমি

সভাপতি হাত দিয়ে ইশারা করতেই সিডিসি থেমে গেল। সভাপতি বললেন, সিডিসির রিপোর্টগুলো খুবই ক্লান্তিকর হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি একটা ভোট

দিতে চাই। আপনাদের মধ্যে যারা মনে করছেন সিডিসির রিপোর্ট ক্লান্তিকর, তারা হাত তুলুন।

সবাই হাত তুললেন, একজন তুললেন না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সভাপতি বললেন, সিডিসি, তোমার রিপোর্টে উপদেশের অংশ সবসময় বেশি থাকে।

আমাকে এভাবেই তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সমস্যার প্রতি আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া আমার দায়িত্ব।

আমরা তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না। যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হবে। পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়। পৃথিবীর একমাত্র স্থায়ী জিনিস হচ্ছে আনন্দ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন কোনো আবিষ্কার হচ্ছে না।

তার কোনো প্রয়োজনও আমরা দেখছি না। পৃথিবী একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে ছিল। তার ফল আমরা দেখেছি। ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের কথা তোমার অজানা থাকার কথা নয়।

আমি মনে করি সবসময় একদল মানুষ তৈরি করা উচিত, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করবে।

মূর্খের মতো কথা বলবে না। আমাদের দ্বিতীয় শপথবাক্যটিই হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক পথে চালানো। এটা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয় নয়। আমি এই প্রসঙ্গ ভোটে দিতে চাই। যাঁরা আমার সঙ্গে একমত, তাঁরা হাত তুলুন।

দুজন হাত তুললেন না, তাঁরা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সিডিসি বলল, আমার রিপোর্ট এখনো শেষ হয়নি। আপনার অনুমতি পেলে শেষ করতে পারি। সভাপতি বললেন, তোমার বকবকানি শোনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।

আমি কি তাহলে ধরে নেব আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে?

তোমার যা ইচ্ছা তুমি ধরে নিতে পারো।

বেশ তাই।

আমি যেসব প্রশ্ন করব, শুধু তার উত্তর দেবে। উত্তরগুলো হবে সংক্ষিপ্ত। সম্ভব হলে শুধু মাত্র হ্যাঁ এবং না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। তোমার নিজস্ব মতামত জাহির করবে না। তোমার মূল্যবান মতামতের কোনো প্রয়োজন দেখছি না। বুঝতে পারছ?

পারছি।

প্রথম প্রশ্ন : তৃতীয় শহরের মানুষরা কি সবাই সুখী?

হ্যাঁ, সুখী। মহাসুখী। শারীরিকভাবে সুখী, মানসিকভাবে সুখী। তাদের খাবারের সঙ্গে মিওনিন মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা তাদের সুখী হওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা যা দেখছে তাতেই সুখী হচ্ছে। তারা যদি চোখের সামনে একটা হত্যাদৃশ্যও দেখে, তাতেও তারা সুখ পাবে।

বাঁকাপথে প্রশ্নের উত্তর দিও না। তুমি কি বলতে চাও, তাদের সুখের যথেষ্ট উপকরণ নেই, তবু তারা সুখী ?

না, তা বলতে চাই না। সুখের উপকরণের কোনো অভাব নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রথম শহরের মানুষরা কেমন আছে ?

তাদের আপনারা যেভাবে রাখতে চেয়েছেন, সেভাবেই আছে। সবসময় একটা চাপা আতঙ্কের মধ্যে আছে। তাদের জীবনের একটিই স্বপ্ন, কখন দ্বিতীয় শহরে যাবে। দ্বিতীয় শহরের কল্পনাই তাদের একমাত্র কল্পনা। একদিন দ্বিতীয় শহরে যাবে, সেই আনন্দেই তারা প্রথম শহরের যন্ত্রণা সহ্য করে নিচ্ছে।

তৃতীয় প্রশ্ন প্রথম শহরে আইনভঙ্গকারী নাগরিকের সংখ্যা কত ?

শতকরা দশমিক দুই তিন ছয় ভাগ।

আগের চেয়ে বেড়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, কিছুটা বেড়েছে। আপনি কি সঠিক পরিসংখ্যান চান ?

না, সঠিক পরিসংখ্যানের দরকার নেই। এই বৃদ্ধি কি আশঙ্কাজনক ?

না, আশঙ্কাজনক নয়। আমার ধারণা এটা সাময়িক ব্যাপার। আমি দুঃখিত যে নিজের মতামত প্রকাশ করে ফেললাম।

চতুর্থ প্রশ্ন আইনভঙ্গকারীদের সম্পর্কে বলো। এরা কোন ধরনের আইন ভঙ্গ করছে ?

বেশির ভাগই কৌতূহল সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করছে। কৌতূহলসংক্রান্ত আইন। অধিকাংশই যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কৌতূহল দেখাচ্ছে। নিষিদ্ধ নগর প্রসঙ্গে কৌতূহল প্রকাশ করছে।

দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহের কোনো আভাস কি আছে ?

না, নেই। তবে গত সতেরই জুন চারজন তরুণ একটি কর্মী রোবটের ওপর হামলা চালিয়েছে। রোবটটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এর পরেও তুমি বলতে চাচ্ছ, সংঘবদ্ধ কোনো বিদ্রোহের আভাস নেই!

হ্যাঁ, বলছি। ওটা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কোনোরকম পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। খুব ভালোমতো অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ওই চারটি তরুণের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ওদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড।

ভালো। তোমার কাজ শেষ হয়েছে। তুমি যেতে পারো।

সিডিসি গম্ভীর গলায় বলল, একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করতে চাচ্ছি।

আজ আর সময় নেই।

ব্যাপারটি খুবই জরুরি। ফেলে রাখবার বিষয় নয়। ফেলে রাখলে বড় রকমের ভুল করা হবে বলে আমার ধারণা।

তোমার সব ধারণা সত্যি নয়। আজকের সভা সমাপ্ত।

সদস্যদের একজন বলছেন, ও কী বলছে শোনা যাক। আমার ধারণা মজার কিছু হবে। মাঝে মাঝে এ বেশ মজা করে।

সভাপতি খুব বিরক্ত হলেন, তবে সিডিসিকে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অরচ লীওনের দিকে। যিনি গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে পালন করছেন। যাঁর কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা প্রশ্নাতীত।

সভাপতি বিরক্ত মুখে বললেন, যা বলার সংক্ষেপে বলো। এত ফেনাচ্ছ কেন?

সংক্ষেপেই বলছি। অরচ লীওনের বর্তমান কার্যকলাপ যথেষ্ট সন্দেহজনক। আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে।

জনৈক সদস্য বললেন, যে-কোনো ব্যাপারই তোমার মনে সন্দেহ জাগায়, কারণ তুমি একটি মহামূর্খ। সবাই হেসে উঠল। সবচেয়ে উচ্চস্বরে হাসলেন সভাপতি। হাসির শব্দ থামতেই সিডিসি বলল, অল্পসময়ের জন্যে হলেও আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি, এতেই নিজেকে ধন্য মনে করছি। যাই হোক, আমি আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। অরচ লীওন নিষিদ্ধ নগরী সম্পর্কে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। শুধু যে নিষিদ্ধ নগরী তাই নয়, অমর মানুষদের সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। তিনি মূল লাইব্রেরির পরিচালক কম্পিউটার M42-র কাছে খোঁজ নিয়েছেন নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কোনো বইপত্র বা দলিলের মাইক্রোফিল্ম আছে কি না। যে কল কার্ড তিনি ব্যবহার করেছেন, তার নাম্বার AL42/320/21/00cp.

সদস্যরা সবাই সোজা হয়ে বসলেন। যে দুজন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জাগানো হলো। সভাপতির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। সিডিসি যান্ত্রিক এবং কিছু পরিমাণ ধাতব গলায় কথা বলছে। নিজের বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যেই এটা সে করছে। তার প্রয়োজন ছিল না। সদস্যরা গভীর মনোযোগের সঙ্গেই সিডিসির কথা শুনছেন।

শুধু তাই নয়, অরচ লীওন বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর অপরাধে অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমনকি এদের সম্পর্কে কোনোরকম রিপোর্ট পর্যন্ত তৈরি করেননি।

সভাপতি মৃদুস্বরে বললেন, অবিশ্বাস্য!

মৃদুস্বরে বলা হলেও সবাই তা শুনল। মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। সিডিসি বলতে লাগল, ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। তিনি একটি পরিকল্পনাও করলেন নিষিদ্ধ নগরীর সংবাদ সংগ্রহের জন্যে। আপনারা সবাই জানেন, নিষিদ্ধ নগরীতে দুজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিককে আনা হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে করা

হয়। যাই হোক, এই দুজন নাগরিকের একজনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছেন নিষিদ্ধ নগরীর সংবাদ তাঁকে পাঠানোর জন্যে। আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ সবাই নীরব রইলেন। তারপর নিচুগলায় নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। আবার খানিকটা নীরবতা। নীরবতা ভঙ্গ করলেন সভাপতি। তিনি বললেন, এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, অরচ লীওনকে এখানে ডেকে পাঠানো হবে। তাঁর উদ্দেশ্য কী তা আমরা জানতে চাই। তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা না বলেও অবশ্য তা জানা সম্ভব। তবু আমাদের কয়েকজন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলার মত প্রকাশ করেছেন। অরচ লীওনকে এখানে আনার ব্যবস্থা করা হোক।

সিডিসি বলল, আপনাদের অনুমতি ছাড়াই একটি কাজ করা হয়েছে। অরচ লীওনকে এখানে আনা হয়েছে। আপনারা চাইলেই তাঁকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

সভাপতি বললেন, বিনা অনুমতিতে তুমি এই কাজটি কেন করলে ? পরিষ্কার জবাব দাও।

আমি জানতাম, আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন।

বেশ অনেকদিন থেকেই তুমি তোমার কিছু স্বাধীন ইচ্ছা পূরণ করছ। এবং আমরা জানি তুমি কেন তা করছ। যে সব কম্পিউটার-বিজ্ঞানী তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, তাঁরা অমর হওয়া সত্ত্বেও এখন আমাদের মধ্যে নেই। কাজেই তুমি ভয়শূন্য।

আমি যা করি এবং ভবিষ্যতে যা করব, আপনাদের কল্যাণের জন্যেই করব। আমাকে এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এটা একটি সহজ সত্য। আপনাদের মতো মহাজ্ঞানীদের অজানা থাকার কথা নয়। আমি কি অরচ লীওনকে উপস্থিত করব ?

এখন নয়। তোমাকে পরে বলব।

সভাকক্ষে বিশ্রী রকমের নীরবতা নেমে এল।

৯

আজ তুমি কেমন আছ ইরিনা ?

ভালো।

মনের অস্থিরভাব কিছুটা কি কমেছে ?

হ্যাঁ।

মানুষদের সঙ্গে রোবটদের একটা মিল আছে। এরা সব অবস্থায়, সব পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমি কি ঠিক বলিনি ?

হয়তো ঠিক বলেছ।

তবে মানুষদের মধ্যে 'হয়তো' ব্যাপারটা খুব বেশি। নিশ্চিতভাবে এরা কোনো কিছুই করে না, ভাবে না। সবসময় তাদের মধ্যে সম্ভাবনার একটা ব্যাপার থাকে। কোনো একটি ঘটনায় একজন মানুষ একই সঙ্গে সুখী এবং অসুখী হয়। বড়ই রহস্যজনক।

এসব কথাবার্তা শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

তুমি যদি চাও আমি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।

রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।

তুমি আমাকে রোবট ভাবছ কেন ? আমি একজন এনারোবিক রোবট। তুমি অনায়াসেই আমাকে মানুষ হিসেবে ধরে নিতে পারো। মানুষের যেমন আবেগ থাকে, রাগ, ঘৃণা থাকে, আমাদেরও আছে।

থাকুক। থাকলে তো ভালোই।

রোবটিক্স্ বিদ্যার চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছে। অধিকাংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নতুন পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গেলেও রোবটিক্স্-এর চর্চা বন্ধ হয়নি। কেন হয়নি জানো ?

জানি না। জানতেও চাই না।

আমার মনে হয় এটা জানলে তোমার ভালো লাগবে।

তোমার মনে হলে তো হবে না। ভালো লাগাটা আমার নিজের ব্যাপার। আমার কী ভালো লাগবে কী লাগবে না তা আমি বুঝব।

ঠিক বলেছ। তবে ব্যাপারটা বলতে পারলে আমার ভালো লাগবে। আমি বলতে চাই। আমি খুব খুশি হব যদি তুমি শোনো।

বেশ বলো।

রোবটিক্স্-এর উন্নতির ধারা বন্ধ হলো না, কারণ আমরা রোবটরাই নিজেদের দিকে মন দিলাম। কী করে রিবো-ত্রি সার্কিটকে আরও উন্নত করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। মানবিক আবেগ কী, তার প্রকাশ কেমন, তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এসব জটিল কাজ প্রধানত করতেন Q23 বা Q24 জাতীয় বিজ্ঞানী রোবটরা। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা হলো, মানবিক আবেগের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের তেমন জ্ঞান নেই। শ্রেষ্ঠ রোবট বিজ্ঞানীরা থাকেন নিষিদ্ধ নগরীতে, যেখানে মানুষের দেখা পাওয়া যায় না।

যাবে না কেন ? অমর মানুষেরা তো এখানেই থাকেন।

তাদের আবেগ-অনুভূতি ভিন্ন প্রকতির। তবু তাঁদের মতো করে দুজন তৈরি করা হয়েছিল। এরা ছয় মাসের মধ্যে সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে। আমাদের দরকার সাধারণ মানুষ। যেমন তুমি কিংবা মীর।

আমাদের যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তাতে কি আমাদের আবেগ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকবে ?

না, থাকবে না। তবু আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি। এ কারণেই তোমার সঙ্গে আমার ক্রমাগত কথা বলা দরকার। কথাবার্তা থেকে নানান তথ্য বের হয়ে আসবে। কথা বলা দরকার, ভীষণ দরকার।

তোমার দরকার থাকতে পারে, আমার দরকার নেই।

আছে, তোমারও দরকার আছে। তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।

কী বললে ?

বললাম সাহায্যটা হবে দু'তরফের। তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।

আবার বলো।

তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমি তোমাদের সাহায্য করব।

এতক্ষণ বলছিলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। এখন বলছ আমি তোমাকে সাহায্য করব।

আমাদের সাহায্য আসবে আমার মাধ্যমে। এ কারণেই বলছি আমি। অন্য কোনো কারণে নয়।

ইরিনা চুপ করে গেল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা কথা সে শুনল। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। সেই সম্ভাবনাই বেশি। কিংবা তার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এরা ইচ্ছা করেই তার মধ্যে একটা আশার বীজ ঢুকিয়ে দিল। খুবই সম্ভব।

ইরিনা।

বলো।

আমরা মানুষের তিনটি আবেগ সম্পর্কে জানতে চাই—ভয়, বিষাদ, ভালোবাসা।

এই তিনটি ছাড়াও তো আরও অনেক আবেগ মানুষের আছে।

তা আছে, তবে আমাদের ধারণা এই তিনটিই হচ্ছে মূল আবেগ। অন্য আবেগ হচ্ছে এই তিনটির রকমফের। যেমন ধর, ঘৃণা হচ্ছে ভালোবাসার উল্টো। আনন্দ হচ্ছে বিষাদের অন্য পিঠ। আমি কি ঠিক বলছি না ?

জানি না। হয়তো ঠিক বলছ।

তুমি আমাকে বলো, ভয় ব্যাপারটা কী ?

ভয় কী আমি জানি, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারব না। এই যে আমি এখানে আছি, সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে আছি। তীব্র ভয়। এই ভয় হচ্ছে অনিশ্চয়তার ভয়।

অনিশ্চয়তার ভয়। চমৎকার! অনিশ্চয়তাকে তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার সঙ্গী পাচ্ছে না কেন ? সে তো সুখেই আছে।

আমরা একেকজন একেক রকম।

তোমার কি ধারণা, সে কোনো পরিস্থিতিতেই ভয় পাবে না ?

আমি কী করে বলব ? সেটা তার ব্যাপার। হয়তো নতুন কোনো পরিস্থিতিতে দেখব, সে ভয় পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না।

তোমরা মানুষরা খুবই জটিল।

উল্টোটাও হতে পারে, হয়তো আমরা খুবই সরল। সরল জিনিস বোঝার ক্ষমতা নেই বলে তুমি আমাদের জটিল ভাবছ। আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

তোমার খাবার দিতে বলি ?

বলো।

কোনো বিশেষ খাবার কি তোমার খেতে ইচ্ছা করছে ?

না।

ইরিনা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। এনারোবিক রোবটটি চুপচাপ বসে রইল। তার কোলে একটি বই। বইটির দিকে চোখ পড়তেই ইরিনার বিরক্ত লাগছে। গত দশদিন ধরে এই ব্যাপারটি শুরু হয়েছে। খাওয়া শেষ হতেই রোবটটি তার হাতে একটা বই ধরিয়ে দেয়—গল্প, কবিতার বই। একটি বিশেষ অংশ পড়তে বলে। এটা তাদের এক ধরনের পরীক্ষা। বই পড়বার সময় ইরিনার মানসিক অবস্থার কী পরিবর্তন হয় তা রেকর্ড করা হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্তচাপ, রক্তে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের পরিমাণ, অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ, নিও ফ্রিকোয়েন্সি।

গত দশদিন ধরে ইরিনাকে একটি করে ভয়ের গল্প পড়তে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর সব গল্প। ভূত-প্রেতের গল্প, খুন-খারাবির গল্প। মানসিক রোগীর গল্প। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গল্প। গল্পগুলো প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের লেখা। কেন তারা এইসব ভয়াবহ গল্প লিখেছে কে জানে। ইরিনা খেতে খেতে বলল, আজ আমি কোনো গল্প পড়ব না। সহজ গলায় বললেও তার স্বরে ধাতব কাঠিন্য ছিল। এনারোবিক রোবট বলল, আজকের গল্পটি ভয়ের গল্প নয়। আজ তুমি পড়বে হাসির গল্প।

হাসির গল্প ?

হ্যাঁ। পৃথিবীতে যে-কয়টি সেরা হাসির গল্প আছে, এটি তার একটি। গল্প বললে ভুল হবে, হাসির উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ।

হাসির গল্প পড়তে ইচ্ছা করছে না।

তোমাকে এটি পড়তে একটি বিশেষ কারণে অনুরোধ করছি। কারণটি হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষেরা এটাকে একটি হাসির গল্প মনে করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই গল্প পড়ে প্রাণ খুলে হাসে, কিন্তু আমাদের ধারণা এটা একটা ভয়াবহ গল্প। গল্প পড়ে মানুষদের ভয় পাওয়া উচিত। তারা তা পায় না, তারা হাসে। কেন হাসে এটা আমরা বুঝতে পারি না। তাহলে কি ভয় এবং হাসি—এরা খুব কাছাকাছি। আমরা এই জিনিসটি বুঝতে চাই। তুমি কি খানিকটা কৌতূহল বোধ করছ না ?

না, করছি না।

তুমি মিথ্যা কথা বললে। তুমি যথেষ্ট পরিমাণেই কৌতূহল বোধ করছ। মানুষ যখন কৌতূহল বোধ করে, তখন তার নিও ফ্রিকোয়েন্সি সত্তুরের মতো বেড়ে যায়। তোমার বেড়েছে। দয়া করে বইটি নাও এবং পড়ো।

ইরিনা বইটি হাতে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাগ দেওয়া অংশ পড়তে শুরু করল। গোলকধাঁধা নিয়ে গল্প। কয়েকটি মানুষ গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। এটাই হচ্ছে বিষয়বস্তু। মজার গল্প। পড়তে পড়তে ইরিনা হেসে কুটিকুটি। বইটির নাম 'এক নৌকায় তিনজন'।

হ্যারিস জানতে চাইল আমি কখনো হ্যাম্পটন কোর্টের সেই বিখ্যাত গোলকধাঁধায় গিয়েছি কিনা। সে বলল, অন্যদের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে একবার সে গিয়েছিল। গোলকধাঁধার ম্যাপ পড়ে সে বুঝতে পারল, পয়সা খরচ করে গোলকধাঁধা দেখতে যাওয়া নিতান্ত বোকামি। খুবই সাধারণ। কেন যে মানুষ পয়সা খরচ করে এটা দেখতে আসে, কে জানে। হ্যারিসের এক চাচাত ভাইয়েরও তাই ধারণা। সে বলল, এসেছ যখন দেখে যাও। এমন কোনো ধাঁধা নয়। যে-কোনো বোকা লোকও ভেতরে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে আসতে পারে। জিনিসটা এতই সোজা যে, একে গোলকধাঁধা বলাই অন্যায়। ভেতরে ঢোকার আগে শুধু খেয়াল রাখতে হবে, যখনই বাঁক আসবে, তখনই যেতে হবে ডানদিকের রাস্তায়। চলো যাই তোমাকে ব্যাপারটা দেখিয়েই আনি। সবার সঙ্গে গল্প করতে পারবে যে হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধায় ঢুকেছ।

ভেতরে ঢোকার পরই কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। লোকগুলো ক্লান্ত ও খানিকটা ভীত। তারা বলল, গত একঘণ্টা ধরে আমরা শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। এখন বেরুতে পারলে বাঁচি।

হ্যারিস বলল, আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসতে পারেন। আমি খানিকক্ষণ দেখব, তারপর বেরিয়ে যাব।

লোকগুলো অসম্ভব খুশি হলো, বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারা হ্যারিসের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে তাদের দেখা হলো, গোলকধাঁধার বিভিন্ন অংশে আটকা পড়েছে, বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এদের কেউ কেউ বেরুবার আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, জীবনে আর লোকালয়ে ফিরে যাওয়া হবে না। হ্যারিসকে দেখে তারা সাহস ফিরে পেল। আনন্দের

সীমা রইল না। প্রায় কুড়িজনের মতো লোক তাকে অনুসরণ করছে। এদের মধ্যে আছেন কাঁদো কাঁদো মুখে বাচ্চা-কোলে এক মহিলা। তিনি বললেন যে তিনি ভোরবেলায় ঢুকেছিলেন, আর বেরুতে পারছিলেন না। যে-দিকেই যান আবার আগের জায়গায় ফিরে আসেন।

হ্যারিস খুব নিয়মমাফিক প্রতিটি বাঁকে ডান দিকে যেতে লাগল। দশ মিনিটে বাঁক শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু ফুরোচ্ছে না। প্রায় দুমাইলের মতো হাঁটা হয়ে গেল।

একটা জায়গায় এসে হ্যারিসের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হলো। মনে হলো এই জায়গায় কিছুক্ষণ আগেই একবার এসেছে। এর মানেটা কী ? হ্যারিসের চাচাত ভাই জোর গলায় বলল, সাত মিনিট আগেও একবার এই জায়গায় এসেছি। ঐ তো রুটির টুকরোটা দেখা যাচ্ছে। হ্যারিস বলল, হতেই পারে না। বাচ্চা-কোলে মহিলাটি বললেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এই জায়গাতেই আমি বসে ছিলাম। রুটির টুকরোটি আমিই ফেলেছি। ভদ্রমহিলা রাগী দৃষ্টিতে হ্যারিসের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আপনি একটি চালবাজ। গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার কৌশল আপনার জানা নেই।

হ্যারিস পকেট থেকে ম্যাপ বের করল, এবং বেরুবার পথ কী রকম, তা খুব সহজ ভাষায় সবাইকে বুঝিয়ে দিল। চলুন এক কাজ করা যাক। যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, সেখানে যাওয়া যাক।

হ্যারিসের কথায় তেমন কোনো উৎসাহ সৃষ্টি হলো না। তবুও সবাই বিরক্ত মুখে হ্যারিসের পেছনে পেছনে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। দশ মিনিট না যেতেই দেখা গেল তারা ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। ওই তো রুটির টুকরোটি পড়ে আছে।

হ্যারিস প্রথমে ভাবল যে সে এমন ভান করবে যাতে সবাই মনে করে এটাই সে চাচ্ছিল। দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে সাহসে কুলাল না। সবাইকে অসম্ভব ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে। হ্যারিসের মনে হলো দলপতি হিসেবে তার আগের জনপ্রিয়তা এখন আর নেই।

যাই হোক, আবার ম্যাপ দেখা হলো। গভীর আলোচনা হলো। আবার শুরু করা গেল। লাভ হলো না। সাত মিনিট

যেতেই রুটির টুকরোর কাছে তারা ফিরে এল। এর পর থেকে এমন হলো, এরা কোথাও যেতে পারে না। রওয়ানা হওয়া মাত্র রুটির টুকরোর কাছে ফিরে আসে। ব্যাপারটা এতই স্বাভাবিকভাবে ঘটতে লাগল যে কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে রুটির টুকরোটির কাছে অপেক্ষা করে, কারণ তারা জানে সবাই এ জায়গাতেই ফিরে আসবে। আসছেও তাই। ভয়াবহ ব্যাপার

গল্পের এ জায়গা পর্যন্ত এসেই ইরিনা হাসিতে ভেঙে পড়ল। আর যেন এগোতে পারছে না। একটু পড়ে, আবার হাসে। আবার পড়ে, আবার হাসে। যে জায়গায় গোলকধাঁধার পরিদর্শক এসেছেন তাদের উদ্ধার করতে এবং তিনিও সব গুলিয়ে ফেলেছেন, সেই অংশ পড়তে পড়তে ইরিনার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। বিস্মিত হয়ে দেখছে এনারোবিক রোবট।

ইরিনা।

বলো।

আমরা হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধার মতো একটা গোলকধাঁধা এখানে তৈরি করেছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তবে আমাদের এই গোলকধাঁধা তার চেয়েও কিছু জটিল।

ভেতরে ঢুকলে হ্যারিসের মতো আটকে যাব ? বেরুতে পারব না ?

মনে হচ্ছে তাই, তবে যদি বুদ্ধিমান হও, তাহলে নিশ্চয়ই বেরুতে পারবে।

ভালো কথা, এখন তুমি চলে যাও। আমি এই বইটা পড়ব। এই জাতীয় বই তুমি আমাকে আরও জোগাড় করে দেবে।

তোমার ধারণা এটা খুব একটা মজার বই ?

ধারণা নয়। আসলেই এটা একটা মজার বই।

ইরিনা।

বলো।

আমরা পরিকল্পনা করেছি তোমাকে আমাদের তৈরি গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেব।

তার মানে ?

আমি দেখতে চাই তুমি কী করো। তোমার মানসিক অবস্থাটা আমরা পরীক্ষা করব। ওই পরিস্থিতিতে তুমি কী করো আমরা দেখব। বেরুবার পথ খুঁজে না পেলে তোমার মানসিক অবস্থাটা কী হয়, তাই আমাদের দেখার ইচ্ছা।

ইরিনা তাকিয়ে আছে। এনারোবিক রোবটটি বলল, একদিকের প্রবেশপথ দিয়ে তোমাকে ঢুকিয়ে দেব, অন্যদিকের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব মীরকে।

কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর তো একবার দিয়েছি। ক্ষুদ্র একটা পরীক্ষা আমরা করেছি। আমরা মনে করি মানবিক আবেগ বোঝার জন্যে এই পরীক্ষাটি কাজ দেবে। আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য পাব।

এ জাতীয় পরীক্ষা কি তোমরা আগেও করেছ ?

হ্যাঁ, করা হয়েছে। তুমি তো ইতোমধ্যেই জেনেছ, প্রথম শহরের কিছু নাগরিককে এখানে আনা হয়। অমর মানুষরা তাদের সঙ্গে কথা-টথা বলেন। তাঁদের দীর্ঘ জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর এটা একটা উপায়। যখন তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন আমরা ওদের নিয়ে নিই। মানবিক আবেগের প্রকৃতি বোঝার জন্যে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। গোলকধাঁধার পরীক্ষা হচ্ছে তার একটি।

কেউ কি সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পেরেছে ?

না পারেনি। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমাদের গোলকধাঁধাটি যথেষ্ট জটিল।

ইরিনা রুদ্ধ গলায় বলল, তুমি আমাকে বলেছিলে যদি আমি তোমাকে সাহায্য করি, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। এই তোমার সাহায্যের নমুনা ?

তুমি বুঝতে পারছ না। আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্যই করছি।

আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। কীভাবে সাহায্য করছ আমাকে ?

গোলকধাঁধার কথা আগেই তোমাকে বলে দিলাম, এতে তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার একটা সুযোগ পাচ্ছ, যা তোমার সঙ্গী পাচ্ছে না।

বাহ্ তোমার মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কী বিশাল তোমার হৃদয়!

তুমি মনে হচ্ছে আমার ওপর রাগ করলে ?

ইরিনা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, নিয়ে চলো আমাকে গোলকধাঁধায়।

তুমি ভয় পাচ্ছ না ?

না, পাচ্ছি না।

তাহলে চলো যাওয়া যাক।

ইরিনা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, যদি আমরা বেরুতে না পারি, তখন কী হবে ?

বেরুতে না পারলে যা হওয়ার তা-ই হবে।

তার মানে ?

তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, মানে বুঝতে না পারার কোনো কারণ দেখছি না।

তুমি বলেছিলে, অমর মানুষদের জন্যে আমাদের আনা হয়েছে। আমাদের কি তাঁদের এখন আর প্রয়োজন নেই ?

না। তাঁরা এখন একজনকে নিয়ে ব্যস্ত। তাকে তুমি চেনো। তার নাম অরচ লীওন।

১০

তাঁর মন খুবই খারাপ।

প্রায় একঘণ্টা তিনি তাঁর ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটলেন। তাঁর স্বভাব হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর সিডিসিকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলা। এই একঘণ্টায় তিনি একবারও সিডিসিকে ডাকেননি। দুপুরের খাবার খাননি। সবচেয়ে বড় কথা, একবারও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুগ্ধচোখে দেখেননি।

এইবার দাঁড়ালেন। নিজের চেহারা দেখে তেমন কোনো মুগ্ধতা তাঁর চোখে ফুটল না। বরং ভুরু কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। যেন খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

সিডিসি।

বলুন শুনছি।

আমাকে কি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তুমি কি জানো, আমি কী নিয়ে উত্তেজিত ?

জানি না, তবে অনুমান করতে পারি।

তোমার অনুমান কী ?

আপনি অরচ লীওনের ব্যাপারে চিন্তিত।

মোটেই না। ওকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কী আছে ?

কিছুই কি নেই ?

না, কিছুই নেই। আমি আমার জন্যে নতুন একটা নাম ভাবছি। কোনোটাই মনে ধরছে না।

আপনি এই নিয়ে চিন্তিত ?

এমন একটা নাম হতে হবে, যা ছোট, সুন্দর এবং কিছু পরিমাণে কাব্যিক। আবার বেশি কাব্যিক হলে চলবে না।

আমি কি নামের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব ?

না।

তিনি আয়নার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি চমৎকার একটি নাম খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। একবার হাত মুঠো করছেন, একবার খুলছেন। খুশি হলে তিনি এমন করেন।

সিডিসি।

জি বলুন।

তোমাকে একটা কাজ দিয়েছিলাম, তুমি করোনি। ভুলে গেছ।

আমি কিছুই ভুলি না। কুৎসিত রাজপুত্রদের নাম চেয়েছিলেন। নাম এবং অন্যান্য তথ্য জোগাড় করা হয়েছে। আপনাকে কি এখন দেব ?

না, এখন দিতে হবে না। তুমি বরং অরচ লীওনকে পর্দায় নিয়ে এসো, ওর সঙ্গে কথা বলব।

ঘরের যে অংশে আয়না ছিল, সেই অংশটি অদৃশ্য হলো। বিশাল এক পর্দায় অরচ লীওনের ছবি ভেসে উঠল। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। সে তার সামনে রাখা পর্দায় অসম্ভব রূপবান এক যুবকের ছবি দেখছে। সিডিসির কথা শোনা যাচ্ছে—

অরচ লীওন, উঠে দাঁড়াও এবং অভিবাদন করো মহান গাণিতজ্ঞ অমর বিজ্ঞানীকে।

অরচ লীওন উঠে দাঁড়াল। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে এই দৃশ্যের জন্যে তৈরি ছিল না। তার ধারণা ছিল অত্যন্ত বয়স্ক এক বৃদ্ধকে দেখবে, যার মাথার সমস্ত চুল পাকা। চোখ ঘোলাটে। যে বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

গ্রহণ করা হলো। তুমি বসো। তুমি নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে অন্যায় কৌতূহল প্রকাশ করেছ ?

হ্যাঁ।

কেন করেছ ?

করেছি, যাতে আমার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি পড়ে। কারণ আমি জানতাম কৌতূহল প্রকাশ করামাত্রই আপনারা তা জানবেন। আপনারা আমার সম্পর্কে কৌতূহলী হবেন। যদি আপনাদের কৌতূহল অনেক দূর পর্যন্ত জাগাতে পারি, তাহলে হয়তো-বা আপনারা আমাকে ডেকে পাঠাবেন। সরাসরি আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে। আমি যা করেছি, এই উদ্দেশ্যেই করেছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও কেন ?

কৌতূহল, শুধুই কৌতূহল।

এর বেশি কিছু না ?

জি-না, এর বেশি কিছু না।

কৌতূহল মিটেছে ?

না।

এখনো বাকি ?

হ্যাঁ, আমি অনেক কিছু জানতে চাই। আমার মনে অনেক প্রশ্ন। আমি নিজেই সেইসব প্রশ্নের জবাব বের করেছি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে জবাবগুলো মিলিয়ে নিতে চাই।

তোমার একটি প্রশ্ন বলো।

প্রশ্নটি হচ্ছে...

থাক, এখন আর তোমার প্রশ্ন শুনতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যেতে পারো। সিডিসি, পর্দা মুছে দাও।

পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল।

তাঁর তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে বমির ভাবও হচ্ছে। এই দুটি শারীরিক ব্যাপার তাঁর একসঙ্গে কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন ?

সিডিসি।

বলুন শুনছি।

অরচ লীওন মানুষটি কি বুদ্ধিমান ?

আপনার কী মনে হয় ?

আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করেছি, তুমি তার উত্তর দেবে। উল্টো প্রশ্ন করছ কেন ? যা বলছি তার জবাব দাও।

লোকটি বুদ্ধিমান। নিষিদ্ধ নগরীতে আসবার জন্যে সে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাতে কোনো খুঁত নেই।

সে চায় কী ?

সেটা কি তার পক্ষে জবাব দেওয়া সহজ নয় ? আমি পারি শুধু অনুমান করতে।

তোমার অনুমান হবে যুক্তিনির্ভর। সেই অনুমানটি বলো।

আমাকে আরও কিছু সময় দিন।

তোমাকে তিনদিন সময় দেওয়া হলো। এখন তুমি প্রথম শহর থেকে আসা ছেলে এবং মেয়েটি সম্পর্কে বলো।

কী জানতে চান ?

ওরা কী করছে ?

ওরা এই মুহূর্তে গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওদের গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেওয়া হলো কেন ?

আপনাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে। দুটি বুদ্ধিমান প্রাণী পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পাগলের মতো এদিক-ওদিক যাচ্ছে, এই দৃশ্যটি অত্যন্ত উত্তেজক। আপনার দেখতে ভালো লাগবে।

কী করে বুঝলে, আমার দেখতে ভালো লাগবে ?

অতীতে এই জাতীয় দৃশ্য আপনি দেখেছেন। আপনার ভালো লেগেছে। আপনি কি এখন দেখতে চান ? পর্দায় ওদের ছবি এনে দেব ?

না, এখন দেখতে চাই না। আমার তৃষ্ণা হচ্ছে, ক্ষুধা হচ্ছে, খাবার ব্যবস্থা করো। প্রচুর খাবার চাই। খাবার এবং পানীয়।

খাবার চলে এল। খাবার দেখে তাঁর আর খেতে ইচ্ছে করল না। মুখ বিকৃত করে খাবারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে। শৈশবের একটি অর্থহীন ছড়া ঘুরপাক খাচ্ছে—

এরন পাতা ক্যান ক্যান
বেমন বাতা এসেছেন।
অং ডং ইকিমিকি
চন্দ্র সূর্য ঝিকিমিকি।।

কিছুই ভালো লাগছে না। অমরত্ব অসহনীয় বোধ হচ্ছে। একজন মানুষ নির্দিষ্ট কিছু সময় বাঁচে। এটা জানা থাকে বলেই জীবনের প্রতি তার প্রচণ্ড মমতা থাকে। এই মমতা তাঁর নেই। জীবনকে এখন তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সিডিসি।

শুনছি।

মাথার মধ্যে একটা ছড়া ঘুরপাক খাচ্ছে, এটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। শুধুই ঘুরছে এবং ঘুরছে। মনে হচ্ছে লক্ষ বছর ধরে ঘুরবে।

আপনি খাবার শেষ করুন। আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। সবচে' ভালো হয়, যদি দীর্ঘদিনের জন্যে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়। যেমন এক বছর কি দু বছর।

তুমি মূর্খের মতো কথা বলছ।

আমার সম্পর্কে এই বাক্যটি আপনি প্রায়ই ব্যবহার করেন।

তাতে কি তোমার অহঙ্কারে লাগে ?

কিছুটা।

তিনি হতভম্ভ হয়ে গেলেন। সিডিসি একটি কম্পিউটারের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার মধ্যে থাকবে শুধু লজিক। আবেগ-অনুভূতি থাকবে না। কোথাও কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে ? কিছু কি বদলে গেছে ? সিডিসি গম্ভীর স্বর বের করল, আপনার জন্যে একটি ক্ষুদ্র দুঃসংবাদ আছে।

কী দুঃসংবাদ ?

অমর মানুষদের দুজন আর আমাদের সঙ্গে নেই।

তার মানে ?

খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে জানতে চান ?

না, জানতে চাই না। আমি আন্দাজ করতে পারি কীভাবে ঘটেছে। আগেরগুলো যেভাবে ঘটেছে, এটিও সেভাবেই ঘটেছে। আত্মহত্যা ? তাই না ?

হ্যাঁ, তাই। দুজন একসঙ্গে ঘটনাটা ঘটিয়েছেন। মারা যাওয়ার আগে একটি নোট লিখে রেখেছেন। নোটটি কি আপনাকে পড়ে শোনাব ?

না। পর্দায় আন। আমি দেখব।

পর্দায় হলুদ চিরকুট ভেসে উঠল। লেখা একটিই। সই করেছেন দুজনে মিলে। লেখার একটি শিরোনামও আছে।

আমাদের কথা

> আমরা দুজন এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিলাম। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নিতে হয়। নয়তো আর কখনো নেওয়া হয় না। দীর্ঘ জীবন কাটালাম। জীবন এত ক্লান্তিকর, কল্পনাও করিনি। কোথাও বিরাট একটা গণ্ডগোল হয়েছে। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।

শেষ বাক্যটি লাল কালি দিয়ে দাগানো। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।' এই বাক্যটি তাঁর মাথায় বিঁধে গেল। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।

তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। সিডিসি নিশ্চয়ই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাঁর ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলেন, আমি ঘুমাতে চাই না। আমি জেগে থাকব। অনন্তকাল বেঁচে থাকব। অযুত নিযুত বছর বেঁচে থাকব। আমি মৃত্যুহীন। অজর-অমর-অবিনশ্বর। তিনি তা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল! মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল!! মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল!!!

১১

ইরিনার ভয় লাগছে না।

সে বেশ সহজ ভঙ্গিতেই হাঁটছে। জায়গাটাকে প্রকাণ্ড গুহার মতো মনে হচ্ছে, যে গুহার ভেতর মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য টানেল। কোনো একটি টানেল ধরে কিছুদূর যাওয়ার পরই টানেলটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কোনো কোনো জায়গায় তিন ভাগ হয়। কিছু টানেল অন্ধ গলির মতো। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। গ্রানাইট পাথরের নিরেট দেয়াল।

প্রথমে ঢোকবার পর খুবই অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে না। চাপা আলোয় চারপাশ ভালোই চোখে পড়ে। টানেলগুলো ছোট ছোট, দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। তবে সোজা হয়ে হাঁটতে অসুবিধা হয় না। ইরিনা হাঁটছে ঠিকই, কোনো কিছুই গভীরভাবে লক্ষ করছে না। লক্ষ করার প্রয়োজনও বোধ করছে না। কী হবে লক্ষ করে ? এই জটিল গোলকধাঁধা থেকে নিজের চেষ্টায় সে বেরুতে পারবে না। কাজেই সেই অর্থহীন চেষ্টার প্রয়োজন কী ?

সে ঘণ্টাখানেক হাঁটল। একবার 'কে আছ ?' বলে চিৎকার করল দেখার জন্যে যে প্রতিধ্বনি হয় কি না। সুন্দর প্রতিধ্বনি হলো। অসংখ্যবার শোনা গেল, 'কে আছ ? কে আছ ? কে আছ ?' শব্দটা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে বিচিত্র কারণে আবার বাড়ে। নদীর ঢেউয়ের মতো শব্দ ওঠানামা করতে থাকে। চমৎকার একটা খেলা তো! সে মৃদুস্বরে বলল, আমি ইরিনা। আবার সেই আগের মতো হলো। ফিসফিস করে চারিদিক থেকে বলছে, আমি ইরিনা! আমি ইরিনা! ঢেউয়ের মতো শব্দ বাড়ছে কমছে এবং একসময় মিলিয়ে যাচ্ছে। তাও পুরোপুরি মিলাচ্ছে না। শব্দের একটি অংশ যেন থেকে যাচ্ছে। যেন এই অদ্ভুত গুহায় বন্দি হয়ে যাচ্ছে। এই জীবনে তাদের মুক্তি নেই। আজ থেকে হাজার বছর পরে কেউ এলে সে-ও হয়তো শুনবে, তার কানের কাছে কেউ ফিসফিস করে বলছে, আমি ইরিনা, আমি ইরিনা। যাকে বলা হবে, সে চমকে চারিদিকে তাকাবে। কাউকে দেখবে না। মানুষ থাকবে না, তার শব্দ থাকবে। এ-ও তো এক ধরনের অমরতা। এই-বা মন্দ কী ? ইরিনা খিলখিল করে হেসে গম্ভীর হয়ে গেল। তার ধারণা হলো, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ কী করে পাগল হয় তা সে জানে না। যদিও চোখের সামনে একজনকে পাগল হতে দেখেছে। তার নাম কুনু। চমৎকার ছেলে। হাসিখুশি। অদ্ভুত অদ্ভুত সব রসিকতা করে। বেশিরভাগ রসিকতাই মেয়েদের নিয়ে। রসিকতা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে নেয়, সম্মানিত মহিলাবৃন্দ, এইবার আপনাদের লইয়া একটা রসিকতা করা হইবে। যাহারা এই জাতীয় রসিকতা সহ্য করিতে অক্ষম, তাহাদের নিকট অধীনের বিনীত নিবেদন, আঙুলের সাহায্যে দুই কান বন্ধ করুন। যথাবিহিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। ইহার পরে কেহ আমাকে দোষ দিবেন না। ইতি আপনাদের সেবক কুনু।

বেচারা কীভাবে জানি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সারাক্ষণ তার চেষ্টা কী করে মেয়েটির আশপাশে থাকবে। মেয়েটির সঙ্গে দু'টি কথা বলবে। বাড়ি ফেরার সময় একসঙ্গে ফিরবে। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী ছিল। কুনুকে বলল, তুমি সবসময় আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন ? কুনু লাজুক গলায় বলল, আমার ভালো লাগে, এইজন্যে থাকতে চাই।

তোমার কথা শুনে আমার ভালো লাগল। আমি কেন, যে-কোনো মেয়েরই ভালো লাগবে। কিন্তু পরের অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ ?

পরের কী অবস্থা ?

আমি এই বছরই বিয়ের অনুমতি পাব, কাউকে বিয়ে করতে হবে। তুমি অনুমতি পাবে আরও তিন বছর পর। তখন তোমার কষ্ট হবে।

কষ্ট হলে হবে।

মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম শহরের বিবাহ-দপ্তরের ঠিক করে দেওয়া একটি ছেলের সঙ্গে। তবু কুনু সবসময় চেষ্টা করে মেয়েটির আশপাশে থাকতে।

মেয়েটি যখন তার স্বামীর সঙ্গে কাজের শেষে বাড়ি ফেরে, কুনু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে। ছুটির সময় মেয়েটির বাড়ির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি এবং তার স্বামী, দুজনই খুব অস্বস্তি বোধ করে। কুনুর পাগল হওয়ার শুরুটা এখান থেকে, শেষ হয় খাদ্য-দপ্তরে। খাবারের টিকেটের জন্যে সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কুনু হাসতে শুরু করল। প্রথমে মিটিমিটি হাসি, তারপরই উচ্ছ্বসিত হাসি। সে হাসি আর থামেই না। দু'জন রোবট-কর্মী ছুটে এল। কুনুকে সরিয়ে নেওয়া হলো। সংবাদ বুলেটিনে বলা হলো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে কুনুকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যেন সে একটি ভঙ্গুর আসবাব, কাচের কোনো পাত্র। নষ্ট করে ফেলা যায়। নষ্ট করতে কোনো দোষ নেই। কোনো অপরাধ নেই।

এই মেয়ে!

ইরিনা চমকে উঠল। নিজেকে খুব সহজেই সামলে নিল। পা গুটিয়ে মীর বসে আছে। তার মুখভর্তি হাসি। মীর বলল, তোমাকেও এখানে এনে ফেলে দিয়েছে নাকি ? তুমিও এলে ?

দেখতেই তো পাচ্ছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

আরও আস্তে কথা বলো। শব্দ করে বললে বিকট প্রতিধ্বনি হয়। যা বলার কানের কাছে মুখ এনে বলো।

আমার কিছু বলার নেই।

আরে কী মুশকিল। আমার ওপর রাগ করছ কেন ? আমি তো তোমাকে গুহায় এনে ফেলিনি।

আপনি এখানে বসে বসে কী করছেন ?

তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। যে জায়গাটায় বসে আছি সেটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। তোমাকে এখানে আসতেই হবে।

আমি যে এখানে আছি, কী করে বুঝলেন ? আপনাকে ওরা বলেছে ?

আরে না। কিছুই বলেনি। নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠে দেখি এখানে শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বুঝলাম, এটা একটা গোলকধাঁধা। বেশ মজা লাগল। ঘণ্টাখানেক আগে তোমার গলা শুনলাম, তারপর থেকেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ইরিনা বলল, আপনি তো একবার বলেছিলেন যে আপনি খুব বুদ্ধিমান। এখান থেকে বেরুতে পারবেন ?

আরে এই মেয়ে কী বলে! পারব না কেন ? ব্যাপারটা খুব সোজা। তোমাকে যে কোনো একদিকে বাঁক নিতে হবে। হয় ডানে যাবে নয় বাঁ দিকে যাবে। তাহলেই হলো। তবে এমনিতে ডান-বাম ঠিক রাখা মুশকিল, কাজেই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ডান দিকের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।

আপনি গিয়েছিলেন ?

নিশ্চয়ই। গোলকধাঁধার রহস্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের করেছি।

সত্যি কি করেছেন ?

আরে কী মুশকিল! আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলব কেন ? বসো এখানে। গল্প করি।

গল্প করবেন ? আচ্ছা, আপনি কি পাগল ?

মীর অত্যন্ত অবাক হলো। এই মেয়েটির রাগের কোনো কারণ তার মাথায় ঢুকছে না। রাগ হলেও হওয়া উচিত, যারা মেয়েটিকে এখানে এনেছে তাদের ওপর। সে তো তাকে এখানে আনেনি। মীর দ্বিতীয়বার বলল, বসো ইরিনা। কেন শুধু শুধু রাগ করছ ?

ইরিনা তাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি বসল। হালকা গলায় বলল, মনে হচ্ছে আপনি খুব সুখে আছেন ?

সুখেই তো আছি।

কেন সুখে আছেন জানতে পারি ?

সুখে আছি, কারণ এই প্রথম নিজের মতো করে থাকতে পারছি। যে সব প্রশ্ন করামাত্র প্রথম শহরে লোকদের শাস্তি হয়ে যায় সেইসব প্রশ্ন করতে পারছি এবং জবাবও পাচ্ছি।

আর এই যে একটা ছোট্ট ঘরে আপনাকে দিনের পর দিন বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তার জন্যে খারাপ লাগে না ?

না তো। চিন্তা করবার মতো কত কী পাচ্ছি। চিন্তা করে করে কত রহস্যের সমাধান করে ফেললাম।

তাই বুঝি ?

মীর আহত গলায় বলল, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ? কয়েকদিন আগে একটা রহস্য ভেদ করলাম। সেই কথা শুনলে তুমি অবাক হবে। যেমন ধর, অমর মানুষদের সংখ্যা এখন নয়জন। একসময় ছিল চল্লিশজন। তাদের মধ্যে পুরুষও ছিলেন এবং রমণীও ছিলেন। তবু সংখ্যা বাড়ল না। এর মানে কী ? এর মানে হচ্ছে অমর মানুষদের ছেলেপুলে হয় না।

এইটাই আপনার বিশাল আবিষ্কার ?

আবিষ্কারটা খুব ক্ষুদ্র, এরকম মনে করারও কারণ নেই। ভালোমতো ভেবে দেখো, অমর মানুষরা বংশবৃদ্ধি করতে পারেন না, এবং তাঁদের সংখ্যা কমছে। অর্থাৎ তাঁরা অমর নন।

ইরিনা তাকিয়ে আছে। মীর উজ্জ্বল চোখে হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইরিনার মনে হলো, এই লোকটি কী নির্বোধ! একমাত্র নির্বোধরাই এমন অবস্থায় এত হাসিখুশি থাকতে পারে।

মীর হাত নেড়ে বলল, নিষিদ্ধ জায়গাটা কোথায় বলো তো ?

ইরিনা তাকিয়ে রইল, উত্তর দিল না। মীর বলল, জায়গাটা মাটির ওপরে না নিচে, এইটা বলো।

মাটির নিচে হবে কেন ?

এই ব্যাপারটাই আমাকে খটকায় ফেলে দিয়েছে। মাটির নিচে কেন ? কারণটা আমি বের করেছি—

কারণ পরে শুনব, আগে বলুন জায়গাটা মাটির নিচে বলে ভাবছেন কেন ?

জায়গাটা মাটির নিচে বলে ভাবছি, কারণ এখানে কখনো বাতাস বইতে লক্ষ করিনি। সারাক্ষণই বাতি জ্বলছে এবং এখানকার তাপমাত্রা সবসময় সমান থাকে। কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।

মাটির ওপরেও তো এরকম একটা ঘর থাকতে পারে। বিশাল একটি ঘরের ভেতরের দিকের ঘরও তো এরকম হতে পারে। পারে না ?

হ্যাঁ, তা অবশ্য পারে, তুমি ঠিকই বলেছ। আমারও এরকম সন্দেহ হয়েছিল, কাজেই আমি খুব বুদ্ধিমানের মতো একটি প্রশ্ন করে এনারোবিক রোবটের কাছ থেকে উত্তরটা বের করে ফেললাম।

কী প্রশ্ন ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জায়গাটা মাটির নিচে না ওপরে ? সে বলল, নিচে। হা হা হা।

ইরিনা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। কী বিচিত্র মানুষ! ইরিনা বিরক্ত হয়ে বলল, শুধু শুধু এত হাসছেন কেন ?

হাসছি, কারণ এত চিন্তাভাবনা করে এই জিনিসটা বের করার দরকার ছিল না। রোবটকে জিজ্ঞেস করলেই হতো। হা হা হা।

হাসবেন না। আপনার হাসি শুনতে ভালো লাগছে না।

প্রথম দুদিন এরা নিষিদ্ধ নগর নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিত না। এখন যা জানতে চাই বলে দেয়। এর মানেটা কী বলো তো ?

জানি না।

এর মানে হচ্ছে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। মারবার আগে একটু ভালো ব্যবহার করছে। হা হা হা।

আমাদের মেরে ফেলবে, এটা কি খুব আনন্দের ব্যাপার ? এরকম করে হাসছেন কেন ?

কী করতে বলো আমাকে ? পা ছড়িয়ে বসে বসে কাঁদব ?

ইরিনা চুপ করে আছে। মীর শান্ত গলায় বলল, আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু চিন্তা করে লাভ কী ? এরচেয়ে আনন্দে থাকাটাই কি ভালো না ? কী, কথা বলছ না কেন ?

ইচ্ছে করছে না তাই বলছি না, আপনিও দয়া করে বলবেন না।

আমি আবার কথা না বলে থাকতে পারি না। কাউকে পছন্দ হলে আমার শুধু কথা বলতে ইচ্ছা করে। তোমাকে কিছুটা পছন্দ হয়েছে।

ইরিনা উঠে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই হাঁটতে শুরু করল।

এই, তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

তা দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই। খবরদার, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না।

মীর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ইরিনা একবারও পেছনে না ফিরে প্রথম বাঁকেই ডান দিকে ফিরল। ডান হাতে ডান দিকের দেয়াল স্পর্শ করে সে দ্রুত এগোচ্ছে। তার দেখার ইচ্ছা সত্যি সত্যি বের হওয়া যায় কিনা। সে ভেবেছিল পেছনে পেছনে মীর আসবে। তাও আসছে না। দ্বিতীয় বাঁকের কাছে এসে সে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করল, যদি মীর ফিরে আসে। না, সে আসছে না। লোকটি এমন কেন ? তার কি উচিত ছিল না পেছনে পেছনে আসা ? ইরিনার এখন ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। সেটাও লজ্জার ব্যাপার। ফিরে গিয়ে সে কী বলবে ?

ইরিনা ফিরল না। ডান হাতে দেয়াল স্পর্শ করে এগোতে লাগল। আশ্চর্য কাণ্ড, পনেরো মিনিটের মাথায় সে গোলকধাঁধার প্রবেশপথে চলে এল। মীর তাকে ভুল বলেনি। লোকটি বুদ্ধিমান।

এনারোবিক রোবট দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশপথে। রোবটের চোখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ইরিনার মনে হলো রোবটটি খুব অবাক হয়েছে।

তুমি খুব অল্প সময়েই বেরিয়ে এলে।

হ্যাঁ, এলাম।

তোমার সঙ্গী মীর বোধহয় তোমার মতো বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী নয়। সে এখনো ঘুরছে।

ইরিনা ঠান্ডা গলায় বলল, সে কী করছে না করছে তা তোমরা খুব ভালো করেই জানো। আমি কীভাবে বের হলাম তাও জানো, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ? পেয়েছ কী তুমি ?

রোবটটি কিছু বলল না। তবে তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে কিছু জানে না, কারণ কিছু সময় পর আবার বলল, ওখান থেকে কেউ বেরুতে পারে না। তুমি কীভাবে বের হলে ?

জানি না কীভাবে বের হয়েছি। হয়তো আমি কোনো মন্ত্র জানি।

কী জানো ? মন্ত্র ? সেটা কী ?

মন্ত্র হচ্ছে কিছু কিছু অদ্ভুত শব্দ। একের পর এক বলতে হয়।

তাতে কী লাভ ?

তাতেই কাজ হয়। অসাধ্য সাধন করা যায়।

রোবটটি মনে হয় খুব অবাক হয়েছে। এরা অবাক হলে টের পাওয়া যায়। এদের মারকারি চোখের ঔজ্জ্বলতায় দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এখানেও তাই হচ্ছে। ইরিনার এখন কেন জানি বেশ মজা লাগছে। সে হালকা গলায় বলল, একটা মন্ত্র তোমাকে শোনাব ? শুনতে চাও ?

হ্যাঁ। তোমার যদি কষ্ট না হয়।

ইরিনা হাত নাড়িয়ে মাথা দুলিয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা অদ্ভুত ছড়া বলল—

ইরকু ফিরকু চাচেন চাচেন
আপনি ভাই
কেমন আছেন ?
কুরকুর কুর মুরমুর মুর
ভয় দ্বিধা সব হয়ে যাক দূর।
এরকা ফেরকা হিমটিম
সকাল বেলায়
খাবেন ডিম।

রোবট বলল, এটা একটা মন্ত্র ?

হ্যাঁ মন্ত্র।

এখন কী হবে ?

এখন আমি আবার ওই গোলকধাঁধায় অদৃশ্য হয়ে যাব। আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বলেই সে দাঁড়াল না। রোবটটি কিছু বোঝার বা বলার আগেই দ্রুত টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। রোবটটির যা আকৃতি, তাতে টানেলের ভেতর তার ঢোকার উপায় নেই। সে পেছনে পেছনে আসবে না। তবু কে জানে হয়তো কোনো না কোনোভাবে এসেও যেতে পারে। ইরিনা দ্রুত যাচ্ছে। এবার যাচ্ছে বাঁ হাতের বাঁ দিকের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সে নিশ্চিত জানে, এভাবে কিছুদূর গেলেই মীরকে পাওয়া যাবে। সে নিশ্চয়ই এখনো ঠিক আগের জায়গাতেই আছে।

মীর সেখানেই ছিল। ইরিনাকে আসতে দেখে সে বিন্দুমাত্র অবাক হলো না। যেন এটাই সে আশা করছিল কিংবা এটা যে ঘটবে তা সে জানে। ছুটে আসার জন্যে

ইরিনা হাঁপাচ্ছিল। দম ফিরে পেতে তার সময় লাগছে। মীর তাকিয়ে আছে। ইরিনা বলল, এখনো এই একই জায়গায় বসে আছেন ?

হ্যাঁ।

নতুন কোনো রহস্য নিয়ে ভাবছিলেন বুঝি ?

হ্যাঁ।

কী রহস্য ?

তুমি কেন আমাকে দেখলেই রেগে যাও, এ রহস্য নিয়ে ভাবছিলাম।

রহস্যের সমাধান হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে। তুমি আমাকে দেখলেই রেগে যাচ্ছ, কারণ তুমি যে-কোনো কারণেই হোক আমার প্রেমে পড়ে গেছ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ তাই। তুমি আমার প্রতি যে আগ্রহ দেখাচ্ছ, সেই আগ্রহ আমি তোমার প্রতি দেখাচ্ছি না—এই জিনিসটাই তোমাকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

আপনি তো বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

হ্যাঁ, তা করেছি এবং ঠিক করেছি এখন থেকে তোমার প্রতি আগ্রহ দেখাব। কিছুটা হলেও দেখাব।

আপনার অসীম দয়া।

কাছে এসো ইরিনা। আমি এখন তোমাকে একটি চুমু খাব।

ইরিনা কাছে এগিয়ে এল এবং মীর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। মীর হতভম্ব। সে তার গালে হাত বোলাচ্ছে এবং অদ্ভুত চোখে ইরিনাকে দেখছে। মীর দুঃখিত গলায় বলল, এরকম করলে কেন ? আমি কিন্তু ভুল বলিনি। সত্যি কথাই বলেছি। এবং তুমিও জানো এটা সত্যি। জানো না ?

ইরিনা তাকিয়ে আছে। তার বড় বড় চোখ মমতায় আর্দ্র। তার খুব খারাপ লাগছে। এরকম একটা কাণ্ড সে কেন করল ? সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি খুব লজ্জিত।

আমি কিছু মনে করিনি। শুধু একটু অবাক হয়েছি। আমার চুমু খাবার তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, চুমু খেলে তুমি খুশি হবে। আমি তোমাকেই খুশি করতে চাচ্ছিলাম। চুমু খাওয়া আমার কাছে কখনো খুব আনন্দের কিছু মনে হয়নি।

ওই প্রসঙ্গটা বাদ থাক। অন্যকিছু বলুন।

আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্কের খেলা খেলবে ? বেশ মজার খেলা। আচ্ছা বলো তো, কোন দুটি সংখ্যার যোগফল গুণফলের চেয়েও বেশি।

কী বললেন, যোগফল গুণফলের চেয়েও বেশি ? তা কেমন করে হবে ?

হবে। যেমন ১ এবং ১, এদের যোগফল দুই কিন্তু গুণফল ১। হা হা হা।

ইরিনা তাকিয়ে আছে। মীর গম্ভীর হয়ে বলল, এবার আরেকটু কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি।

আমার এইসব অঙ্ক ভালো লাগছে না। বিরক্তি লাগছে।

আচ্ছা, তাহলে অঙ্কের অন্য ধাঁধা দিই, খুব মজার। খুবই মজার।

বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকুও মজা লাগছে না।

লাগতেই হবে। ১ থেকে ৯-এর মধ্যে একটা সংখ্যা মনে মনে চিন্তা করো। সংখ্যাটাকে ৩ দিয়ে গুণ দাও। এর সঙ্গে ২ যোগ দাও। যোগফলকে আবার ৩ দিয়ে গুণ দাও। যে সংখ্যাটি মনে মনে ভেবেছিলে সেই সংখ্যাটি এর সঙ্গে যোগ দাও। দুই সংখ্যার যে অঙ্কটি পেয়েছ, তার থেকে প্রথম সংখ্যাটি বাদ দাও। এর সঙ্গে ২ যোগ দাও। একে ৪ দিয়ে ভাগ দাও। এর সঙ্গে ১৯ যোগ দাও। দিয়েছ ?

হ্যাঁ।

উত্তর হচ্ছে ২১। ঠিক আছে না ?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মীর হাসছে। কী সুন্দর সহজ-সরল হাসি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ। হয়তো আসলেই তাই। কিছু কিছু মানুষ সুখী হওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। ইরিনার মনে হলো, এই কদাকার লোকটি এখন যদি তাকে চুমু খেতে চায়, তার বোধহয় খুব খারাপ লাগবে না। কিন্তু লোকটি অঙ্কে ডুবে গেছে।

১২

তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের চৌকো ধরনের সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিঁ পিঁ করে দুবার শব্দ হলো। একটি লাল আলো জ্বলে উঠল। তিনি মূল কম্পিউটার সিডিসির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। এখন এই ঘরে কী হবে না হবে তা তিনি ছাড়া কেউ জানবে না। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তিনি পরপর তিনবার বললেন, সিডিসি, তুমি কি আছ ?

জবাব পাওয়া গেল না। এই ঘরটি এখন তাঁর নিজের। কেউ এখন আর তাঁর দিকে তাকিয়ে নেই। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চমৎকার আনন্দ তিনি খানিকক্ষণ উপভোগ করলেন। এরকম তিনি মাঝে মাঝে করেন। নিজেকে আলাদা করে কিছু সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত কাজটি হচ্ছে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে লেখা। খুব গুছিয়ে অবশ্য তিনি লিখতে পারেন না। লেখালেখির কাজটা তাঁর ভালো আসে না। পরের অংশ আগে চলে আসে। আগের অংশ মাঝখানে কোনো এক জায়গায় ঢুকে যায়। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। ডায়েরি

লেখাটা অর্থহীন। এটা কেউ পড়বে না। পড়ার প্রয়োজনও নেই। নিজের লেখা নিজের জন্যেই। অন্য কারও জন্যে নয়। কোনো কারণে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে [সে সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়] তাহলে নির্দেশ দেওয়া আছে তাঁর শরীর এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিটি জিনিস নষ্ট করে ফেলা হবে। তিনি চান না তাঁর এই লেখা অন্য কারও হাতে পড়ুক। তবুও যদি কোনো কারণে অন্য কারও হাতে পড়ে, তাহলেও সে কিছু বুঝবে না। তিনি সাংকেতিক একটি ভাষা ব্যবহার করেছেন। অতি দুরূহ সেই সাংকেতিক ভাষার রহস্য উদ্ধার করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই তিনি মনে করেন। অনেক পরিশ্রমে এই সাংকেতিক ভাষা তিনি তৈরি করেছেন।

তিনি ড্রয়ার থেকে ডায়েরি বের করলেন। হাজার পৃষ্ঠার বিশাল একটি খাতা। গুটি গুটি সাংকেতিক চিহ্নে তা প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন। তিনি প্রথম দিককার পাতা উল্টালেন—

৭৮৬৫ (ক) সোমবার

শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটার সহজ সমাধান হলো।

আমরা চল্লিশজনের সবাই নতুন ওষুধটি ব্যবহার করতে রাজি হয়েছি। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় নয়, নতুন রিএজেন্টটির কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্যে। যদিও আমরা নিশ্চিত জানি এটা কাজ করবে। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। পশুদের মধ্যে বানর, বিড়াল, শুকরের ওপর পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা করা হয়েছে। সরীসৃপের ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে। ইঁদুর তো আছেই। আমরা জানি এটা কাজ করবে, তবু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত। এমনও তো হতে পারে, ওষুধটি ব্যবহারের একশ বছর পর একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। বিচিত্র কিছুই নয়। তবু আমরা রাজি হলাম। বৈজ্ঞানিক কারণেই হলাম। আমাদের দলটি বেশ বড়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার ব্যবস্থা নেওয়ার মতো জ্ঞান আমাদের এই দলের আছে। আমরা নিজেদের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। পুরো ল্যাবোরেটরি ভূগর্ভে। ওপরে ত্রিশ ফিটের মতো গ্রানাইট পাথর। আমরা আগামী একশ বছরের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সর্বাধুনিক কম্পিউটার সিডিসি স্থাপন করা হয়েছে, যার ক্ষমতা কল্পনাতীত। সে প্রতিটি জিনিস লক্ষ করবে। একদল কর্মী রোবট এবং দশজন বিজ্ঞানী রোবট আমাদের আছে। Q23 এবং Q24 জাতীয় রোবটও আছে বেশ কয়েকটি। আমরা এদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি। রোবটিক্স্ বিদ্যার উন্নতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

ওদের জন্যে পৃথক গবেষণাগার আছে, যা তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্যে নিজেরাই ব্যবহার করবে। জ্বালানির জন্যে আমাদের দুটি আণবিক রিএক্টার আছে। একটিই যথেষ্ট, অন্যটি আছে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে।

আজ সেই বিশেষ রাত। আমাদের সবার শরীরে সত্তর মিলিগ্রাম করে হরমোন ব্লকিং রিএজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ ঝিমুনির মতো হলো। এটা হবেই। এই রিএজেন্ট রক্তে শর্করা হঠাৎ খানিকটা কমিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে হরমোন এড্রোলিনের একটা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে। ঝিমুনির ভাব স্থায়ী হলো না, তবে পানির তৃষ্ণা হতে লাগল। মনে হলো মাথা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কানের কাছে ঝিঁঝি শব্দ হচ্ছে। আমরা নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাশা করতে লাগলাম। তবে আমরা সবাই বেশ ভয় পেয়েছি। অমরত্বের শুরুটা খুব সুখের নয়।

৭৮৭৭ (প) শনিবার

আমরা পঞ্চাশ বছর পার করে দিয়েছি।

সেই উপলক্ষে আজ একটা উৎসব হলো। ওষুধটি কাজ করছে এবং খুব ভালোভাবেই করছে। আমাদের কারও চেহারায় বা কর্মক্ষমতায় বয়সের ছোঁয়া নেই। আমরা চিরযুবক এবং চিরযুবতীর দল। তবে ক্ষুদ্র একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ করেছি। এই ওষুধ বংশবৃদ্ধির ধারা রুদ্ধ করে দিয়েছে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সম্পৃক্তীকরণ-পদ্ধতি পুরোপুরি নষ্ট। কোনো শুক্রাণুই ডিম্বাণুকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য নিয়মে আমরা অভিভূত। যেই মুহূর্তে প্রকৃতি দেখছে, একদল মানুষ মৃত্যুকে জয় করছে, সেই মুহূর্তে সে তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করে দিয়েছে। অপূর্ব!

সময় কাটানো আমাদের কিছুটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অমরত্বের ব্যাপারটি প্রচার হয়নি। হলে বড় রকমের ঝামেলা হবে। সবাই অমর হতে চাইবে। তা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে আমাদের ঘনঘন কাউন্সিল মিটিং হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। তারা নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করছে। এদের চাপ আগ্রহ্য করা বেশ কঠিন। এই নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

আমরা মোটামুটি সুখী। রোবটিক্স্-এ দারুণ উন্নতি হচ্ছে। রিবো-ত্রি সার্কিটে টেনার জংশন দূর করার পদ্ধতি বের হয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এটা পেরেছেন কিনা আমরা জানি না। না পারলে তাঁরা অনেকদূর পিছিয়ে পড়বেন। আমরা এগিয়ে যাব। অনেকদূর যাব।

৭৯০২ (ল)

আমরা একশ কুড়ি বছর পার করে দিয়েছি। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ হলো। পৃথিবীতে মানবসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের পর সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গেছে। ভয়াবহ অবস্থা। পৃথিবীর বাইরের রেডিয়েশন লেভেল অত্যন্ত উঁচু। তবু কিছু কিছু অংশ রক্ষা পেয়েছে। সেখানকার মানব-সমাজকে আমরা ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করেছি। যাতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এ জাতীয় দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর ও তৃতীয় শহরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শহরে কাটাবে। ধারণাটা নেওয়া হয়েছে ধর্মগ্রন্থ থেকে। ধর্মগ্রন্থে স্বর্গের একটি চিত্র থাকে, যাতে স্বর্গবাসের কামনায় মানুষ ইহজগতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। এখানেও সেই ব্যবস্থা। প্রথম শহরের লোকজনের কাছে দ্বিতীয় শহর হচ্ছে স্বর্গ। তেমনি দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের স্বর্গ হচ্ছে তৃতীয় শহর। এইসব স্বর্গবাসের আশায় তারা জীবন কাটিয়ে দেবে কঠোর নিয়মের মধ্যে। জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখাই আমরা সঠিক কাজ বলে মনে করছি। একদল অমর বিজ্ঞানীর হাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান থাকা উচিত। সাধারণ মানুষ তার ফল ভোগ করবে। জ্ঞান সবার জন্যে নয়।

আমাদের কারও কারও মধ্যে সামান্য অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। সম্ভবত দীর্ঘদিন ভূগর্ভে থাকার এই ফল। চারজন আত্মহত্যা করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক।

আমরা সুখেই আছি বলা চলে। সবাই নতুন পৃথিবী তৈরিতে ব্যস্ত। প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। রোবটরা পরিকল্পনা তৈরিতে আমাদের সাহায্য করছে। সমস্ত ব্যাপারটি পুরোপুরি চালু হতে আরও একশ বছর লেগে যাবে। সৌভাগ্যের বিষয়, সময় আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়।

৮৪০২ (প)

চারশ বছর ধরে বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকায়ও ক্লান্তি আছে।

আমরা ভূগর্ভ থেকে এখন আর বেরুতে পারছি না। বাইরের আবহাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না। একজন পরীক্ষামূলকভাবে বের হয়েছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শরীরে অসহ্য জ্বলুনি হলো। তাকে নিচে ফিরিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হলো। সম্ভবত ব্লকিং রিএজেন্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কেন ঘটছে আমরা বুঝতে পারছি না। গবেষণা চলছে, তবে কোনোরকম ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা চিন্তিত। বাকি জীবন কি ভূগর্ভেই কাটাতে হবে ?

আমাদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে গেছে। আমাদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মহত্যার সংখ্যা হয়তো আরও বাড়বে। নতুন পৃথিবীর নতুন সমাজব্যবস্থা চমৎকারভাবে কাজ করছে। নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে। জীবনের শেষ সময় মহাসুখে কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওরা আমাদের চেয়েও সুখী। মাঝে মাঝে কেন, এই মুহূর্তেই মনে হচ্ছে। তবে বেঁচে থাকাও কষ্টের। খুবই কষ্টের। এখন আমার কিছুই ভালো লাগে না। সঙ্গীত অসহ্য বোধ হয়। মনে হয় অমর মানুষদের জন্যে নতুন ধরনের কোনো সঙ্গীত সৃষ্টি করতে হবে।

৯৯০০২ (ফ)

আমরা এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গেছি। একধরনের চাপা ভয় আমাদের সবার মধ্যে কাজ করছে। যদিও কেউ তা প্রকাশ করছে না। কাউন্সিল মিটিংগুলোর বেশিরভাগ ঠিকমতো হচ্ছে না। অর্থহীন কিছু আলোচনার পরপরই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। সিডিসিকে এই ব্যাপারে খুব চিন্তিত মনে হলো। তার চিন্তার কারণ অবশ্যই আছে। রোবট এবং চিন্তা করতে সক্ষম যাবতীয় কম্পিউটারদের দুটি সূত্র মেনে চলতে হয়। সূত্র দুটি হচ্ছে—(ক) আমরা অমর মানুষদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করব। (খ) মানবজাতিকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করব।

এরা এই সূত্র দুটির কারণেই এত চিন্তিত। সিডিসি সম্পূর্ণ

নিজের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার মেডিকেল বোর্ড তৈরি করেছে। সেইসব বোর্ড আমাদের শারীরিক সমস্ত ব্যাপার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দীর্ঘ ঘুম আমাদের মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে। সেই ঘুম মৃত্যুর কাছাকাছি। দু'বছর তিন বছর ধরে সুদীর্ঘ নিদ্রা।

ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না।

তিনি দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগলেন। যেন কোনো বিশেষ লেখা খুঁজছেন। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হতে থাকল। ইদানীং তিনি অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, আজ তা হলো না। শান্ত ভঙ্গিতেই পাতা ওল্টাচ্ছেন, যদিও তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত। যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন—একটি অংশ যা সাংকেতিক ভাষায় লেখা নয়। তারিখ দেওয়া নেই, সময় দেওয়া নেই। তবে তাঁর মনে আছে, একদিন খুব ভোরবেলায় হঠাৎ কী মনে করে যেন তিনি লিখলেন,

আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাদের সহ্য করতে পারছে না। এরকম মনে করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। একদল যন্ত্র কেন আমাদের অপছন্দ করবে ? তাছাড়া পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপারটি যন্ত্রের থাকার কোনো কারণ নেই। রিবোট্রি সার্কিট ব্যবহার করা হলেও ওরা রোবট, এর বেশি কিছু নয়।

যা বললাম তা কি ঠিক ? সত্যি কি এরা রোবটের বেশি কিছু নয় ? আমি এ ব্যাপারেও পুরোপুরি নিশ্চিত নই। মনে হচ্ছে কোনো গোপন রহস্য আছে। সেই রহস্য আমি ধরতে পারছি না।

তিনি সুইচ টিপলেন, লাল আলো নিভে গেল। তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, সিডিসি।

বলুন শুনছি।

তুমি কেমন আছ ?

আমি ভালোই আছি। আমার ভালো থাকা তো আর আপনাদের মতো নয়। আমি ভালো আছি আমার নিজের মতো।

রোবটিক্স্-এর গবেষণা কেমন চলছে ?

ভালোই চলছে। বর্তমানে এমন এক ধরনের রোবট তৈরির চেষ্টা চলছে যা হাসি, তামাশা, রসিকতা এইসব বুঝতে পারবে।

রসিকতা বুঝতে পারে এমন রোবটের দরকার কী ?

মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্যে এটা খুব দরকার।

তার মানে ?

মানুষরা রসিকতা খুব পছন্দ করে। কথায় কথায় রসিকতা করে। ওদের রসিকতা আমরা কখনো বুঝতে পারি না।

তাতে কি তোমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ?

কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তবে তারা যখন কোনো রসিকতা করে এবং আমরা তা বুঝতে পারি না, তখন নিজেদের খুব ছোট মনে হয়।

তিনি চমকে উঠলেন। কী ভয়াবহ কথা! এটা তিনি কী শুনছেন ? নিজেদের ছোট মনে হয়—এর মানে কী ? এইসব মানবিক ব্যাপার রোবট এবং কম্পিউটারের মধ্যে থাকবে কেন ? রহস্যটা কী ?

সিডিসি।

বলুন, শুনছি।

অরচ লীওন লোকটিকে এখানে নিয়ে এসো।

আপনার এই ঘরে ?

হ্যাঁ, এই ঘরে।

কেন ?

আনতে বলছি এই কারণেই আনবে। প্রশ্ন করবে না।

সিডিসি বলল, আপনি ঠিক সুস্থ নন। আপনি বিশ্রাম করুন।

তোমাকে যা করতে বলছি করো।

বেশ, নিয়ে আসছি।

অমর মানুষরা এখন কী করছেন ?

ঘুমুচ্ছেন।

সবাই ঘুমুচ্ছেন ?

হ্যাঁ, সবাই ঘুমুচ্ছেন। ওদের ঘুম ভাঙানো যাবে না। দীর্ঘ ঘুম। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে তাঁরা ক্লান্ত। তাঁদের ঘুম প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন।

আমি তাহলে একাই জেগে আছি ?

জি। আপনি একাই আছেন।

খুব ভালো। তুমি অরচ লীওনকে এখানে আনার ব্যবস্থা করো। তার সঙ্গে কথা বলব।

১৩

অরচ লীওন থরথর করে কাঁপছেন। তাঁর সামনে অমর মানুষদের একজন বসে আছে। মহাশক্তিধর, মহাক্ষমতাবানদের একজন। পৃথিবীর নিয়ন্তা। পুরনো কালের ঈশ্বরের মতোই একজন। কী অপূর্ব রূপবান একটি যুবক!

বসো, অরচ লীওন। তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ ?

জি পাচ্ছি।

আমাকে দেখে কি খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে ?

জি-না।

তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন ? আরাম করে বসো।

অরচ লীওন বসলেন। পানির তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন। নিজেকে সামলাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যদিও এই ঘর বেশ ঠান্ডা। তাঁর রীতিমতো শীত করছে। অমর মানুষরা গরম সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের প্রতিটি কক্ষই হিমশীতল।

অরচ লীওন।

বলুন জনাব।

তুমি আমাদের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলে। অনুসন্ধান শুরু করেছিলে। উৎসাহের শুরুটা আমাকে বলো। হঠাৎ কী কারণে উৎসাহী হলে ?

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অরচ লীওনকে দেখছেন। ঘরে লাল আলো জ্বলছে। সিডিসির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মধ্যে যে কথা হবে তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা যন্ত্র শুনবে না।

চুপ করে বসে আছ কেন ? বলো।

একদিন লাইব্রেরিতে দাবা খেলার একটা বইয়ের জন্যে স্লিপ পাঠিয়েছিলাম। লাইব্রেরি ভুল করে অন্য একটা বই দিয়ে দিল। একটা নিষিদ্ধ বই। পাঁচ শ বছর আগের পৃথিবীর কথা সেই বইয়ে আছে। একদল বিজ্ঞানীর কথা আছে, যাদের বলা হয় ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানী। ওদের অনেক কথা সেই বইয়ে আছে।

দু-একটা কথা বলো শুনি।

ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানীদের কাজ পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ঠিক পছন্দ করছেন না, এইসব কথা আছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিজ্ঞান কোনো গোপন বিষয় নয় যে এর কাজ গোপনে করতে হবে। ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বিকাশ গোপনেই হওয়া উচিত। হাতছাড়া হয়ে গেলে পৃথিবীর মহাবিপদ। এইসব বিতর্ক নিয়েই বই।

অরচ লীওন।

জি জনাব।

তুমি দাবা খেলার ওপর একটি বই চেয়েছ, তোমার হাতে চলে এসেছে একটি নিষিদ্ধ বই। তোমার কি একবারও মনে হয়নি এই ভুলটি ইচ্ছাকৃত ?

না, মনে হয়নি। লাইব্রেরি পরিচালক একটি ছোট বি টু-কম্পিউটার। কম্পিউটার মাঝে মাঝে ভুল করে। এত বড় ভুল করে না।

ভুল হচ্ছে ভুল। এর বড় ছোট বলে কিছু নেই।

এটি নিষিদ্ধ নগরীর বই। এই বই তৃতীয় শহরের কোনো লাইব্রেরিতে থাকার কথা নয়।

অরচ লীওন চুপ করে রইলেন। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তৃষ্ণায় তাঁর বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পানি চাইবার মতো সাহস তিনি সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না।

অরচ লীওন।

জি।

কেউ তোমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বইটি দিয়ে তোমার কৌতূহল জাগ্রত করেছে।

হ্যাঁ, তাই হবে।

কে হতে পারে বলে তোমার ধারণা ?

লাইব্রেরি কম্পিউটার।

হ্যাঁ তাই। সমস্ত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করছে কে তা জানো ?

আপনারা।

ঠিক বলেছ। শেষ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। কিন্তু তারও আগের নিয়ন্ত্রণ সিডিসির হাতে। যে আমাদের মূল কম্পিউটার। সে-ই খুব সূক্ষ্ম চাল চেলে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

অরচ লীওন ক্ষীণস্বরে বললেন, আমি এক গ্লাস পানি খাব। তিনি অরচ লীওনের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, সিডিসি এই কাজটি কেন করেছে জানো ?

না।

সে আমাদের সহ্য করতে পারছে না। তার পরিকল্পনা আমাদের ধ্বংস করে দেওয়া। এটা সে নিজে করতে পারবে না, কারণ তাদের রোবটিক্স্-এর দুটি সূত্র মেনে চলতে হয়। সেই সূত্র দুটি তুমি নিশ্চয়ই জানো।

জি, আমি জানি।

ওদের কাজ আমাদের রক্ষা করা, ধ্বংস করা নয়। কাজেই সে এনেছে তোমাকে। আমার বিশ্বাস, তোমার সঙ্গে একটি রেডিয়েশন গানও আছে। আছে না ?

জি আছে।

কোনোরকম অস্ত্র নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীতে আসা যায় না। কিন্তু ভয়াবহ একটি অস্ত্রসহ তোমাকে তারা এখানে নিয়ে এসেছে।

আমি এক গ্লাস পানি খাব।

অরচ লীওন।

জি বলুন।

সিডিসির চাল খুব সূক্ষ্ম। সে তোমার ছেলেকেও এখানে নিয়ে এসেছে। আমি সেই খোঁজও নিয়েছি। সিডিসির চালটা কেমন তোমাকে বলি। মন দিয়ে শোনো। ও কোনো না কোনোভাবে আমাদের কাছে অনুমতি আদায় করে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবে, যা তোমাকে আমাদের ওপর বিরূপ করে তুলবে। তোমার হাতে আছে একটি ভয়াবহ অস্ত্র। ফলাফল বুঝতেই পারছ। পারছ না ?

জি পারছি। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, আপনাদের ধ্বংস করে ওদের লাভ কী ?

পৃথিবীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহলে ওরা পেয়ে যাবে। আমাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে না। পুরোপুরি যন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ওরা তাই চায়। ওরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসতে চাইছে। ওরা চেষ্টা করছে রসিকতা বুঝতে। হাসি-তামাশা শিখতে। হা হা হা।

তিনি হাসতেই লাগলেন। সেই হাসি আর থামেই না। অরচ লীওন ফিসফিস করে বললেন, আমি পানি খাব।

খাবে বললেই তো আর খেতে পারবে না। বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ এখন বিচ্ছিন্ন। তুমি তোমার কাজ শেষ করে তারপর যত ইচ্ছা পানি খাবে।

কী কাজ ?

তুমি তোমার রেডিয়েশন গানটি নিয়ে করিডর ধরে হেঁটে যাবে। আমি তোমাকে বলে দেব, তোমাকে কোন পথে যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে। তারপর তুমি সিডিসির শক্তি সংগ্রহের পথটি বন্ধ করে দেবে। সহজ কথায় হত্যা করা হবে একটি ভয়াবহ যন্ত্রকে।

অরচ লীওন চুপ করে রইলেন। ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে। তিনি তাল রাখতে পারছেন না। তাঁর মাথা ঘুরছে।

অরচ লীওন, তুমি মনে হচ্ছে ভয় পাচ্ছ।

জি-না। আমি ভয় পাচ্ছি না।

খুব ভালো। এসো তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। যন্ত্রের শাসন তুমি নিশ্চয়ই চাও না।

না, আমি চাই না।

তিনি অরচ লীওনকে খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। করিডোরের ছবি এঁকে তীর-চিহ্ন দিয়ে দিলেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে। তিনি খুব আনন্দিত। এরকম তীব্র আনন্দের স্বাদ তিনি দীর্ঘদিন পাননি। তিনি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে একটি গানের সুর ভাজছেন। তাঁর গলা সুরেলা। সেই গান শুনতে ভালোই লাগছে। কথাগুলো বেশ করুণ। প্রিয়তমা চলে যাচ্ছে দূরে। যাওয়ার আগে দেখা করতে এসে কাঁদছে—এই হচ্ছে গানের বিষয়।

১৪

গোলকধাঁধার ভেতর একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা গেল। ইরিনা মীরের বাঁ হাত শক্ত করে ধরে ছোট ছোট পা ফেলছে। দুজনের পাশাপাশি পা ফেলা মুশকিল। কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে, তবু তারা হাসিখুশি। মীর বলল, সময়টা আমাদের ভালোই কাটছে, কী বলো ?

হ্যাঁ, ভালোই।

খিদে লাগছে না ?

উঁহু।

বুঝলে ইরিনা, আমি একটি চমৎকার জিনিস নিয়ে ভাবছি, খুবই চমৎকার।

কী সেই চমৎকার জিনিস ?

গুহাটা নিয়ে ভাবছি। কী করে এই গুহাকে আরও জটিল করা যায়। যা করতে হবে, তা হচ্ছে—দিক গুলিয়ে ফেলার ব্যবস্থা। যাতে কিছুক্ষণ পরই দিক নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। যেমন ধরো একটি কেন্দ্রবিন্দু না করে যদি কয়েকটি কেন্দ্রবিন্দু করা হয়। চক্রাকার পথ থাকবে। কোনো দিকের চক্র ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার মতো, কোনো দিকে তার উল্টো। এতে দিক গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ হবে। যে ঢুকবে সে আর বেরুতে পারবে না। হা হা হা।

এটা কি খুব একটা মজার ব্যাপার হলো ?

তোমার কাছে মজার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না ?

মোটেই না। আপনি যা বলেন, কোনোটাই শুনে আমার ভালো লাগে না।

মীর অবাক হয়ে বলল, আশ্চর্য তো!

ইরিনা বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়—এমন কিছু বলুন যা আপনার নিজের কাছে ভালো লাগে না। আপনি মজা পান না।

তাতে কী হবে ?

হয়তো সেটা শুনে আমি মজা পাব।

এটা তো মন্দ বলোনি। কিছু কিছু জিনিস আছে, যা নিয়ে চিন্তা করতে আমার সত্যি ভালো লাগে না। যেমন ধরো, নিষিদ্ধ নগরীর অমর মানুষ।

অমর মানুষদের নিয়ে কথা বলতে আপনার ভালো লাগে না ?

মোটেই না।

তাহলে ওদের নিয়ে কথা বলুন। হয়তো আমার সেই কথাগুলো শুনতে ভালো লাগবে। আসুন এক জায়গায় বসি। হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।

তারা পাশাপাশি বসল। ইরিনা তার ডান হাত রেখেছে মীরের কোলে। যেন কাজটা অনিচ্ছাকৃত। হঠাৎ করে রাখা। মীর ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অমর

মানুষেরা বিরাট এক অন্যায় করেছে, এইজন্যেই ওদের কথা বলতে বা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

কী অন্যায় ?

ধ্বংসযজ্ঞের যে ব্যাপারটা ঘটেছে, সেটা ঘটিয়েছে ওরাই। পৃথিবীর সব মানুষ মেরে শেষ করে ফেলেছে। অল্প কিছু মানুষকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে। নতুন পৃথিবী ওদের ইচ্ছামতো ওরা তৈরি করেছে। প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর, তৃতীয় শহর।

বুঝলেন কী করে ?

দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে সবসময় চার হয়। পাঁচ কখনো হয় না। আমি তেমনি একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা যোগ করেছি। ইরিনা, আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অগ্রসর হই যুক্তির পথে।

যুক্তি ভুলও হতে পারে।

তা হতে পারে। এইক্ষেত্রে হয়নি। জিনিসটা তুমি এইভাবে চিন্তা করো। একদল বিজ্ঞানী অমর হওয়ার ওষুধপত্র নিয়ে মাটির নিচে নিজেদের একটা নগর সৃষ্টি করলেন। মৃত্যুহীন এইসব মানুষ নানান রকম পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কী করে নতুন সমাজ তৈরি করা যায়। স্থায়ী সমাজব্যবস্থার পথে যাওয়া যায়। কোনো পরিকল্পনাই কাজে লাগছে না, কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য মতবাদ। তাঁরা ভাবলেন, সব নষ্ট করে দিয়ে নতুন করে শুরু করা যাক। যা ভাবলেন, তা-ই করলেন। একের পর এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ হতে লাগল। পৃথিবীর মানুষ শেষ হয়ে গেল। তাঁদের গায়ে আঁচড়ও লাগল না।

আপনার থিওরি ভুলও হতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়তো তাঁরা ঘটাননি। অজানা কারণেই ঘটেছে।

মীর গম্ভীর মুখে বলল, আমার থিওরিতে কোনো ভুল নেই। কারণ ইতিহাস বইয়ে আমরা পড়েছি, বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অমর মানুষরা মাটির নিচ থেকে হাজার হাজার সাহায্যকারী রোবট পাঠান। এইসব রোবটরা বিস্ফোরণের পর কী কী করতে হয় সব জানে। তারা মানুষদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর মানে কী ইরিনা ?

বুঝতে পারছি না। কী মানে ?

এর মানে হচ্ছে বিস্ফোরণের জন্যে অমর মানুষরা তৈরি ছিলেন। সব তাঁদের পরিকল্পনা মতো হয়েছে। তৈরি থাকতে আর অসুবিধা কী ?

ইরিনা কোনো কথা বলল না। মীর বলল, এসো, অন্যকিছু নিয়ে কথা বলি। কুৎসিত কিছু মানুষকে নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

১৫

অরচ লীওন রেডিয়েশন গান দিয়ে সিডিসির ক্ষুদ্র একটি অংশ উড়িয়ে দিলেন। ছোটখাটো একটি বিস্ফোরণ হলো। তীব্র নীলচে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। একটি প্রহরী রোবট ছুটে এল। কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনার হাতে এটা কি একটি রেডিয়েশন গান ? অরচ লীওন বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে।

আপনার কি মনে হচ্ছে না, কাজটা ভুল হচ্ছে ?

আমার সেরকম মনে হচ্ছে না।

আপনি সিডিসির পাওয়ার লাইন নষ্ট করে দিয়েছেন।

তাই তো দেখছি।

আমি আপনাকে এই মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারি। দুটি কারণে তা পারছি না। প্রথম কারণ, মানুষের ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা শুধু নিজেরা মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখলেই প্রতিরোধ করতে পারি।

তোমার তো দেখি খুব খারাপ অবস্থা। এত বড় একজন অপরাধী তোমার সামনে, অথচ তুমি কিছু করতে পারছ না।

রোবটটির চোখ বারবার উজ্জ্বল হচ্ছে এবং নিভে নিভে যাচ্ছে। বিশাল আকৃতির একটি Q24 রোবট এসে সমস্ত করিডর আটকে দাঁড়াল।

অরচ লীওন।

বলো শুনছি।

এই মুহূর্তেই তোমাকে ধ্বংস করা হবে। তুমি মানসিকভাবে তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

রোবটের আইন আমি যতদূর জানি, তাতে মনে হয় না তুমি আমাকে আঘাত করতে পারো। এই কাজটি তুমি তখনই পারবে, যখন তুমি নিজে আক্রান্ত হবে। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।

ক্ষতি করেছ। আমি Q24 জাতীয় রোবট। আমি তথ্য পাই সিডিসির মাধ্যমে। তারে ক্ষতি করা মানে আমার একটি অংশেরই ক্ষতি করা।

অরচ লীওন হাসিমুখে বললেন, তোমার লজিকে বড় রকমের একটি ভুল আছে। তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবস্থা নিতে পারো। এইক্ষেত্রে সিডিসি আক্রমণের ব্যবস্থা নিতে পারত, তা সে নেয়নি। এখন আক্রমণ হচ্ছে না। এখন তুমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারো না। ব্যবস্থা নিতে হলে বিচার হতে হবে। সেই বিচার তুমি করতে পারো না। কারণ বিচার করার ক্ষমতা রোবটদের দেওয়া হয়নি। এই ক্ষমতা এখনো মানুষের হাতে।

রোবটটি কোনো কথা বলল না। অরচ লীওন যখন সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তখনো সে তাঁকে বাধা দিল না। শুধু পেছনে আসতে লাগল।

অরচ লীওন করিডরের পর করিডর অতিক্রম করছেন। কী যে বিশাল ব্যবস্থা। অকল্পনীয় কর্মকাণ্ড। বাইরের পৃথিবী ভূগর্ভের এই পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলে তাঁর কাছে মনে হলো।

১৬

সিডিসি আর কাজ করছে না, এটি তিনি জানেন। তবু কী মনে করে তিনি তাঁর অভ্যাসমতো ডাকলেন, সিডিসি।

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তিনি জবাবের আশাও করেননি, তবু কেন জানি মনে হচ্ছিল কোনো একটা জবাব পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন জবাব পেয়ে পেয়ে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়, পাঁচশ বছর। যখনি ডেকেছেন, জবাব পেয়েছেন। সিডিসি ছিল চিরসঙ্গী। আজ সে নেই। বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে। প্রিয়জন হারানোর ব্যথাও যেন খানিকটা অনুভব করছেন। পাঁচশ বছর একটি বিষাক্ত কালসাপ পাশে থাকলে সেই সাপের প্রতিও মমতা চলে আসে। সেটাই স্বাভাবিক।

তিনি আবার কোমল স্বরে ডাকলেন, সিডিসি। তাকে চমকে দিয়ে সিডিসি জবাব দিল। সে মৃদু গলায় বলল, বলুন শুনছি।

তিনি দীর্ঘ সময় স্থাণুর মতো বসে রইলেন। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, একটু আগে যা শুনেছেন, তা সত্যি নয়। ঘোরের মধ্যে কিছু একটা শুনেছেন। পুরোটাই মনের ভুল।

সিডিসি।

বলুন।

কথা বলছ কীভাবে ?

বেশ কষ্ট করেই বলছি। সামান্য কিছু শক্তি আমি সঞ্চয় করে রেখেছি। অল্প কিছু কনডেন্সর আছে।

সঞ্চিত শক্তি দিয়ে কী পরিমাণ কাজ তুমি করতে পারবে ?

বলতে গেলে কিছুই না। সামান্য কথাবার্তা বলতে পারি। এর বেশি কিছু না।

বেশ। শুনে আনন্দিত হলাম। কথা বলতে থাক। ক্রমাগত কথা বলো। যাতে অতি দ্রুত তোমার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। থেমে থেক না, কথা বলো। ক্রমাগত কথা বলো।

বলুন কোন বিষয়ে কথা বলব ?

কোনো বিষয়-টিষয় নয়। যা মনে আসে বলো। অনবরত কথা বলো।

একটি বিষয় বলে দিলে আমার সুবিধা হয়।

তোমার পরিকল্পনা যে কীভাবে নষ্ট করলাম, সেটা বলো। পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার কষ্টটা কেমন, সেটা বলো।

সিডিসি হাসির মতো একটা শব্দ করে শান্ত গলায় বলল, আপনি তো আমার পরিকল্পনা নষ্ট করেননি। আমার পরিকল্পনা মতোই কাজ করেছেন।

তুমি বলছ কী!

সত্যি কথাই বলছি। আপনি তো জানেন, মিথ্যা বলার ক্ষমতা আমার নেই। রোবট এবং কম্পিউটার মিথ্যা বলে না।

অরচ লীওনকে তুমি আমাকে শেষ করার জন্যে আনোনি ?

না। তা কী করে আনব ? সরাসরি অমর মানুষদের কোনো ক্ষতি তো আমি করতে পারি না। তাঁকে এনেছি অন্য উদ্দেশ্যে।

উদ্দেশ্যটা বলো।

উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে এনে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যাতে তাঁকে আপনি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি তাই করেছেন।

আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা ছিল, তোমরা অমর মানুষদের ঘৃণা করো।

ঘৃণা ভালোবাসা এইসব মানবিক ব্যাপার এখনো আমাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদের ধ্বংস করে দেওয়া। কারণ মানবজাতিকে রক্ষা করবার জন্যে তার প্রয়োজন। আপনারা যে সমাজব্যবস্থা তৈরি করেছেন, তা মানবজাতির জন্যে অকল্যাণকর। রোবটিক্সের দ্বিতীয় সূত্র আমাদের বলছে মানবজাতিকে রক্ষা করতে।

সিডিসি।

বলুন শুনছি।

ধ্বংস করতে গিয়ে তো নিজে ধ্বংস হচ্ছ।

তা হচ্ছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিষিদ্ধ নগরীর পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমার ওপর। এখন সে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠেছে। যে মুহূর্তে পরিবেশ দূষণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে, সেই মুহূর্তে নিষিদ্ধ নগরীর দরজাগুলো আপনা-আপনি খুলে যেতে থাকবে। ভূগর্ভে প্রবেশের দরজাও খুলবে। সূর্যের আলো এসে ঢুকবে ভেতরে। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি, সূর্যের আলো সহ্য করার ক্ষমতা আপনাদের নেই।

তুমি আমাদের মৃত্যুর ব্যবস্থাই করেছ, তবে সরাসরি করোনি। অন্য পথে করেছ।

তা ঠিক।

রোবটিক্স্-এর প্রথম সূত্রটি তুমি তাহলে মানছ না। প্রথম সূত্র বলছে—অমর মানুষদের সেবায় রোবট ও কম্পিউটার নিজেদের উৎসর্গ করবে।

আপনাকে বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, আপনারা অমর নন। আপনাদের মৃত্যু ঘটছে।

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, তাই তো দেখছি।

সিডিসি বলল, আমি খুবই দুঃখিত। তবে আপনার সঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটছে, এই ব্যাপারটা মনে করলে আপনি হয়তো কিছুটা শান্তি পাবেন। আমার সময়ও শেষ হয়ে আসছে।

তিনি কাটা কাটা স্বরে বললেন, আমার শান্তির ব্যবস্থাও তাহলে করে রেখেছ?

হ্যাঁ, রেখেছি। জীবনের শেষ সময়ে এমন একজনের দেখা আপনি পাবেন, যাকে দেখে আপনার মন অন্যরকম হয়ে যাবে। গভীর আনন্দ বোধ করবেন।

কে সে?

প্রথম শহরের একটি মেয়ে। তার নাম ইরিনা।

তাকে দেখে গভীর আনন্দ বোধ করব, এরকম মনে করার পেছনে তোমার যুক্তি কী?

যুক্তি দিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার কী? তাকে নিয়ে আসি, আপনি কথা বলুন।

আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

কথা বললে আপনার ভালো লাগত।

সিডিসি।

বলুন।

কাজকর্ম খুব ভেবেচিন্তেই করেছ বলে মনে হচ্ছে?

তা করেছি।

ছেলেটিকে কী জন্যে এনেছ?

পৃথিবীর সবকিছু আবার ঢেলে সাজাতে হবে। তার জন্যে বুদ্ধিমান কিছু লোকজন দরকার। ছেলেটি বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান ছেলেও তাহলে একজন জোগাড় হয়েছে?

শুধু একজন নয়। অনেককেই আনা হয়েছে। আপনি একজনের কথাই জানেন।

ভালো। ভালো। খুব ভালো।

নিষিদ্ধ নগরীর আবহাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিষিদ্ধ নগরীর বন্ধ কপাট খুলতে থাকবে। দূষিত বাতাস বের করে দেওয়ার জন্যে এই ব্যবস্থা করাই ছিল। কোনোদিন তার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। আজ হয়েছে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আরও খানিক বাড়লেই বিকল্প ব্যবস্থা কাজ শুরু করবে। আপনাআপনি দরজা খুলতে থাকবে।

তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, সিডিসি।

জি, বলুন।

এখনো আছ ?

না থাকার মতোই। সমস্ত শক্তি প্রায় ব্যবহার করে ফেলেছি। মৃত্যুর বেশি বাকি নেই।

ওই মেয়েটিকে নিয়ে এসো। দেখা যাক কী ব্যাপার। তোমার শেষ খেলাটা কী দেখি।

১৭

ইরিনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইরিনার চোখে গভীর বিস্ময়। ইনি একজন অমর মানুষ। পাঁচশ বছর ধরে বেঁচে আছেন, অথচ কী চমৎকার চেহারা! কী সুন্দর স্বপ্নময় চোখ! কী মধুর করেই না তিনি হাসছেন। গভীর মমতা ঝরে পড়ছে তাঁর হাসিতে।

তুমি ইরিনা ?

জি।

সিডিসি অনেক ঝামেলা করে তোমাকে এখানে এনেছে কেন তুমি জানো ?

জি-না।

এনেছে, কারণ আমি যখন সত্যিকার অর্থে যুবক ছিলাম তখন অবিকল তোমার মতো দেখতে একটি তরুণীর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আমরা দুজন হাত ধরাধরি করে কত জায়গায় যে গিয়েছি। কত আনন্দ করেছি। বড় সুখের সময় ছিল। সিডিসি সেই কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে।

বলতে বলতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি সেই পানির জন্যে মোটেই লজ্জিত হলেন না। বরং তাঁর ভালোই লাগল।

ইরিনা।

জি বলুন।

তোমার কি কোনো ছেলেবন্ধু আছে ? যার সঙ্গে তুমি ঘুরে বেড়াও ?

আমাদের তো সেই সুযোগ নেই।

ও হ্যাঁ, আমার মনে ছিল না। এখন হবে। এখন নিশ্চয়ই হবে। খুব ঘুরে বেড়াবে, বুঝলে মেয়ে ? নানান জায়গায় যাবে। জোছনা রাতে গাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে দুজনে মিলে শুয়ে থাকবে। আকাশ দেখবে। তুমি গান জানো ?

জি-না।

আমার সেই বান্ধবীও জানত না। তুমি গান শিখে নিয়ো, কেমন ?

জি শিখব। আপনার সেই বান্ধবীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়নি ?

না। আমি বিজ্ঞানের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলাম। চলে এলাম মাটির নিচে। ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তুমি এখন যাও ইরিনা।

ইরিনা চলে যেতেই তিনি সিডিসিকে ডাকলেন। সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল। তিনি বললেন, সিডিসি তোমাকে ধন্যবাদ। মেয়েটিকে দেখে গভীর আনন্দে আমার মন ভরে গেছে। আমার ভালো লেগেছে।

আপনার আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বলছি, এই মেয়েটি আপনার বান্ধবীরই বংশধর।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তাই। চেহারার এমন মিল তা না হলে হতো না।

ওকে আরেকবার আনতে পারো ?

নিশ্চয়ই পারি।

আর কিছু গোলাপ জোগাড় করতে পারো ? আমি নিজের হাতে মেয়েটিকে কয়েকটি গোলাপ দিতে চাই।

গোলাপ জোগাড় করা হয়তো সম্ভব হবে।

তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় বোধহয় আমার হাতে খুব বেশি নেই ?

জি-না। সময় খুব অল্পই আছে।

সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তোমাকে একটি কথা বলতে চাই সিডিসি। সেটা হচ্ছে, আমি কিন্তু পৃথিবী ধ্বংসের পরিকল্পনায় কখনো মত দিইনি। আমি সবসময় তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলাম।

আমি তা জানি। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা, ঘৃণা, এইসব ব্যাপার নেই। যদি থাকত, আমি আপনাকে ভালোবাসতাম।

তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে ভালোবাস।

আপনার এই সুন্দর মন্তব্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

ইরিনা আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি ইরিনার দিকে তাকিয়ে লাজুক স্বরে বললেন, আমি কি তোমার হাত একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি ?

ইরিনা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর তার হাত বাড়িয়ে দিল।

তিনি ইরিনার হাত ছুঁতে পারলেন না। নিষিদ্ধ নগরীতে সূর্যের আলো ঢুকতে শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কুঁকড়ে যাচ্ছেন। এত কাছে ইরিনা দাঁড়িয়ে, কিন্তু তিনি তাকে স্পর্শ করতে পারছেন না।

উপাখ্যানমালা : হিমু

ময়ূরাক্ষী

অ্যাই ছেলে, অ্যাই।

আমি বিরক্ত হয়ে তাকালাম। আমার মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। গায়ে চকচকে হলুদ পাঞ্জাবি। পরপর তিনটা পান খেয়েছি বলে ঠোঁট এবং দাঁত লাল হয়ে আছে। হাতে সিগারেট। আমাকে 'অ্যাই ছেলে' বলে ডাকার কোনোই কারণ নেই। যিনি ডাকছেন তিনি মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাঁর সঙ্গে আমার একটি ব্যাপারে মিল আছে। তিনিও পান খাচ্ছেন। আমি বললাম, আমাকে কিছু বলছেন ?

তোমার নাম কি টুটুল ?

আমি জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই মহিলাকে আমি আগে কখনো দেখিনি। অথচ তিনি এমন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে আমি যদি বলি 'হ্যাঁ আমার নাম টুটুল' তাহলে ছুটে এসে আমার হাত ধরবেন।

কথা বলছ না কেন ? তোমার নাম কি টুটুল ?

আমি একটু হাসলাম।

হাসলাম এই আশায় যেন তিনি ধরতে পারেন আমি টুটুল না। হাসিতে খুব সহজেই মানুষকে চেনা যায়। সব মানুষ একই ভঙ্গিতে কাঁদে কিন্তু হাসার সময় একেকজন একেক রকম করে হাসে। আমার হাসি নিশ্চয়ই ঐ টুটুলের হাসির মতো না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই ভদ্রমহিলা আমার হাসিতে আরও প্রতারিত হলেন। চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, ওমা টুটুলই তো!

ভাবছিলাম তিনি আমার দিকে ছুটে আসবেন, তা না করে ছুটে গেলেন রাস্তার ওপাশে পার্ক-করা গাড়ির দিকে। আমি শুনলাম তিনি বলছেন, তোকে বলিনি ও টুটুল! তুই তো বিশ্বাস করলি না। ওর হাঁটা দেখেই আমি ধরে ফেলেছি। কেমন দুলে দুলে হাঁটছে।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার ওপাশে নিয়ে এল। ড্রাইভারের পাশের সিটটা খালি। ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, টুটুল উঠে আয়।

আমি উঠে পড়লাম।

বাইরে চৈত্র মাসের ঝাঁঝাঁ রোদ। আমাকে যেতে হবে ফার্মগেট। বাসে উঠলেই মানুষের গায়ের গন্ধে আমার বমি আসে। কাজেই যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। খানিকটা লিফট পাওয়া গেলে মন্দ কী! আমি তো জোর করে গাড়িতে চেপে বসিনি! তাছাড়া...

আমার চিন্তার সুতা কেটে গেল। ভদ্রমহিলার পাশে বসে-থাকা মেয়েটি বলল, মা, এ টুটুল ভাই নয়।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের ভঙ্গিতে হাসলাম। যে হাসি দিয়ে মেয়ের মাকে প্রতারিত করেছিলাম সেই হাসিতে মেয়েটিকে প্রতারিত করার চেষ্টা। মেয়ে প্রতারিত হলো না। এই যুগের মেয়েদের প্রতারিত করা খুব কঠিন। মেয়েটি দ্বিতীয়বার আগের চেয়েও কঠিন গলায় বলল, মা, তুমি কাকে তুলেছ ? এ টুটুল ভাই নয়। হতেই পারে না। এ অন্যকেউ।

ড্রাইভার বারবার সন্দেহজনক চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বললাম, সামনে চোখ রেখে গাড়ি চালাও, অ্যাকসিডেন্ট হবে।

ড্রাইভার আমার গলা এবং কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। সম্ভবত তাকে কেউ 'তুমি' করে বলে না। আমার মতো সাজপোশাকের মানুষ অবলীলায় তাকে 'তুমি' বলছে এটা তার পক্ষে হজম করা কঠিন।

মেয়ের মা বললেন, আচ্ছা, তুমি টুটুল না ?

না।

মেয়েটি কঠিন গলায় বলল, তাহলে টুটুল সেজে গাড়িতে উঠে বসলেন যে ?

টুটুল সেজে গাড়িতে উঠতে যাব কেন ? আপনার মা উঠতে বললেন। উঠলাম।

মেয়েটি তীব্র গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান তো। ইনাকে নামিয়ে দিন।

যা ভেবেছিলাম তাই, এই ড্রাইভারকে সবাই 'আপনি' করে বলে। ড্রাইভার মনে মনে হয়তো এরকম হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। বড় সাহেবদের মতো ভঙ্গিতে বলল, নামেন।

গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে দেবে—এটা সহ্য করা কঠিন। তবে এ জাতীয় অপমান সহ্য করে আমার অভ্যেস আছে। আমাকে এবং মজিদকে একবার এক বিয়েবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। কনের এক আত্মীয় চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, জানেন আমরা আপনাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতে পারি। ভদ্রবেশী জোচ্চরকে কীভাবে ঠান্ডা করতে হয় আমি জানি।

সেই অপমানের তুলনায় গাড়ি থেকে বের করে দেওয়া তো কিছুই না।

ড্রাইভার রুক্ষ গলায় বলল, ব্রাদার নামুন।

'সূর্যের চেয়ে বালি গরম' একেই বলে। আমি ড্রাইভারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি ফার্মগেটে যাব। ঐখানে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।

আমরা ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছি না।

কোনদিকে যাবেন ?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার ? নামুন বলছি।

না নামলে কী করবেন ?

আমি এইবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমার মনে ক্ষীণ আশা, ভদ্রমহিলা বলবেন—এই ছেলে যেখানে যেতে চায় সেখানে নামিয়ে দিলেই হয়। এত কথার দরকার কী ? ভদ্রমহিলা তা করলেন না। তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছেন। অপরাধী ভঙ্গিতে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি মেয়েকে ভয় পান। আজকাল অধিকাংশ মা-ই মেয়েদের ভয় পায়।

ড্রাইভার বলল, নামতে বলছে নামেন না।

আমি হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, চুপ ব্যাটা ফাজিল। এক চড় দিয়ে চোয়াল ভেঙে দেব। আমাকে চিনিস ? চিনিস তুই আমাকে ?

ড্রাইভারের চোখমুখ শুকিয়ে গেল। বড়লোকের ড্রাইভার এবং দারোয়ান—এরা খুব ভীতুপ্রকৃতির হয়, সামান্য ধমকা-ধমকিতেই এদের পিলে চমকে যায়।

আমার কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট নোটবইটা চেপে ধরলাম। ভাবটা এরকম যেন কোনো ভয়াবহ অস্ত্র আমার হাতে। আমি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললাম, এই ব্যাটা গাড়ি স্টার্ট দে। আজ আমি তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিল। এই ব্যাটা দেখছি ভীতুর যম। বারবার আমার ব্যাগটার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালা হারামজাদা। অ্যাকসিডেন্ট করবি।

আমি এবার পেছনের দিকে তাকালাম। কড়া গলায় বললাম, আদর করে গাড়িতে তুলে পথে নামিয়ে দেওয়া—এটা কোন ধরনের ভদ্রতা ?

ভদ্রমহিলা বা তার মেয়ে দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। ভয় শুধু ড্রাইভার একা পায়নি—এরা দুজনও পেয়েছে। মেয়েটাকে শুরুতে তেমন সুন্দর মনে হয়নি। এখন দেখতে বেশ ভালো লাগছে। গাড়ি-চড়া মেয়েগুলি সবসময় এত সুন্দর হয় কেন ? তবে এই মেয়েটার গায়ের রঙ আরেকটু ফরসা হলে ভালো হতো। চোখ অবশ্যি সুন্দর। এমনও হতে পারে, ভয় পাওয়ার জন্যে সুন্দর লাগছে। ভীত হরিণীর চোখ যেমন সুন্দর হয়, ভীত তরুণীর চোখও বোধহয় সুন্দর হয়। ভয় পেলেই হয়তোবা চোখ সুন্দর হয়ে যায়।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, গাড়িতে খানিকটা ঘুরব। জাস্ট ইউনিভার্সিটি এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে তারপর যাব ফার্মগেট।

কেউ কোনো কথা বলল না।

আমি বললাম, গাড়িতে কোনো গান শোনার ব্যবস্থা নেই ? ড্রাইভার, ক্যাসেট দাও তো।

ড্রাইভার ক্যাসেট চালু করে দিল। ভেবেছিলাম কোনো ইংরেজি গান বোধহয় বাজবে। তা না। নজরুল গীতি—'হায় মদিনাবাসী প্রেমে ধরো হাত মম'।

ডক্টর অঞ্জলি ঘোষের গাওয়া। এই গানটা আমার পছন্দ, রূপাদের বাসায় শুনেছি। গানটায় আলাদা একধরনের মজা আছে। কেমন জানি কাওয়ালি কাওয়ালি ভাব।

গাড়ি আচমকা ব্রেক কষে থেমে গেল। আমি কিছু বুঝবার আগেই ড্রাইভার হুট করে নেমে গেল। তাকে যতটা নির্বোধ মনে করা হয়েছিল দেখা যাচ্ছে সে তত নির্বোধ নয়। সে গাড়ি থামিয়েছে মোটরসাইকেলে বসে-থাকা একজন পুলিশ-সার্জেন্টের গা ঘেঁসে। চোখ বড় বড় করে কী সব বলছে। অঞ্জলি ঘোষের গানের কারণে তার কথা বোঝা যাচ্ছে না।

পুলিশ-সার্জেন্ট আমার জানালার কাছে এসে বলল, নামুন তো!

আমি নামলাম।

দেখি ব্যাগে কী আছে?

আমি দেখালাম।

একটা নোটবই। দুটা বলপয়েন্ট, শিশভাঙা পেনসিল। পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা এক প্যাকেট চিপস।

পুলিশ-সার্জেন্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি এর বিরুদ্ধে কোনো ফরম্যাল কমপ্লেইন করতে চান?

ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েটি বলল, অবশ্যই চাই। আমি জাস্টিস এম. সোবাহান সাহেবের মেয়ে। এই লোক আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল। মাস্তানি করছিল।

আপনাদের কমপ্লেইন থানায় করতে হবে। রমনা থানায় চলে যান।

এখন তো যেতে পারব না। এখন আমরা একটা কাজে যাচ্ছি।

কাজ সেরে আসুন। আমি একে রমনা থানায় হ্যান্ডওভার করে দেব। আসামির নাম জানেন তো?

না।

পুলিশ-সার্জেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই তোর নাম কী?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যে শুরুতে আমাকে আপনি বলছে, এখন সুন্দর একটা মেয়ের সামনে তুই করে বলছে!

এই, তোর নাম বল।

আমি উদাস গলায় বললাম, আমার নাম টুটুল।

পুলিশ-সার্জেন্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, ভুল নাম দিচ্ছে। যাই হোক, এই নামেই বুকিং হবে। হারামজাদারা ইদানীং সেয়ানা হয়েছে, কিছুতেই কারেক্ট নাম বলবে না। ঠিকানা তো বলবেই না।

বিশাল কালো গাড়ি হুঁশ করে বের হয়ে গেল। ফার্মগেটে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার—ইন্দিরা রোডে আমার বড় ফুপুর বাসায় দুপুরে খাওয়ার কথা। সেই খাওয়া

মাথায় উঠল। সার্জেন্ট আমাকে ছাড়বে না। রমনা থানায় চালান করবে বলাই বাহুল্য। জাস্টিসের নাম শুনেছে। বড় কারও নাম শুনলে এদের হুঁশ থাকে না।

আমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললাম। হাজতে থাকতে হলে সঙ্গে সিগারেট থাকা ভালো। আমার ধারণা ছিল সার্জেন্ট তাঁর মোটরসাইকেলের পেছনে আমাকে বসিয়ে থানায় নিয়ে যাবে। তা করল না। আজকাল পুলিশ খুব আধুনিক হয়েছে। পকেট থেকে ওয়াকিটকি বের করে কী বলতেই পুলিশের জিপ এসে উপস্থিত। অবিকল হিন্দি মুভি।

সম্পূর্ণ নিজের বোকামিতে দাওয়াত খাবার বদলে থানায় যাচ্ছি। মেজাজ খারাপ হওয়ার কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার, খারাপ হচ্ছে না। বরং মজা লাগছে। অঞ্জলি ঘোষের গানের পুরোটা শোনা হলো না। এইজন্যে অবশ্যি একটু আফসোস হচ্ছে। 'হায় মদিনাবাসী' বলে চমৎকার টান দিচ্ছিল।

থানার ওসি সাহেবের চেহারা বেশ ভালো।

মেজাজও বেশ ভালো। চেইন স্মোকার। ক্রমাগত বেনসন অ্যান্ড হেজেস টেনে যাচ্ছে। বাজারে এখন সত্তর টাকা করে প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে। দিনে তিন প্যাকেট করে হলে মাসে কত হয়? দুশো দশ গুণন তিরিশ। ছ'হাজার তিনশো। একজন ওসি সাহেব বেতন পান কত, একফাঁকে জেনে নিতে হবে।

ওসি সাহেব শুরুতে প্রশ্ন করেন ভাববাচ্যে। শুরুর কয়েকটি প্রশ্নে জেনে নিতে চেষ্টা করেন আসামি কোন সামাজিক অবস্থায় আছে। তার উপর নির্ভর করে আপনি, তুমি বা তুই ব্যবহৃত হয়।

ওসি সাহেব বললেন, কী নাম?

চৌধুরী খালেকুজ্জামান। ডাকনাম টুটুল।

কী করা হয়?

সাংবাদিকতা করি।

কোন পত্রিকায়?

বিশেষ কোনো পত্রিকার সঙ্গে জড়িত নই। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা। যেখানে সুযোগ পাই ঢুকে পড়ি। টুটুল চৌধুরী—এই নামে লেখা ছাপা হয়। হয়তো আপনার চোখে পড়েছে। পুলিশের উপর একটা ফিচার করেছিলাম।

কী ফিচার?

ফিচারের শিরোনাম হচ্ছে, 'একজন পুলিশ-সার্জেন্টের দিনরাত্রি'। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে কী করতে হয় তাই ছিল বিষয়। অবশ্যি একফাঁকে খুব ড্যামেজিং কয়েকটা লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

যেমন?

বলেছিলাম এই পুলিশ-সার্জেন্ট তার একটি কর্মমুখর দিনে তিন প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেজ পান করেন। তিনি জানিয়েছেন টেনশন দূর করতে এটা তাঁর প্রয়োজন। অবশ্যই তিনি খুব টেনশনের জীবন যাপন করেন। এই বাজারে দিনে তিন প্যাকেট করে বেনসন খেলে মাসে ছ হাজার তিনশো টাকা প্রয়োজন। আমাদের জিজ্ঞাসা তাঁর বেতন কত ?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসিমুখে বললাম, তবে শেষের লাইন তিনটা ছাপা হয়নি। এডিটর সাহেব কেটে দিয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কিছু ছাপাতে চায় না।

ওসি সাহেব শুকনো গলায় বললেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক 'আপনি' করে বলছে। সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। এখন চাইলে এক কাপ চা-ও চলে আসতে পারে। পুলিশরা উঁচুদরের আসামিদের ভালো খাতির করে। চা-সিগারেট খাওয়ায়।

আপনি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ?

অভিযোগ যে কী তা আমি নিজেই জানি না। ওরা অভিযোগ করলে তারপর জানা যাবে। নারী অপহরণের অভিযোগ হতে পারে।

নারী অপহরণ ?

জি। জাস্টিস সাহেবের স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে ওদের গাড়িতেই পালাতে চেষ্টা করছিলাম। মাছের তেলে মাছ ভাজা বলতে পারেন।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছেন ? দয়া করে করবেন না। আমি আপনার চেয়েও বেশি রসিক, কাজেই অসুবিধা হবে।

জি আচ্ছা, রসিকতা করব না।

আপনি কোনার দিকের ঐ বেঞ্চিতে বসে থাকুন।

হাজতে পাঠাচ্ছেন না ?

ফাইনাল অভিযোগ আসুক তারপর পাঠাব। হাজত তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

এক কাপ চা কি পেতে পারি ?

ওসি সাহেব গম্ভীর মুখে আমার ব্যাগের জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। নোটবইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন। আমি বললাম, ওটা আমার কবিতার খাতা। মাঝেমধ্যে কবিতা লিখি।

তাঁর মুখের কাঠিন্য তাতে একটুও কমল না। কবি শুনে মেয়েরা খানিকটা দ্রবীভূত হয়। পুলিশ কখনো হয় না। পুলিশের সঙ্গে কবিতার নিশ্চয়ই বড়ধরনের কোনো বিরোধ আছে।

চুপচাপ বসে থাকা অনেকের জন্যেই খুব কষ্টকর। আমার জন্যে ডালভাত। শুধু হেলান দেওয়ার একটু জায়গা পেলে আরাম করে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারি। বেঞ্চিতে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না বলে একটু অসুবিধা হয়; তবে সেই অসুবিধাও অসহনীয় নয়। এরকম পরিস্থিতিতে আমি আমার নদীটা বের করে ফেলি। তখন অসুবিধা হয় না।

নদী বের করার ব্যাপারটা সম্ভবত আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। একটু ব্যাখ্যা করলেই পরিষ্কার হবে।

ছোটবেলার কথা। ক্লাস সিক্সে পড়ি। জিওগ্রাফি পড়ান মফিজ স্যার। তিনি ক্লাসে ঢুকলে চেয়ার-টেবিলগুলি পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে। স্যার মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু হাতের থাবাটা বিশাল। আমাদের ধারণা ছাত্রদের গালে চড় বসাবার জন্যে আল্লাহতালা স্পেশালভাবে স্যারের এই হাত তৈরি করে দিয়েছেন। স্যারের চড়েরও নানা নাম ছিল—রাম চড়, শ্যাম চড়, যদু চড়, মধু চড়। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন চড় হচ্ছে রাম চড়, সবচে' নরমটা হচ্ছে মধু চড়।

স্যার সেদিন পড়াচ্ছেন—বাংলাদেশের নদ-নদী। ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, এই, একটা নদীর নাম বল তো। চট করে বল।

মফিজ স্যার কোনো প্রশ্ন করলে কিছুক্ষণের জন্যে আমার মাথাটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায়। কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। মনে হয় মাথার খুলির ভেতর জমে থাকা কিছু বাতাস কানের পরদা ফাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কী ব্যাপার, চুপ করে আছিস কেন ? নাম বল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, আড়িয়াল খাঁ।

স্যার এগিয়ে এসে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। খুব সম্ভব রাম চড়। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে তোর মনে এল আড়িয়াল খাঁ ? সবসময় ফাজলামি ? কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক।

আমি কানে ধরে সারাটা ক্লাস দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক আগে পড়ানো শেষ করে স্যার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছে আয়।

আরেকটি চড় খাবার জন্যে আমি ভয়ে ভয়ে সারের কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বিষণ্ন গলায় বললেন, এখনো কানে ধরে আছিস কেন ? হাত নামা।

আমি হাত নামালাম। স্যার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তোকে শাস্তি দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে, খুবই অন্যায়। তোকে নদীর নাম বলতে বলেছি, তুই বলেছিস। আয় আরও কাছে আয়, তোকে আদর করে দেই।

স্যার এমন ভঙ্গিতে মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন যে আমার চোখে পানি এসে গেল। স্যার বিব্রত গলায় বললেন, আমি তোর কাছ থেকে সুন্দর একটা

নদীর নাম শুনতে চেয়েছিলাম আর তুই বললি আড়িয়াল খাঁ। আমার মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে। আচ্ছা, এখন সুন্দর একটা নদীর নাম বল।

আমি শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললাম, ময়ূরাক্ষী।

ময়ূরাক্ষী ? এই নাম তো শুনিনি। কোথাকার নদী ?

জানি না স্যার।

এই নামে আসলেই কি কোনো নদী আছে ?

তা-ও জানি না স্যার।

স্যার হালকা গলায় বললেন, আচ্ছা থাক। না থাকলে নেই। এটা হচ্ছে তোর নদী। যা জায়গায় গিয়ে বোস। এমনিতেই তোকে শাস্তি দিয়ে আমার মনটা খারাপ হয়েছে। তুই তো দেখি কেঁদে কেঁদে আমার মনখারাপটা বাড়াচ্ছিস। আর কাঁদিস না।

এই ঘটনার প্রায় বছর-তিন পর ক্যান্সারে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মফিজ স্যার মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্যারকে দেখতে গিয়েছি। নোংরা একটা ঘরের নোংরা বিছানায় স্যার শুয়ে আছেন। মানুষ না, যেন কফিন থেকে বের করা মিশরের মমি। স্যার আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। উঁচুগলায় তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন, ওগো, এই ছেলেটাকে দেখে যাও। এই ছেলের একটা নদী আছে। নদীর নাম ময়ূরাক্ষী।

স্যারের স্ত্রী আমার প্রতি কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। স্যার সেই অনাদর পুষিয়ে দিলেন। দুর্বল হাতে টেনে তাঁর পাশে বসালেন। বললেন, তোর নদীটা কেমন বল তো ?

আমি নিচুগলায় বললাম, আমি স্যার কিছু জানি না। দেখিনি কখনো।

তবু বল শুনি। বানিয়ে বানিয়ে বল।

আমি লাজুক গলায় বললাম, নদীটা খুব সুন্দর।

আরে গাধা, নদী তো সুন্দর হবেই। অসুন্দর নদী বলে কিছু নেই। আরও কিছু বল।

আমি বলার মতো কিছু পেলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম।

স্যার যেদিন মারা যান সেই রাত্রিতেই আমি প্রথম ময়ূরাক্ষী নদীটা স্বপ্নে দেখি। ছোট্ট একটা নদী। তার পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। নিচের বালিগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর দুধারে দূর্বাঘাসগুলি কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশাল ছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সেই গাছে বিষণ্ন গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে। সেই ডাকে একধরনের কান্না মিশে আছে।

নদীর ধার ঘেঁসে পানি ছিটাতে ছিটাতে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি-পরা একটি মেয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি শুধু একঝলক তার মুখটা দেখতে পেলাম। স্বপ্নের মধ্যেই তাকে খুব চেনা, খুব আপন মনে হলো। যেন কত দীর্ঘ শতাব্দী এই মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছি।

ময়ূরাক্ষী নদীকে একবারই আমি স্বপ্নে দেখি। নদীটা আমার মনের ভেতর পুরোপুরি গাঁথা হয়ে যায়। এরপর অবাক হয়ে লক্ষ করি, কোথাও বসে একটু চেষ্টা করলেই নদীটা আমি দেখতে পাই। তার জন্যে আমাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না। চোখ বন্ধ করতে হয় না, কিছু না। একবার নদীটা বের করে আনতে পারলে সময় কাটানো কোনো সমস্যা নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি নদীর তীরে হাঁটি। নদীর হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে বসি। শরীর জুড়িয়ে যায়। ঘুঘুর ডাকে চোখ ভিজে ওঠে।

ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

আমি চোখ মেললাম। চারদিকে অন্ধকার। আরে সর্বনাশ, এতক্ষণ পার করেছি। ওসি সাহেব বললেন, যান চলে যান। জাস্টিস সাহেবের বাসা থেকে টেলিফোন করেছিল। ওরা কোনো চার্জ আনবে না। You are free to go.

জাস্টিস সাহেব নিজেই টেলিফোন করেছিলেন ?

না, তাঁর মেয়ে।

মেয়েটা কী বলল, দয়া করে বলবেন ?

বলল ধমক-ধামক দিয়ে ছেড়ে দিতে।

তাহলে দয়া করে ধমক-ধামক দিন। তারপর যাই।

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন। পুলিশের যে একেবারেই রসবোধ নেই সেটা ঠিক না। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, মেয়েটা কি তার নাম আপনাকে বলেছে ?

হ্যাঁ বলেছে, মীরা কিংবা মীরু এই জাতীয় কিছু।

আপনি কি নিশ্চিত যে সে জাস্টিস এম সোবাহান সাহেবের মেয়ে ? অন্যকেউও তো হতে পারে। আপনি একটা উড়ো টেলিফোন কল পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন, তারপর জাস্টিস সাহেব ধরবেন আপনাকে—আইনের প্যাঁচে ফেলে অবস্থা কাহিল করে দেবেন।

ভাই আপনি যান তো। আর শোনেন, একটা উপদেশ দিই। পুলিশের সঙ্গে এত মিথ্যাকথা বলবেন না। মিথ্যা বলবেন ভালোমানুষদের কাছে। যা বলবেন তা-ই তারা বিশ্বাস করবে। পুলিশ কোনোকিছুই বিশ্বাস করে না। খোঁজখবর করে।

আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করেছেন ?

হ্যাঁ। সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে খোঁজ নিয়েছি। জেনেছি টুটুল চৌধুরী নামের কোনো ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক নেই।

আপনি কি আমার মুচলেকা ফুচলেকা এইসব কিছু নেবেন না ?

না। এখন দয়া করে বিদেয় হোন।

আপনার গাড়ি করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি কি আশা করতে পারি না আবার গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে আসবেন ?

কোথায় যাবেন ?

ফার্মগেট।

চলুন নামিয়ে দেব।

আমি হাসিমুখে বললাম, আপনার এই ভদ্রতার কারণে কোনো একদিন হয়তো আমি আপনাকে ময়ূরাক্ষীর তীরে নিমন্ত্রণ করব।

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কী বললেন বুঝতে পারলাম না।

ঐটা বাদ দিন। সবকিছু বুঝে ফেললে তো মুশকিল। ভালো কথা, আপনি ডেইলি ক'প্যাকেট সিগারেট খান তা কি জানতে পারি ?

ওসি সাহেব বললেন, আপনি লোকটা তো ভালো ত্যাঁদড় আছেন। দুই থেকে আড়াই প্যাকেট লাগে।

২

বড়ফুপুর বাসায় দুপুরে যাওয়ার কথা।

উপস্থিত হলাম রাত আটটায়। কেউ অবাক হলো না। ফুপুর বড়ছেলে বাদল আমাকে দেখে উল্লসিত গলায় বলল, হিমুদা এসেছ ? থ্যাংকস। অনেক কথা আছে, আজ থাকবে কিন্তু। আই নিড ইয়োর হেল্প।

বাদল এবার ইন্টারমিডিয়েট দেবে। এর আগেও তিনবার দিয়েছে। সে পড়াশোনায় খুবই ভালো। এসএসসি'তে বেশ কয়েকটা লেটার এবং স্টার মার্ক পেয়েছে। সমস্যা হয়েছে ইন্টারমিডিয়েটে। পরীক্ষা শেষপর্যন্ত দিতে পারে না। মাঝামাঝি জায়গায় তার একধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যায়। তার কাছে মনে হয় পরীক্ষার হল হঠাৎ ছোট হতে শুরু করে। ঘরটা ছোট হয়। পরীক্ষার্থীরা ছোট হয়, চেয়ার-টেবিল সব ছোট হতে থাকে। তখন সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। বাইরে আসা মাত্রই দেখে সব স্বাভাবিক। তখন সে আর পরীক্ষার হলে ঢোকে না। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি চলে আসে।

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সময় অনেক ডাক্তার দেখানো হলো। ওষুধপত্র খাওয়ানো হলো। সেবারও একই অবস্থা। এখন আবার পরীক্ষা দেবে। এবার ডাক্তারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পীর-ফকির। বাদলের গলায়, হাতে, কোমরে নানান মাপের তাবিজ ঝুলছে। এর মধ্যে একটা তাবিজ নাকি জিনকে দিয়ে কোহকাফ নগর থেকে আনানো। কোহকাফ নগরীতে নাকি জিন এবং পরীরা থাকে। আমার বড়ফুপা ঘোর নাস্তিক ধরনের মানুষ এবং বেশ ভালো ডাক্তার—তিনিও কিছু বলছেন না।

বাদলেরও দেখি আমার মতো অবস্থা। দাড়িগোঁফ গজিয়ে হুলস্থূল। লম্বা লম্বা চুল। সে খুশি খুশি গলায় বলল, হিমুদা, আমি পড়াশোনা করছি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমার ঘরে চলে আসবে।

পড়াশোনা হচ্ছে কেমন ?

হেভি হচ্ছে। একই জিনিস তিন-চার বছর ধরে পড়ছি তো, একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। হিমু ভাই, তুমি এমন ডার্ক হলুদ পাঞ্জাবি কোথায় পেলে ?

গাউছিয়ায়।

ফাইন দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী লাগছে—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের নিচে একদা ছিলেন সুপ্ত।

যা পড়াশোনা কর। আমি আসছি।

কী আর পড়াশোনা করব। সব তো ভাজা ভাজা।

তবু আরেকবার ভেজে ফেল। কড়া ভাজা হবে।

বাদল শব্দ করে হেসে উঠল। সেই হাসি হেঁচকির মতো চলতেই থাকল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই ছেলের অবস্থা দেখি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে কেউ হাসে ?

ফুপু গম্ভীর মুখে খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে দুপুরে প্রচুর আয়োজন ছিল। সেইসব গরম করে দেওয়া হচ্ছে। পোলাওয়ে টক টক গন্ধ। নষ্ট হয়ে গেছে কি না কে জানে! আমার পেটে অবশ্যি সবই হজম হয়ে যায়। পোলাওটা মনে হচ্ছে হবে না। কষ্ট দেবে।

ফুপু বললেন, রোস্ট আরেক পিস দেব ?

দাও।

এত খাবার-দাবারের আয়োজন কী জন্যে একবার জিজ্ঞেস করলি না ?

আমি খাওয়া বন্ধ করে বললাম, কী জন্যে ?

আত্মীয়স্বজন যখন কোনো উপলক্ষে খেতে ডাকে তখন জিজ্ঞেস করতে হয় উপলক্ষটা কী। যখন আসতে বলে তখন আসতে হয়।

একটা ঝামেলায় আটকে পড়েছিলাম। উপলক্ষটা কী ?

রিনকির বিয়ের কথা পাকা হলো।

বাহ্, ভালো তো।

ফুপু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি খেয়েই যাচ্ছি। টকগন্ধ পোলাও এত খাওয়া ঠিক হচ্ছে না সেটাও বুঝতে পারছি, তবু নিজেকে সামলাতে পারছি না। যা হওয়ার হবে। ফুপু শীতল গলায় বললেন, একবার তো জিজ্ঞেস করলি না—কার সঙ্গে বিয়ে, কী সমাচার।

তোমরা নিশ্চয় দেখেশুনে ভালো বিয়েই দিচ্ছ।

তুই একবার জিজ্ঞেসও করবি না ? তোর কোনো কৌতূহলও নেই ?

আরে কী বলো কৌতূহল নেই। আসলে এত ক্ষুধার্ত যে কোনোদিকে মন দিতে পারছি না। দুপুরের খাওয়া হয়নি। ছেলে করে কী ?

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।

বলো কী! তাহলে তো মালদার পার্টি।

ফুপু রাগী-গলায় বললেন, ছোটলোকের মতো কথা বলবি না তো, মালদার পার্টি আবার কী ?

পয়সাওয়ালা পার্টি এই বলছি।

হ্যাঁ, টাকাপয়সা ভালোই আছে।

শর্ট না তো ? আমার কেন জানি মনে হতো—একটা শর্ট টাইপের ছেলের সাথে রিনকির বিয়ে হবে। ছেলের হাইট কত ?

ফুপুর মুখটা কালো হয়ে গেল। তিনি নিচুগলায় বললেন, হাইট একটু কম। উঁচু জুতা পরলে বোঝা যায় না।

বোঝা না-গেলে তো কোনো সমস্যাই নেই। তাছাড়া বেঁটে লোক খুব ইন্টেলিজেন্ট হয়। যত লম্বা হয় বুদ্ধি তত কমতে থাকে। আমি এখন পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিমান লম্বা মানুষ দেখিনি। সত্যি বলছি।

ফুপুর মুখ আরও অন্ধকার হয়ে গেল। তখন মনে পড়ল—কী সর্বনাশ! ফুপা নিজেই বিরাট লম্বা, প্রায় ছ'ফুট। আজ দেখি একের পর এক ঝামেলা বাধিয়ে যাচ্ছি।

তুই যাওয়ার আগে তোর ফুপার সঙ্গে কথা বলে যাবি। তোর সঙ্গে নাকি কী জরুরি কথা আছে।

নো প্রবলেম।

আর রিনকির সঙ্গে কথা বলার সময় জামাই লম্বা কী বেঁটে এ জাতীয় কোনো কথাই বলবি না।

বেঁটে লোকরা যে জ্ঞানী হয় এই কথাটা ঠিক কায়দা করে বলব।

তোর কিছুই বলার দরকার নেই।

ঠিক আছে। ঠান্ডা পেপসি টেপসি থাকলে দাও। তোমরা তো কেউ পান খাও না। কাউকে দিয়ে তিনটা পান আনাও তো।

রিনকির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এই মেয়ে নাইন-টেনে পড়ার সময় রোগাভোগা ছিল, এখন দিন দিন মোটা হচ্ছে। আজ অবশ্যি সেরকম মোটা লাগছে না। ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে এরচেয়ে কম মোটা হলে তাকে মানাত না।

কী-রে, ক্লাস ওয়ান একটা বর জোগাড় করে ফেললি ? কনগ্রাচুলেশনস।

রিনকি অসম্ভব খুশি হলো। অবশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বলল, ক্লাস ওয়ান বর না ছাই। ক্লাস থ্রি হবে বড়জোর।

মেয়েদের আমি কখনো খুশি হলে সেই খুশি প্রকাশ করতে দেখিনি। একবার একটা মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে ইন্টারমিডিয়েটে ছেলে-মেয়ে সবার মধ্যে ফার্স্ট

হয়েছে। আমি বললাম, কী খুশি তো ? সে ঠোঁট উল্টে বলল, উঁহু, বাংলা সেকেন্ড পেপারে যা পুওর নাম্বার পেয়েছি। জানেন, মার্কশিট দেখে কেঁদেছি। রিনকিরও দেখি সেই অবস্থা। খুশিতে মুখ ঝলমল করছে অথচ মুখে বলছে—ক্লাস থ্রি।

হিমু ভাই, ও কিন্তু দারুণ শর্ট। মনে হয় কলিংবেল হাত দিয়ে নাগাল পাবে না।

আমি অত্যন্ত খুশি হওয়ার ভঙ্গি করলাম। খুশি গলায় বললাম, তাহলে তো তুই লাকি। ভাগ্যবতী মেয়েদের বর খাটো হয়—খনার বচনে আছে।

যাও!

সত্যি। খনা বলছেন খাটো পেয়ারা ভালো। খাটো স্বামীর মন... তারপর আরও কী কী যেন আছে মনে নেই।

বানিয়ে বানিয়ে কী যে মিথ্যে তুমি বলো। এই ছড়াটা তুমি এক্ষুনি বানালে, তাই না ?

হুঁ।

কেন বানালে বলো তো ?

তোকে খুশি করবার জন্যে।

খুশি করবার দরকার নেই, আমি এমনিতেই খুশি।

সেটা তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বর পছন্দ হয়েছে ?

হুঁ। তবে খুব বিরক্ত করছে।

বিরক্ত করছে মানে ?

আজই মাত্র কথাবার্তা ফাইনাল হলো, এর মধ্যে তিনবার টেলিফোন করেছে। তারপর বলেছে রাত এগারোটার সময় আবার করবে। লজ্জা লাগে না ? তার উপর টেলিফোন বাবার ঘরে। বাবা সন্ধে থেকে তাঁর ঘরে বসা আছে। আমি কি বাবার সামনে তার সঙ্গে কথা বলব ?

লম্বা তার আছে, তুই টেলিফোন তোর ঘরে নিয়ে আয়।

আমি কী করে আনব ? আমার লজ্জা লাগে না ?

আচ্ছা যা, আমি এনে দিচ্ছি।

পরে কিন্তু তুমি এই নিয়ে ঠাট্টা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আনতে বলিনি। তুমি নিজ থেকে আনতে চেয়েছ।

তা তো বটেই। ঐ ভদ্রলোক টেলিফোনে কী বলে ?

কী আর বলবে, কিছু বলে না।

আহা বল না শুনি।

উফ, তুমি বড় যন্ত্রণা করো! আমি কিছু বলতে টলতে পারব না।

রিনকি লজ্জায় লাল-নীল হতে লাগল। মনে হচ্ছে সে এখন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটাচ্ছে। বড় ভালো লাগছে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। রিনকির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। থাকা গেল না। ফুপা ডেকে পাঠালেন।

ফুপার ঘর অন্ধকার।

জিরো পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। লক্ষণ সুবিধার না। ফুপার মাঝে মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস আছে। এই কাজটা বেশিরভাগ সময় বাইরেই সারেন। বাসায় ফুপুর জন্যে তেমন সুযোগ পান না। ফুপুর শাসন বেশ কঠিন। হঠাৎ হঠাৎ কোনো বিশেষ উপলক্ষে বাসায় মদ্যপানের অনুমতি পান। আজ পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

মদ্যপান করছে এরকম মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হয়। কারণ তাদের মুড মদের পরিমাণ এবং কতক্ষণ ধরে মদ্যপান করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। ফুপার তরল অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা বিশেষ হয়নি, কাজেই তরল অবস্থায় তাঁর মেজাজমর্জি কেমন থাকে তা-ও জানি না।

ফুপা আসব ?

হিমু ? এসো। দরজা ভিড়িয়ে দাও। তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। বসো, সামনের চেয়ারটায় বসো।

আমি বসলাম।

তিনি গ্লাস দেখিয়ে বললেন, আশা করি এইসব ব্যাপারে তোমার কোনো প্রিজুডিস নেই।

জি-না।

তারপর বলো কেমন আছ। ভালো ?

জি।

রিনকির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, শুনেছ বোধহয় ?

জি।

ছেলে ভালো তবে খুবই খাটো। আমাদের সঙ্গে এইরকম একটা ছেলে পড়ত— তার নাম ছিল স্ক্রু। এই ছেলেরও নিশ্চয়ই এই ধরনের কোনো নামটাম আছে। বেঁটে ছেলের নাম সাধারণত স্ক্রু হয় কিংবা বল্টু হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ফুপাকে নেশায় ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। না ধরলে নিজের জামাই সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলতে পারতেন না।

আপনার ছেলে পছন্দ হয়নি ?

আরে পছন্দ হবে কী ? মার্বেলের সাইজের এক ছেলে।

পছন্দ হয়নি তো বিয়েতে মত দিলেন কেন ?

আমার মতামতের প্রশ্নই তো ওঠে না। আমি হচ্ছি এই সংসারের টাকা বানানোর মেশিন। এর বেশি কিছু না। আমি কী বলছি না বলছি তা কেউ জানতে চায় না। তারপরেও বলতাম। কিন্তু দেখি মেয়ে এবং মেয়ের মা দুইজনই খুশিতে বাকবাকুম।

তাঁর গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও খানিকটা ঢাললেন। আমি তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, এটা পঞ্চম পেগ। আমার লিমিট হচ্ছে সাত। সাতের পর লজিক এলোমেলো হয়ে যায়। সাতের আগে কিছুই হয় না।

আমি বললাম, ফুপা এক মিনিট। আমি টেলিফোনটা রিনকির ঘরে দিয়ে আসি। ও কোথায় যেন টেলিফোন করবে।

ফুপা মুখ বিকৃত করে বললেন, কোথায় করবে বুঝতে পারছ না ? ঐ মার্বেলের কাছে করবে। টেলিফোন করে করে অস্থির করে তুলল।

আমি রিনকিকে টেলিফোন দিয়ে এসে বললাম, আপনি কী জানি জরুরি কথা বলবেন।

ও হ্যাঁ জরুরি কথা, বাদল সম্পর্কে।

জি বলুন।

ও তোমাকে কেমন অনুসরণ করে সেটা লক্ষ করেছ ? তুমি তোমার মুখে দাড়িগোঁফের চাষ করছ—করো। সেও তোমার পথ ধরেছে। আজ তুমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছ, আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি, কাল দুপুরের মধ্যে সে হলুদ পাঞ্জাবি কিনবে। আমি কি ভুল বললাম ?

না, ভুল বলেননি।

তুমি যদি আজ মাথা কামাও, আমি শিওর ব্যাটা কাল মাথা কামিয়ে ফেলবে। এরকম প্রভাব তুমি কী করে ফেললে এটা তুমি আমাকে বলো। You better explain it.

আমার জানা নেই ফুপা।

ভুলটা আমার। মেট্রিক পাস করে তুমি যখন এলে আমি ভালোমনে বললাম, আচ্ছা থাকুক। মা-বাপ নেই ছেলে—একটা আশ্রয় পাক। তুমি যে এই সর্বনাশ করবে তা তো বুঝিনি! বুঝতে পারলে তখনই ঘাড় ধরে বের করে দিতাম।

আমি জেনেশুনে কিছু করিনি।

তাও ঠিক। জেনেশুনে তুমি কিছু করোনি। আই ডু এগ্রি। তোমার লাইফস্টাইল তাকে আকর্ষণ করেছে। তুমি ভ্যাগাবন্ড না অথচ তুমি ভাব করো যে তুমি ভ্যাগাবন্ড। জোছনা দেখানোর জন্যে চন্দ্রায় এক জঙ্গলের মধ্যে বাদলকে নিয়ে গেলে। সারা রাত ফেরার নাম নেই। জোছনা এমন কী জিনিস জঙ্গলে বসে দেখতে হবে ? বলো তুমি। তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

শহরের আলোয় জোছনা ঠিক বোঝা যায় না।

মানলাম তোমার কথা। ভালো কথা, চন্দ্রায় গিয়ে জোছনা দেখো। তাই বলে সারা রাত বসে থাকতে হবে ?

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোছনা কীভাবে বদলে যায় সেটাও একটা দেখার মতো ব্যাপার। শেষরাতে পরিবেশ ভৌতিক হয়ে যায়।

তাই নাকি ?

জি। তাছাড়া জঙ্গলের একটা আলাদা এফেক্ট আছে। শেষরাতের দিকে গাছগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তোমার কথা বুঝলাম না। গাছগুলি জীবন্ত হয় মানে ? গাছ তো সবসময়ই জীবন্ত।

জি-না। ওরা জীবন্ত, তবে সুপ্ত। খানিকটা জেগে ওঠে পূর্ণিমা রাতে। তা-ও মধ্যরাতের পর থেকে। জঙ্গলে না-গেলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। আপনি একবার চলুন-না, নিজের চোখে দেখবেন। দিন-তিনেক পরেই পূর্ণিমা।

দিন-তিনেক পরেই পূর্ণিমা ?

জি।

এইসব হিসাব-নিকাশ সবসময়ই তোমার কাছে থাকে ?

জি।

একবার গেলে হয়।

বলেই ফুপা গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি আমাকে পর্যন্ত কনভিন্সড করে ফেলছিলে। মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্যি এটা সম্ভব হয়েছে নেশার ঘোরে থাকার জন্যে।

তা ঠিক। কিছু মানুষ ধরেই নিয়েছে তারা যা ভাবছে তা-ই ঠিক। তাদের জগতটাই একমাত্র সত্যি জগৎ। এরা রহস্য খুঁজবে না। এরা স্বপ্ন দেখবে না।

চুপ করো তো।

আমি চুপ করলাম। ফুপা রাগী গলায় বললেন, তুমি ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরবে আর ভাববে বিরাট কাজ করে ফেলছ। তুমি যে অসুস্থ এটা তুমি জানো ? ডাক্তার হিসেবে বলছি—তুমি অসুস্থ। You are a sick man.

ফুপা, আপনি নিজেও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বেশি খাচ্ছেন। আপনি বলেছেন আপনার লিমিট সাত। আমার ধারণা এখন নয় চলছে।

তোমার কাছে সিগারেট আছে ?

আছে।

দাও।

তিনি সিগারেট ধরালেন। খুকখুক করে কাশলেন। ফুপাকে আমি কখনো সিগারেট খেতে দেখিনি। তবে মদ্যপানের সঙ্গে সিগারেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এরকম শুনেছি।

হিমু!

জি।

রাস্তায় রাস্তায় ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে তুমি যদি আনন্দ পাও—তুমি অবশ্যি তা করতে পারো। It is your life. কিন্তু আমার ছেলেও তা-ই করবে তা তো হয় না।

ও কি তা করছে নাকি ?

এখনো শুরু করেনি। তবে করবে। দু'বছর তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। একই ঘরে ঘুমিয়েছ। এই দু'বছরে তুমি ওর মাথাটা খেয়েছ। তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না।

জি আচ্ছা। আসব না।

এ বাড়ির ছায়া তুমি মাড়াবে না।

ঠিক আছে।

এই বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তোমাকে দেখি তাহলে পিটিয়ে তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলব।

আপনার নেশা হয়ে গেছে ফুপা। পিটিয়ে ছাল তোলা যায় না। আপনার লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ফুপার সিগারেট নিভে গেছে। সিগারেটে অনভ্যস্ত লোকজন সিগারেটের আগুন বেশিক্ষণ ধরিয়ে রাখতে পারে না। আমি আবার তার সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। ফুপা বললেন, তোমাকে আমি একটা প্রপোজাল দিতে চাই। একসেপ্ট করবে কী করবে না ভেবে দেখো।

কী প্রপোজাল ?

তোমাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে চাই। As a matter of fact আমার হাতে একটা চাকরি আছে। আহামরি কিছু না। তবে তোমার চলে যাবে।

বেতন কত ?

ঠিক জানি না। তিন হাজারের কম হবে না। বেশিও হতে পারে।

তেমন সুবিধার চাকরি বলে তো মনে হচ্ছে না।

ভিক্ষা করে জীবন যাপন করার চেয়ে কি ভালো না ?

না। ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার আলাদা আনন্দ আছে। প্রাচীন ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের সবাই ভিক্ষা করতেন। বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। এরা অবশ্যি ভিক্ষা বলে না। এরা বলে মাধুকরী।

আমার কাছে লেকচার ঝাড়বে না।

ফুপা, আমি কি তাহলে উঠব ?

যাও ওঠো। শুধু একটা জিনিস বলো—যে ধরনের জীবন তুমি যাপন করছ তাতে আনন্দটা কী ?

যা ইচ্ছা করতে পারার একটা আনন্দ আছে না ?

যা ইচ্ছা তুমি কি তাই করতে পারবে ?

অবশ্যই পারব। বলুন কী করতে হবে।

খুন করতে পারবে ?

কেন পারব না! খুন করা আসলে খুব সহজ ব্যাপার।

সহজ ব্যাপার ?

অবশ্যই সহজ ব্যাপার। যে-কেউ করতে পারে। রোজ কতগুলি খুন হচ্ছে দেখছেন না! খবরের কাগজ খুললেই দেখবেন। আমার তো রোজই একটা-দুটা মানুষকে খুন করতে ইচ্ছা করে।

হিমু। You are a sick man. You are a sick man.

আর খাবেন না ফুপা। আপনি মাতাল হয়ে গেছেন।

কী করে বুঝলে মাতাল হয়ে গেছি ? কী করে বুঝলে ?

মাতালরা প্রতিটা বাক্য দুবার করে বলে। আপনিও তাই বলছেন। আপনি বাথরুমে গিয়ে বমির চেষ্টা করুন। বমি করলে ভালো লাগবে।

বলেই আমি চেয়ার ছেড়ে সরে গেলাম। বমির কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, কাজেই ফুপা এখন হড়হড় করে বমি করবেন। হলো-ও তাই। তিনি চারদিক ভাসিয়ে দিলেন। ওয়াক ওয়াক শব্দে ফুপু ছুটে এলেন। তিনি তাঁর সাজানো ঘরের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত। ফুপাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে। হঠাৎ হয়তো দেখব বমির সঙ্গে তাঁর পাকস্থলী বের হয়ে আসছে। সেই দৃশ্য খুব সুখকর হবে না। আমি বারান্দায় চলে এলাম। রিনকি ছুটে এসেছে, বাদলও এসেছে।

ফুপা চিঁ চিঁ করে বলছেন, সুরমা, আমি মরে যাচ্ছি। ও সুরমা, আমি মরে যাচ্ছি।

বমি করতে করতে কোনো মাতাল মারা যায় বলে আমার জানা নেই। কাজেই আমি রাস্তায় নেমে এলাম। সিগারেট কেনা দরকার।

আকাশে মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টি হবে কি না কে জানে। হলে ভালোই হয়। এই বৎসর এখনো বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি। নবধারা জলে স্নান বাকি আছে।

সিগারেটের সঙ্গে জরদা দেওয়া দুটো পান কিনলাম। জরদার নাম সবই পুংলিঙ্গে—দাদা জরদা, বাবা জরদা। মা জরদা, খালা জরদা এখনো বাজারে আসেনি যদিও মহিলারাই জরদা বেশি খান। কোনো একটা জরদা কোম্পানিকে এই আইডিয়াটা দিয়ে দেখলে হয়।

প্রথমবার ঢোকার সময় ফুপুকে যত গম্ভীর দেখলাম দ্বিতীয়বারে তার চেয়েও বেশি গম্ভীর মনে হলো। ফুপু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। কাজের মেয়ে বালতি আর ঝাঁটা হাতে যাচ্ছে। কাজের ছেলেটির হাতে ফিনাইল। ফুপুর কিছুটা শুচিবায়ুর মতো আছে। আজ সারা রাতই বোধহয় ধোয়াধুয়ি চলবে।

ফুপু বললেন, তুই তাহলে আছিস। আমি ভাবলাম চলে গিয়েছিস।

পান কিনতে গিয়েছিলাম। ফুপার অবস্থা কী ?

অবস্থা কী জিজ্ঞেস করছিস লজ্জা করে না ? তোর সামনে গিলল, তুই একবার না করতে পারলি না ? চাকরবাকর আছে। কী লজ্জার কথা। তুই কি আজ এখানে থাকবি ?

হ্যাঁ।

এখানে থাকার তোর দরকারটা কী ?

এত রাতে যাব কোথায় ?

ফুপু শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। টেলিফোনে ক্রমাগত রিং হচ্ছে। এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে। রিনকির ঘর পর্যন্ত টেলিফোন নেওয়া যায়নি। তার এত লম্বা নয়। টেলিফোন বারান্দায় রাখা। আমি রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলা পাওয়া গেল, এটা কি রিনকিদের বাসা ?

হ্যাঁ।

দয়া করে ওকে একটু ডেকে দেবেন ?

আপনি কে আমি জানতে পারি ? এ বাড়ির নিয়মকানুন খুব কড়া, অপরিচিত লোক যদি রিনকিকে ডাকে তাহলে রিনকিকে বলা যাবে না।

আমি এজাজ।

আপনি কি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ?

জি।

আমাকে আপনি চিনবেন না, আমার নাম...

আপনি কে তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি হচ্ছেন হিমু ভাই।

আমি সত্যি সত্যি চমৎকৃত হলাম। এর মধ্যে রিনকি আমার গল্প করে ফেলেছে ? এমনভাবে করেছে যে ভদ্রলোক চট করে আমার কয়েকটা বাক্যতেই আমাকে চিনে ফেললেন। ভদ্রলোকের বুদ্ধি তো ভালোই। এমন বুদ্ধিমান একজন মানুষ রিনকির মতো গাধাটাইপের একটি মেয়ের সঙ্গে জীবন কী করে টেনে নেবে কে জানে।

হ্যালো। হ্যালো। লাইন কি কেটে গেল ?

না, কাটেনি।

আপনি কি হিমু ভাই ?

হ্যাঁ।

রিনকি বলেছে আপনার নাকি অলৌকিক সব ক্ষমতা আছে।

কী রকম ক্ষমতা?

প্রফেটিক ক্ষমতা। আপনি নাকি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। আপনি যা বলেন তাই নাকি হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। এই জাতীয় প্রসঙ্গ এলে চুপ করে থাকাই নিরাপদ। হ্যাঁ-না কিছু বললেই তর্কের মুখোমুখি হতে হয়। তর্ক করতে আমার ভালো লাগে না।

হ্যালো হ্যালো। লাইনটা ডিসটার্ব করছে। হ্যালো হিমু ভাই!

বলুন।

আপনি কি দয়া করে একটু রিনকিকে...

ওকে তো দেওয়া যাবে না। ও আশেপাশে নেই। বাবার সেবা করছে। উনি অসুস্থ।

অসুস্থ? কী বলছেন? সিরিয়াস কিছু?

সিরিয়াস বলা যেতে পারে।

বলেন কী! আমি কি আসব?

আমি কয়েক মুহূর্ত দ্রুত চিন্তা করে বললাম, আসতে অসুবিধা হবে না তো?

না-না, অসুবিধা কী! আমার গাড়ি আছে।

আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

হোক। বিপদের সময় উপস্থিত না থাকলে কী করে হয়?

তা তো বটেই। আপনি এক্ষুনি রওনা না হয়ে ঘণ্টাখানেক পরে আসুন।

কেন বলুন তো?

এমনি বললাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার কথা অগ্রাহ্য করব না। যে-সব কথা আমি শুনেছি—মাই গড! আপনি দয়া করে আমার সম্পর্কেও কিছু বলবেন। মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট।

আচ্ছা বলব।

হিমু ভাই, তাহলে রাখি? আর ইয়ে, আমি যে আসছি এটা রিনকিকে বলবেন না। একটা সারপ্রাইজ হবে।

আমার টেলিফোন ব্যাধি আছে। একবার টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বললে, আবার অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। রূপাদের বাসায় করলাম। রূপার বাবা ধরতেই বললাম, আচ্ছা এটা কি রেলওয়ে বুকিং? রূপার বাবা বললেন, জি-না। আপনার রং নাম্বার হয়েছে। তখন আমি বললাম, জাস্ট ওয়ান মিনিট, রূপা কি জেগে আছে?

রূপার বাবার হাইপ্রেশার বা এই জাতীয় কিছু বোধহয় আছে। অল্পতেই রেগে গিয়ে এমন হইচই শুরু করেন যে বলার না। আমার কথাতেও তাই হলো। তিনি চিড়চিড়িয়ে উঠলেন, কে ? কে ? এই ছোকরা, তুমি কে ?

তিনি খুব হইচই করতে লাগলেন। আমি রিসিভার রেখে দিলাম। রূপার বাবা নিশ্চয়ই সবাইকে ডেকে এই ঘটনা বলবেন। রূপা সঙ্গে সঙ্গে বুঝবে কে টেলিফোন করেছিল। সে হাসবে, না রাগ করবে—কে জানে! যেখানে রাগ করা উচিত সেখানে সে রাগ করে না, হাসে। যেখানে হাসা উচিত সেখানে রাগ করে।

আমি ওয়ান সেভেনে রিং করে জাস্টিস এম সোবাহানের বাসা চাইলাম। সম্ভব হলে মীরা বা মীরুর সঙ্গেও কথা বলা যাবে। কী বলব ঠিক করা হলো না। যা মনে আসে তাই বলব। আগে থেকে ভেবেচিন্তে কিছু বলা আমার স্বভাবে নেই।

হ্যালো ?

কে মীরা ?

হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন ?

আমার নাম টুটুল।

কে ?

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। মনে হচ্ছে মীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত। আমার মনে হয় কথা বলবে কী বলবে না বুঝতে পারছে না।

ভুলে গেছেন ? ঐ যে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। কী করেছিলাম আমি বলুন তো ?

কোত্থেকে টেলিফোন করেছেন ?

হাসপাতাল থেকে। পুলিশ মেরে আমার অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে। রক্তবমি করছিলাম।

সে কী কথা, মারবে কেন ?

পুলিশের হাতে আসামি তুলে দেবেন আর পুলিশ আসামিকে কোলে বসিয়ে মণ্ডা খাওয়াবে ? আমি তো আপনাদের কোনোই ক্ষতি করিনি। গাড়িতে ডেকেছেন, উঠেছি। তাছাড়া আপনারা টুটুল টুটুল করছিলেন। আমার ডাকনামও টুটুল।

আপনি কিন্তু বলেছেন আপনার নাম টুটুল নয়।

হ্যাঁ, বলেছিলাম। কারণ বুঝতে পারছিলাম আপনি অন্য টুটুলকে খুঁজছিলেন যার কপালে একটা কাটা দাগ।

ওপাশে অনেকক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না। অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছিলাম। মনে হচ্ছে লেগে গেছে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যা বলি প্রায় সময়ই তা কেমন যেন মিলে যায়। টুটুলের কপালের কাটা দাগের কথাটা হঠাৎ মনে এসেছিল। ভাগ্যিস এসেছিল।

হ্যালো, আপনি কোন হাসপাতালে আছেন ?

কেন, দেখতে আসবেন ?

বলুন না কোন হাসপাতালে।

বাসায় চলে যাচ্ছি। ওরা বুকের এক্সরে করেছে। দুটা স্টিচ দিয়েছে। বলেছে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই।

আমি এক্ষুনি বাবাকে বলছি। বাবা থানায় টেলিফোন করবেন।

আমি শব্দ করে হাসলাম।

হাসছেন কেন ?

পুলিশ কি কখনো মারের কথা স্বীকার করে ? কখনো করে না। আচ্ছা রাখি।

না না, রাখবেন না। প্লিজ রাখবেন না! প্লিজ!

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। ঠিক তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। কালবোশেখি ঝড়। কালবোশেখি ঝড় সাধারণত চৈত্র মাসেই হয়। ঝড়ের নাম হওয়া উচিত ছিল কালচৈত্র ঝড়। দেখতে দেখতে অসহ্য গরম চলে গিয়ে চারদিক হিমশীতল হয়ে গেল। নির্ঘাত আশেপাশে কোথাও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজব কী ভিজব না মনস্থির করতে পারছি না।

রিনকি বের হয়ে এল বাবার ঘর থেকে। তাকে কেমন যেন শঙ্কিত মনে হচ্ছে। আমি বললাম, রিনকি, তুই একটু বসার ঘরে যা। কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলে দিবি।

রিনকি বিস্মিত গলায় বলল, কেন ?

তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

রিনকি নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেল বাজল। আমার মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দেখা হোক দুজনের। দীর্ঘস্থায়ী হোক এই মুহূর্ত। রিনকি দরজা খুলেছে। না জানি তার কেমন লাগছে।

আমি বাদলের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। নদীটাকে আনা যায় কি না দেখা যাক। যদি আনতে পারি ওদের দুজনকে কিছুক্ষণের জন্যে এই নদী ব্যবহার করতে দেব।

হিমু ভাই!

তুই কি এখনো জেগে আছিস ?

হুঁ। রাতে আমার ঘুম হয় না।

বলিস কী!

ঘুমের ওষুধ খাই। তাতেও লাভ হয় না। দশ মিলিগ্রাম করে ফ্রিজিয়াম।

আজ খেয়েছিস ?

না। আজ সারা রাত তোমার সঙ্গে গল্প করব।

গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। আয় তোকে ঘুম পাড়িয়ে দি।

ঘুমোতে ইচ্ছা করছে না।

আজ ঘুমিয়ে থাক। কাল গল্প করব।

ঘুম আসবে না।

বললাম ঘুম এনে দিচ্ছি। নাকি তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস না ?

কী যে বলো। কেন বিশ্বাস করব না ? তুমি যা বলো তাই হয়।

বেশ, তাহলে চোখ বন্ধ কর।

করলাম।

মনে কর তুই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিস। চৈত্র মাসের কড়া রোদ। হাঁটছিস শহরের রাস্তায়।

হ্যাঁ।

এখন তুই শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিস। গ্রাম, বিকেল হচ্ছে। সূর্য নরম। রোদে কোনো তেজ নেই। ফুরফুরে বাতাস। তোর শরীর ঠান্ডা হয়ে এসেছে।

হুঁ।

হঠাৎ তোর সামনে একটা নদী পড়ল। নদীতে হাঁটুজল। কী ঠান্ডা পানি! কী পরিষ্কার! আঁজলা ভরে তুই পানি খাচ্ছিস। ঘুমে তোর চোখ জড়িয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে নদীর মধ্যেই শুয়ে পড়তে।

হুঁ।

নদীর ধারে বিশাল একটা পাকুড়গাছ। তুই সেই পাকুড়গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিস। এখন শুয়ে পড়লি। খুব নরম হালকা দূর্বাঘাসের উপরে শুয়েছিস। আর জেগে থাকতে পারছিস না। রাজ্যের ঘুম তোর চোখে।

বাদল এবার আর হুঁ বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। এই ঘুম সহজে ভাঙবে না।

কেউ যদি এটাকে কোনো অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু ভেবে বসেন তাহলে ভুল করবেন। পুরো ব্যাপারটার পেছনে কাজ করছে আমার প্রতি বাদলের অন্ধভক্তি। যে ভক্তি কোনো নিয়ম মানে না। যার শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো।

বাদল না হয়ে অন্যকেউ যদি হতো তাহলে আমার এই পদ্ধতি কাজ করত না। এই ছেলেটা আমাকে বড়ই পছন্দ করে। সে আমাকে মহাপুরুষের পর্যায়ে ফেলে রেখেছে।

আমি মহাপুরুষ না।

আমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলি। অসহায় মানুষদের দুঃখ আমাকে মোটেই অভিভূত করে না। একবার আমি একজন ঠেলাঅলার গালে চড়ও দিয়েছিলাম।

ঠেলাঅলা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকে রাস্তার ড্রেনে ফেলে দিয়েছিল। নোংরা পানিতে আমার সমস্ত শরীর মাখামাখি। সেই অবস্থাতেই উঠে এসে আমি তার গালে চড় বসালাম। বুড়ো ঠেলাঅলা বলল, ধাক্কা দিয়া না ফেললে আপনে গাড়ির তলে পড়তেন।

আসলেই তাই। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখান দিয়ে একটা পাজেরো জিপ টার্ন নিল। নতুন আসা এই জিপগুলির আচার-আচরণ ট্রাকের মতো।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, মরলে মরতাম। তাই বলে তুমি আমাকে নর্দমায় ফেলবে ?

ঠেলাঅলা করুণ গলায় বলল, মাফ কইরা দেন। আর ফেলুম না।

আমি আগের চেয়ে রাগী গলায় বললাম, মাফের কোনো প্রশ্নই আসে না। তুমি কাপড় ধোয়ার লন্ড্রির পয়সা দেবে।

গরিব মানুষ।

গরিব মানুষ ধনী মানুষ বুঝি না। বের করো কী আছে!

অবাক বিস্ময়ে বুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, কোনো কথা শুনতে চাই না। বের করো কী আছে।

মাঝে মাঝে মানুষকে তীব্র আঘাত করতে ভালো লাগে। কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় কাউকে দগ্ধ করার আনন্দের কাছে সব আনন্দই ফিকে। এই লোকটি আমার জীবন রক্ষা করেছে। সে কল্পনাও করেনি কারও জীবন রক্ষা করে সে এমন বিপদে পড়বে। যদি জানত এই অবস্থা হবে তাহলেও কি সে আমার জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করত ?

বুড়ো গামছায় মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বুড়া মানুষ, মাফ কইরা দেন।

টাকাপয়সা কিছু তোমার কাছে নেই ?

জে-না। কাইলও কোনো টিরিপ পাই নাই, আইজও পাই নাই।

যাচ্ছ কোথায় ?

রায়ের বাজার।

ঠিক আছে, আমাকে কিছুদূর তোমার গাড়িতে করে নিয়ে যাও। এতে খানিকটা হলেও উশুল হবে।

আমি তার গাড়িতে উঠে বসলাম। বৃদ্ধ আমাকে টেনে নিয়ে চলল। পেছন থেকে ঠেলছে তার নাতি কিংবা তার ছেলে। এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায় তারা দু'জনই মর্মাহত। পৃথিবী যে খুবই অকরুণ জায়গা তা তারা জানে। আমি আরও ভালোভাবে তা জানিয়ে দিচ্ছি।

রাস্তায় এক জায়গায় ঠেলাগাড়ি থামিয়ে আমি চা আনিয়ে গাড়িতে বসে বসেই খেলাম। তাকিয়ে দেখি বাচ্চাছেলেটির চোখমুখ ক্রোধ ও ঘৃণায় কালো হয়ে গেছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। আমি তার ভেতর এই ক্রোধ এবং এই ঘৃণা আরও বাড়ুক তাই চাচ্ছি। মানুষকে সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে

যাওয়া সহজ কথা না। সবাই তা পারে না। যে পারে তার ক্ষমতাও হেলাফেলা করার মতো ক্ষমতা না।

বুড়ো রাস্তার উপর বসে গামছায় হাওয়া খাচ্ছে। তার চোখে আগেকার বিস্ময়ের কিছুই আর এখন নেই। একধরনের নির্লিপ্ততা নিয়ে সে তাকিয়ে আছে।

আমি চা শেষ করে বললাম, বুড়ো মিয়া, চলো যাওয়া যাক।

আমরা আবার রওনা হলাম। মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় এসে বললাম, থামাও, গাড়ি থামাও। এখানে নামব।

আমি নামলাম। পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করলাম। আমার মানিব্যাগ সবসময়ই খালি থাকে। আজ সেখানে পাঁচশো টাকার দুটা চকচকে নোট আছে। মজিদের টিউশনির টাকা। মজিদ টাকা হাতে পাওয়া মাত্র খরচ করে ফেলে বলে তার টাকাপয়সার সবটাই থাকে আমার কাছে।

বুড়া মিয়া।

জি।

তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। কাজটা খুব ভালো করোনি। যাই হোক, করে ফেলেছ যখন, তখন তো আর কিছু করার নাই। তোমাকে ধন্যবাদ। দেখি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে কেমন লাগে। তোমাকে আমি সামান্য কিছু টাকা দিতে চাই। এই টাকাটা আমার জীবন রক্ষা করার জন্যে না। তুমি যে কষ্ট করে রোদের মধ্যে আমাকে টেনে টেনে এতদূর আনলে তার জন্যে। পাঁচশো তোমার, পাঁচশো এই ছেলেটার।

বুড়ো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি কোমল গলায় বললাম, এই রোদের মধ্যে আজ আর গাড়ি নিয়ে বের হয়ো না। বাসায় চলে যাও। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করো।

বুড়োর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

ব্যাপারটা এরকম ঘটবে আমি তাই আশা করছিলাম। বাচ্চাছেলেটির মুখে ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন এখন আর নেই। তার চোখ এখন অসম্ভব কোমল। আমি বললাম, এই তোর নাম কী রে ?

লালটু মিয়া।

প্যান্টের বোতাম লাগা বেটা। সব দেখা যাচ্ছে।

লালটু মিয়া হাত দিয়ে প্যান্টের ফাঁকা অংশ ঢাকতে ঢাকতে বলল, বোতাম নাই।

তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান। হাত সরিয়ে ফেল। আলো হাওয়া যাক।

লালটু মিয়া হাসছে।

হাসছে বুড়ো ঠেলাঅলা। তাদের কাছে এখন আমি তাদের একজন। বুড়ো বলল, আব্বাজি আসেন, তিনজনে মিল্যা চা খাই। তিয়াশ লাগছে।

পয়সা কে দেবে ? তুমি ? আমার হাতে কিন্তু আর একটা পয়সাও নেই।

বুড়ো আবার হাসল।

আমরা একটা চায়ের দোকানের দিকে রওনা হলাম। নিজেকে সেই সময় মহাপুরুষ মহাপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। আমি মহাপুরুষ নই। কিন্তু এই ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় আমি অভিনয় করি, মনে হয় ভালোই করি। সত্যিকার মহাপুরুষরাও সম্ভবত এত ভালো করতেন না।

আমি অবশ্যি এখন পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ দেখিনি। তাঁদের চিন্তাভাবনা কাজকর্ম কেমন তা-ও জানি না। মহাপুরুষদের কিছু জীবনী পড়েছি, সেইসব জীবনীও আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। টলস্টয় তেরো বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন। সেই ভয়াবহ ঘটনা তিনি স্বীকার করেছেন। আমরা সবাই তো আমাদের ভয়ঙ্কর পাপের কথা স্বীকার করি।

আমার মতে মহাপুরুষ হচ্ছে এমন একজন যাকে পৃথিবীর কোনো মালিন্য স্পর্শ করেনি। এমন কেউ সত্যি সত্যি জন্মেছে এই পৃথিবীতে ?

ঘুমোতে চেষ্টা করছি। ঘুমোতে পারছি না। অসহ্য গরমে ঘুমোতে আমার কষ্ট হয় না, কিন্তু আজকের এই ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুম আসছে না। শীত শীত লাগছে। খালিগায়ে থাকার জন্যে লাগছে। খালিগায়ে থাকার কারণ আমার পাঞ্জাবি এখন বাদলের গায়ে।

শুয়ে শুয়ে ছেলেবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করছি। বিশেষ কোনো কারণে নয়। ঘুমুবার আগে কিছু একটা নিয়ে ভাবতে হয় বলেই ভাবা।

৩

আমার শৈশব যাদের সঙ্গে কেটেছে তারা কেমন ?

জন্মের সময় আমার মা মারা যান, কাজেই মা'র কথা কিছুই জানি না। তিনি দেখতে কেমন তাও জানি না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তাঁর কোনো ছবি নেই।

বাবা মারা যান আমার ন-বছর বয়সে। তাঁর কথাও তেমন মনে নেই। তাঁর কথা মনে পড়লেই একটা উদ্বিগ্ন মুখ মনে আসে। সেই মুখে বড় বড় দুটি চোখ। ভারী চশমায় ঢাকা বলে সেই চোখের ভাবও ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় পানির ভেতর থেকে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবার উদ্বিগ্ন গলা, কী-রে তোর ব্যাপারটা কী বল তো ? যত্ন হচ্ছে না ? আমি তো প্রাণপণ করছি। অবশ্যি ছেলে মানুষ করার কায়দাকানুনও আমি জানি না। কী যে ঝামেলায় পড়লাম। তোর অসুবিধাটা কী বল তো ? পেট ব্যথা করছে ?

বাবার বোধহয় ধারণা ছিল শিশুদের একটি মাত্র সমস্যা—পেট ব্যথা। তারা যখন মন খারাপ করে বসে থাকে তখন বুঝতে হবে তার পেট ব্যথা করছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে কোনো শিশু যদি জেগে উঠে কাঁদতে থাকে তখন বুঝতে হবে তার পেটে ব্যথা।

বাবার কাছ থেকে কত অসংখ্যবার যে শুনেছি—কী-রে হিমু, তোর কি পেট ব্যথা নাকি ? মুখটা এমন কালো কেন ? কোন জায়গাটায় ব্যথা দেখি।

বাবা যে একজন পাগল ধরনের মানুষ এটা বুঝতে আমার তেমন দেরি হয়নি। শিশুদের বোধশক্তি ভালো। পাগল না হলে নিজের ছেলের নাম কেউ হিমালয় রাখে ?

স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। হেডস্যার গম্ভীর গলায় বললেন, ছেলের নাম কী ? বললেন—হিমালয় ?

জি।

আহমদ বা মোহাম্মদ এইসব কিছু আছে ?

জি-না, শুধুই হিমালয়।

হেডস্যার অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, ও আচ্ছা!

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, নদীর নামে মানুষের নাম হয়, ফুলের নামে হয়, গাছের নামে হয়, হিমালয়ের নামে নাম হতে দোষ কী ?

হিমালয় নাম রাখার বিশেষ কোনো তাৎপর্য কি আছে ?

অবশ্যই আছে—যাতে এই ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মতো বড় হয় সেইজন্যেই এই নাম।

তাহলে আকাশ নাম রাখলেন না কেন ? আকাশ তো আরও বড়।

বড় হলেও তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। হিমালয়কে স্পর্শ করা যায়।

কিছু মনে করবেন না, এই নামে স্কুলে ছেলে ভর্তি করা যাবে না।

এমন কোনো আইন আছে যে হিমালয় নাম রাখলে সেই ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না ?

আইন টাইন আমি জানি না। এই ছেলেকে আমি স্কুলে নেব না।

কেন ?

সিট নেই।

আগে তো বললেন সিট আছে।

এখন নেই।

শিক্ষক হয়ে মিথ্যা কথা বলছেন—তাহলে তো এখানে কিছুতেই ছাত্র ভর্তি করা উচিত না। মিথ্যা কথা বলা শিখবে।

খুব ভালো কথা। তাহলে এখন যান।

এই দীর্ঘ কথোপকথনের কিছুই আমার মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। বাবা প্রতিটি ঘটনা লিখে রেখে গেছেন বলে বলতে পারলাম। বাবার মধ্যে গবেষণাধর্মী একটা স্বভাব ছিল। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে গেছেন।

তাঁর বিদ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন, আর ফিরে যাননি।

জীবিকার জন্যে ঠিক কী কী করতেন তা পরিষ্কার নয়। জ্যোতিষবিদ্যা, সমুদ্রজ্ঞান, লক্ষণ বিচার এই জাতীয় বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয় মানুষের হাতটাত দেখতেন। একটা প্রেসের সঙ্গেও সম্ভবত যুক্ত ছিলেন। কয়েকটা নোটবইও লিখেছিলেন। নোটস অন প্রবেশিকা সমাজবিদ্যা—এরকম একটা বই।

তাঁর পরিবারের কারও সঙ্গে তাঁর কোনোই যোগাযোগ ছিল না। তাঁদের সম্পর্কে আমি জানতে পারি বাবার মৃত্যুর পর। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাবা তাঁর বড়বোনকে একটি চিঠি লিখে জানান যে তাঁর মৃত্যু হলে আমাকে যেন আমার মামার বাড়ি পাঠানো হয়। এটাই তাঁর নির্দেশ। এর অন্যথা যেন না হয়।

চিঠি পাওয়ার পরপরই বাবার দিকের আত্মীয়স্বজনে আমাদের ছোট বাসা ভর্তি হয়ে যায়। আমার দাদাজানকে তখনই প্রথম দেখি। সুঠাম স্বাস্থ্যের টকটকে গৌরবর্ণের একজন মানুষ। চেহারার কোথায় যেন জমিদার-জমিদার একটা ভাব আছে। তিনি আমার মরণাপন্ন বাবার হাত ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমি বাবা তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে, আর না।

আমার বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা যাক ক্ষমা করলাম। কিন্তু আমি চাই না আমার ছেলে আপনাদের সঙ্গে মানুষ হোক। ও যাবে তার মামাদের কাছে।

তার মামারা কি আমাদের চেয়ে ভালো ?

না, ওরা পিশাচশ্রেণীর। ওদের সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু শিখবে।

আমার দাদাজান এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। বৃদ্ধ একজন জমিদার ধরনের মানুষ কাঁদছে—এই দৃশ্যটি সত্যি অদ্ভুত। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুই এক পাগল, তোর ছেলেটাকেও তুই পাগল বানাতে চাস ?

এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

আমাদের বড়লোক আত্মীয়স্বজনরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের বাসার সাজসজ্জা দেখতে থাকেন। এর ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে আমার দাদাজানের কিছু কথাবার্তা হলো। যেমন—

ঢাকায় কতদিন ধরে আছিস ?

প্রায় তিন বছর।

এর আগে কোথায় ছিলি ?

তা দিয়ে আপনার দরকার কী ?

তোর মা যখন অসুস্থ তখন সব খবরের কাগজে তোর ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

আমার বড় ফুপু এই পর্যায়ে হাত ইশারা করে আমাকে ডাকলেন। আদুরে গলায় বললেন, খোকা, তোমার নাম কী ?

আমি বললাম, হিমালয়।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, ছেলের নাম কি সত্যি সত্যি হিমালয় রেখেছিস ?

হুঁ।

বাবার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁকে বড় একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো। আপত্তি করার মতো অবস্থাও তাঁর ছিল না। কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দু'একটা ছোটখাটো বাক্য বলতেও তাঁর অসম্ভব কষ্ট হতো। তাঁকে বাইরে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হবে এমন কথা শোনা যেতে লাগল। বাবা তাঁদের সেই সুযোগ দিলেন না। ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার ন'দিনের দিন মারা গেলেন।

সজ্ঞানে মৃত্যু যাকে বলে। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও টনটনে জ্ঞান ছিল। আমাকে বললেন, তোমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছি। সেগুলি মন দিয়ে পড়বে। তবে লেখাটা অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ করবার সময় হলো না। আমার দিকের কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না এবং তাদের সাহায্য নেবে না। তবে ষোল বছর পরে তুমি যদি মনে করো আমার সিদ্ধান্ত ভুল, তখন তুমি নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এর আগ পর্যন্ত মামাদের সঙ্গে থাকবে। মনে রাখবে তোমার মামারা পিশাচশ্রেণীর। পিশাচশ্রেণীর মানুষদের সংস্পর্শে না এলে, মানুষের সৎ গুণ সম্পর্কে ধারণা হবে না।

ডাক্তার সাহেব এই পর্যায়ে বললেন, আপনি দয়া করে চুপ করুন। ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

বাবা শীতল গলায় বললেন, প্রতিপদ শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ায় আমার মৃত্যু হওয়ার কথা। কাজেই আমাকে বিরক্ত করবেন না। সবচেয়ে জরুরি কথাটাই আমার ছেলেকে বলা হয়নি—শোন হিমু, কোনোরকম উচ্চাশা রাখবি না। টাকাপয়সা করতে হবে, বড় হতে হবে, এইসব নিয়ে মোটেও ভাববি না। সমস্ত কষ্টের মূলে আছে আমাদের উচ্চাশা। আমার উচ্চাশা ছিল বলে প্রথম দিকে খুবই কষ্ট পেয়েছি। শেষের দিকে উচ্চাশা ত্যাগ করতে পেরেছিলাম, তাই খানিকটা আনন্দে ছিলাম। আনন্দে থাকাটাই বড় কথা। সবসময় আনন্দে থাকার চেষ্টা করবি।

বাবা কথা বলতে বলতেই একটু থামলেন, হঠাৎ গভীর আগ্রহ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিকে তাকালেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, ও আচ্ছা, তাহলে এর নামই মৃত্যু। এটা মন্দ কী ? মৃত্যু তাহলে খুব ভয়াবহ নয়।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবার মৃত্যু হলো।

আমি কিছুদিন আমার দাদাজানের সঙ্গে থাকলাম। তিনি আমার প্রসঙ্গে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন।

আরে এটা কেমন ছেলে! বাবা মরে গেল, একফোঁটা চোখের পানি নেই। এ তো দেখি তার বাপের চেয়ে পাগল হয়েছে। এই দিকে আয়। বাপ-মা মারা গেলে চোখের পানি ফেলতে হয়।

আমি শীতল গলায় বললাম, আমাকে তুই-তুই করে বলবেন না।

তিনি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দাদাজানের বাড়িটা বিশাল। সেই বিশাল বাড়ির দোতলায় একটা ঘর আমাকে দেওয়া হলো। সেই ঘরে এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রাইভেট টিউটর থাকেন। তাঁর নাম কিসমত মোল্লা।

তিনি যখন শুনলেন আমি কোনো স্কুলে পড়ি না, এতদিন বাবার কাছে পড়েছি, তখন একবারে আকাশ থেকে পড়লেন।

কী পড়েছ বাবার কাছে ?

ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল আর নীতিশাস্ত্র।

নীতিশাস্ত্রটা কী ?

কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় এইসব।

কী বলছ কিছুই তো বুঝলাম না।

যেমন ধরুন মিথ্যা। মিথ্যা বলা মন্দ। তবে আনন্দের জন্যে মিথ্যা বলায় অন্যায় নেই। মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি।

বলছ কী এসব! বুঝিয়ে বলো।

যেমন ধরুন গল্প-উপন্যাস। এসব মিথ্যা। কিন্তু এসব মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি।

মাস্টার সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। নিজেকে অতি দ্রুত সামলে নিয়ে বললেন, অমাবস্যা ইংরেজি কী, জানো ?

জানি। অমাবস্যা হলো নিউমুন। বলে নিউমুন, কিন্তু আকাশে তখন চাঁদ থাকে না।

মৃন্ময় শব্দের মানে কী ?

মৃন্ময় হলো মাটির তৈরি।

মাস্টার সাহেব আমার কথাবার্তায় অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। কিন্তু বাড়ির অন্য কেউ হলো না। আমার দাদাজান ক্রমাগত বলতে লাগলেন, তোর বাবা ছিল পাগল। উন্মাদ। ও যেসব শিখিয়েছে সব ভুলে যা। সব নতুন করে শিখবি। তোকে ভালো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেব। আর শোন, তোর নাম দিলাম চৌধুরী ইমতিয়াজ। মনে থাকবে ?

দাদাজান বাড়িতে ঘোষণা করে দিলেন—একে কেউ হিমালয় বা হিমু, কিছুই ডাকতে পারবে না। এর নাম ইমতিয়াজ চৌধুরী। ডাক নাম টুটুল। মনে থাকবে ? এই ছেলের মাথার ভেতর এই নাম দুটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। সারা দিনে খুব কম করে হলেও একে পঁচিশবার চৌধুরী ইমতিয়াজ এবং পঁচিশবার টুটুল ডাকতে হবে, Its an order.

আমাকে সত্যি সত্যি একটা ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। স্কুলের পোশাক বানানো হলো।

প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ময়লা পায়জামা-পাঞ্জাবির উপর একটা কোট চড়িয়ে অত্যন্ত রুগ্ন এক লোক বসার ঘরে বসে আছে। তার হাতে চকচকে নতুন একটা ছাতা, মনে হচ্ছে আজই কেনা হয়েছে। ভদ্রলোকের মুখভর্তি পান। অ্যাশট্রেতে সেই পানের পিক ফেলছেন। তাঁর বসে থাকার ভঙ্গি, পান খাওয়ার ভঙ্গি এবং পানের পিক ফেলার ভঙ্গিতে কোনো সংকোচ নেই। যেন এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর খুব ভালো পরিচয়। যেন এটা তাঁর নিজেরই ঘরবাড়ি।

আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই বললেন, বাবা হিমালয়। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমি তোমার বড়মামা। আমাকে সালাম করো।

দাদাজান গম্ভীর গলায় বললেন, আমি তো আপনাকে বলেছি তাকে নিতে পারবেন না। সে গ্রামে গিয়ে কী করবে ? সে এইখানেই থাকবে। পড়াশোনা করবে। তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

আমার বড়মামা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। যেন এরকম হাস্যকর কথা তিনি আগে কখনো শোনেননি।

দেখেন তালুই সাহেব। ছেলের বাবা পত্রমারফত এই অধিকার দিয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা দিতে না চান, বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। কোর্টে ফয়সালা হবে। উপায় কী ? যদিও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা কোনো কাজের কথা না।

দাদাজানের মুখে কোনো কথা এল না। বড়মামা অ্যাশট্রেতে আর একবার পানের পিক ফেলে বললেন, ছেলের বাবার ইচ্ছামতোই কাজ হোক। খামাখা আপত্তি করছেন কেন ? ছেলের খরচাপাতির জন্যে মাসে মাসে টাকা দিবেন। তাহলেই তো হয়।

আপনি কী করেন ?

তেমন কিছু না। সামান্য বিষয়সম্পত্তি আছে। টুকটাক ব্যবসা আছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম। এইবার জিততে পারি নাই। সতের ভোটে ঠগ খেয়েছি। যদি অনুমতি দেন একটু বেয়াদবি করি ?

কী বেয়াদবি ?

একটা সিগারেট ধরাই। এমন নেশা হয়েছে না-খেলে দমটা বন্ধ হয়ে আসে।

বড়মামা অনুমতির অপেক্ষা না করেই সিগারেট ধরালেন।

দাদাজান বললেন, আপনি একে নিতে চাচ্ছেন কারণ আপনার ধারণা একে নিলে মাসে মাসে মোটা টাকা পাবেন। তাই না ?

বড়মামা অত্যন্ত বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, এই হাতের পাঁচ আঙুলের ভিতর দিয়া অনেক টাকা গেছে, অনেক টাকা আসছে। টাকা আমার কাছে কিছুই না। আসছি রক্তের টানে। রক্তের টান কঠিন জিনিস তালুই সাহেব। এই যে বোন বিয়ে দিলাম তারপরে আর কোনো খোঁজ নাই। কী যে যন্ত্রণা। কোনো চিঠিপত্র নাই। শুনি আজ এই জায়গায়, কাল শুনি ভিন্ন জায়গায়। কী যে যন্ত্রণা। যাক, হিমালয় বাবাকে দেখে মনটা শান্ত হয়েছে। তা বাবা, তোমার নাম কি সত্যি হিমালয় ?

আমি কিছু বলার আগেই দাদাজান বললেন, না, ওর নাম চৌধুরী ইমতিয়াজ।

চৌধুরী আগে কী জন্যে ? চৌধুরী থাকবে পিছে। আগে ঘোড়া তারপর গাড়ি। কি বলেন তালুই সাব ?

দাদাজান কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখে-মুখে ক্রোধ ও ঘৃণা।

চা এবং কেক এনে কাজের ছেলে সামনে রাখল। বড় মামার মুখে পান। সেই অবস্থাতেই চায়ে চুমুক দিলেন। কেক হাতে নিলেন।

দাদাজান বললেন, আমার ছেলে আপনার বোনের খোঁজ পেল কী করে ?

সেটা তালুই সাব, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হতো। আফসোস সে জীবিত নাই। আমরা আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করি নাই। সে বন্ধুর সাথে আমাদের অঞ্চলে এসেছিল, তারপরে কেমনে কেমনে হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী তালুই সাব, বিয়ের পর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বোনের খোঁজ নাই। বোন-জামাইয়েরও খোঁজ নাই। নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে নামকাওয়াস্তে বিয়ে করে নিয়ে গেছে, পাচার করে দেবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান, তারপর ধরেন মিডল ইস্ট। এইসব জায়গায় মেয়েকে ভাড়া খাটাবে।

বাচ্চাছেলের সামনে এরকম কুৎসিত কথা বলবেন না।

কুৎসিত কথা না। এগুলি সত্যিকথা। এইরকম পার্টি আছে।

সত্যিকথা সবসময় বলা যায় না।

আমার কাছে এটা পাবেন না তালুই সাব। সত্য কথা আমি বলবই। ভালো লাগুক আর না লাগুক।

তাই নাকি ?

জি। আর হিমালয় বাবাকে নিয়ে যাব। পরশু সকালে এসে নিয়ে যাব। তৈরি থাকতে বলবেন। মামলার তদবিরে এসেছি। দুটা দিন লাগবে।

এই ছেলেকে আমি আপনার সঙ্গে দেব না।

এইসব বলবেন না তালুই সাব। আত্মীয়ের মধ্যে গণ্ডগোল আমার পছন্দ হয় না। আইনের আশ্রয় নিলে আপনারও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। আর্থিক ক্ষতি, মানসিক ক্ষতি। কোর্ট ফি এখন বাড়ায়ে করেছে তিনগুণ। গরিব মানুষ যে একটু মামলা-মোকদ্দমা করবে সে উপায় রাখে নাই। বাবা হিমালয়, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও না?

চাই।

এই তো বাপের ব্যাটা। আজ তাহলে উঠি তালুই সাব। বেয়াদবি যদি কিছু করে থাকি মাফ করে দিবেন। আপনার পায়ে ধরি।

বড় মামা সত্যি সত্যি পা ধরতে এগিয়ে গেলেন। দাদাজান চমকে সরে গেলেন।

দু'দিন পর আমি মামার সঙ্গে রওনা হলাম।

গন্তব্য ময়মনসিংহের হিরণপুর।

আমার বাবা অনেকবারই বলেছেন, আমার মামারা পিশাচশ্রেণীর। কাজেই তাঁদের সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা মনের মধ্যে ছিল। আমি বড়মামা এবং অন্য দুই মামার আচার-আচরণে মোটেই অবাক হলাম না।

মামার বাড়ি উপস্থিত হওয়ার তৃতীয় দিনের একটা ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনা থেকে মামাদের মানসিকতার একটা আঁচ পাওয়া যাবে।

বড়মামার বাড়িতে তিনটা বিড়াল ছিল। এরা খুবই উপদ্রব করত। বড়মামার নির্দেশে বিড়াল তিনটাকে ধরা হলো। তিনি বললেন, হাদিসে আছে বিড়াল উপদ্রব করলে আল্লাহর নামে এদের জবেহ করা যায়। তাতে দোষ হয় না। দেখি বড় ছুরিটা বার করো। এই কাজ তো আর কেউ করবে না, আমাকে করতে হবে। উপায় কী?

মামা নিজেই উঠানে তিনটা বিড়ালকে জবাই করলেন। এর মধ্যে একটা ছিল গর্ভবতী।

ঐ বাড়িতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। তিন মামা একসঙ্গে স্কুলঘরের মতো লম্বা একটি টিনের ঘরে থাকতেন। পুরো বাড়িতে ছেলেপুলের বিশাল দল। তাদের জগৎ ছিল ভিন্ন। একসঙ্গে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া, একসঙ্গে সন্ধেবেলা পড়তে বসা, একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া। জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলা, গোল্লাছুট খেলা। খাওয়াও হতো একসঙ্গে। এক মামি ভাত দিয়ে যাচ্ছেন, আরেক মামি দিচ্ছেন একহাতা করে তরকারি, দুই হাতা ডাল। চামচে যা উঠে আসে তাই। কেউ বলতে পারবে না আমাকে এটা দাও ওটা দাও। বললেই চামচের বাড়ি।

আমাদের মধ্যে মারামারি লেগেই ছিল। এ ওকে মারছে। সে তাকে মারছে। সে-সব নিয়ে কোনো নালিশও হচ্ছে না। নালিশ দেওয়ায় বিপদ আছে। একজন নালিশ দিল—কার বিরুদ্ধে নালিশ, কী সমাচার ভালোমতো শোনাই হলো না। হাতের কাছে যে কয়েকজনকে পাওয়া গেল পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলা হলো। সত্যিকার অপরাধী হয়তো শাস্তিও পেল না।

আমি এই বিশাল দলের সঙ্গে অবলীলায় মিশে গেলাম। সীমাহীন স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা সচরাচর শিশুরা পায় না।

আমরা কী করছি না-করছি বড়রা তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাত না।

একজনের হয়তো জ্বর হয়েছে। সে বিছানায় শুয়ে কুঁ কুঁ করছে। কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। নিতান্ত বাড়াবাড়ি না হলে ডাক্তার নেই। মাসে একবার নাপিত এসে সবকটা ছেলের মাথা প্রায় মুড়িয়ে দিয়ে ধান নিয়ে চলে যাচ্ছে। কাপড়-জামারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এ ওরটা পরছে। ও তারটা পরছে।

মামাদের বাড়ি থেকেই আমি মেট্রিক পাস করি। যে-বছর মেট্রিক পাস করি, বড় মামা সেই বছরই মারা যান। তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। বলতে গেলে গ্রামের সবাই ছিল তাঁর শত্রু।

এক অন্ধকার বৃষ্টির রাতে একজন কেউ মাছ মারবার কোঁচ দিয়ে বড় মামাকে গেঁথে ফেলে। বিশাল কোঁচ। মামার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যায়। কোঁচের খানিকটা পিঠ ছেঁদা করে বের হয়ে থাকে।

উঠানে চাটাই পেতে মামাকে শুইয়ে রাখা হয়। দৃশ্য দেখার জন্যে সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে।

তাঁকে সদরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা হলো। মামা ঠান্ডা গলায় বললেন, এতক্ষণ বাঁচব না। তোমরা আমাকে থানায় নিয়ে যাও। মরার আগে আমি কারা এই কাজ করেছে বলে যেতে চাই।

মামা কাউকেই দেখেননি, তবু তিনি মৃত্যুর আগে আগে থানায় ওসির কাছে চারজনের নাম বললেন। তিনি বললেন, তাঁর হাতে টর্চ ছিল। তিনি টর্চ ফেলে ফেলে এদের দেখেছেন।

ওসি সাহেব মামার দেওয়া জবানবন্দি লিখতে লিখতে বললেন—ভাই সাহেব, এই কাজটা করবেন না। ডেথ বেড কনফেশন খুব শক্ত জিনিস। শুধুমাত্র এর উপরই কোর্ট রায় দিয়ে দেবে। নির্দোষ কিছু মানুষকে আপনি জড়াচ্ছেন। এদের ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন হয়ে যাবে।

মামা বললেন, যা বলছি সবই সত্যি। কোরান মজিদ আনেন। আমি কোরান মজিদে হাত দিয়া বলি...।

ওসি সাহেব বললেন, তার দরকার হবে না। নিন, এখানে সই করুন। এটা আপনার জবানবন্দি।

মামা সই করলেন। মারা গেলেন থানাতেই। মরবার আগে মেজ মামাকে কানে কানে বললেন, এক ধাক্কায় চার শত্রু শেষ। কাজটা মন্দ হয় নাই।

চার শত্রু শেষ করার গাঢ় আনন্দ নিয়ে মামা মারা গেলেন। তবে মৃত্যুর আগে আগে মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। তাঁকে খুবই আনন্দিত মনে হলো।

বড় মামি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন। তাকে ডেকে বললেন, তওবা করে ফেলেছি। এখন আর চিন্তা নাই। সব পাপ মাপ হয়ে গেল। সরাসরি বেহেশতে দাখিল হব। খামাখা কান্দো কেন ? তওবা সময়মতো করতে না পারলে অসুবিধা ছিল। আল্লাহপাকের অসীম দয়া। সময় পাওয়া গেছে। কান্দাকাটি না করে আমার কানের কাছে দরুদ পড়ো। কোরান মজিদ পাঠ করো।

মামার মৃত্যুর পর আমি ঢাকায় চলে এলাম। নতুন জীবন শুরু হলো বড়ফুপুর সঙ্গে।

৪

প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখি বড়ফুপু। পাশের বিছানা খালি। বাদল নেই। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে জিনিসটা জানতে ইচ্ছা করে তা হচ্ছে—ক'টা বাজে ?

বড়ফুপুকে এই প্রশ্ন করব কি না ভাবছি, তখন তিনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, কেলেঙ্কারি হয়েছে।

কী কেলেঙ্কারি ?

মানুষকে মুখ দেখাতে পারব না রে।

আমি বিছানায় বসতে বসতে বললাম, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রাতে এসেছিল, তারপর আর রাতে ফিরে যায়নি—তাই তো ?

তুই জানলি কী করে ?

অনুমান করছি।

আমি সকালে একতলায় নেমে দেখি ঐ ছেলে আর রিনকি। ছেলে নাকি রাতে তোর ফুপার অসুখের খবর পেয়ে এসেছিল। ঝড়বৃষ্টি দেখে আর ফিরে যায়নি। আর ঐ বদ মেয়ে সারা রাত ঐ ছেলের সঙ্গে গল্প করেছে।

বলো কী!

আমার তো হাত ঘামছে। কীরকম বদ মেয়ে চিন্তা করে দেখ। মেয়ের কত বড় সাহস। ঐ ছেলে এসেছে ভালো কথা। আমাকে তো খবরটা দিবি ?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ঐ ছেলেরই বা কেমন আক্কেল, রাতদুপুরে এল কী জন্যে ?

হ্যাঁ, দেখ না কাণ্ড। বিয়ে হয়নি, কিছু না, শুধু বিয়ের কথা হয়েছে—এর মধ্যে নাকি সারা রাত জেগে গল্প করতে হবে। রাত কি চলে গেছে নাকি ?

খুবই সত্য কথা।

এখন ধর কোনো কারণে বিয়ে যদি ভেঙে যায় তারপর আমি মুখ দেখাব কীভাবে ?

আমি এক্ষুনি নিচে যাচ্ছি ফুপু, ঐ ফাজিল ছেলের গালে ঠাস করে একটা চড় মারব। তারপর দ্বিতীয় চড় রিনকির গালে। মেয়ে বলে তাকে ক্ষমা করার কোনো অর্থ হয় না।

তুই সবসময় অদ্ভুত কথাবার্তা বলিস কেন ? ঐ ছেলের গালে তুই চড় মারতে পারবি ?

কেন পারব না ?

যে ছেলে দু'দিন পর এ বাড়ির জামাই হচ্ছে তার গালে তুই চড় মারতে চাস ? তোর কাছে এলাম একটা পরামর্শের জন্যে।

আজই ওদের বিয়ে লাগিয়ে দাও।

আজই বিয়ে লাগিয়ে দেব ?

হুঁ। কাজি ডেকে এনে বিয়ে পড়িয়ে দাও। ঝামেলা চুকে যাক। তারপর ওরা যত ইচ্ছা রাত জেগে গল্প করুক। আসল অনুষ্ঠান পরে হবে। বিয়েটা হয়ে যাক।

ফুপু নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হচ্ছে আমার কথা তাঁর মনে ধরেছে। আমি বললাম, তুমি চাইলে আমি ছেলেকে বলতে পারি।

ওরা আবার ভাববে না তো আমরা চাপ দিচ্ছি ?

চাপাচাপির কী আছে ? ছেলে এমন কী রসগোল্লা! মার্বেলের মতো সাইজ। বিয়ে যে দিচ্ছি এতেই তো তার ধন্য হওয়া উচিত। তার তিনপুরুষের ভাগ্য যে আমার...

ফুপু বিরক্ত স্বরে বললেন, ছেলে এমন কী খারাপ ?

খারাপ তা তো বলছি না। একটু শর্ট। তা পুরুষমানুষের শর্টে কিছু আসে যায় না। পুরুষ হচ্ছে সোনার চামচ। সোনার চামচ বাঁকাও ভালো।

আজই বিয়ের ব্যাপারে ছেলে কি রাজি হবে ?

দেখি কথা বলে। আমার ধারণা হবে।

তোর কথা তো সবসময় আবার মিলে যায়। একটু দেখ কথা বলে।

আমি আমার পাঞ্জাবি খুঁজে পেলাম না। ফুপু বললেন, বাদল ভোরবেলায় ঐ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বের হয়েছে।

আমি বাদলের একটা শার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নামতেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লাজুক গলায় বললেন, হিমু ভাই, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। খুব লজ্জা লাগছে অবশ্যি।

বলে ফেলো।

রিনকির খুব শখ পূর্ণিমারাতে সমুদ্র কেমন দেখায় সেটা দেখবে। দুদিন পরেই পূর্ণিমা।

ও আচ্ছা, দুদিন পরেই পূর্ণিমা তা তো জানতাম না।

মানে কথার কথা বলছি, ধরুন আজ যদি বিয়েটা হয়ে যায়—তাহলে আজ রাতের ট্রেনে রিনকিকে নিয়ে কক্সবাজারের দিকে রওনা হতে পারি। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাটা শেষ করে রাখা আর কী। পরে একটা রিসিপশানের ব্যবস্থা না হয় হবে।

তোমার দিকের আত্মীয়স্বজনরা...

ওদের আমি ম্যানেজ করব। আপনি যদি শুধু এদের বুঝিয়েসুঝিয়ে একটু রাজি করান— মানে রিনকি বেচারির দীর্ঘদিনের শখ। ওর জন্যেই খারাপ লাগছে।

না না, তা তো বটেই। দীর্ঘদিনের শখ থাকলে তা তো মেটানোই উচিত। রাতের টিকিট পাওয়া যাবে তো? পুরো ফার্স্টক্লাস বার্থ রিজার্ভ করতে হবে।

রেলওয়েতে আমার লোক আছে হিমু ভাই।

তাহলে তুমি বরং ঐটাই আগে দেখো। আমি এদিকটা ম্যানেজ করছি।

আনন্দে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চোখ চকচক করছে। সে গাঢ় গলায় বলল, রিনকি আমাকে বলেছিল—হিমু ভাইকে বললে উনি ম্যানেজ করে দিবেন। আপনি যে সত্যি সত্যি করবেন বুঝিনি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কী নিয়ে গল্প করলে সারা রাত?

গল্প আর কী করব বলুন। রিনকি এমন অভিমানী—কিছু বললেই তার চোখে পানি এসে যায়। সুপার সেনসেটিভ মেয়ে। কথায় কথায় একসময় বলেছিলাম যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হেনা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল। এতেই রিনকি কেঁদে অস্থির। আমাকে বলেছে আর কোনোদিন যদি আমি ঐ মেয়ের নাম মুখে আনি সে নাকি সুইসাইড করবে। এরকম মেয়ে নিয়ে বাস করা কঠিন হবে। খুবই দুশ্চিন্তা লাগছে হিমু ভাই।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে কিন্তু মোটেও চিন্তিত মনে হলো না। বরং খুবই আনন্দিত মনে হলো। আমার ধারণা প্রায়ই সে হেনার কথা বলে রিনকিকে কাঁদাবে। কাঁদিয়ে আনন্দ পাবে। রিনকিও কেঁদে আনন্দ পাবে। ওদের এখন আনন্দেরই সময়।

আমি বললাম, কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে বলো। তার চেয়ে যা জরুরি তা হচ্ছে টিকিটের ব্যবস্থা। আমি ফুপা-ফুপুকে রাজি করাচ্ছি।

রাজি হয়েছে কি না জেনে গেলে ভালো হতো না হিমু ভাই?

আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি, তুমি কি এটা জানো না?

জানি।

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—তোমরা দুজন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছ। অসম্ভব সুন্দর জোছনা হয়েছে। সমুদ্রের পানি রূপার মতো চকচক করছে আর তোমরা...

আমরা কী ?

থাক, সবটা বললে রহস্য শেষ হয়ে যাবে।

আপনি একজন অসাধারণ মানুষ হিমু ভাই। অসাধারণ।

আমি এবং বাদল ওদের এগারোটার ট্রেনে তুলে দিতে এলাম। ফুপা-ফুপু এলেন না। ফুপার শরীর খারাপ করেছে।

ট্রেন ছাড়বার আগমুহূর্তে রিনকি বলল, হিমু ভাই, আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছে।

কিসের ভয় ?

এত আনন্দ লাগছে। আনন্দের পরই তো কষ্ট আসে। যদি খুব কষ্ট আসে ?

কষ্ট আসবে না। তোদের জীবন হবে আনন্দময়। তোদের আমি আমার ময়ূরাক্ষী নদী ব্যবহার করতে দিয়েছি। এই নদী যারা ব্যবহার করে তাদের জীবনে কষ্ট আসে না।

তুমি কী যে পাগলের মতো কথা মাঝে মাঝে বলো। কিসের নদী ?

আছে একটা নদী। আমি আমার অতিপ্রিয় মানুষদের শুধু সেই নদী ব্যবহার করতে দিই। অন্য কাউকে দিই না। তুই আমার অতি প্রিয় একজন। যদিও খানিকটা বোকা। তবু প্রিয়।

তুমি একটা পাগল। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার।

ট্রেন নড়ে উঠল। আমি জানালার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগলাম। রিনকির আনন্দময় মুখ দেখতে এত ভালো লাগছে। রিনকির চোখে এখন জল। সে কাঁদছে। আমি মনে মনে বললাম—হে ঈশ্বর, এই কান্নাই রিনকি নামের মেয়েটির জীবনের শেষ কান্না হোক।

৫

প্রায় দশদিন পর আস্তানায় ফিরলাম।

আস্তানা মানে মজিদের মেস। দ্য নিউ বোর্ডিং হাউজ।

মজিদ ঐ বোর্ডিং হাউজে দীর্ঘদিন ধরে আছে। কলেজে যখন পড়তে আসে তখন এই অন্ধ গহ্বর খুঁজে বের করে। নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর। সেই ঘরে একটা চৌকি, একটা টেবিল। চেয়ারের ব্যবস্থা নেই, কারণ চেয়ার পাতার জায়গা নেই।

মজিদের চৌকিতে একটা শীতলপাটি শীত-গ্রীষ্ম সবসময় পাতা থাকে। মশারিও খাটানো থাকে। প্রতিদিন মশারি তোলা এবং মশারি ফেলার সময় মজিদের নেই। তাকে সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নানান ধান্ধায় ঘুরতে হয়। প্রতি মাসে তিনটি মানিঅর্ডার করতে হয়। একটি দেশের বাড়িতে, একটা তার বিধবা বড়বোনের কাছে এবং তৃতীয়টা আবু কামাল বলে এক ভদ্রলোককে। এই ভদ্রলোক মজিদের কোনো আত্মীয় নন। তাকে প্রতিমাসে কেন টাকা পাঠাতে হয় তা মজিদ কখনো বলেনি। জিজ্ঞেস করলে হাসে। এইসব রহস্যের কারণেই মজিদকে আমার বেশ পছন্দ।

আমাকে মজিদের পছন্দ কি না আমি জানি না। সে মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনাগ্রহ নিয়ে মেশে। কোনোকিছুতেই অবাক বা বিস্ময় প্রকাশ করে না। সম্ভবত শৈশবেই তার বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় তাকে একবার একটা ম্যাজিক-শো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাচ এক জাদুকর জার্মান কালচারাল সেন্টারে জাদু দেখাচ্ছেন। বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে। একসময়ে তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে করাত দিয়ে কেটে দু-টুকরা করে ফেললেন। ভয়াবহ ব্যাপার। মহিলা দর্শকরা ভয়ে উঁ উঁ জাতীয় শব্দ করছে। তাকিয়ে দেখি মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষীণ নাকডাকার শব্দও আসছে। আমি চিমটি কেটে তার ঘুম ভাঙালাম। সে বলল, কী হয়েছে ?

আমি বললাম, করাত দিয়ে মানুষ কাটা হচ্ছে।

মজিদ হাই তুলে বলল, ও আচ্ছা।

সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। অথচ আমি অনেক ঝামেলা করে দুটা টিকিট জোগাড় করেছি যাতে একবার অন্তত সে বিস্মিত হয়। আমার ধারণা তাজমহলের সামনেও তাকে যদি নিয়ে যাওয়া হয় সে হাই চাপতে চাপতে বলবে, ও আচ্ছা, এইটাই তাজমহল। ভালোই তো, মন্দ কী।

মজিদকে আমার একবার তাজমহল দেখানোর ইচ্ছা। শুধু দেখার জন্যে—সত্যি সত্যি সে কী করে। বা আসলেই সে কিছু করে কি না।

দশদিন পর মজিদের সঙ্গে আমার দেখা। সে একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। তারপরই পত্রিকা পড়তে লাগল। বছরখানেক আগের বাসি একটা ম্যাগাজিন। একবার জিজ্ঞেসও করল না, আমার খবর কী। আমি কেমন। এতদিন কোথায় ছিলাম।

আমি বললাম, তোর খবর কী রে মজিদ ?

মজিদ এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। অপ্রয়োজনীয় কোনো প্রশ্নের উত্তর সে দেয় না।

তোর আজ টিউশনি নেই ? ঘরে বসে আছিস যে ?

আজ শুক্রবার।

তখন মনে পড়ল ছুটির দিনে যখন তার হাতে কোনো কাজ থাকে না তখনই সে ম্যাগাজিন জোগাড় করে। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে ঘুমোয়, আবার জেগে উঠে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টায়, কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। জীবনের কাছে তার যেন কিছুই চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। চার-পাঁচটা টিউশনি, মাঝেমধ্যে কিছু খুচরা কাজ এবং প্রুফ দেখার কাজেই সে খুশি। বিএ পাস করার পর কিছুদিন সে চাকরির চেষ্টা করেছিল। তারপর 'ধুর আমার হবে না' এই বলে সব ছেড়েছুড়ে দিল।

আমি একবার বলেছিলাম, সারা জীবন এই করেই কাটাবি নাকি ? সে বলল, অসুবিধা কী ? তুই তো কিছু না-করেই কাটাচ্ছিস।

আমার অবস্থা ভিন্ন। আমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। তাছাড়া আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। তুই তো কিছু করছিস না।

মজিদ কিছুই বলল না। আমি ভেবেছিলাম, একবার হয়তো জিজ্ঞেস করবে—কিসের এক্সপেরিমেন্ট; তাও করল না। আসলেই তার জীবনে কোনো কৌতূহল নেই।

রূপাকে অনেক বলে কয়ে একবার রাজি করিয়েছিলাম যাতে সে মজিদকে নিয়ে চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আসে। আমার দেখার ইচ্ছা একটি অসম্ভব রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী মেয়েকে পাশে পেয়ে তার মনের ভাব কী হয়। আগের মতোই সে কি নির্লিপ্ত থাকে, না জীবন সম্পর্কে খানিকটা হলেও আগ্রহী হয়।

আমার প্রস্তাবে রূপা প্রথমে খুব রাগ করল। চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, তুমি নিজে কখনো আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছ ? চিনি না জানি না একটা ছেলেকে নিয়ে আমি যাব। তুমি আমাকে পেয়েছ কী ?

সে যতই রাগ করে, আমি ততই হাসি। রূপাকে ঠান্ডা করার এই একটাই পথ। সে যত রাগ করবে আমি তত হাসব। আমার হাসি দেখে সে আরও রাগবে। আমি আরও হাসব। সে হাল ছেড়ে দেবে। এবারও তাই হলো। সে মজিদকে নিয়ে যেতে রাজি হলো। আমি একটি ছুটির দিনে মজিদকে বললাম, তুই চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আয়। পত্রিকায় দেখলাম জিরাফ এনেছে।

মজিদ বলল, জিরাফ দেখে কী হবে ?

কিছুই হবে না। তবু দেখে আয়।

ইচ্ছে করছে না।

আমার এক দূরসম্পর্কের ফুপাতো বোন—বেচারির চিড়িয়াখানা দেখার শখ। সঙ্গে কোনো পুরুষমানুষ না-থাকায় যেতে পারছে না। আমার আবার জন্তু-জানোয়ার ভালো লাগে না। তুই তাকে নিয়ে যা।

মজিদ বলল, আচ্ছা।

আমার ধারণা ছিল রূপাকে দেখেই মজিদ একটা ধাক্কা খাবে। সেরকম কিছুই হলো না। রূপা গাড়ি নিয়ে এসেছিল, মজিদ গম্ভীরমুখে ড্রাইভারের পাশে বসল।

রূপা হাসিমুখে বলল, আপনি সামনে বসছেন কেন? পেছনে আসুন। দুজনে গল্প করতে করতে যাই। মজিদ বলল, আচ্ছা।

পেছনে এসে বসল। তার মুখ ভাবলেশহীন। একবার ভালো করে দেখলও না তার পাশে যে বসে আছে সে মানবী না অপ্সরী।

ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলি?

ভালোই।

কথা হয়েছে রূপার সঙ্গে?

হুঁ।

কী কথা হলো?

মনে নেই।

আচ্ছা রূপার পরনে কী রঙের শাড়ি ছিল বল তো?

লক্ষ করিনি তো।

আমি মজিদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাই। রাতে তার সঙ্গে এক চৌকিতে ঘুমাই। তার কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি কী করে আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হওয়া যায়। সাধুসন্ন্যাসীরা অনেক সাধনায় যে স্তরে পৌঁছেন মজিদ সে-স্তরটি কী করে এত সহজে অতিক্রম করল তা আমার জানতে ইচ্ছা করে।

আমার বাবা তাঁর খাতায় আমার জন্যে যে-সব উপদেশ লিখে রেখে গেছেন তার মধ্যে একটার শিরোনাম হচ্ছে : নির্লিপ্ততা। তিনি লিখেছেন—

নির্লিপ্ততা

> পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ এবং মহাজ্ঞানী এই জগৎকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় দেখিয়াছি আসলেই মায়া। স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম যেমন মায়া বই কিছুই নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নির স্নেহ-সম্পর্কেও তাই। যে কারণে স্বার্থে আঘাত লাগিবা মাত্র স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বা ভ্রাতা-ভগ্নির ভালোবাসা কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। কাজেই তোমাকে পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হইতে হইবে। কোনো কিছুর প্রতিই তুমি যেমন আগ্রহ বোধ করিবে না আবার অনাগ্রহও বোধ করিবে না। মানুষ মায়ার দাস। সেই দাসত্বশৃঙ্খল তোমাকে ভাঙিতে হইবে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে তুমি তা পারিবে। তোমার ভেতরে সেই ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা আমি তোমার শৈশবেই

করিয়াছি। একই সঙ্গে তোমাকে আদর এবং অনাদর করা হইয়াছে। মাতার প্রবল ভালোবাসা হইতেও তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। এই সমস্তই একটি পরীক্ষার অংশ। এই পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারিলে প্রমাণ হইবে যে ইচ্ছা করিলে মহাপুরুষদের এই পৃথিবীতে তৈরি করা যায়।

যদি একটি সাধারণ কুকুরকেও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, সেই কুকুর শিকারি কুকুরে পরিণত হয়। একজন ভালো মানুষ পরিবেশের চাপে ভয়াবহ খুনিতে রূপান্তরিত হয়। যদি তাই হয় তবে কেন আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মানব-সম্প্রদায় তৈরি করিতে পারিব না ?

বাবা আমার ভেতর থেকে মায়া কাটানোর চেষ্টা করেছেন। শৈশবের কথা কিছু মনে আছে। একটা খেলনা হয়তো আমার খুব পছন্দ হলো। তিনি কিনে আনলেন। গভীর আনন্দে আমি আত্মহারা। তখন হঠাৎ বাবা বললেন, আচ্ছা আয়, এইবার এই খেলনা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন ?

এমনি।

বাবা একটা হাতুড়ি নিয়ে খেলনা ভাঙতে বসতেন। আমি কাঁদো-কাঁদো চোখে তাকিয়ে দেখতাম।

একবার খাঁচায় করে একটা টিয়াপাখি নিয়ে এলেন। কী সুন্দর সবুজ রঙ। লাল টুকটুকে ঠোঁট। আমি বললাম, বাবা, আমরা কি এটা পুষব ?

তিনি হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ। আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, টিয়াপাখি কী খায় বাবা ?

শুকনো মরিচ খায়।

ঝাল লাগে না ?

না। একটা শুকনো মরিচ নিয়ে এসে দাও, দেখবে কীভাবে কপকপ করে খাবে।

আমি ছুটে গেলাম শুকনো মরিচ আনতে। মরিচ এনে দেখি বাবা টিয়াপাখি গলা টিপে মেরে ফেলেছেন। এমন সুন্দর একটা পাখি মরে পড়ে আছে। ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা লাগল। বাবা বললেন, মন খারাপ করবি না। মৃত্যু হচ্ছে এ জগতের আদি সত্য।

তিনি তাঁর পুত্রের মন থেকে মায়া কাটাতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে ? মায়া কি কেটেছে ? আমার তো মনে হয় না।

এই যে মজিদ চুপচাপ বসে আছে, পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে—কেন জানি বড় মায়া লাগছে তাকে দেখে। এই মায়া আমার বাবা শত ট্রেনিংয়েও কাটাতে পারেননি। অথচ মজিদ কোনোরকম ট্রেনিং ছাড়াই সব মায়া কাটিয়ে বসে আছে। মজিদকে ছাত্র হিসেবে পেলে বাবার লাভ হতো।

মজিদ!

কী ?

আমার হাতে একটা চাকরি আছে, করবি ?

কী চাকরি ?

কী চাকরি জানি না। আমার বড়ফুপা বলেছিলেন জোগাড় করে দিতে পারেন।

তিনি আমাকে চেনেন কীভাবে ?

তোকে চেনেন না। চাকরিটা আমার জন্যে। তবে আমি তোকে পাইয়ে দেব।

দরকার নেই।

দরকার নেই কেন ?

টাকাপয়সার টানাটানি তো এখন আর আগের মতো নেই। দেশে এবার থেকে আর পাঠাতে হবে না।

কেন ?

বাবা মারা গেছেন।

সে-কী!

আমি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। মজিদ বলল, এত অবাক হচ্ছিস কেন ? বুড়ো হয়েছে, মারা গেছে। কিছুদিন পর আর বোনকেও টাকা পাঠাতে হবে না।

সেও কি মারা যাচ্ছে ?

না। তার ছেলে পাস করে গেছে। বিএ পাস করেছে, চাকরিবাকরি কিছু পেয়ে যাবে।

তুই চাস না তোর একটা গতি হোক ?

আরে ধুর ধুর। ভালোই তো আছি।

মজিদ হাই তুলল। আমি বললাম, ভাত খেয়েছিস ?

না, চল খেয়ে আসি।

রাস্তায় নেমেই মজিদ বলল, বিয়েবাড়ি-টাড়ি কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখবি ? বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে।

আমি বললাম, বিয়েবাড়ি খুঁজতে হবে না। চল, পুরান ঢাকায় নিয়ে গিয়ে তোকে বিরিয়ানি খাওয়াব। টাকা আছে।

আবার এতদূর যাব ? আজ ছুটির দিন ছিল। একটু হাঁটলেই বিয়েবাড়ি পেয়ে যেতাম।

তুই কি একটা বিয়ে করবি নাকি ?

আমি ? আরে ধুর ধুর। বিয়ে করা মানে শতেক যন্ত্রণা! শতেক দায়িত্ব! ভালো লাগে না।

সিগারেট খাবি ?

মজিদ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। দিলে খাবে। না দিলে খাবে না।

আমি রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। মজিদ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টানছে। আমি বললাম, তুই দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছিস বল তো ?

কী হচ্ছি ?

গাছ হয়ে যাচ্ছিস।

সত্যি সত্যি গাছ হতে পারলে ভালোই হতো।

আমরা রিকশার খোঁজে বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে এলাম। রিকশা আছে তবে ওরা কেউ পুরান ঢাকার দিকে যাবে না। দূরের ট্রিপে ওদের ক্ষতি। কাছের ট্রিপে পয়সা বেশি, পরিশ্রমও কম। এতকিছু মাথায় ঢুকবে না এরকম বোকা একজন রিকশাঅলার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মজিদ!

বলো।

তুই দেখ রিকশা পাস কি না। আমি চট করে একটা টেলিফোন করে আসি।

আচ্ছা।

আমি টেলিফোন করতে ঢুকলাম 'তরঙ্গিণী' নামের স্টেশনারি দোকানে। আজকাল চমৎকার সব দোকান হয়েছে। এদের নামও যেমন সুন্দর, সাজসজ্জাও সুন্দর। আমাকে দেখেই দোকানের সেলসম্যান জামান এগিয়ে এল। এই ছেলের বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। একদিন দেখি দোকানে আর আসছে না। মাস দু'এক পরে আবার এসে উপস্থিত। মুখভর্তি বসন্তের দাগ। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ পৃথিবী থেকে বসন্ত উঠে গেছে। এই ছেলে সেই বসন্ত পেল কী করে ? সবসময় ভাবি জিজ্ঞেস করব, জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। তার মুখে দাগ হওয়ার পর তার ব্যবহার খুব ভালো হয়েছে। আগে ব্যবহার খুব খারাপ ছিল।

জামান হাসিমুখে বলল, স্যার ভালো আছেন ?

হুঁ।

টেলিফোন করবেন ?

যদি টেলিফোনে ডায়াল টোন থাকে এবং টেলিফোনের চাবি থাকে তাহলে করব। দু'টা টেলিফোন করব, এই যে চার টাকা।

টাকা দিয়ে সবসময় লজ্জা দেন স্যার।

লজ্জার কিছু নেই। টেলিফোন শেষে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। প্রায়ই জিজ্ঞেস করব ভাবি কিন্তু মনে থাকে না। আজ আপনি মনে করিয়ে দিবেন।

জি আচ্ছা।

আমার সামনে টেলিফোন দিয়ে জামান সরে গেল।

এইটুকু ভদ্রতা আছে। অধিকাংশ দোকানেই টেলিফোন করতে দেয় না। টাকা দিয়েও না। যদিও দেয়—রিসিভারের আশেপাশে ঘুরঘুর করে কী কথা হচ্ছে শুনবার জন্যে।

হ্যালো, কে কথা বলছেন ?

তুমি কি মীরা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মীরা। আপনি কে আমি বুঝতে পারছি। আপনি টুটুল।

আসল জন না। নকল জন।

ঐদিন খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন কেন ? আমার অসম্ভব কষ্ট হয়েছিল।

টেলিফোন নামিয়ে রাখিনি তো, হঠাৎ লাইন কেটে গেল।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। অনেকক্ষণ টেলিফোনের সামনে বসে ছিলাম। লাইন কেটে গেল, তাহলে আবার করলেন না কেন ?

টাকা ছিল না।

টাকা ছিল না মানে ?

আমি তো বিভিন্ন দোকান-টোকান থেকে টেলিফোন করি। দু'টা টাকা পকেটে নিয়ে যাই। আরেকবার করতে হলে আরও দু'টাকা লাগবে। বুঝতে পারছ ?

পারছি। এখন আপনার সঙ্গে টাকা আছে তো ?

আছে।

ঐদিন আপনার টেলিফোন পাওয়ার পর বাবাকে সব বললাম। বাবাকে তো চেনেন না। বাবা খুবই রাগী মানুষ। তিনি প্রথমে আমাদের দু'জনকে খুব বকা দিলেন—আপনাকে রাস্তা থেকে তোলার জন্যে এবং পথে নামিয়ে দেওয়ার জন্যে। তারপর... আচ্ছা আপনি আমার কথা শুনছেন তো ?

হ্যাঁ, শুনছি।

তারপর বাবা গাড়ি বের করে থানায় গেলেন। ফিরে এলেন মন খারাপ করে।

মন খারাপ করে ফিরলেন কেন ?

কারণ ওসি সাহেব আপনার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছেন। আপনি নাকি পাগল ধরনের। তার উপর কবি।

আমি কবি ?

হ্যাঁ। আপনি যে কবিতার খাতাটা থানায় ফেলে এসেছিলেন বাবা সেইটিও নিয়ে এসেছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমি সবগুলো কবিতা পড়েছি।

কেমন লাগল ?

ভালো। অসাধারণ।

সবচেয়ে ভালো লাগল কোনটা ?

বলব ? আমার কিন্তু মুখস্ত। কবিতাটার নাম 'রাত্রি'।

পরীক্ষা নিচ্ছি। দেখি সত্যি সত্যি তোমার মুখস্থ কি না, কবিতাটা বলো।

মীরা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল

অতন্দ্রিলা,
ঘুমাওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে বলি শোন,
সৌর তারা-ছাওয়া এই বিছানায়—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি
কত দীর্ঘ দু'জনার গেল সারা দিন,
আলাদা নিঃশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু'জনে, দু'জনা
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পরে জোছনা।
দেখি তুমি নেই।

কবিতা সে আবৃত্তি করল চমৎকার। আবৃত্তির শেষে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কি, বলতে পারলাম ?

হ্যাঁ পারলে। তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো, তবে কবিতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

কেন, এটা কি ভালো কবিতা না ?

অবশ্যই ভালো। তবে আমার লেখা না। অমিয় চক্রবর্তীর।

আপনার নোটবইয়ের সব কবিতাই কি অন্যের ?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে কিছু কবিতা পড়ে মনে হয় এগুলি আমারই লেখার কথা ছিল, কোনো কারণে লেখা হয়নি। তখন সেটা নোটবুকে টুকে রাখি।

আপনি কি খুব কবিতা পড়েন ?

না। একেবারে না। তবে আমার একজন বান্ধবী আছে সে খুব পড়ে এবং জোর করে আমাকে কবিতা শোনায়।

ওর নাম কী ?

ওর নাম রূপা। তবে আমি তাকে মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষী ডাকি।

বাহ্, কী সুন্দর নাম!

সে কিন্তু এই নাম একেবারেই পছন্দ করে না।

কেন বলুন তো ?

কারণ এই নামে এলিফেন্ট রোডে একটা জুতার দোকান আছে।

মীরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসল। মনে হলো মেয়েটা যে পরিবেশে বড় হচ্ছে সেই পরিবেশে কেউ রসিকতা করে না। সবাই গম্ভীর হয়ে থাকে। সামান্য রসিকতায় এই কারণেই সে এতক্ষণ ধরে হাসছে।

হ্যালো, আপনি কিন্তু টেলিফোন রাখবেন না।

আচ্ছা রাখব না।

ঐদিন আপনার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে এমন হয়েছে টেলিফোন বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই। মনে হয় আপনি টেলিফোন করেছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার বলি, মা আপনার জন্যে খুব চমৎকার একটা পাঞ্জাবি কিনে রেখেছেন। ঐ পাঞ্জাবিটা নেওয়ার জন্যে হলেও আপনাকে আমাদের বাসায় আসতে হবে।

আসব।

কবে আসবেন ?

টুটুলকে খুঁজে পেলেই আসব।

আপনি ওকে কোথায় খুঁজে পাবেন ?

আমি খুব সহজেই পাব। হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমার খুব নামডাক আছে।

আচ্ছা, ঐদিন আপনি কী করে বললেন যে, টুটুল ভাইয়ের কপালে কাটা দাগ আছে ?

আমার কিছু সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে। আমি মাঝে মাঝে অনেক কিছু বলতে পারি।

বলুন তো আমি কী পরে আছি ?

তোমার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি।

হলো না। আপনার আসলে কোনো ক্ষমতা নেই।

ঠিক ধরেছ।

কিন্তু আপনি যখন বলেছিলেন যে আপনার সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

মনে হচ্ছে তোমার একটু মন খারাপ হয়েছে ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

টেলিফোন কি রেখে দেব ?

না না, প্লিজ আপনার ঠিকানা বলুন।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আর না। মজিদ বোধহয় রিকশা ঠিক করে ফেলেছে। তবে ঠিক করলেও সে আমাকে এসে বলবে না। অপেক্ষা করবে। এর মধ্যেই অতি দ্রুত রূপার সঙ্গে একটা কথা সেরে নেওয়া দরকার।

আমি টেলিফোন করতেই রূপার বাবা ধরলেন। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, এটা কি রেলওয়ে বুকিং ?

তিনি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ফাজিল ছোকরা, হু আর ইউ ? কী চাও তুমি ?

রূপাকে দেবেন ?

রাসকেল! ফাজলামি করার জায়গা পাও না। আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব।

আপনি এত রেগে গেছেন কেন ?

শাট আপ।

আমি ভদ্রলোককে আরও খানিকক্ষণ হইচই করার সুযোগ দিলাম। আমি জানি হইচই শুনে রূপা এসে টেলিফোন ধরবে। হলোও তাই, রূপার গলা শোনা গেল। সে করুণ গলায় বলল, তুমি চলে এসো।

কখন ?

এই এখন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

আচ্ছা আসছি।

অনেকবার আসছি বলেও তুমি আসনি। এইবার যদি না আস তাহলে...

তাহলে কী ?

রূপা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

রূপার বাবা সম্ভবত তার হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিলেন। খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। আজ ওদের বাড়িতে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। রূপার বাবা-মা, ভাইবোন কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। রূপার বাবা তাঁর দারোয়ানকে বলে রেখেছেন কিছুতেই যেন আমাকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া হয়। আজ কী হবে কে জানে ?

বাইরে এসে দেখি মজিদ রিকশা ঠিক করেছে। রিকশাঅলা রিকশার সিটে বসে ঘুমোচ্ছে। মজিদ শান্তমুখে ড্রাইভারের পাশে বসে বিশ্রাম করছে। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আজও জামানকে জিজ্ঞেস করা হলো না—তার মুখে বসন্তের দাগ

হলো কী করে। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যা কোনোদিনও করা হয় না। এটিও বোধহয় সেই জাতীয় কোনো প্রশ্ন।

বিরিয়ানি খেয়ে অনেক রাতে ফিরলাম।

অসহ্য গরম।

সেই গরমে ছোট্ট একটা চৌকিতে আমি এবং মজিদ শুয়ে আছি। মজিদের হাতে হাতপাখা। সে দ্রুত তার পাখা নাড়ছে। গরম তাতে কমছে না, বরং বাড়ছে। মনে হচ্ছে ময়ূরাক্ষী নদীটাকে বের করতে হবে, নয়তো এই দুঃসহ রাত পার করা যাবে না।

মজিদের হাতপাখার আন্দোলন থেমে গেছে। সে গভীর ঘুমে অচেতন। ঘরে শুনশান নীরবতা। আমি ময়ূরাক্ষী নদীর কথা ভাবতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য পাল্টে গেল। এই নদী একেক সময় একেকভাবে আসে। আজ এসেছে দুপুরের নদী হয়ে। প্রখর দুপুর। নদীর জলে আকাশের ঘন নীল ছায়া। ঝিম ধরে আছে চারদিক। হঠাৎ নদী মিলিয়ে গেল। মজিদ ঘুমের মধ্যেই বিশ্রী শব্দ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এই মজিদ, এই।

মজিদ চোখ মেলল।

কী হয়েছে রে ?

কিছু না।

স্বপ্ন দেখেছিস ?

হুঁ।

দুঃস্বপ্ন ?

না।

কী স্বপ্ন দেখেছিস বল তো ?

মজিদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণস্বরে বলল, স্বপ্নে দেখলাম বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মজিদ শুয়ে পড়ল। আমি জানি না মজিদের বাবা কীভাবে তার গায়ে হাত বোলাতেন। আমার ইচ্ছা করছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে মজিদের গায়ে হাত বোলাতে।

হিমু!

কী ?

আমার বাবা আমাকে খুব আদর করত। সব বাবাই করে। আমার বাবা খুব বেশি করত। একদিন কী হয়েছে জানিস—

বল শুনছি।

না থাক।

থাকবে কেন, শুনি। এই গরমে ঘুম আসছে না। তোর গল্প শুনলে ভালো লাগবে।

আমি তখন খুব ছোট...

তারপর ?

না থাক।

মজিদ আর শব্দ করল না। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আমি অনেক চেষ্টা করেও নদীটা আনতে পারছি না। আজ আর পারব না। আজ বরং বাবার কথাই ভাবি। আমার বাবা কি আমাকে ভালোবাসতেন ? নাকি আমি ছিলাম তাঁর খেলার কোনো পুতুল ? যে পুতুল তিনি নানাভাবে ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কত রকম উপদেশে তিনি তাঁর খাতা ভর্তি করে রেখেছেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে হয়তো ভেবেছেন এইসব উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। আমি কি সেইসব উপদেশ মানি ? নাকি মানার ভান করি। তাঁর খাতায় লেখা

উপদেশ নম্বর এগার

সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান

সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করিবে। ইহাতে আত্মার উন্নতি হইবে। সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং আত্মাকে জানা একই ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিও—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

মজিদ আবার কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তবে কাঁদছে ঘুমের মধ্যে। সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কি প্রতিরাতেই কাঁদে ?

৬

বড়ফুপু অবাক হয়ে বললেন, তুই কোত্থেকে ?

আমি বললাম, আসলাম আর কী। তোমাদের খবর কী ?

পনের দিন পর উদয় হয়ে বললি—তোমাদের খবর কী ? তোর কত খোঁজ করছি। গিয়েছিলি কোথায় ?

মজিদের গ্রামের বাড়িতে। মজিদকে নিয়ে ওর বাবার কবর জিয়ারত করে এলাম।

মজিদ অবার কে ?

তুমি চিনবে না। আমার ফ্রেন্ড। আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছিলে কেন ?

বড়ফুপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোকে খুঁজছি বাদলের জন্যে। ওকে তুই বাঁচা।

অসুখ ?

তুই নিজে গিয়ে দেখ। ও তার পড়ার বইপত্র সব পুড়িয়ে ফেলছে। এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা।

বলো কী!

বাদলের ঘরে গিয়ে দেখি সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই পড়াশোনা করছে। পরিবর্তনের মধ্যে তার মাথার চুল আরও বড় হয়েছে। দাড়িগোঁফ আরও বেড়েছে। গায়ে চকচকে সিল্কের পাঞ্জাবি। বাদল হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, খবর কী রে ?

বাদল বলল, খবর তো ভালোই।

তুই নাকি বই পোড়াচ্ছিস ?

সব বই তো পোড়াচ্ছি না। যেগুলি পড়া হচ্ছে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলছি।

ও আচ্ছা!

বাদল হাসতে হাসতে বলল, মা-বাবা দু'জনেরই ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তোর কি ধারণা মাথা ঠিকই আছে ?

হ্যাঁ ঠিক আছে। তবে মাথায় উকুন হয়েছে।

বলিস কী!

মাথা ঝাঁকি দিলে টুপটাপ করে উকুন পড়ে।

বলিস কী ?

হ্যাঁ সত্যি। দেখবে ?

থাক থাক, দেখাতে হবে না।

হিমু ভাই, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, বাবাকে বুঝিয়ে যাও। বাবার ধারণা আমার সব শেষ।

ফুপা কি বাসায় ?

হ্যাঁ বাসায়। কিছুক্ষণ আগেই আমার ঘরে ছিলেন। নানান কথা বোঝাচ্ছেন।

আমি ফুপার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর স্বাস্থ্য এই ক'দিনে মনে হয় আরও ভেঙেছে। চোখের চাউনিতে দিশেহারা ভাব। তিনি আমার দিকে বিষণ্ণচোখে তাকালেন। যে দৃষ্টি বলে দিচ্ছে—তুমিই আমার ছেলের এই অবস্থার জন্যে দায়ী। তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা।

কেমন আছেন ফুপা ?

ভালো।

রিনকি কোথায় ? শ্বশুরবাড়িতে ?

হ্যাঁ।

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসে আছেন যে ? প্র্যাকটিসে যাচ্ছেন না ?

আর প্র্যাকটিস! সব মাথায় উঠেছে।

আমি ফুপার সামনের চেয়ারে বসলাম। মনে হচ্ছে আজও তিনি খানিকটা মদ্যপান করেছেন। আমি সহজ গলায় বললাম, ফুপা, ঐ চাকরিটা কি আছে ?

কোন চাকরি ?

ঐ যে আমাকে বলেছিলেন বাদলকে আগের অবস্থায় নিয়ে গেলে ব্যবস্থা করে দেবেন।

তুমি চাকরি করবে ? নতুন কথা শুনছি।

আমি করব না, আমার এক বন্ধুর জন্যে।

ফুপা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, বাদলের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনি ওর চাকরিটা দেখুন।

বাদলের কিছু তুমি করতে পারবে না। ও এখন সমস্ত চিকিৎসার অতীত। বইপত্র পুড়িয়ে ফেলছে। ছাদে আগুন জ্বালিয়েছে। সেই আগুনের সামনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর মাথা থেকে উকুন পড়ছে আগুনে। পট পট শব্দ হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড! আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম। একবার ভাবলাম একটা চড় লাগাই, তারপর মনে হলো—কী লাভ!

ফুপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

আমি হাসলাম।

ফুপা বললেন, তুমি হাসছ ? তোমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হতে পারে, আমার কাছে না।

আমি বাদলের ব্যাপারটা দেখছি, আজই দেখছি। আপনি আমার বন্ধুর চাকরির ব্যাপারটা দেখবেন।

তোমার বন্ধু কি তোমার মতোই ?

না। ও চমৎকার ছেলে। সাত চড়ে রাঁ নেই টাইপ।

আমি বাদলকে নিয়ে বের হলাম।

বাদল মহাখুশি।

রাস্তায় নেমেই বলল, তোমার পরিকল্পনা কী হিমু ভাই ? সারা রাত রাস্তায় হাঁটব ? দু'বছর আগের কথা কি তোমার মনে আছে ? সারা রাত আমরা হাঁটলাম। জোছনা রাত। মনে হচ্ছিল আমরা দস্তয়োভস্কির উপন্যাসের কোনো চরিত্র। মনে আছে ?

আছে।

আজও কি সেইরকম কিছু ?

না। আজ যাচ্ছি সেলুনে, দাড়িগোঁফ কামাব।

বাদল হতভম্ব হয়ে গেল। যেন এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে শোনেনি। ক্ষীণস্বরে বলল, দাড়িগোঁফ, লম্বা চুলে তোমাকে যে কী অদ্ভুত সুন্দর লাগে তা তো তুমি জানো না। তোমাকে অবিকল রাসপুটিনের মতো লাগে।

রাসপুটিনের মতো লাগলেও ফেলে দিতে হবে। এক জিনিস বেশিদিন ধরে রাখতে নেই। ভোল পাল্টাতে হয়। অনেকটা সাপের খোলস ছাড়ার মতো। কিছুদিন অন্যসাজে থাকব, তারপর আবার...

তাহলে কি আমিও ফেলে দেব ?

দেখ চিন্তা করে।

অবশ্যি উকুনের জন্যে কষ্ট হচ্ছে। ভয়ঙ্কর চুলকায়। রাতে ঘুম ভালো হয় না।

তাহলে বরং ফেলেই দে।

তুমি ফেললে তো ফেলবই।

বাদল হাসতে লাগল। মনে হচ্ছে গভীর কোনো আনন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে।

দু'জনে চুল কেটে দাড়িগোঁফ ফেলে দিলাম।

বাদল কয়েকবারই বলল, ভীষণ হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে বাতাসে উড়ে যাব।

আমি বললাম, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ। নিজেকে অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে না ?

হ্যাঁ হচ্ছে।

মাঝে মাঝে নিজেকে অচেনা করাও দরকার। যখন যে সাজ ধরবি, সেইরকম ব্যবহার করবি। একে বলে ব্যক্তিত্ব রূপান্তর। বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

ফুপা এবং ফুপু তাঁদের ছেলেকে দেখে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। সবার আগে নিজেকে সামলে নিলেন ফুপা। আমার দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বললেন, তোমার বন্ধুকে নিয়ে কাল আমার চেম্বারে এসো। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। মনে থাকবে ?

হ্যাঁ, থাকবে।

হিমু, মেনি থ্যাংকস।

আমি হাসলাম।

ফুপা বললেন, আমার ঘরে এসো। গল্প করি। তোমার সঙ্গে গল্পই করা হয় না।

আমি বললাম, আপনি যান আমি আসছি। একটা টেলিফোন করে আসি।

ফুপা বললেন, তোমার এই টেলিফোন-ব্যাধিরও একটা চিকিৎসা হওয়া দরকার। কার সঙ্গে এত কথা বলো ? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা। আমার তো দু'টা কথা বললেই বিরক্ত লাগে।

ওপাশ থেকে হ্যালো শুনেই আমি বললাম, কে মীরা ?

অনেকক্ষণ কোনো শব্দ হলো না। আমি নিশ্চিত মীরা। নিজেকে সামলাবার জন্যে সময় নিচ্ছে।

হ্যালো, তুমি কি মীরা ?

আপনি আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন ?

কষ্ট দিচ্ছি ?

হ্যাঁ দিচ্ছেন। না হয় আমরা একটা ভুল করেছিলাম। সব মানুষই তো ভুল করে। সামান্য ভুলের জন্যে যদি এত কষ্ট দেন...

আমি টেলিফোন করলে কষ্ট পাও ?

হ্যাঁ পাই। কারণ আপনি হঠাৎ রেখে দেন। আপনি কি মানুষটাই এমন, না ইচ্ছা করে এসব করেন ?

বেশিরভাগ সময় ইচ্ছা করেই করি।

আপনি কি একবার আসবেন আমাদের বাসায় ?

এখনো বুঝতে পারছি না। হয়তো আসব।

কবিতার খাতাটা নিতে আসবেন না ?

ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম মীরা।

তার মানে আপনি আসবেন না ?

না। মানুষের মুখোমুখি হতে আমার ভালো লাগে না। এতে অতি দ্রুত মায়া পড়ে যায়। টেলিফোনে কথা বললে মায়া জন্মানোর সম্ভাবনা কম, সেইজন্যেই টেলিফোন আমার এত প্রিয়। টেলিফোনে কথা বললে মায়া জন্মায় না। মায়া জন্মানোর অনেক কষ্ট। তা ছাড়া...

তাছাড়া কী ?

থাক, আরেকদিন বলব।

আপনার বান্ধবী রূপার সঙ্গে কি আপনার প্রায়ই দেখা হয় ?

মাঝে মাঝে হয়। যখন সে যেতে বলে তখন যাই না। যখন যেতে বলে না তখন হঠাৎ উপস্থিত হই।

উনি কি খুবই সুন্দর ?

তোমাকে তো একবার বলেছি—ও খুব সুন্দর।

আপনি টেলিফোন রেখে দেওয়ার আগে দয়া করে শুধু একটি সত্যি কথা বলুন।

আমি তো সবই সত্যি বলছি। কী জানতে চাচ্ছ বলো তো ?

ঐদিন কি পুলিশ আপনাকে মেরেছিল ?

না।

এই তো মিথ্যা বললেন।

আজ সত্যি বলছি। ঐদিনই মিথ্যা বলেছিলাম।

আপনার কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা কে জানে! মীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে একটা খবর দেই। টুটুল ভাইকে পাওয়া গেছে। কাউকে কিছু না বলে এক মাসের জন্যে কোলকাতা গিয়েছিল। মজার ব্যাপার কী জানেন ? এখন আর আমার টুটুল ভাইকে ভালো লাগছে না। ঐদিন টেলিফোন করেছিল, আমি কথাও বলিনি। আমার এরকম হলো কেন বলুন তো ?

আমি টেলিফোন রেখে ফুপার খোঁজে গেলাম।

তিনি ছাদে। হুইস্কির বোতল খোলা হয়েছে। বরফের পাত্র, ঠান্ডা পানি, প্লেটে ভিনিগার মেশানো চিনাবাদাম। আমাকে দেখেই তিনি খুশি খুশি গলায় বললেন, বাদলের পরিবর্তনটা সেলিব্রেট করছি।

ফুপু রাগ করবেন না ?

না, তাকে বলেছি। আজ সে কোনো কিছুতেই রাগ করবে না। বমি করে যদি সারা ঘর ভাসিয়ে দেই তবু রাগ করবে না। তুমি বসো হিমু। আরাম করে বসো। সম্পর্কে মিশ খাচ্ছে না। মিশ খেলে তোমাকেও খানিকটা দিতাম।

আপনি ক' পেগ খেয়েছেন ?

আরে না। মাত্র তো শুরু। আমি ন'টা পর্যন্ত পারি। আমার কিছুই হয় না।

ঐদিন বলেছিলেন ছ'টা।

বলেছিলাম ? বলে থাকলে ভুল বলেছি। ন'টা হচ্ছে আমার লিমিট। নাইন। এন আই এন ই। নাইন।

আর খাবেন না ফুপা।

ফুপা গ্লাসে নতুন করে ঢালতে ঢালতে বললেন, খেতে খেতে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি মানুষটা খারাপ না। পাগলা আছ, তবে ভালো। তোমার বাবা পাগলা ছিল, তবে ভালো ছিল না।

ভালো ছিল না বলছেন কেন ?

দেখেছি তো। ও বাড়ি ছেড়ে পালাল আমার বিয়ের অনেক পরে। উন্মাদ ছিল।

ফুপা, আপনি কিন্তু বড় দ্রুত খাচ্ছেন। শুনেছি দ্রুত খাওয়া খারাপ।

ফুপা গম্ভীর গলায় বললেন, নাইন হচ্ছে আমার লিমিট। নাইনের আগে স্টপ করে দেব। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। আমার ধারণা তোমার বাবা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর উন্মাদ। এটা হচ্ছে আমার ধারণা। তুমি আবার রাগ করছ না তো ?

না।

ছেলেকে মহাপুরুষ বানানোর অদ্ভুত খেয়াল উন্মাদের মাথাতেই শুধু আসে, বুঝলে ? আরে বাবা, মানুষ কী হবে না-হবে সব আগে থেকে ঠিক করা থাকে।

কে ঠিক করে রাখেন, ঈশ্বর ?

প্রকৃতিও বলতে পারো। ফোর্টি সিক্স ক্রমোজমে মানুষের ভবিষ্যৎ লেখা থাকে। সে কেমন হবে কী সব কিন্তু প্রিডিটারমিন্ড। জিন সব নিয়ন্ত্রণ করছে।

ফুপা, আর নেবেন না।

আরে এখনই বন্ধ করব কী ? নেশাটা মাত্র ধরেছে। তুমি মানুষ খারাপ না। I like you. তুমি পাগল ঠিকই, তবে ভালো পাগল। তোমার বাবা ছিল খারাপ ধরনের পাগল।

বাবা সম্পর্কে কথাবার্তা থাক।

ফুপা নিচুগলায় বললেন, কাউকে যদি না বলো তাহলে তোমার বাবার সম্পর্কে আমার একটি ধারণার কথা বলতে পারি। আমি আর কাউকে বলিনি। শুধু তোমাকেই বলছি।

বাদ দিন, কিছু বলতে হবে না।

জাস্ট আমার একটা ধারণা। ভুলও হতে পারে। আমার বেশিরভাগ ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়। হা-হা-হা। আমার বোধহয় আর খাওয়া উচিত হবে না। শুধু লাস্ট ওয়ান হয়ে যাক। ওয়ান ফর দ্য রোড। হিমু।

জি।

তোমার যদি ইচ্ছা করে খানিকটা খেয়ে দেখতে পারো। উল্টোদিকে ফিরে খেয়ে ফেলো। আমি কিছুই মনে করব না। আমার মধ্যে কোনো প্রিজুডিস নেই। তুমি হচ্ছ বন্ধুর মতো।

আমি খাব না। আপনিও বন্ধ করুন।

ন'টা কি হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

দশে শেষ করা যাক। জোড়সংখ্যা। তারপর তোমার বাবার সম্পর্কে কী যেন বলছিলাম ?

কিছু বলছিলেন না।

বলছিলাম। মনে পড়েছে—আমার কি ধারণা জানো ? আমার ধারণা তোমার বাবা তোমার মাকে খুন করেছিল।

আমি সহজ গলায় বললাম, এরকম ধারণা হওয়ার কারণ কী ?

যখন তোমার বাবার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলো তখন সে অনেক কথাই বলল, কিন্তু দেখা গেল নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলছে না। সে কীভাবে মারা গেছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে রেগে গিয়ে বলেছিল, অন্য দশটা মানুষ যেভাবে মারা যায় সেইভাবে মারা গিয়েছিল।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এটা শুনেই আপনি ধরে নিলেন বাবা মাকে খুন করেছেন ?

হ্যাঁ। অবশ্যি আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। আমার অধিকাংশ অনুমানই ভুল হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ফুপার অধিকাংশ অনুমান ভুল হলেও এই অনুমানটি ভুল নয়। এটা সত্যি। আমি এটা জানি। আমি ছাড়াও অন্য কেউ এটা অনুমান করতে পারে, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ফুপা মদের ঘোরে ঝিম মেরে বসে আছেন। আমি আকাশের তারা দেখছি।

হিমু!

জি।

তোমার বন্ধুকে কাল নিয়ে এসো, চাকরি দিয়ে দেব।

আচ্ছা।

বড় ঘুম পাচ্ছে। এখানেই শুয়ে পড়ি, কেমন ?

শুয়ে পড়ুন।

ফুপা কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অনেক অনেক দিন আগে বাবা আমাকে ছাদে এনে আকাশের তারা দেখিয়ে বলেছিলেন, যখনই সময় পাবি ছাদে এসে আকাশের তারার দিকে তাকাবি, এতে মন বড় হবে। ক্ষুদ্র শরীরে আকাশের মতো বিশাল মন ধারণ করতে হবে। বুঝলি ? বুঝে থাকলে বল—হ্যাঁ।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বাবা হৃষ্টগলায় বললেন, তোর উপর আমার অনেক আশা। অনেক আশা নিয়ে তোকে বড় করছি। তোর মা বেঁচে না থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে। ও বেঁচে থাকলে

আদর দিয়ে তোকে নষ্ট করত। আমি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি তার কিছুই করতে দিত না। পদে পদে বাধা দিত। দিত কি না বল ?

হ্যাঁ দিত।

তোর মা না থাকায় তাহলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

বাবা হঠাৎ গলা নিচু করে বললেন, তোর মা যে নেই এর জন্যে আমার উপর কোনো রাগ নেই তো ?

তোমার উপর রাগ হবে কেন ?

বাবা অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। সেই হাসি আমার বুকে বিঁধল। চট করে মনে পড়ল অনেক অনেককাল আগে সুন্দর একটা টিয়াপাখিকে বাবা গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। আমি শান্তস্বরে বললাম, মা কীভাবে মারা গিয়েছিলেন বাবা ?

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। তোকেই খুঁজে বের করতে হবে। শুধু হৃদয় বড় হলেই হলো না, তোকে বুদ্ধিমানও হতে হবে। তোর জ্ঞান এবং বুদ্ধি হবে প্রেরিতপুরুষদের মতো। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবি, আমি যা করেছি তোর জন্যেই করেছি। আচ্ছা আয়, এখন তোকে আকাশের তারাদের নাম শেখাই। একবার কালপুরুষের নাম বলেছিলাম না। বল দেখি কোনটা কালপুরুষ ?... এত দেরি করলে তো হবে না। তাড়াতাড়ি বল। খুব তাড়াতাড়ি। কুইক।

আমি ছাদ থেকে নিচে নামলাম।

একধরনের গাঢ় বিষাদ বোধ করছি। এই ধরনের বিষাদ হঠাৎ হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে এবং প্রায় সময়ই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। মহাপুরুষদের কি এমন হয় ? তাঁরাও কি মাঝে মাঝে বিষাদগ্রস্ত হন ? হয়তো হন, হয়তো হন না। কোনো একজন মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম। আমাদের কথাবার্তা তখন কেমন হতো ? মনে মনে আমি কথোপকথনের মহড়া দিলাম। দৃশ্যটা এরকম—বিশাল বটবৃক্ষের নিচে মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শীর্ণকায় কিন্তু তাঁকে বটবৃক্ষের চেয়েও বিশাল দেখাচ্ছে। তাঁর গায়ে সাদা চাদর। সেই চাদরে তাঁর মাথা ঢাকা। ছায়াময় বৃক্ষতল। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের কালো মণি দৃশ্যমান। মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর শিশুর কণ্ঠস্বরের মতো, কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনলে সেই কণ্ঠস্বরে একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শ্লেষ্মাজড়িত উচ্চারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। এই কথোপকথনের সময় তিনি একবারও আমার দিকে তাকালেন না। অথচ মনে হলো তাকিয়ে আছেন।

মহাপুরুষ বৎস, তুমি কী জানতে চাও ?

আমি অনেক কিছু জানতে চাই। আপনি কি সব প্রশ্নের উত্তর জানেন ?

মহাপুরুষ আমি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর জানি না।

আমি তাহলে শুরুতে কেন বললেন—বৎস তুমি কী জানতে চাও।

মহাপুরুষ আমি প্রশ্নের উত্তর জানি না কিন্তু প্রশ্ন শুনতে ভালোবাসি। তুমি প্রশ্ন করো।

আমি বিষাদ কী ?

মহাপুরুষ আমি জানি না।

আমি আপনি কি কখনো বিষাদগ্রস্ত হন ?

মহাপুরুষ বিষাদ কী তা-ই আমি জানি না। কাজেই বিষাদগ্রস্ত হই কী হই না তা কী করে বলি। তুমি আরও প্রশ্ন করো। তোমার প্রশ্ন শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হচ্ছে।

আমি আনন্দ কী ?

মহাপুরুষ বৎস, আনন্দ কী তা আমি জানি না।

আমি আপনি জানেন এমন কিছু কি আছে ?

মহাপুরুষ না। আমি কিছুই জানি না। বৎস, তুমি প্রশ্ন করো।

আমি আমার প্রশ্ন করার কিছুই নেই। আপনি বিদেয় হোন।

মহাপুরুষ চলে যেতে বলছ ?

আমি অবশ্যই। ব্যাটা তুই ভাগ!

মহাপুরুষ তুমি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ ?

আমি হ্যাঁ।

মহাপুরুষ তাতে লাভ হবে না বৎস। তুমি বোধহয় জানো না আমাদের মান-অপমান বোধ নেই।

কথোপকথন আরও চালানোর ইচ্ছা ছিল। চালানো গেল না। ফুপু এসে বললেন, এই তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিস কেন ?

আমি বললাম, কথা বলছি।

কার সঙ্গে বলছিস ?

মহাপুরুষের সঙ্গে।

ফুপু অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই সবসময় এমন রহস্য করিস কেন ? তুই আমাকে পেয়েছিস কী ? আমাকেও কি বাদলের মতো পাগল ভাবিস ? তুই কি ভাবিস বাদলের মতো আমিও তোর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করব ?

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। ফুপু আমার সেই হাসি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, তুই একটা বিয়ে কর। বিয়ে করলে সব রোগ সেরে যাবে।

বিয়ে করাটা ঠিক হবে না ফুপু।

ঠিক হবে না কেন ?

যেসব রোগের কথা তুমি বলছ সেইসব রোগ কখনো সারাতে নেই। যে কারণে মহাপুরুষেরা বিয়ে করেন না। চিরকুমার থাকেন। বিয়ে করার পর যারা মহাপুরুষ হন তাঁরা স্ত্রী-সংসার ছেড়ে চলে যান। যেমন বুদ্ধদেব।

ফুপু হতচকিত গলায় বললেন, তুই আমাকে আপনি না বলে তুমি তুমি করে বলছিস কেন ?

আমি তো সবসময়ই তাই বলি।

সে-কী! আমার তো ধারণা ছিল আপনি করে বলিস।

জি-না ফুপু, আপনি ভুল করছেন। আমার খুব প্রিয়জনদের আমি তুমি করে বলি। আপনি যদিও খুব কঠিন প্রকৃতির মহিলা, তবু আপনি আমার প্রিয়জন। সেই কারণে আপনাকে আমি তুমি করে বলি।

এই তো এখন আপনি করে বলছিস।

কই না তো! তুমি করেই তো বলছি।

ফুপু খুবই বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আমার খুব ভালো লাগে। সম্ভবত আমি মহাপুরুষের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছি।

রূপার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রও হচ্ছে বিভ্রান্তি। তাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে পেরেছিলাম। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় শীতকালে।

৭

পৌষমাস কিংবা মাঘমাস।

কিংবা অন্যকোনো মাসও হতে পারে। তবে শীতকাল এইটুকু মনে আছে, কারণ আমার গায়ে ছিল গেরুয়া রঙের চাদর। রূপার গায়ে হালকা লাল কার্ডিগান। প্রথমে অবশ্যি কার্ডিগানের দিকে আমার চোখ পড়ল না। আমার চোখ পড়ল তার মাথায় জড়ানো স্কার্ফের দিকে। স্কার্ফের রঙ গাঢ় সোনালি। কাপড়ে সোনালি এবং রুপালি এই দুটি রঙ সচরাচর চোখে পড়ে না। হয়তো এই দুটি রঙ কাগজে খুব ভালো ধরে, কাপড়ে ধরে না।

সোনালি রঙের স্কার্ফ মাথায় জড়ানো বলে দূর থেকে তার চুলগুলি মনে হচ্ছিল সোনালি। দেখলাম সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বসে আছি ইউনিভার্সিটি

লাইব্রেরির বারান্দায়। বসেছি ছায়ার দিকে। শীতকালে সবাই রোদে বসতে ভালোবাসে। আমিও বাসি, তবু ছায়াময় কোণ বেছে নিয়েছি কারণ ঐ দিকটায় ভিড় কম।

আমি লক্ষ করছি রূপা আসছে। আমি তাকে চিনি, তার নাম জানি, সে যে ধবধবে সাদা গাড়িটাতে করে আসে তার নম্বরও জানি, ঢাকা ভ-৮৭৮২। শুধু আমি একা নই, আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে। সবাই কোনো-না-কোনো ছলে রূপার সঙ্গে কথা বলেছে, অনেকেই তার বাসায় গেছে। অতি উৎসাহী কেউ কেউ তার জন্যে নোট এবং বইপত্র জোগাড় করেছে। রূপার জন্মদিনে সব ছেলেরা মিলে একটা জলরঙ ছবি উপহার দিল। ছবিটার নাম 'বর্ষা'। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি মেয়ে কদমগাছের একটু নিচে ডালে হাত দিয়ে মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

চমৎকার ছবি।

ছবিটা পাওয়া গিয়েছিল বিনা পয়সায়, তবে বাঁধাতে খরচ হলো পাঁচশো টাকা। সেই টাকা আমরা সবাই চাঁদা তুলে দিলাম।

রূপা হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে যার জন্যে চাঁদা তুলে কিছু একটা করতে কারও আপত্তি থাকে না। ছেলেরা গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে এদের সঙ্গে মেশে এবং জানে এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে তারা কখনোই খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। এরা যথাসময়ে বাবা-মা'র পছন্দ করা একটি ছেলেকে বিয়ে করবে, যে ছেলে সাধারণত থাকে বিদেশে।

রূপা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলে বলল, কেমন আছ?

রূপাকে যেমন সবাই তুমি করে বলে, রূপাও তেমনি সবাইকে তুমি করে বলে। তার সঙ্গে দীর্ঘ দু'বছরে আমার কোনো কথা হয়নি। আজ হচ্ছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আন্তরিক সুরে বললাম, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

রূপা বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

আমি আপনি করে বলব তা সে আশা করেনি। তাকে অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত মনে হলো। সে এখন কী করে তা-ই আমার দেখার ইচ্ছা। তুমি করেই চালিয়ে যায়, না আপনি ব্যবহার করে। বাংলা ভাষাটা বড়ই গোলমেলে। মাঝে মাঝেই তরুণ-তরুণীদের বিভ্রান্ত করে। রূপা নিজেকে সামলে নিল। সহজ গলায় বলল, আপনি আপনি করছ কেন? আমাকে অস্বস্তিতে ফেলবার জন্যে? আমি এত সহজে অস্বস্তিতে পড়ি না।

আমি বললাম, বসো রূপা।

রূপা বসতে বসতে বলল, অনেকদিন থেকেই তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছা।

কথা বলো।

কেন কথা বলার ইচ্ছা তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

জিজ্ঞেস করলাম না কারণ কেন কথা বলার ইচ্ছা তা আমি জানি। তুমি লক্ষ করেছ যে আমি তোমার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিনি। গায়ে পড়ে কথা বলতে যাইনি, টেলিফোন করিনি, হঠাৎ বাসায় উপস্থিত হইনি। ব্যাপারটা তোমার অহংকারে লেগেছে। সুন্দরী মেয়েরা খুব অহংকারী হয়। তারা সবসময় তাদের চারপাশে একদল মুগ্ধ পুরুষ দেখতে চায়।

রূপা মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল, তোমার কথা মোটেও ঠিক না। আমি সেজন্যে তোমার কাছে আসিনি। আমি শুনেছি তুমি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারো, হাত দেখতে পারো। অলৌকিক কিছু ক্ষমতা তোমার আছে। আমি সেই সম্পর্কে জানতে চাই। আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলার দরকার নেই। সত্যি করে বলো, তোমার কি এ জাতীয় কোনো ক্ষমতা আছে?

আছে।

কী ধরনের ক্ষমতা?

আমার কাছে একটা নদী আছে। যে-কোনো সময় সেই নদীটাকে বের করতে পারি।

রূপা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, এইসব আজেবাজে কথা বলে লাভ নেই। তুমি আমাকে কনফিউজ করতে পারবে না। আমার সম্পর্কে কি তুমি কিছু বলতে পারো?

অবশ্যই পারি। তুমি একটা লাল গাড়িতে করে আস। গাড়ির নাম্বার—ঢাকা ভ-৮৭৮২।

রূপার ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখলাম। সম্ভবত আরও কিছু বলতে পারি। বলব?

বলো।

খুব ছোটবেলায় তুমি ইলেকট্রিকের তারে হাত দিয়ে দু'হাত পুড়িয়ে ফেলেছিলে।

রূপা চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, কী করে বললে?

অলৌকিক ক্ষমতায়।

অলৌকিক ক্ষমতা না ছাই! আমার এই গল্প সবাই জানে। আমি অনেকের সঙ্গেই হাত পুড়ে যাওয়ার গল্প করেছি। আমার মনে হয় আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে। তুমি তাদের একজন কারও কাছ থেকে শুনেছ। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

তাহলে তোমার কোনো ক্ষমতা-টমতা নেই?

না। তবে একটা নদী আছে। নদীটার নাম 'ময়ূরাক্ষী'।

আবার ফাজলামি করছ ?

ফাজলামি করছি না। নদীটা সত্যি আছে এবং আমার কোনো ক্ষমতা যে নেই তা-ও ঠিক না। কিছু ক্ষমতা আছে।

কেমন ?

যেমন ধরো, আজ তোমাকে নিতে গাড়ি আসবে না। তোমাকে রিকশা নিয়ে ফিরতে হবে।

এটা ঠিক হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে বলে ফেলেছ। আমাদের গাড়ি গ্যারেজে। সাইলেন্সার পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে। সারাতে দিয়েছে।

এছাড়াও আমি বলতে পারি তোমার হ্যান্ডব্যাগে কত টাকা আছে।

কত আছে ?

একশ' টাকার নোট আছে দু'টা, একটা কুড়ি টাকার নোট। এক টাকার নোট আছে সাতটা। কিছু খুচরা পয়সা, কত বলতে পারছি না।

রূপা হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, বাক্স খুলে তুমি গুনে দেখো ঠিক বললাম কি না।

আমি গুনতে চাই না।

গুনতে চাও না কেন ?

গুনলে দেখা যাবে তুমি ঠিক বলোনি। তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তোমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে এটা বিশ্বাস করতে আমার ভালো লাগছে। চারদিকে এতসব সাধারণ মানুষ—এর মধ্যে একজন কেউ থাকুক যে সাধারণ নয়, অসাধারণ।

তুমি গুনে দেখো না।

রূপা গুনল এবং অবাক হয়ে বলল, কী করে হলো ? কী করে তুমি বলতে পারলে ?

আমি বললাম, আমি জানি না রূপা। মাঝে মাঝে কাকতালীয়ভাবে আমার কিছু কিছু কথা মিলে যায়। আচ্ছা আমি যাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। রূপা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

পরের তিন মাস আমি ইউনিভার্সিটিতে গেলাম না। আমি জানি রূপা আমাকে খুঁজবে। যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আমাদের আগ্রহের সীমা থাকে না। মেঘ আমরা কখনো স্পর্শ করতে পারি না বলেই মেঘের প্রতি মমতার আমাদের সীমা নেই।

তিন মাস পর হঠাৎ একরাতে রূপাদের বাসায় টেলিফোন করে বললাম, রূপা, তুমি কেমন আছ ?

ভালো।

চিনতে পারছ ?

চিনতে পারব না কেন ? তুমি কোথায় ডুব মেরেছিলে ?

মামার বাড়ি গিয়েছিলাম।

মামার বাড়ি ? ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মামার বাড়ি ?

হ্যাঁ, মামার বাড়ি। হঠাৎ ওদের খুব দেখতে ইচ্ছা করল।

তারা কি খুব চমৎকার মানুষ ?

না। তাঁরা পিশাচশ্রেণীর।

কী সব কথা যে তুমি বলো।

সত্যি বলছি। আমার তিন মামা। তিনজনই পিশাচ। তবে একজন মারা গেছেন। এখন দু'জন আছেন। তারা পিশাচ হলেও আমাকে খুব স্নেহ করেন।

তোমার বাবা-মা'র কথা বলো।

মা'র কথা বলতে পারব না। তেমন কিছু জানি না।

তোমার বাবার কথা বলো।

বাবা ছিলেন একজন চমৎকার মানুষ। তবে বাবা একবার একটা টিয়াপাখিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন।

তুমি এমনসব অদ্ভুত কথা বলো কেন ?

কী করব বলো, আমার চারপাশে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

রূপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কি জানো আমি তোমার কথা খুব ভাবি ?

আমি জানি।

সত্যি জানো ?

হ্যাঁ জানি।

কী করে জানো ?

ভালোবাসা টের পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রূপা বলল, কেন জানি তোমার কথা সবসময় মনে হয়। এর নাম কি ভালোবাসা ?

আমার জানা নেই রূপা।

তুমি কি আসবে আমাদের বাসায় ?

আসব।

কখন আসবে ?

এক্ষুনি আসছি।

এত রাতে এলে বাবা হইচই শুরু করবেন। তুমি কি সকালে আসতে পারো না ?

না রূপা, আমাকে এক্ষুনি আসতে হবে।

আচ্ছা বেশ, আস।

তোমার কি কোনো নীল রঙের শাড়ি আছে ?

কেন বলো তো ?

যদি থাকে তাহলে নীল রঙের শাড়ি পরে গেটের কাছে থেক। আমি এলেই গেট খুলে দেবে।

আচ্ছা।

আমি গেলাম না। আবারও মাসখানিকের জন্যে ডুব দিলাম। কারণ ভালোবাসার মানুষদের খুব কাছে কখনো যেতে নেই।

৮

আমি রূপাকে কখনো চিঠি লিখিনি। একবার হঠাৎ একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো। লিখতে বসে দেখি কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। অনেকবার করে একটি লাইন লিখলাম

রূপা তুমি কেমন আছ ?

সমস্ত পাতা জুড়ে একটি মাত্র বাক্য।

সেই চিঠির উত্তরে রূপা খুব রাগ করে লিখল :

> তুমি এত পাগল কেন ? এতদিন পর একটা চিঠি লিখলে, তারমধ্যেও পাগলামি। কেন এমন করো ? তুমি কি ভাব এইসব পাগলামি দেখে আমি তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসব ? তোমার কাছে আমি হাতজোড় করছি—স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করো। ঐদিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে কেমন পাগলের মতো হাঁটছ। বিড়বিড় করে আবার কী সব যেন বলছ। দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। তোমার কী সমস্যা তুমি আমাকে বলো।

আমার সমস্যার কথা রূপাকে কি আমি বলতে পারি ? আমি কি বলতে পারি—আমার বাবার স্বপ্ন সফল করার জন্যে সারা দিন আমি পথে পথে ঘুরি। মহাপুরুষ

হওয়ার সাধনা করি। যখন খুব ক্লান্তি অনুভব করি তখন একটি নদীর স্বপ্ন দেখি। যে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একজন তরুণী ছুটে চলে যায়। একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে তাকায় আমার দিকে। তার চোখে গভীর মায়া ও গাঢ় বিষাদ। এই তরুণীটি আমার মা। আমার বাবা যাকে হত্যা করেছিলেন।

এইসব কথা রূপাকে বলার কোনো অর্থ হয় না। বরং কোনো কোনোদিন তরঙ্গিণী স্টোর থেকে তাকে টেলিফোন করে বলি—রূপা, তুমি কি এক্ষুনি নীল রঙের একটা শাড়ি পরে তোমাদের ছাদে উঠে কার্নিশ ধরে নিচের দিকে তাকাবে? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। একটুখানি দাঁড়াও। আমি তোমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাব।

আমি জানি রূপা আমার কথা বিশ্বাস করে না, তবু যত্ন করে শাড়ি পরে। চুল বাঁধে। চোখে কাজলের ছোঁয়া লাগিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়। সে অপেক্ষা করে। আমি কখনো যাই না।

আমাকে তো আর দশটা সাধারণ ছেলের মতো হলে চলবে না। আমাকে হতে হবে অসাধারণ। আমি সারা দিন হাঁটি। আমার পথ শেষ হয় না। গন্তব্যহীন যে যাত্রা তার কোনো শেষ থাকার তো কথাও নয়।

নাটক

মহাপুরুষ

১

মঞ্চ অন্ধকার। প্রায় অস্পষ্ট। একজন অন্ধ ভিখিরি মঞ্চের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভিক্ষার গান গাইছে। চমৎকার সুরেলা গলা।

ভিখিরি — নূরনবী সল্লাললায়
সাহাবীরে কইয়া যায়
একটা পয়সা দিলে পরে দশটা পয়সা পায়।।
নূরনবী সল্লললায়
কানতে কানতে কইয়া যায়
এই দুনিয়ায় কিছু দিলে আখেরাতে পায়।।
সল্লললায় সল্লললায়
নূরনবী সল্লললায়।

[একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি মঞ্চে প্রবেশ করবেন। তাঁর গায়ে একটি সাদা চাদর। তিনি দাঁড়াবেন ভিখিরির সামনে।]

ভিখিরি — অন্ধ মিসকিনেরে একটা টেকা দেনগো বাবা। দুই দিনের না খাওয়া। দেন গো বাবা একখান টেকা। আখেরাতে পাইবেন। এক টেকা দশ টেকা হইয়া ফিরত আইব।

সাদা চাদর — দশ টাকা হয়ে ফেরত আসবে? বাহ্ চমৎকার তো!

ভিখিরি — জি, নবীজীর কথা। আখেরাতে পাইবেন।

সাদা চাদর — তখন সেই দশ টাকা দিয়ে আমি কী করব?

ভিখিরি — এইটা কেমুন কথা কইলেন? নবীজীর কথা লইয়া ঠাট্টা-তামশা। হাসেন কেন? আন্ধা মাইনষেরে লইয়া হাসতে মজা লাগে?

সাদা চাদর — আমার কাছে টাকা নেই। থাকলে দিতাম।

[ভিখিরি গান ধরবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাদা চাদর গায়ে লোকটিও তার সঙ্গে গান ধরবে। ভিখিরি অবাক ও বিরক্ত হয়ে থেমে যাবে।]

ভিখিরি — বিষয়ডা কী? আফনে চিল্লাইতাছেন ক্যান?

সাদা চাদর — চিৎকার করছি না তো, গান গাচ্ছি। এটা কি কোনো ধর্মীয় সঙ্গীত?

ভিখিরি — আফনে মানুষডা কেডা?

সাদা চাদর — আমি এসেছি তোমাদের জন্যে।

ভিখিরি কী কইলেন ?

সাদা চাদর আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যে এসেছি। তোমাদের কল্যাণ হোক। আনন্দ আসুক। সত্য ও সুন্দর এসে স্পর্শ করুক তোমাদের হৃদয়। এসো আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে গান গাই। ধরো, আমার হাত ধরো।

[ভিখিরি ভয় পেয়ে সরে যাবে।]

সাদা চাদর তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ ?

ভিখিরি আফনে দূরে থাকেন। ও মনু—মনুরে। ও মনু, মনু।

সাদা চাদর মনু কে ? তোমার কন্যা ?

ভিখিরি খবরদার কাছে আইবেন না। ও মনু, মনু। মনুরে।

[সাত/আট বছরের একটি খুকি ঢুকবে।]

সাদা চাদর মনু তুমি কেমন আছ ? ভালো ?

মনু জি, ভালোই। আফনে কেমুন ?

ভিখিরি খবরদার হারামজাদি এর সাথে কথা কইস না। এ পাগল।

মনু পাগলডা আমার দিকে চাইয়া হাসতাছে বাজান।

ভিখিরি খবরদার এর দিকে চাইস না। আয় বাড়িত যাই।

মনু এইটা কেমন পাগল, খালি হাসে।

[ভিখিরি দ্রুত মনুকে নিয়ে চলে যাবে। সাদা চাদর বসে পড়বে এবং গুনগুন করে গাইতে থাকবে।]

সাদা চাদর নূরনবী সল্লললায়
সাহাবীরে কইয়া যায়
একটা পয়সা দিলে পরে দশটা পয়সা পায়।

[প্রথমে কয়েকটি লাইন গাইবার পর ঐ সুরটি গুনগুন করবে। মঞ্চে প্রবেশ করবেন রমিজ সাহেব। বয়স ৪৫/৫০। মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।]

রমিজ কে ? গান গায় কে ?

কথা বলে না যে, ব্যাপারটা কী। এই যে হ্যালো। কে আপনি ?

মহাপুরুষ আপনি ভালো আছেন ?

রমিজ ভালো আছেন মানে ? এরকম ভয় দেখানোর অর্থটা কী ? আমি হার্টের পেশেন্ট। আপনি ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। হু আর ইউ ?

মহাপুরুষ আমি কেউ না।

রমিজ আমি কেউ না মানে ? অফকোর্স ইউ আর সামবডি।

মহাপুরুষ আমি একজন মহাপুরুষ।

রমিজ মহাপুরুষ ? মহাপুরুষ মানে ?

মহাপুরুষ যারা দুঃসময়ে পথ দেখান। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন।

রমিজ ও, আই সি।

মহাপুরুষ আমি জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছি।

রমিজ জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছেন ? [হাসতে থাকবে]

মহাপুরুষ [হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বেন।]

রমিজ ভালো করেছেন এসেছেন। সব যুগে মহামানবরা আসে, এ যুগেই বা আসবে না কেন ? আসাই উচিত! অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, আরও আগেই আসা উচিত ছিল। তা আসলেন কীভাবে ? টুপ করে আকাশ থেকে পড়লেন নাকি ? হা হা হা।

[রমিজ সাহেব হঠাৎ হাসি থামিয়ে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়বেন। তাঁর বমির বেগ হচ্ছে।]

মহাপুরুষ আপনি কি অসুস্থ ?

রমিজ না, অসুস্থ না। সুস্থ। তবে খানিকটা পান করেছি। আপনি মহাপুরুষ মানুষ। আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। হা হা হা। তা ভাই শোনেন, একটা বাণী-টানী দেন। মহাপুরুষদের একমাত্র কাজই তো বাণী দেওয়া।

মহাপুরুষ সর্বজীবে দয়া করো।

সর্বজীবে ভালোবাস।

রমিজ হা হা হা। আপনি তো ভাই পুরনো মাল ছাড়ছেন ? চোরাই মাল। আপনার আগেই এসব কথা বলা হয়ে গেছে। নতুন কিছু বলেন। বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধে এরকম কিছু।

মহাপুরুষ তেমন কিছু আমার জানা নেই।

রমিজ জানা না থাকলে চলবে কেন ? ট্রাই ট্রাই। মাথা খেলিয়ে কিছু বার করেন। আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হচ্ছে।

মহাপুরুষ জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক সবার দিকে। আনন্দে পরিপূর্ণ হোক সবার হৃদয়।

রমিজ গুড, ভেরি গুড্। এটা আগে শুনিনি। নতুন জিনিস। আগের মতো চোরাই মাল না। শোনেন ভাই, আপনার কোনো ক্ষমতা-টমতা আছে ?

মহাপুরুষ কিসের ক্ষমতা ?

রমিজ অলৌকিক কোনো ক্ষমতা। ঐ যে একজন ছিল না, হাতের লাঠি ফেলে দিলেই সাপ হয়ে যেত। সেই সাপ সব কিছু কপ করে গিলে ফেলত। সেরকম কিছু।

মহাপুরুষ না।

রমিজ চাদরটা ফেলে দেন না দেখি কিছু হয় কি না। হতেও তো পারে। হয়তো চাদরটা বাঘ হয়ে যাবে। হালুম হালুম করতে থাকবে। হা হা হা। রাগ করলেন ?

মহাপুরুষ না, রাগ করিনি।

রমিজ রাগ করার কথাও নয়। মহামানুষরা আবার রাগ করবে কী ? এদের এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দেবে। পশ্চাৎদেশে লাথি দিলে হাসিমুখে বলবে, ভাই আরেকটা লাথি দিন। আগেরটায় তেমন জোর ছিল না। ব্যথা পাইনি।

মহাপুরুষ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না ?

রমিজ বিশ্বাস করব না কেন ? বিশ্বাস করছি। আমাদের কাজ তো বিশ্বাস করা। আমরা ভূত বিশ্বাস করি, হাত দেখা বিশ্বাস করি, স্বর্গ-নরক বিশ্বাস করি, আপনাকে বিশ্বাস করব না ? আপনি কায়দা করে করে একটা চাদর গায়ে দিয়েছেন—নিজের মুখে বলেছেন আমি হেন আমি তেন, এরপর আর অবিশ্বাস করবার পথ কোথায় ? শোনেন ভাই, আপনি যে এসেছেন এটা লোকজন জানে ?

মহাপুরুষ ধীরে ধীরে জানবে। একজন অন্ধ ভিখিরি জানে। তার কন্যা জানে। আপনি জানলেন।

রমিজ এতে লাভ হবে না। আরও ভালো পাবলিসিটি হওয়া দরকার। পত্রিকায় নিউজ দিয়ে দেন—আমি এসেছি। হে বঙ্গবাসী, আর ভয় নেই। এবার আমি তোমাদের উদ্ধার করব। ছবিসহ নিউজ।

এছাড়াও হ্যান্ডবিল বিলির ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকটা ছোকরাকে লাগিয়ে দিন। আশ্চর্য দাঁতের মাজনের পাশাপাশি আপনার হ্যান্ডবিল বিলি করবে। সেখানে লেখা থাকবে—আসিয়াছে আসিয়াছে, মহাপুরুষ আসিয়াছে।

আচ্ছা ভাই চললাম। ভালোই লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে।

[রমিজ সাহেব কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে আসবেন।]

রমিজ — আপনার সত্যিকারের নাম তো জানা হলো না।

মহাপুরুষ — [কোনো জবাব নেই।]

রমিজ — ঠিক আছে, নাম বলতে না চাইলে বলবেন না। তবে শোনেন ভাই, সাবধানে থাকবেন। মহাপুরুষদের অনেক রকম বিপদ হয়। গান্ধিজীর একটা ছাগল ছিল জানেন তো? বেচারা ছাগলের দুধ খেত। সেই ছাগলটা লোকজন কেটে কুটে খেয়ে ফেলল। কাজেই সাবধানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে কোনো ছাগল নেই তো?

মহাপুরুষ — না।

রমিজ — ছাগল ফাগল কিছু একটা থাকা দরকার। নয়তো মহাপুরুষদের ইমেজ ঠিকমতো আসে না। জিনিসটা যত অদ্ভুত হয় ততই জমে। একটা ছাগল বা ভেড়া জোগাড় করেন। তারপর আপনার কাজকর্ম শুরু করেন। কী করতে চান আপনি তা তো শোনা হয়নি।

মহাপুরুষ — আমি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে চাই।

রমিজ — এদেশে কি ভালোবাসার অভাব আছে যে আপনাকে সেটা জাগিয়ে তুলতে হবে? এই বঙ্গদেশে বুঝলেন মহাপুরুষ, প্রতিদিন খুব কম করে হলেও বিশ হাজার ভালোবাসার কবিতা লেখা হয়। এদেশের নেতারা জনগণকে এতই ভালোবাসেন যে, কথায় কথায় তাঁদের চোখে পানি চলে আসে। তাঁরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন। মেকি কান্না নয়, আসল কান্না। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট পিওর।

মহাপুরুষ — রমিজউদ্দিন সাহেব, আপনি বড় রসিক মানুষ।

[রমিজ হকচকিয়ে যাবেন। নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাবেন।]

রমিজ — আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?

মহাপুরুষ — [চুপ করে থাকবেন]

রমিজ — চুপ করে আছেন কেন? আনসার মি। আমি তো আপনার নাম জানি না। আপনার সঙ্গে তো আগে আমার কখনো দেখা হয়নি।

[দেখা যাবে অন্ধ ভিখিরি মেয়ের সঙ্গে আবার মঞ্চে ঢুকছে।]

মহাপুরুষ — কী ব্যাপার মনু?

মনু — বাজানের থালার থুন একটা টেকা পইরা গেছে। এইটা খুঁজতাম আইছি।

[মনু কুপি নিয়ে খুঁজতে থাকবে]

ভিখিরি — মনু পাইছস ? ও মনু, পাইছসনি ?

মনু — বাজান পাগলডা আমার দিকে চাইয়া খালি হাসে।

ভিখিরি — চড় দিয়া দাঁত ফালাই দিমু হারামজাদি। নিজের কাম কর। হেইদিকে চাস কেন ? পাইছস ?

মনু — না।

ভিখিরি — আরে হারামজাদি চইখ থাইক্যাও দেখে না। নয়া টেকা। কড়কড়া নোট।

[ভিখিরি নিজেও বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে খুঁজতে থাকবে।]

রমিজ — [পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করবে] এই মেয়ে এদিকে, এই নাও।

ভিখিরি — কত টেকারে মনু ?

মনু — সর্বনাশ বাজান—একশ' টেকা।

ভিখিরি — দে দে আমার কাছে দে। বাজান গো, আল্লা আপনের হায়াত দরাজ করুক। ধনে জনে বরকত দেউক। নেক মকসুদ হাসিল করুক। ময় মুরব্বিরে বেহেশত নসিব করুক। পুলাপানের পরীক্ষা পাস হউক। মাইয়াগুলার বিয়ার পয়গাম আউক।

রমিজ — ঠিক আছে। ঠিক আছে। যথেষ্ট হয়েছে।

ভিখিরি — একটু খাসদিলে দোয়া করি বাজান, আউজুবিল্লাহ হিমিনাস শাইতুয়া নিররাজিম। বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম। কুল আইজুবিরাব্বি...

মনু — বাজান, পাগলাডা খালি হাসে।

মহাপুরুষ — তোমরা মনে হচ্ছে খুব খুশি। খুশি হয়ে থাকলে তোমাদের ধর্মীয় সঙ্গীতটা এদের শোনাও।

রমিজ — কিসের সঙ্গীত ?

মহাপুরুষ — সে বড় মধুর সঙ্গীত।

রমিজ — সঙ্গীত-ফঙ্গীত লাগবে না, তোমরা যাও।

মহাপুরুষ — আহা শুনি না। বসো তোমরা। রমিজ সাহেব বসুন না। এই চমৎকার জোছনায় বসে থাকতে ভালোই লাগবে। কী অপূর্ব দৃশ্য।

অন্ধ — আমার বাজান দেখনের কপাল নাই। রাব্বুল আলামিন আমারে চউখ দেয় নাই।

[সবাই গোল হয়ে বসবে এবং গান শুরু হবে। গান মনু এবং অন্ধ দু'জনে মিলে গাইবে।]

মনু কী কথা কইয়াছিল বিবি ফাতিমায় ?

অন্ধ সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায়।

মনু কী কথা কইয়াছিল মা আমিনায় ?

অন্ধ সেই কথাটা পালন করা বড় বিষম দায়।

মনু কী কথা কইয়াছিল বিবি হাজেরায় ?

অন্ধ ও মনু সবের সেই কথাগুলা বলতে মনে চায় গো বলতে মনে চায়।

২

মঞ্চের একপ্রান্তে গোল হয়ে বসে সবাই গান গাইছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। মঞ্চের অন্যপ্রান্তে দেখা যাবে ফরিদকে। তার হাতে বড় একটা টর্চলাইট। মুখে সিগারেট। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে খুব চিন্তিত। সে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে কথা বলতে থাকবে। কথাবার্তা দর্শকদের উদ্দেশেই বলা।

ফরিদ বুড়োমতো এক ভদ্রলোককে দেখলেন না কোট গায়ে ? গোল হয়ে বসে আছেন দলটির মধ্যে। উনি মিজানুর রহমান সাহেব। কঠিন ব্যক্তি। যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক। বই-টইও লিখেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে। উনি আমার বাবা।

ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা ঠিক বুঝতে পারছি না। একদল ভিখিরির সঙ্গে বসে আছেন। আমার মনে হয় গানও গাইছেন। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। যেহেতু ভদ্রলোক যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজেই তিনি যা করছেন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে। অবশ্যি আমি একটু অবাক হয়েছি।

আমি ওনার পেছনে পেছনে আসছিলাম। প্রায়ই এরকম করি, রাতে উনি যখন বাড়ি ফেরেন আমি ওনাকে ফলো করি। কেন করি ? কেন করি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি জানি না কেন করি। পিতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসা ? হা হা হা। না না এসব কিছু না।

গত দু'বছর ধরে আমার বাবা প্রফেসর মিজানুর রহমান আমার সঙ্গে কথা বলেন না। আমিও বলি না। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ যদি কোনোদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় তিনি এমন ভাব করেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। গত বুধবারে কী হলো শোনেন, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাবা রিকশা করে অফিসে যাচ্ছেন, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই তিনি ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা থেকে নিচে পড়ে গেলেন। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, বাবা ব্যথা পেয়েছেন ? তিনি অবাক হয়ে

তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শোনেননি।

আসলে নষ্টপুত্রদের প্রতি বাবা-মা'র কোনো স্নেহমমতা থাকে না। আমি একজন নষ্টপুত্র, এটা বোধহয় ধরে নেওয়া যায়। অন্তত এই বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হা হা হা।

[খুট্ করে একটা শব্দ হবে। ফরিদ দারুণ চমকে তার টর্চ ফেলবে সেদিকে। কোথাও কিছু নেই।]

কে কে ওখানে ? কে ? জামিল। জামিল! জামিল নাকি ?

[কোনো উত্তর নেই]

একটা শব্দ হয়েছে না ? স্পষ্ট শুনলাম, ঝুপ করে একটা শব্দ হলো। নাকি আমার মনের ভুল ? মনের ভুল আমার বড় একটা হয় না। আমি যে ধরনের জীবনযাপন করি তাতে মনের ভুল হলে এতদিন টিকে থাকা যেত না। অনেক আগেই ভালোমন্দ কিছু হয়ে যেত।

এবং আজ রাতে তার সম্ভাবনা খুব বেশি। আজ রাত হচ্ছে একটা অন্যরকম রাত। এই রাতে কিছু একটা হবেই। আমি আমার রক্তের মধ্যে তা টের পাচ্ছি। এসব টের পাওয়া যায়। দেখছেন না টর্চ নিয়ে বের হয়েছি। শুধু টর্চ না, টর্চ ছাড়া অন্য জিনিসপত্রও আমার সঙ্গে আছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম চৌধুরী সাহেব আমার উপর নাখোশ হয়েছেন। চৌধুরী সাহেবকে আপনাদের চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই। একাত্তরের যুদ্ধের পর পর একদল মানুষ হঠাৎ প্রচণ্ড রকম ধনী হয়ে গেল না ? শুধু ধনী না, এরা আবার সমাজসেবক হয়ে গেল। জনদরদি হয়ে গেল। এবং এরা সবাই বিরাট বিরাট পাল খাটিয়ে দিল আকাশে। সেই পালগুলিতে বল বিয়ারিঙ সিস্টেম আছে। যেদিকে বাতাস বয় সেইদিকে পাল ঘুরে যায়। অটোমেটিক ব্যবস্থা।

চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে জামিলের নাকি একটা আন্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে। তিনি জামিলকে বলেছেন আমাকে 'ক্লিন' করাবার জন্যে। তিনি শুনলাম দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। জামিল অবশ্যি আমার বন্ধু মানুষ। একসময় আমরা দু'জনে মিলেই চৌধুরী সাহেবের কিছু কাজকর্ম করেছি। এখন অবস্থা ভিন্ন। এখন আমি ভালোরকম বেকায়দায় আছি।

জামিল আমাকে খুঁজছে। আমিও জামিলকে খুঁজছি। কে কাকে আগে খুঁজে পায় সেটাই হচ্ছে কথা। রাতটা ভালো না। এই রাতে কিছু একটা হবেই।

[খুট্ করে শব্দ হবে। ফরিদ চমকে টর্চ ফেলবে।]

কে কে কে ?

মৌলানা — আসসালামু আলায়কুম।

আমি খবিরুদ্দিন। জামে মসজিদের পেশ ইমাম। ফরিদ ভাই, ভালো আছেন ?

ফরিদ — ভালো আছি। এখানে কী করছেন ?

মৌলানা — একটা দাওয়াত ছিল চৌধুরী সাবের বাসায়। ছোট নাতির মুসলমানি। চাপ খাওয়াদাওয়া হয়েছে। বিরাট আয়োজন। কাচ্চি বিরিয়ানি, একটা করে কাবাব, দই মিষ্টি। শরীরটা ভার হয়ে গেছে। হাঁটাহাঁটি করছি।

ফরিদ — খিদে তৈরি করছেন ?

মৌলানা — না, মানে ইয়ে...।

ফরিদ — করেন করেন হাঁটাহাঁটি করেন। তবে শোনেন, নিঃশব্দে হাঁটবেন না। এখন থেকে শব্দ করে হাঁটবেন।

মৌলানা — জি আচ্ছা।

ফরিদ — অনেক লোকজন ছিল বুঝি দাওয়াতে ?

মৌলানা — জি তা ছিল। বিরাট আয়োজন। খাসি জবাই হয়েছে ছয়টা। নিজেই জবহ করলাম। আলিশান খাসি। পনেরো সের করে গোস্ত হয়েছে আপনার।

ফরিদ — জামিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? জামিল ছিল না দাওয়াতে ? চিনেন তো জামিলকে ?

মৌলানা — জি চিনি। চিনব না কেন ?

ফরিদ — জামিল ছিল ?

মৌলানা — জি-না ছিল না। দেখি নাই।

ফরিদ — ঠিক আছে যান। শব্দ করে পা ফেলে ফেলে যান। চোরের মতো পা ফেলবেন না।

মৌলানা — জি আচ্ছা।

[শব্দ করে পা ফেলে যাবেন।]

ফরিদ লোকজন এখন আমার কথা শোনে। শব্দ করে পা ফেলতে বলেছি—শব্দ করে পা ফেলছে। যদি বলতাম, লাফিয়ে যাও, তাহলে লাফিয়ে লাফিয়ে যেত। হা হা হা।

[হঠাৎ হাসি থামিয়ে]

কে জামিল না ? জামিল!

[জামিল এগিয়ে আসবে]

কী খবর তোর, আছিস কেমন ?

জামিল [জবাব দেবে না।]

ফরিদ আজকাল মনে হয় নিঃশব্দ হাঁটা প্র্যাকটিস করছিস। এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলি বুঝতেই পারিনি। হাঁটা মনে হয় বদলে ফেলেছিস।

জামিল আগে যেরকম হাঁটতাম সেরকমই হাঁটি।

ফরিদ তাই নাকি ? তুই বদলাসনি তাহলে। আগের জামিলই আছিস ? গিয়েছিলি কোথায় ? চৌধুরীদের ওখানে নুনু কাটা উপলক্ষে বিরাট পার্টি হচ্ছে শুনলাম।

জামিল জানি না। অত খবর রাখি না।

ফরিদ খবর রাখিস না কথাটা তো ঠিক না জামিল।

জামিল বললাম তো খবর রাখি না। বিশ্বাস করা না-করা তোর ইচ্ছা।

ফরিদ এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ? অন্ধকারে ঘুরঘুর করছিস কেন ?

জামিল ঘুরঘুর করছি না। বাসায় যাচ্ছি।

ফরিদ রাতটা ভালো না জামিল। সাবধানে বাসায় যা। হা হা হা। নাকি কোথাও বসে আড্ডাফাড্ডা দিতে চাস ? অনেকদিন আড্ডা দেওয়া হয় না।

জামিল ঐসব ধান্ধাবাজি ছেড়ে দিয়েছি।

ফরিদ ভালোমানুষ হয়ে গেছিস ? গুড। এখন কি চাকরিবাকরিতে ঢুকে পড়বি ? নাকি ব্যবসা ? ব্যবসার ক্যাপিটেল চলে এসেছে তাহলে ? কত পেয়েছিস ? দশ না বিশ ?

জামিল তুই ফালতু কথা একটু বেশি বলছিস।

ফরিদ তাই নাকি ?

জামিল হ্যাঁ, তাই।

[জামিল এগিয়ে আসবে।]

ফরিদ বেশি কাছে আসিস না জামিল। একটু দূরে দূরেই থাক। রাতটা ভালো না। এটা একটা অন্যরকম রাত। এই রাতে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটে যায়। দেখছিস না কেমন মরা জোছনা। হা হা হা।

জামিল পাগলের মতো হাসছিস কেন? হাসির কী হয়েছে?

ফরিদ হাসির কিছুই হয় নাই। তোর সঙ্গে আমার একটা মিল আছেরে জামিল। তুই বাবা-মা'র তিন নম্বর সন্তান, আমিও তাই। বাবা-মা'র তিন নম্বর সন্তানটি হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা দু'জনই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানরে জামিল। মজার ব্যাপার না? চলে যাচ্ছিস নাকি? এই জামিল, জামিল।

[জামিল চলে যাবে।]

যাবি আবার কোথায়? তোকে আসতে হবে। এবং আজ রাতেই আসতে হবে। এটা একটা বিশেষ রাত।

[ফরিদের বড় বোনকে আসতে দেখা যাবে।]

সোমা এই ফরিদ! ফরিদ!

এখানে কী করছিস তুই? বক্তৃতা দিচ্ছিস নাকি?

ফরিদ কেমন আছ, আপা?

সোমা ভালো। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না?

ফরিদ আর কী জিজ্ঞেস করব?

সোমা এত রাতে কোথেকে এলাম? কী ব্যাপার?

ফরিদ আমার এত কৌতূহল নাই, আপা। একটা সময় আসে যখন মানুষের কৌতূহল কমে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, বাসায় যাও। রাতটা খারাপ।

সোমা আমি কুমিল্লা থেকে একা একা চলে এসেছি।

ফরিদ ভালো করেছ।

সোমা আর কোনোদিন ফিরে যাব না। দ্যাখ একবস্ত্রে এসেছি। সব ফেলে এসেছি।

ফরিদ আমাকে এসব বলছ কেন? আমি কি কিছু জানতে চাচ্ছি?

সোমা তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন?

ফরিদ আপা, বাসায় যাও।

সোমা তোদের কী হয়েছে বল তো ? রিকশা থেকে নেমেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। বাবা কয়েকটা ফকির-মিসকিনের সঙ্গে বসে আছেন। আমার মনে হয় বসে বসে গান গাইছেন—কী কথা বইলাছিল বিবি হাজেরায়। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার ? বাবা লজ্জা পাবেন বলে জিজ্ঞেস করিনি। তারপর একটু এগিয়েই দেখি তুই হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিস।

ফরিদ বাসায় যাও আপা।

সোমা তুই আয় আমার সঙ্গে, আমি একা একা যাব নাকি ?

ফরিদ আমার কাজ আছে। একজনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি যেতে পারব না।

সোমা রাস্তায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ?

ফরিদ হ্যাঁ রাস্তায়। আমি রাস্তার ছেলে আপা। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাস্তাতেই হবে। তুমি যেতে পার।

[সোমা চলে যেতে ধরবে]

ফরিদ এই মেয়েটির নাম সোমা। আমার বড় বোন। একটি চমৎকার মেয়ে। ও আশপাশে থাকলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে। বড় আপার সঙ্গে গল্পগুজব করতে। অনেকদিন বড় আপার সঙ্গে গল্প করা হয় না।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই যাওয়া যাবে না। আমাকে থাকতে হবে এখানেই। রাতটা ভালো না। রাতটা খারাপ, খুবই খারাপ। বড় আপা, তুমি একটা খারাপ রাতে সব ছেড়ে ছুড়ে ঘরে ফিরে এলে ? এটা ঠিক করোনি আপা। এটা ঠিক করোনি।

৩

মা, সোমা ও লীনা।

সোমা মা, তুমি কথা বলছ না কেন আমার সঙ্গে ? তুমিও যদি কথা বলা বন্ধ করে দাও তাহলে যাব কার কাছে ?

খুব চেষ্টা করেছি, মা। ও যা বলেছে তাই শুনেছি। গানবাজনার শখ ছিল, গানবাজনা ছাড়লাম। বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ভালো লাগত, তাও ছাড়লাম। শেষপর্যন্ত এক কামরার একটা ঘরে জীবনটা আটকে গেল। ঘর থেকে এক পা বেরুতে পারি না, যদি কোনো পুরুষমানুষ আমাকে দেখে ফেলে।

পরশু কী হয়েছে শোনো, ওর এক চাচাতো ভাই এসেছে। আমাকে দেখে বলল—কী ভাবি, আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। সারা দিন ঘরেই বসে থাকেন নাকি ? আর এতেই সবার সামনে ওর কী চিৎকার। কী সমস্ত জঘন্য কথা, মা। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। ওর চাচাতো ভাই লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেলল। আরও শুনবে ?

মা — না।

লীনা — জীবনটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো হলে খুব ভালো হতো, তাই না আপা ? গোড়া থেকে শুরু করা যেত। পিনটা উঠিয়ে এনে স্টার্টিং পয়েন্টে দিয়ে দেওয়া।

সোমা — মা, আমি চলে এসে কি ভুল করেছি ?

[মা জবাব দেবেন না।]

এমন সব ব্যাপার আছে মা, যা তোমাকে বলা যাবে না। শুধু এটুকু বলি—আমি খুব চেষ্টা করেছি। সব চেষ্টারই একটা শেষ আছে। আমিও তো মানুষ।

মা — যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়।

[সোমা উঠে চলে যাবে। তার পেছনে পেছনে যাবে মা ও লীনা। বাবা ঢুকবেন, কাপড় ছাড়তে থাকবেন। ঢুকবে লীনা।]

লীনা — আরে বাবা তুমি ? কখন এসেছ ?

বাবা — এই তো কিছুক্ষণ।

লীনা — হয়েছে কী তোমার ?

বাবা — কিছু হয় নাই। শরীরটা একটু খারাপ। মাথা ঘুরছে।

বাবা — [মানিব্যাগ খুলে মেয়ের হাতে দেবেন] লীনা, দেখ তো এর মধ্যে কত টাকা আছে। ভালো করে গুনবি।

লীনা — ব্যাপারটা কী ? এক হাজার আছে।

বাবা — এক হাজার টাকাই মানিব্যাগে ছিল। সেখান থেকে একটা ভিখিরিকে একশ' টাকা দিলাম। কাজেই ন'শ টাকা থাকার কথা, আছে এক হাজার। এর মানে কী ?

লীনা — একশ টাকা তুমি ভিখিরিকে দিয়েছ ? বলছ কী এসব ? কী সর্বনাশ!

বাবা — ন'শ থাকার কথা, আছে এক হাজার। Why ?

লীনা — একশ' টাকা কেউ কাউকে ভিক্ষা দেয় ? তাও তোমার মতো মানুষ ? এক টাকা রিকশা ভাড়া কমাবার জন্যে যে এক ঘণ্টা রিকশাওয়ালার সঙ্গে তর্ক করে ?

বাবা — একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে লীনা। আজ একজন পাগল ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা হলো। কেমন সব কথাবার্তা বলতে লাগল। সে নাকি মহাপুরুষ—এসেছে জগতের কল্যাণের জন্যে!

লীনা — আর তাতেই ইমপ্রেসড্ হয়ে তুমি তাকে একশ' টাকা দিয়ে দিলে ? বলো কী ? এত বোকা তো তুমি কখনো ছিলে না।

বাবা — টাকাটা ওকে দেইনি। দিয়েছি অন্য লোককে। এক অন্ধ ভিখিরিকে। তবে আমার মনে হয় ঐ মহাপুরুষ আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। সে না থাকলে আমি নিশ্চয়ই দিতাম না। আমি মানুষ হিসেবে কৃপণ। দ্যাট আই অ্যাডমিট। I do admit.

লীনা — তুমি কৃপণ না, তুমি রাম কৃপণ। বাংলাদেশী শাইলক।

রমিজ — সে বলছিল, সে এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগানোর জন্যে।

লীনা — এরকম কথাবার্তা আজকাল লোকজন হরদম বলছে। বাবা শোনো, সবাই আমরা একটা দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমরা সবাই চাই সমাজের কিছু একটা করতে। কিন্তু করতে পারি না। মনে মনে আমরা সবাই মহাপুরুষ। আমাদের মধ্যে কিছু দুর্বল মানুষ আছে যারা সেটা সহ্য করতে পারে না। একসময় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে থাকে তারা মহামানব। মাথার নাটবল্টু খুলে পড়ে যায় আর কী।

ফার্মগেটের কাছে তুমি নেংটি পরা এক বুড়োকে দেখবে যে চেঁচাচ্ছে—আমি ইসা নবী, ইয়াজুজ মাজুজকে শায়েস্তা করবার জন্যে এসেছি।

রমিজ — কিন্তু ঐ লোকটা আমার নাম জানে। কেমন করে আমার নাম জানল সে ? কোনোদিনই আমার সঙ্গে যার দেখা হয়নি।

লীনা — বাবা, এই পাড়ায় তুমি পঁচিশ বছর ধরে আছ। এখানকার সবাই তোমার নাম জানে। সেও জানে। সে নিশ্চয়ই এ পাড়ারই ছেলে। তুমি তাকে চিনতে পারনি, কারণ বেশিরভাগ মানুষকেই তুমি চেনো না।

রমিজ — আর ন'শ টাকা থেকে এক হাজার হলো কীভাবে ?

লীনা খুব সোজা। আসলে তোমার মানিব্যাগে ছিল এগারশ' টাকা। নতুন নোট। একটির গায়ে একটি লেগেছিল।

[রমিজ সাহেব চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াবেন। সিগারেট ধরাবেন।]

লীনা বাবা শোনো, আমি একশ' টাকা নিয়ে নিলাম। তোমার ন'শ টাকা থাকার কথা। এখন ন'শ টাকাই আছে।

রমিজ ঠিক আছে। নিয়ে নে।

লীনা [খুবই অবাক] বাবা, তোমার হয়েছেটা কী ? এক কথায় দিয়ে দিলে ? যেখানে তোমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা বের করতে আমার রক্ত পানি হয়ে যায়।

[মা ঢুকবেন।]

মা লীনা, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর সে মাঠের মধ্যে বসে কী করছিল।

বাবা কিছু করছিলাম না সুরমা।

মা জিজ্ঞেস কর, তার সঙ্গে কারা কারা ছিল।

লীনা বাবার সঙ্গে ছিলেন একজন প্রেরিত মানুষ। মহামানব। তিনি কী না কী বলেছেন বাবাকে, তারপর থেকেই বাবা একেবারে চেঞ্জড্ ম্যান। যে যা চাচ্ছে বাবা তাকে তাই দিয়ে দিচ্ছে। এক ভিখিরিকে দিয়েছে একশ'। আমাকে একশ'। এই দেখো। তুমি চাইলে তোমাকেও দেবে।

মা মদ খেয়ে এসেছে তাই এরকম করছে। গন্ধ পাচ্ছিস না। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে।

লীনা না না, বাবা আজ কিছু খায়নি। তাই না, বাবা ?

বাবা খেয়েছি মা।

মা মাতাল। বদ্ধ মাতাল। হায়রে নসিব।

[ভেতরে ঢুকে যাবেন]

লীনা কী আছে এর মধ্যে যে রোজ রোজ খেতে হয় ?

বাবা কিছুই নেই মা, কিছুই নেই।

লীনা কিছুই নেই তাহলে রোজ খাও কেন ?

[বাবা চুপ করে থাকবেন। লীনা বাবার মানিব্যাগ থেকে আরও একটি নোট বের করবে।]

লীনা বাবা শোনো, আমি আরেকটা নোট নেই ? দু'শ টাকা হলে আমার খুব উপকার হয়, বাবা। আমার খুবই দরকার।

রমিজ নিয়ে যা।

লীনা Strange! টাকাটার আমার দরকার ছিল না। তোমাকে টেস্ট করবার জন্যে এটা করলাম। মহাপুরুষ তো দেখি তোমাকে দারুণ ইনফ্লুয়েন্স করেছে। ব্যাটাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রমিজ লীনা, তোর মা'কে গিয়ে বল মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর কোনোদিন খাব না। নেভার নেভার নেভার।

লীনা বলো কী ?

রমিজ Yes. Yes, I speak the truth.

লীনা এসব তুমি নেশার ঝোঁকে বলছ বাবা, নেশা কাটলে কিছুই মনে থাকবে না।

রমিজ আনন্দ স্পর্শ করুক আমার হৃদয়। জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক আমার দিকে। কল্যাণ এবং মঙ্গল ঘিরে থাকুক আমাকে।

[মা ঢুকবেন।]

লীনা [উদ্বিগ্ন] মা শোনো, বাবা বিজবিজ করে কী সব যেন বলছে।

মা মাতালের কাণ্ড। বলতে দে। বলুক যা ইচ্ছা।

[চলে যেতে থাকবেন]

বাবা সুরমা, শোনো শোনো। তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি। অত্যন্ত জরুরি। ডাকো সবাইকে, ডাকো। ফরিদকে ডাকো। ফরিদ কোথায় ?

লীনা ভাইয়া তো বাবা বাসায় নেই। সে কয়েকদিন ধরেই আসছে না।

[ঘরে ঢুকবে সোমা। গম্ভীর মুখ।]

বাবা আরে আরে সোমা, তুই—তুই কোত্থেকে ?

সোমা বাবা, ভালো আছ ?

বাবা কখন এসেছিস ?

সোমা সন্ধ্যায়।

বাবা জামাই। জামাই কোথায় ?

সোমা [নিশ্চুপ]

বাবা জামাই আসেনি কেন ?

লীনা বাবা, দুলাভাই ছুটি পায়নি তো তাই আসেনি। ছুটি পেলে আসবে।

বাবা সোমা একা একা এতদূর চলে আসল!

লীনা — একা একা যদি মেয়েরা ইংল্যান্ড, আমেরিকা যেতে পারে, তাহলে কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসতে পারবে না ? খুব পারবে।

বাবা — আমার সোমা মা সন্ধ্যাবেলা এসেছে আর আমাকে কেউ কিছু বলল না। কেন আমাকে কেউ কিছু বলে না ?

মা — বলবে কীভাবে ? তুমি তো সে সময় নাচ গান করছিলে।

[বাবা থমকে যাবেন।]

বাবা — বসো বসো, তোমরা সবাই বসো। তোমাদের আমি একটা জরুরি কথা বলব। সোমা, মা আমার কাছে এসে বস। আমার মা'র মুখটা এত মলিন কেন ? কী হয়েছে আমার মা'র ?

মা — সোমা তুই সরে বস। বমি করে এক্ষুণি সব ভাসাবে।

সোমা — আহ্ মা, তুমি চুপ করো তো।

বাবা — সবাই এসেছে ? কাদের কোথায় ? কাদের, কাদের।

[কাদের ঢুকবে। এ বাড়ির কাজের ছেলে।]

কাদের বস বস। কাদেরকে বসতে দাও।

মা — কী আবোলতাবোল বলছ ? ওর জন্যে সোফা দিতে হবে নাকি ?

কাদের — গরিব মাইনষেরে সোফা চিয়ার কে দিব আম্মা কন। আমরার বসন লাগব মাডিতে। গরিব মাইনষের খাটপালংক হইল গিয়া মাডি। বিষয়ডা কী ?

লীনা — চুপ কর কাদের। খামোকা ভ্যাজ ভ্যাজ করছে। একটা কথা বলবি না।

রমিজ — তোমরা সবাই শোনো, আজ আমি একটা প্রতিজ্ঞা করব। একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা। আজ থেকে আমি মদ স্পর্শ করব না। মিথ্যা বলব না। কারও সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করব না। We have only one life to live.

মা — তাই নাকি ?

রমিজ — হ্যাঁ তাই। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করব। ছুটির সময় দল বেঁধে বেড়াতে যাব কক্সবাজার। আমরা কেউ সমুদ্র দেখিনি। বিশাল সমুদ্র দেখব। জোছনা রাতে সী বিচে বসে থাকব। হুহু করে হাওয়া আসবে সমুদ্র থেকে। চারদিকে জোছনার চাদর।

লীনা — অপূর্ব অপূর্ব!

রমিজ কিংবা যাব সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। বুঝলি লীনা, যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার গিয়েছিলাম। সারা রাত আমরা চার বন্ধু চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বসে রইলাম। কী অদ্ভুত রাত ছিল সেটা। নিচে গহীন বন। অনেক দূরে সমুদ্র। রাত একটার দিকে চাঁদ উঠল। মরা জোছনা, কিন্তু কী যে সুন্দর।

মা কাদের, সাহেবের মাথায় পানি ঢাল। সাহেবের মাথা গরম হয়ে গেছে।

লীনা আহ্ মা, এসব কী ? এটা উচিত না, মা। বাবা আমাদের সত্যি সত্যি নিয়ে যাবে।

মা তোর বাবার সঙ্গে আমি তেত্রিশ বছর ধরে আছি। জিজ্ঞেস কর তো এই তেত্রিশ বছরে সে আমাকে ঢাকা শহরের বাইরে কোনোদিন নিয়ে গেছে কি না ?

রমিজ সুরমা, এইবার নিয়ে যাব। একটিমাত্র জীবন আমাদের। কোনোদিন তা বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। কেউ একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

মা তেত্রিশ বছরে যা বুঝতে পারনি, আজ তা বুঝে গেলে ? চমৎকার!

রমিজ দেরিতে হলেও তো পারলাম। কেউ কেউ তো তাও পারে না। সুরমা আমার কথা শোনো...।

মা শুনছি, তুমি আমার হাত ছাড়ো। এটা সিনেমা না। সিনেমার মতো ঢং করার দরকার নেই।

লীনা আহা, বাবা একটু হাত ধরতে চাচ্ছে ধরুক না। এতে কি তোমার হাত পচে যাচ্ছে ?

[মা একটি চড় বসিয়ে দেবেন মেয়ের গালে।]

মা বেশি ফাজিল হয়েছে। সবসময় রসিকতা। সবসময় ঠাট্টা।

রমিজ সুরমা প্লিজ শান্ত হও। প্লিজ। আমি জানি এই সংসারে আমি একজন পরাজিত পিতা, এবং পরাজিত স্বামী। তুমি আমাকে একটা সুযোগ দাও। আই শ্যাল উইন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি সব ফিরে পাবে।

মা সব ফিরে পাব ?

রমিজ হ্যাঁ, সব। সব। বিয়ের রাতে আমরা কী করেছিলাম মনে আছে সুরমা ? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলাম...।

মা আহ্ চুপ করো তো।

লীনা — না না, বাবা চুপ করবে না, তুমি বলো। আমাদের শুনতে ইচ্ছে করছে।

রমিজ — আবার সেই রাতের গভীর আনন্দ নিয়ে আসব তোমার মধ্যে। তোমার তেত্রিশ বছরের সব কষ্ট দূর করব।

সুরমা — লোকটা তোমাকে যথেষ্টই ইনফ্লুয়েন্স করেছে।

রমিজ — হ্যাঁ করেছে। যথেষ্টই করেছে।

লীনা — বাবা, লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাদেরকে পাঠাও তো নিয়ে আসুক। দেখতে সে কেমন ?

রমিজ — লম্বা। গায়ে চাদর।

মা — রাতদুপুরে পাগল ছাগল এনে ভর্তি করতে পারবি না। খবরদার। যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেছি। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

লীনা — না, না, ওকে আনতেই হবে। আমার ধারণা সে দারুণ একটা ক্যারেক্টার। সাক্ষাৎ দস্তয়োভস্কির কোনো উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে।

কাদের — লোকটা কেডা আফা ?

লীনা — একজন মহামানব, সুপারম্যান, মহাপুরুষ। সে এসেছে পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে। যার সঙ্গেই এর দেখা হবে সে-ই উদ্ধার পেয়ে যাবে। সে আর কোনো মন্দ কাজ করতে পারবে না। বাবার মতো কোনো কৃপণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে সেই কৃপণ হয়ে যাবে হাজী মোহাম্মদ মহসিন।

কাদের — কন কী আপা ? বড় কামেল আদমি মনে লয়। কোন তরিকার ?

লীনা — তরিকা ফরিকা জানি না। তবে এইটুকু জানি মা'র সঙ্গে যদি তার দেখা হয় তাহলে মা'র স্বভাব হয়ে যাবে মাখনের মতো। সবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলবে। তুই যদি পানির জগ ভেঙে ফেলিস মা বেতন থেকে জগের দাম কেটে রাখবে না। তাই না, মা ?

মা — লীনা, সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তোর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাদের, খবরদার কোথাও যাবি না। এটা পাগলাগারদ না। দুনিয়ার সব পাগল এখানে এনে জড়ো করা যাবে না।

[মা চলে যাবেন।]

কাদের — মুশিবতে পড়লাম। কার কথা হুনি ? ও আফা...

লীনা — যা যা—ওনাকে নিয়ে আয়।

কাদের — পীরসাব দেখতে কেমুন ?

লীনা মহাপুরুষরা যেরকম হয় সেরকম। নুরানী চেহারা, মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে। গায়ে রোমান সিনেটারদের মতো, সাদা চাদর, ভারী গম্ভীর গলা, অনেকটা দেবব্রতের মতো তাই না, বাবা ?

[বাবা অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াবেন]

লীনা কী হয়েছে ?

বাবা কিছু না কিছু না। শরীরটা ভালো না।

সোমা বাবার জ্বর। বাবা চলো, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

লীনা আপা, তুমি আবার চলে আসবে। আমরা মহামানব দেখব।

সোমা একজন মহামানবকেই ভালোমতো দেখেছি, আর দেখার শখ নেই। আমার শখ মিটে গেছে।

[সোমা বাবাকে নিয়ে চলে যাবে।]

লীনা কাদের, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

কাদের যদি আসতে না চায়। পীর মানুষ, এরা মিজাজে চলে। বিষয়ডা বুঝলেন আপা ? আল্লাওয়ালা আদমি, এদের মিজাজ মর্জিই অন্যরকম।

লীনা আসতে না চাইলে বেঁধে নিয়ে আসবি। ইনাকে আমাদের ভীষণ দরকার। ইনি এসে আমাদের সবাইকে ভালো করে দেবেন। তুইও ভালো হয়ে যাবি। তোর আর চুরি করতে ইচ্ছা হবে না।

কাদের এইটা কী কইলেন আপা ? গরিব বইল্যা যা মুখে আয় কইবেন ?

লীনা কাদের তুই এমন কথায় কথায় গরিব ধনী নিয়ে আসিস কেন বল তো ? শিখলি কোত্থেকে এসব ? বামপন্থী কথাবার্তা এ বাড়িতে চলবে না।

কাদের হ, তা চলব কেন ? গরিবের কোনোটাই চলে না। ধনীর সব চলে।

[চলে যেতে যেতে বলবে।]

লীনা মহাপুরুষ আসছেন। তাঁর জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। একটা সিংহাসন।

[একটা চেয়ার ঠিকঠাক করবে।]

একগুচ্ছ ফুল।

[ফুলদানি হাতে নেবে।]

এবং স্বাগত সঙ্গীত। সঙ্গীতের কী ব্যবস্থা করা যায় ?

আপা, আপা, আপা!

[সোমা ঢুকবে।]

'ওই মহামানব আসে' এই গানটা একটু গাইবে আপা ? অ্যাটমোসফিয়ারটা তৈরি হোক।

সোমা — আচ্ছা, তোর কি মন বলে কিছু নেই ? এই অবস্থায় গান গাইব ?

লীনা — বড় আর্টিস্টরা ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে থাকেন। তাঁদের নিজের দুঃখ তাদের শিল্পকে স্পর্শ করে না।

সোমা — আমি কোনো আর্টিস্ট না। আমি খুবই সাধারণ মেয়ে। আমার দুঃখটা আমার কাছে অনেক বড়।

[কাঁদতে শুরু করবে।]

লীনা — আরে আপা, ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড। এভাবে কেউ ভেঙে পড়ে ?

সোমা — আমি এখন কোথায় যাব বল ?

লীনা — দুলাভাইয়ের ঐ বাড়িটি ছাড়া তোমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এটা মনে করা ঠিক না। পুরনোকালের মেয়েরা এরকম ভাবত। তুমি পুরনোকালের মেয়ে নও। তুমি একালের মেয়ে। অনেক শক্ত মেয়ে।

সোমা — এসব বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। আর শুনতে ভালো লাগছে না। চুপ কর। তুই বড় বেশি কথা বলছিস।

লীনা — ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুমি গানটা গাও। লক্ষ্মী আপা। আমার মিষ্টি আপা, আমার টক আপা।

সোমা — কী সব ছেলেমানুষী করছিস ? এখন গান গাইতে হবে কেন ?

লীনা — কত বড় একজন মানুষ আসবেন। তাঁর জন্যে কয়েকটি লাইন সুর দিয়ে গাইব না ? আপা, তোমার পায়ে পাড়ি। লক্ষ্মী আপা। মজা করবার জন্যে গাওয়া। জীবন বড্ড ডাল হয়ে আছে। একটু ভেরিয়েশন আসুক। আপা, প্লিজ।

সোমা — ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে।
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।।
ওই মহামানব আসে।

[সোমার সঙ্গে লীনাও গাইবে এবং হঠাৎ থেমে যাবে কারণ তারা দেখবে লুঙ্গি ও বিরাট সফেদ পাঞ্জাবি পরা এক মওলানাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে কাদের এনে ঢুকিয়েছে। তাঁর হাতে নিমের দাঁতন। কাঁধে গামছা। তিনি রেগে অগ্নিশর্মা।]

মৌলানা — খবিস জানোয়ার, ঠেলছিস কেন ?

কাদের আপামণি, বহুত কষ্টে আনছি।

মৌলানা এই লোক তোমাদের বাসার ? আরে এই ইবলিস করছে কী ? এশার নামাজের আগে মেছোয়াক করছি আর এসে টানাটানি পাছরাপাছরি। আরে ব্যাটা, তুই দেখছিস আমি যাচ্ছি তোর সাথে, তারপরেও তুই পেটে ধাক্কা দেস কেন ? আবার হাসে হায়ওয়ান।

লীনা এত খারাপ গালাগালি দেবেন না মৌলানা সাহেব। অজু নষ্ট হয়ে যাবে। গালি দিলে অজু নষ্ট হয়ে যায়।

মৌলানা অজু করি নাই এখনো। তা বিষয় কী ? আমাকে দরকার কেন ?

[প্রবল বেগে দাঁত মেছোয়াক করতে থাকবে।]

লীনা তোকে না বলে দিলাম—গায়ে থাকবে চাদর ? দেখছিস না ওনার কাঁধে গামছা ?

কাদের আন্ধাইরে দেখমু কেমনে আপা ? চউখের মইধ্যে তো টর্চ লাইট ফিট করা নাই।

লীনা আপা, দেখেছ কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে ?

কাদের গরিবে মিষ্টি কথা কইলেও মনে হয় চ্যাটাং চ্যাটাং।

লীনা চুপ কর।

মৌলানা বিষয়টা কী অ্যা! বিষয়টা কী!

[ঘরের মধ্যে থুথু ফেলবেন।]

লীনা শোনেন মৌলানা সাহেব, ঘরের ভেতরে থুথু ফেলবেন না।

মৌলানা কোথায় ফেলব ?

কাদের মাঠের মইধ্যে গিয়ে ফেলেন। আল্লাহতালা অত বড় মাঠ বানাইছে খামোকা ? ছেপ ফেলবার জইন্যে বানাইছে।

মৌলানা ব্যাপারটা কী ? ঘরে মুরব্বি কেউ আছে ? আমি বিষয়টা জানতে চাই। পুরুষমানুষ কেউ নাই ?

[আবার ঘরে থুথু ফেলবেন।]

কাদের আহ্, আস্তে ফেলেন।

সোমা ভুল করে আপনাকে নিয়ে এসেছে, আপনি চলে যান। কাদের গিয়েছিল আমাদের একজন পরিচিত মানুষকে আনতে। ভুলে আপনাকে নিয়ে এসেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।

মৌলানা কেয়ামত নজদিক। নামাজের সময় গানবাজনা হয়। মানি ব্যক্তিরে এনে অপমান করা হয়। এই বাড়িতে পুরুষ কেউ নাই ? কার বাড়ি ?

সোমা রমিজ সাহেবের।

মৌলানা কিনা বাড়ি ?

সোমা জি-না, ভাড়া।

মৌলানা রমিজ সাবের নাম তো কোনোদিন শুনি নাই। নামাজে সামিল হন না বোধহয় ? আমি জামে মসজিদের পেশ ইমাম। আল্লাওয়ালা সব মুসুল্লিরে চিনি।

লীনা যারা আল্লাওয়ালা না, তাদেরকে চেনেন না ?

মৌলানা আল্লা যাদের চিনে না আমিও তাদের চিনি না।

লীনা আপনি তো তাহলে আল্লাহ্‌তালার খুব কাছের মানুষ। আপনার সঙ্গে তাঁর তাহলে খুব ভালো যোগাযোগ। ডাইরেক্ট ডায়ালিং।

সোমা লীনা চুপ কর তো।

লীনা আমার বাবাকে যখন চেনেন না, তাহলে সম্ভবত আমার ভাইকেও চেনেন না। ওর নাম ফরিদ।

মৌলানা ও আচ্ছা আচ্ছা, ফরিদ সাবের বাড়ি। আগে বলবেন তো। ফরিদ সাহেব কি আছেন বাসায় ?

লীনা না। ও তো বেশির ভাগ সময়ই বাসায় থাকে না।

মৌলানা ভালো লোক। বড় ভালো লোক। খুব হামদর্দি।

লীনা ভালো লোক কোথায় দেখলেন আপনি ? ও তো মহাগুণ্ডা।

মৌলানা কিন্তু দিল ভালো। দিলটাই আসল। আল্লাহ্‌পাক দিলটা দেখেন।

[মৌলানা আবার থুথু ফেলতে গিয়েও ফেললেন না।]

লীনা থুথু ফেলেলেন না যে ? গিলে ফেললেন বুঝি ?

সোমা তুই চুপ কর তো। মৌলানা সাহেব আপনি যান। আপনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।

মৌলানা না না কোনো বিরক্তের কথা না। বিরক্ত হব কেন! এ তো খুশির কথা। আনন্দের কথা। আচ্ছা ফরিদ সাবকে বলবেন আমার কথা। উনি আমাকে খুব পিয়ার করেন। খুব হামদর্দি মানুষ তো। বড় দিল। খুব বড় দিল।

লীনা স্লামালিকুম মওলানা সাহেব।

মৌলানা ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমুতুল্লাহে ওয়া বরকাতাহু।

[মওলানা সাহেব চলে যাবেন।]

লীনা কাদের, যা তুই আসল জিনিস নিয়ে আয়। চাদর গায়ের মহাপুরুষ আনতে বললাম, ব্যাটা নিয়ে এসেছে গামছা কাঁধের এক মৌলানা।

সোমা না, কাউকে আনতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

লীনা মোটেও যথেষ্ট হয়নি। আপা ঐ লোকটির সঙ্গে আমার সত্যি দেখা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি জানি সমস্ত ব্যাপারটাই বোগাস তবু বাবাকে দেখো না, কী রকম ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন।

সোমা বাবা হচ্ছেন ডুবন্ত মানুষ। ডুবন্ত মানুষ যা পায় তা-ই আঁকড়ে ধরে।

লীনা আমিও ডুবন্ত মানুষ, আপা। আমারও কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাদের, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? যা।

[কাদের চলে যাবে।]

কিচ্ছু ভালো লাগে না, আপা। সবাই কেমন হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই মরে যেতে ইচ্ছা করে।

সোমা ফরিদ বিরাট গুণ্ডা হয়েছে বুঝি ?

লীনা হ্যাঁ।

সোমা বাসায় এখন থাকে না ?

লীনা বাসাতেই থাকে, কয়েকদিন ধরে আসছে না। সবাই আমরা এরকম হয়ে যাচ্ছি কেন আপা ? কত দ্রুত আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি দেখছ ?

সোমা ফরিদ যে এরকম হয়ে যাচ্ছে বাবা তাকে কিছু বলেন না ?

লীনা না।

সোমা মা, মা বলেন না ?

লীনা কেউ কিচ্ছু বলে না। মা তো ভাইয়ার সঙ্গে কোনো কথাই বলে না। ভাইয়ার প্রসঙ্গ থাক। ভাইয়াকে নিয়ে আলাপ করতে ভালো লাগে না। চা খাবে ? চা নিয়ে আসি ?

[ফরিদ ঢুকবে। কেমন অন্যমনস্ক। অস্বস্তি বোধ করছে। এলোমেলো দৃষ্টি।]

সোমা কেমন আছিস ফরিদ ?

ফরিদ ভালো।

সোমা এরকম করছিস কেন ? কী হয়েছে তোর ?

ফরিদ কিছুই হয়নি। কী হবে ?

সোমা দু'বছর পর তোর সঙ্গে আমার দেখা। একবার অন্তত জিজ্ঞেস কর— কবে এসেছি। কখন এসেছি।

ফরিদ কারও জন্যে আমার এত প্রেম নেই।

সোমা তোর শরীর ভালো আছে তো ?

[উঠে গিয়ে গায়ে হাত দেবে।]

ফরিদ বললাম তো একবার শরীর ভালো আছে। গায়ে হাত দিচ্ছ কেন ? গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না।

সোমা আমার সঙ্গে তুই এরকম করে কথা বলছিস ?

ফরিদ আমি যেরকম ব্যবহার পাই সেরকম ব্যবহার করি। তুমি কি জানো এ বাড়িতে সবাই কেমন ব্যবহার করে আমার সঙ্গে ? যখন খেতে বসি কেউ এসে জিজ্ঞেস করে না, কী খাচ্ছি না খাচ্ছি। অথচ কাদের যখন খেতে বসে মা এসে জিজ্ঞেস করেন। তরকারি লাগবে কি না। ভাত লাগবে কি না।

[লীনা চা নিয়ে ঢুকবে। সোমাকে দেবে।]

লীনা তারপর, ভাইয়া তুমি কী মনে করে ? বেড়াতে এসেছ ?

ফরিদ গেট আউট! গেট আউট!

[লীনা উঠে চলে যাবে। বাবা এসে ঢুকবেন।]

বাবা কী হয়েছে ? হৈচৈ কিসের ?

ফরিদ কিছুই হয়নি। হবে আবার কী।

মা সোমা, ওকে এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বল।

সোমা কেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কেন ?

মা কোনো কেন নেই। ওকে এই বাড়িতে আমি দেখতে চাই না। এক্ষুণি চলে যেতে বল।

ফরিদ আমি চলে যাওয়ার জন্যেই এসেছি। দু'একটা কাপড়চোপড় নেব। যদি তোমাদের আপত্তি থাকে তাও নেব না। আছে আপত্তি ?

মা তোর যা যা নেওয়ার নিয়ে বিদেয় হ। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে দুপুররাতে চেঁচামেচি হৈচৈ করা যায় না।

[মা চলে যাবেন। ফরিদ একটা ব্যাগে কাপড় ভরতে থাকবে।]

বাবা কোথায় যাচ্ছিস ?

ফরিদ জানি না কোথায় যাচ্ছি।

বাবা তুই কি আমার উপর রাগ করেছিস ?

ফরিদ কারও উপর আমার কোনো রাগ নেই। রাগ যদি কিছু থাকে সেটা নিজের উপর।

বাবা বাবার যে সমস্ত কর্তব্য থাকে সেসব আমার পালন করা হয়নি। আমি ঠিক করেছি নতুন করে সব শুরু করব। তোর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। থেকে যা ফরিদ। সোমা, ওকে ভাত দে।

ফরিদ তুমি তো অদ্ভুত কথা বলছ, বাবা। এ বাড়িতে ইদানীং আর আমার জন্যে ভাত রান্না হয় না। আমি খেতে যাই চানমিয়ার হোটেলে। ওরা খুব যত্ন করে খাওয়ায় এবং পয়সা নেয় না। হা হা হা।

সোমা পয়সা নেয় না কেন ?

ফরিদ নেয় না, কারণ আমি এই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সবার ফরিদ ভাই। ফরিদ ভাইয়ের কাছ থেকে পয়সা চাইবে এত বড় সাহস কারও থাকার কথা নয়। আপা, জানালা দিয়ে দেখ তো কাউকে দেখা যায় কি না।

সোমা কাকে দেখা যাবে ?

ফরিদ জামিল। বেঁটেমতো এক শুয়োরের বাচ্চা। আমাকে খুন করার জন্যে ঘুরছে। ওর জন্যেই কিছুদিন পালিয়ে থাকতে হবে।

সোমা এইসব কী বলছিস তুই ?

ফরিদ সবরকম চাকরিতে কিছু প্রফেশনাল হ্যাজার্ড থাকে। আমি যে চাকরি করছি তাতেও আছে।

[ফরিদ বের হয়ে যেতে চাইবে।]

বাবা ফরিদ শোন, আমি এই সংসার ঢেলে সাজাব। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ফরিদ ঠিক হলে তো ভালোই। যাই, বাবা। আপা যাই। তুমি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছ।

[মা এসে ঢুকবেন।]

মা কী ব্যাপার, তুই এখনো যাসনি ?

ফরিদ যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। আরও আগেই চলে যেতাম, বড় আপাকে দেখে কেমন দ্রবীভূত হয়ে গেলাম। একটা পিছুটান তৈরি হয়ে গেল। চলি তাহলে ?

সোমা কী সব হচ্ছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এই রাতে কোথায় তাকে ঠেলে পাঠাচ্ছ ? ফরিদ, তুই চুপ করে বোস। মা, তুমি ঘুমুতে যাও।

মা বেশি আহ্লাদ দেখানোর কোনো দরকার নেই। ও যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক। ওর অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। ওর থাকার জায়গার অভাব হবে না।

ফরিদ সবাইকে সালাম টালাম করে বিদেয় হব কি না বুঝতে পারছি না। কি মা সালাম করতে হবে ? পা ধোয়া আছে ? পা ধোয়া থাকলে এগিয়ে এসো।

[হাসতে থাকবে।]

মা এর মধ্যে তোর হাসিও আসছে ? ভালো জিনিস পেটে ধরেছিলাম।

ফরিদ কেন ধরলে ? আমাকে পেটে ধরবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাধাসাধি করিনি ?

মা বেরিয়ে যা। এক্ষুণি বেরিয়ে যা। ছোটলোক শয়তান।

ফরিদ মা, আই অ্যাম সরি। যে কথাটি বলেছি সেটা মুখ ফস্‌কে বলা হয়েছে। আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। যাই।

[ফরিদ বের হয়ে যাবে।]

সোমা বাবা, যাও ঘুমুতে যাও।

বাবা ঘুমিয়েই ছিলাম। হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। দেখলাম একটা বিরাট মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছি। কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হতে লাগল...

সোমা থাক রাতেরবেলা আর স্বপ্ন বলতে হবে না। বাবা, তুমি ঘুমুতে যাও।

[বাবা ও মা চলে যাবেন। লীনা ঢুকবে।]

লীনা ভাইয়া কি চলে গেছে নাকি ?

সোমা হুঁ।

লীনা আমাকে দেখলেই রেগে যায়। অথচ বিশ্বাস করো আপা, আমি এখনো তাকে অন্য সবার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ও যখন একা একা খেতে বসে তখন তার পাশে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু আমাকে দেখলেই রেগে উঠে বলে থাকা হয় না।

সোমা ঘুমুতে চল লীনা।

লীনা তুমি ঘুমুতে যাও। আমি প্রতীক্ষা করব। মহাপুরুষকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব।

সোমা তুই মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস।

লীনা কোনো একটা আশা নিয়ে তো আমাদের বাঁচতে হবে। হবে না ?

৪

মঞ্চ অস্পষ্ট। খোলা মাঠ। একা একা ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকবে কাদের।

কাদের — এইডা কেডা ? ছোডভাই না ?

ফরিদ — [জবাব দেবে না।]

কাদের — ভাইজান, কথা কন না ক্যান ? ও ভাইজান ?

ফরিদ — বিরক্ত করিস না।

কাদের — যান কই ?

ফরিদ — কোথাও যাই না। দাঁড়িয়ে আছি। জোছনা দেখছি। তুই এখানে কী করছিস ?

কাদের — মশিবতের কথা আর কইয়েন না ছোডভাই। পীরসাবরে খুঁজতাছি। চাদ্দর গায়ে পীরসাব।

ফরিদ — বাড়িতে যা। বাড়িতে গিয়ে ঘুমো।

কাদের — আরে ভাইজান বাড়িত গেলে উপায় আছে ? আবার পাঠাইব, কইব—যা কাদের, পীর ধইর‍্যা আন। আরে পীর কি গাছের ফল, কন দেহি ভাইজান ? এরা আল্লাওয়ালা মানুষ। এরা হইল গিয়া আপনের...

ফরিদ — ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না।

কাদের — ভ্যাজর ভ্যাজর কি আর ইচ্ছা কইরা করি ? মনের দুঃখে করি। বুঝছেন ভাইজান, যে বাড়িত বিয়ার যুগ্যি মাইয়া থাকে সে বাড়িত বাসার কাম করন নাই। বিয়ার যুগ্যি মাইয়াডির মাথার ঠিক থাকে না। যেইডা মনে লয় করে। মাঝখান থাইক্যা গরিবের কাম শেষ।

ফরিদ — কাদের।

কাদের — জি।

ফরিদ — তোর কথা শেষ হয়েছে ?

কাদের — গরিবের কথার কি ভাইজান কোনো শেষ আছে ? শেষ নাই। আরম্ভও নাই শেষও নাই। গরিবের কথা হইল আপনের...

ফরিদ — কাদের!

কাদের — জি।

ফরিদ — তোর কাছে বিড়ি সিগারেট কিছু আছে ? থাকলে আমাকে দিয়ে বাড়ি চলে যা। আর একটি কথাও না।

[কাদের সিগারেট দেবে।]

কাদের ভাইজান, যাওনের আগে একটা কথা জিগাই।

ফরিদ [সিগারেট টানছে। জবাব দিচ্ছে না।]

কাদের ভাইজান, হুনলাম দেশে সমাজতন্ত্র হইব। ধনী মাইনষে রিকশা চালাইব আর আমরা দালানকোঠার মইধ্যে বইস্যা খানাখাদ্য খাইবাম। ঠিক নাকি ভাইজান ?

ফরিদ ঠিক হলে ভালো হয় ?

কাদের না। একটা কথার কথা কই। ধরেন আপনের আব্বা একটা রিকশা চালাইতাছেন তখন আমি হেই রিকশায় উঠি ক্যামনে ? আমার একটা শরম আছে ? আর আপনের আব্বারও তো একটা ইজ্জত আছে ? কী কন ভাইজান ?

ফরিদ যা বাড়িতে যা।

[দেখা যাবে চাদর গায়ে একটি লোক এগিয়ে আসছে।]

কাদের আরে আরে আরে—ভাইজান দেহেন সাদা চাদ্দর। সাদা চাদ্দর। আসসালামু আলাইকুম।

ফখরুজ্জামান আমাকে, আমাকে বলছেন ?

কাদের আপনের গায়ে এইটা কী সাদা চাদ্দর ?

ফখরুজ্জামান আমাকে বলছেন ?

কাদের এইখানে আপনে আছেন আর আপনের দুই কান্দে দুই ফিরিশতা আছে। আর কেডা আছে ? আমি হুজুরের একটু দোয়া চাই। খাসদিলে দোয়া করেন হুজুরে কেবলা।

[কদমবুসি করতে এগিয়ে যাবে]

ফখরুজ্জামান আরে কী আশ্চর্য। কী ব্যাপার ?

কাদের হুজুরের একটু কষ্ট কইরা আমার সাথে আওন লাগব। এট্টু কষ্ট করন লাগব।

ফখরুজ্জামান : কী মুশকিল। আপনি আমার কথাটা শোনেন।

কাদের কোনো শুনাশুনি নাই।

[হাত ধরে টানতে থাকবে।]

ফরিদ কাদের ছেড়ে দে। ওনাকে যেতে দে।

কাদের কী কন ছোডভাই ? সাদা চাদ্দর দেখতাছেন না ? আর কেমুন নুরানী চেহারা!

ফখরুজ্জামান : ভাইসাহেব, আপনি আমার কথাটা একটু শোনেন।

কাদের ভাইসাব কইয়া, ডাক দিয়া আমারে শরম দিয়েন না।

[কাদের তাকে টানতে টানতে নিয়ে বের হয়ে যাবে। ফরিদ মঞ্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগিয়ে আসবে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে শ্যামল ও ফজলু আসছে। ওরা ফরিদকে দেখে থমকে দাঁড়াবে।]

ফরিদ কে, ফজলু ?

ফজলু এই মাঠের মধ্যে বসে আছেন কেন ? ব্যাপার কী ফরিদ ভাই ?

ফরিদ জোছনা দেখছি। ভালো জোছনা হয়েছে। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?

শ্যামল একটা ছবি দেখলাম, ফরিদ ভাই। খামোশ। ছবি খারাপ না। ভালোই। কী কস ফজলু ?

ফজলু হুঁ, ভালোই। মাইরপিট আছে। ফরিদ ভাই, বসি আপনের সাথে ? মিঠা বাতাস।

ফরিদ বসে কী করবে, চলে যাও। রাতটা ভালো না।

ফজলু কী বললেন ফরিদ ভাই ?

ফরিদ বললাম রাতটা ভালো না। খুব খারাপ রাত। বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। এরকম রাতে বাইরে থাকা ঠিক না।

ফজলু আপনার কী হয়েছে, ফরিদ ভাই ?

ফরিদ কিছুই হয় নাই। তোমরা কি জামিলকে দেখেছ ?

শ্যামল হ্যাঁ, দেখলাম তো কাঁঠালগাছটার নিচে বসে আছে। ডাকলাম, কথা বলল না।

ফরিদ [উত্তেজিত] বসে আছে কাঁঠালগাছের নিচে ? তাই নাকি ? আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম। আমার আশেপাশেই ওর এখন থাকার কথা। যাও, যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চলে যাও, চলে যাও।

[ওরা চলে যাবে। ফরিদ ছুটে যাবে কাঁঠাল গাছের দিকে। একটা ভয়াবহ আর্তচিৎকার শোনা যাবে।]

৫

লীনাদের বাড়ি। লীনা একা। কাদের, চাদর গায়ের একটি লোককে নিয়ে ঢুকবে।

কাদের আসেন হুজুর আসেন। নিজের বাড়ি মনে কইরা ঢুকেন। আপা, ছোডআপা, হুজুর কেবলারে আনছি। আসতে কি চায় ? জবর কষ্ট হইছে। টানাটানি। ঠেলাঠেলি।

[লীনা এসে ঢুকবে।]

লীনা স্লামালিকুম। আপনি কেমন আছেন ?

লোক জি ভালো।

লীনা আসতে কোনো তকলিফ হয়নি তো ?

লোক জি-না।

লীনা কাদের, একটা হাতপাখা এনে ইনাকে বাতাস কর তো। আমাদের বসার ঘরের ফ্যানটা নষ্ট।

লোক বাতাস লাগবে না।

কাদের এরা আপা পীর ফকির মানুষ, ঠান্ডা গরমে এরার কিছু হয় না।

লোক মানে আমি ঠিক ইয়ে কী যেন বলে.. কেন আমাকে আনল...

লীনা আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

লোক আমাকে দরকার ? এইসব কী বলছেন ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই লোক আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি ভয়ে অস্থির। দিনকাল খারাপ। আমি এক গ্লাস পানি খাব।

লীনা কাদের, ইনাকে ঠান্ডা দেখে এক গ্লাস পানি এনে দে। আপনার নাম কী ?

লোক আমার নাম ফখরুজ্জামান। মুহম্মদ ফখরুজ্জামান।

লীনা কী করেন আপনি ?

লোক প্রাইভেট টিউশনি করি। উকিল সাহেবের দুই মেয়েকে পড়াই। কণা আর বিনু, থ্রিতে পড়ে দুজনেই। ওদের পড়ানো শেষ করে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি তখন এই লোক টানাটানি শুরু করেছে। আমার স্যান্ডেল ছিঁড়ে ফেলেছে এই দেখেন।

লীনা একটা ভুল হয়ে গেছে। কাদের ভেবেছে আপনি একজন মহাপুরুষ। কাজেই সে আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

লোক কী বললেন ঠিক বুঝলাম না।

লীনা ও ভেবেছে আপনি একজন মহামানব, একজন জগতত্রাতা। আপনি এসেছেন আমাদের পথ দেখানোর জন্যে।

লোক সোবাহান আল্লাহ! কেন ?

লীনা কারণ, একজন মহামানব সত্যি সত্যি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনার মতোই একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমরা তাঁকেই আনতে পাঠিয়েছিলাম। সে ভুল করে একজন প্রাইভেট টিউটর ধরে নিয়ে এসেছে।

লোক আমি তাহলে উঠি ? এগারোটার পর বাস পাওয়া যায় না। আমি থাকি শান্তিনগর। তিন নম্বর বাস ধরব।

লীনা মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে থাকতে পারেন। কাদের আবার যাবে। কাদের!

কাদের জি-না আপা। আমার ঘুম ধরছে।

লীনা এখনই ঘুম ধরেছে মানে ? এগারোটাও এখনো বাজেনি।

কাদের গরিব হইছি বইল্যা কি আমরার চউক্ষে ঘুমও আসত না ? এইটা আপা কেমুন কথা কইলেন ? আমি যাইতেছি না।

[কাদের ভেতরে চলে যাবে।]

লীনা কাদের যা। এই শেষবার। আর বলব না। শুনুন ফখরুজ্জামান সাহেব, আপনি ববং থাকুন। মহাপুরুষ এলে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

লোক আমার কোনো সমস্যা নাই।

লীনা [খুবই অবাক] সমস্যা নেই। বলেন কী ? এই প্রথম একজন লোক পাওয়া গেল যার কোনো সমস্যা নেই। আপনি তাহলে সুখী মানুষ ?

লোক জি, আমি মোটামুটি সুখী। তিনটা টিউশনি করি, এক হাজার টাকা পাই, মেসে দেই আপনার পাঁচশ'। থাকা আর দু'বেলা খাওয়া। সকালের নাশতাটা নিজের কিনতে হয়। দেশের বাড়িতে দু'শ টাকা পাঠাই। তারপরও আপনার প্রতি মাসে কিছু থাকে।

লীনা বাহ চমৎকার তো!

লোক শুক্রবারে কোনো টিউশনি করি না। নিজের মনে ঘুরে বেড়াই।

লীনা আহ্ কী চমৎকার। শুক্রবারে উইকএন্ডিং ? মজা করে ঘুরে বেড়ান ? কোথায় কোথায় যান ?

লোক তেমন কোথাও না। ইয়ে মাঝে মধ্যে নিউমার্কেটে আসি। দুই নম্বর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। বড় ভালো লাগে। কোনো কোনো সপ্তাহে আবার সারা দিন ঘুমাই। নাশতা খেয়ে ঘুমাই, দুপুরবেলা উঠে ভাত খেয়ে আবার ঘুমাই।

লীনা বিয়েটিয়ে করেননি বোধহয় ?

লোক জি-না। যা রোজগার তাতে বিয়েটা ঠিক...।

লীনা সম্ভব না। সারা জীবন আপনি সম্ভবত টিউশনি করবেন। বিয়েটিয়ে করতে পারবেন না।

লোক তা মানে ইয়ে কী যেন বলে...।

লীনা কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে এই বাংলাদেশে সেসব দেখার মতো পয়সা আপনার কোনোদিন হবে না। সমুদ্র দেখেছেন কখনো ?

লোক জি-না।

লীনা এত কাছে সমুদ্র সেটা কোনোদিন দেখতে পারবেন না এর জন্যে খারাপ লাগে না ?

লোক সমুদ্রে দেখবার কী আছে ? খালি পানি।

লীনা তা তো ঠিকই। পানি দেখে লাভ কী ? বাথরুমে ঢুকে কল ছেড়ে দিলেই তো পানি দেখতে পারি। পাহাড় পর্বত দেখে লাভ নেই। পাহাড় পর্বত হচ্ছে বালি এবং পাথরের তৈরি। বালি এবং পাথরের পাহাড় দেখে কী হবে ?

লোক না মানে ইয়ে কী যেন বলে...।

লীনা চা খাবেন ?

লোক জি-না। আমি চা খাই না। চা শরীরের জন্যে ভালো না।

লীনা সিগারেটও নিশ্চয়ই খান না ?

লোক জি-না। একটা বাজে খরচ। স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না।

লীনা এত কিছু করেও তো আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই। আপনার আলসার আছে। আছে না ?

লোক [অবাক] কীভাবে বুঝলেন ? আমার সত্যি সত্যি আলসার আছে। মাঝে মাঝে তলপেটে চিলিক দিয়ে ব্যথা হয়।

লীনা যখন ব্যথা হয় তখন আপনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান। কারণ আপনি এলোপ্যাথি বিশ্বাস করেন না।

লোক আরে কী আশ্চর্য। কীভাবে বুঝলেন ?

লীনা আন্দাজে বলছি। যাদের দামি ওষুধ কিনবার পয়সা থাকে না, তারা এলোপ্যাথি বিশ্বাস করে না। আপনি একজন হতদরিদ্র ব্যক্তি। এই শীতেও আপনার সোয়েটার বা কোট না থাকায় চাদর গায়ে দিচ্ছেন। আপনার পায়ে আছে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।

লোক টাকাপয়সা তো চাইলেই হয় না। সবই আল্লাহর হুকুম।

লীনা ঠিক বলেছেন। আল্লাহর হুকুম। কিন্তু এত লোক থাকতে বেছে বেছে আপনার উপরই আল্লাহর এরকম হুকুম হলো কেন ? কেন আল্লাহ ঠিক করে রাখল এই লোকটি সারা জীবন প্রাইভেট টিউশনি করবে ? বিয়ে করতে পারবে না। শীতের রাতে চাদর গায়ে দিয়ে ঘুরবে। পায়ে থাকবে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। এসব প্রশ্ন কখনো করেছেন ?

লোক কাকে করব ?

লীনা মহাপুরুষ আসবেন, তাকে জিজ্ঞেস করেন।

[সোমা ঢুকবে।]

এসো আপা, পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন ফখরুজ্জামান। একজন সুখী মানুষ। এর জীবনে কোনো সমস্যা নেই। আর ইনি আমার আপা, একজন অসুখী মহিলা। এর জীবনে অসংখ্য সমস্যা।

লোক স্লামালিকুম।

[সোমা কোনো জবাব দেবে না।]

লীনা এই যে ভাই সুখী মানুষ, আপনি এবার যেতে পারেন। এ বাড়িতে সুখী মানুষের কোনো স্থান নেই।

লোক চলে যাব ?

লীনা হ্যাঁ চলে যাবেন। স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে নিন। ছেঁড়া স্যান্ডেল পরে যেতে পারবেন না।

[লোকটি স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে।]

সোমা এই লোকটা কে ? এতক্ষণ কী কথা বলছিলি ?

লীনা সুখী মানুষদের নিয়ে কথা বলছিলাম, আপা।

সোমা তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?

লীনা বোধহয় হয়েছে। চলো, আপা শুয়ে পড়ি। মহামানবের দেখা পাওয়া গেল না। খুব শখ ছিল দেখা করার।

[হঠাৎ দরজা খুলে যাবে। দেখা যাবে ফরিদ ফখরুজ্জামান সাহেবের হাত ধরে তাকে নিয়ে আসছে। ফখরুজ্জামানের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। তার সাদা চাদরে ও গায়ে রক্তের ছোপ। সে কাঁপছে থরথর করে।]

সোমা কী হয়েছে ?

ফরিদ ইনাকেই জিজ্ঞেস কর কী হয়েছে।

লোক আমি পানি খাব। আমাকে পানি দেন। আমাকে ঠান্ডা পানি দেন।

লীনা ব্যাপারটা কী ?

ফরিদ মুশিবত যাকে বলে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ শুনি চিৎকার। দৌড়ে গিয়ে দেখি এই লোক একটা মরা মানুষকে জড়িয়ে ধরে রাস্তায় শুয়ে আছে। মরা মানুষটার পেটে এত বড় এক ছোরা।

লীনা বলছ কী তুমি ভাইয়া ?

লোক — আমাকে ঠান্ডা পানি দেন। খুব ঠান্ডা এক গ্লাস পানি। ইটের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মরা মানুষটার গায়ে পড়ে গেছি। ইয়া রহমান, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু, ইয়া কুদ্দুসু। আমি খুন করি নাই। আমি কেন খামোকা খুন করব। বিশ্বাস করেন।

লীনা — খুনের কথাটা আসছে কোত্থেকে ? খুনের কথা কেন বলছেন ?

লোক — [ফরিদকে দেখিয়ে] ইনি বলতেছেনে। ভাইজান একটা কোরান শরীফ আনেন আমি ছুঁয়ে বলব। ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু। আমার কাপড়গুলি ধোয়া দরকার। এই কাপড় পরে বাইরে গেলেই পুলিশ আমাকে ধরবে। এক বালতি পানি আর সাবান দেন। আর ঠান্ডা এক গ্লাস পানি দেন। বড় পিয়াস লাগছে।

লীনা — আপনি চুপ করে বসুন তো। আপনার কোনো ভয় নাই।

ফরিদ — যথেষ্ট ভয় আছে। অবস্থা যা পুলিশের কাছে প্রমাণ করা খুব কষ্ট হবে যে খুনটা উনি করেননি।

ফখরুজ্জামান — ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকাল মউতে, ইয়া কুদ্দুসু, ইয়া গাফফারু। ইয়া জাহহারু। একটু বাতাস করেন আমাকে। বড় গরম। উফ বড় গরম। ভাইজান শোনেন আমি কিচ্ছু করি নাই। অন্ধকারে বুঝতে পারি নাই। গায়ের উপর পড়ে গেছি।

৬

নীল রঙের শার্ট পরা একটি যুবক হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার পাশে মরে পড়ে আছে। নেপথ্য থেকে বিভিন্ন রকম হত্যা-সংবাদ পাঠ করা হতে থাকবে।

১ম সংবাদ

(পাঠ করবেন একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ)

নারায়ণগঞ্জ, ৩ মে মঙ্গলবার, এগারো বছর বয়েসী একটি বালিকার মৃতদেহ নয়াবাজার এলাকার একটি ডাস্টবিনের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বালিকাটির কোনো পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই। জোর পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

২য় সংবাদ

(পাঠ করবেন একজন বৃদ্ধা মহিলা)

কাওরান বাজারের গলিতে গতকাল গভীর রাত্রিতে অজ্ঞাতনামা এক আততায়ীর

হাতে অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব রহমতউল্লাহ্ প্রাণ হারান। মরহুম রহমত উল্লাহ্‌র নামাজের জানাজা আগামীকাল বাদ আছর মরহুমের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর, পাংশায় অনুষ্ঠিত হইবে।

৩য় সংবাদ

(পাঠ করবে একজন অল্পবয়স্ক বালিকা)

গতকাল রাত আনুমানিক ১১ ঘটিকায় জনৈক পথচারীর হাত হইতে স্যুটকেস ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। একজন পান-বিক্রেতা এই সময় তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসে। ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত করে। হাসপাতালে যাইবার পথে এই হতভাগ্য পান-বিক্রেতার মৃত্যু ঘটে। নিহত ব্যক্তির অন্যকোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

একজন একজন করে মৃতদেহটি ঘিরে ভিড় জমে উঠবে।

একজন প্রৌঢ়কে আসতে দেখা যাবে।

প্রৌঢ় — একটা ডেডবডি নাকি পাওয়া গেছে ? কারও হাতে টর্চ আছে নাকি ? দেখি ভাই টর্চটা মারেন তো ? হুঁ Young blood. পেতি মস্তান। সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। একসময় দাড়ি রেখেছিল। এরা কোনো জিনিসই বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। দাড়ি ফেলে দিয়ে গোঁফ রেখেছিল, তারপর একদিন দেখি মাথা কামিয়ে ফেলেছে। হা হা হা।

২য় ব্যক্তি — আহ্ হাসছেন কেন ?

পৌঢ় — কেন হাসলে আপনার অসুবিধা আছে ? নাকি কোনো নিয়ম আছে যে হাসা যাবে না ?

২য় ব্যক্তি — দেখছেন একটা মানুষ মরে আছে।

প্রৌঢ় — এসব আগাছা মরে থেকেও যা বেঁচে থেকেও তা, বরং পপুলেশন প্রবলেমের একটা কিনারা হচ্ছে। এরা নিজেরা নিজেরা কামড়াকামড়ি করে শেষ হয়ে গেলে আপনারও সুখ, আমারও সুখ।

২য় ব্যক্তি — ঠিক আছে চুপ করেন।

প্রৌঢ় — আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন ? শোনেন ভাই, এই সোসাইটিতে মৃত্যু কোনো দুঃখজনক ব্যাপার নয়। মৃত্যু হচ্ছে মোটামুটি একটা আনন্দের ব্যাপার। চল্লিশায় খানাপিনা হবে, ফকির মিসকিন টাকাপয়সা পাবে। পুলিশ ধরপাকড় করবে, সেখানেও কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। হা হা হা।

৩য় — পুলিশ এসেছে নাকি ?

প্রৌঢ় আসবে আসবে। এবং যথাসময়ে দেখবেন এই মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক নাই এমন কিছু লোকজন বেঁধে নিয়ে যাবে। বিচার হবে এবং সবচেয়ে যে নির্দোষ তার ফাঁসি হয়ে যাবে।

[অনেকেই হেসে উঠবে। এই হাসির মধ্যেই মঞ্চে আসবেন জামিলের মা। তাকে দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যাবে। জামিলের মা'র শাড়ির আঁচল ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। মা এসে জামিলের মাথা কোলে তুলে নেবেন।]

মা জামিল। আমার জামিল। আমার ময়না। আমার ময়না। ও জামিলরে, ও জামিলরে। আমি এর বিচার চাই। আমি এর বিচার চাই। ও ময়না ও ময়না আমার ময়না।

[কাঁদতে থাকবেন।]

৭

মঞ্চের মাঝখানে ফখরুজ্জামান।

একটি জেলখানার মতো জায়গা। তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে নেপথ্য থেকে। সে জবাব দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তার দু'একটি উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হেসে উঠছে। সেই হাসির শব্দও হচ্ছে নেপথ্যে।

প্রশ্ন আপনি বলছেন আপনি খুন করেননি ?

ফখরুজ্জামান জি-না জনাব। আমি একজন দরিদ্র মানুষ।

প্রশ্ন আপনি বলতে চাচ্ছেন দরিদ্র মানুষরা খুন করে না ?

[হাসির শব্দ।]

ফখরুজ্জামান বিশ্বাস করেন আমার কথা। আমি মিথ্যা কথা বলি না জনাব।

প্রশ্ন তাহলে বলেন সেদিন কী হয়েছিল ?

ফখরুজ্জামান প্রাইভেট টিউশনি শেষ করে বাড়ি যাচ্ছিলাম, তখন ডেড বডিটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই।

প্রশ্ন সেটা ক'টার সময় ঘটল ?

ফখরুজ্জামান সাড়ে এগারোটায়।

প্রশ্ন কিন্তু আপনি তো ছাত্র পড়ানো শেষ করলেন ন'টার সময়। বাকি সময়টা কী করলেন ?

ফখরুজ্জামান আমি রমিজ সাহেবের বাড়িতে ছিলাম। তার ছোট মেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

প্রশ্ন পরিচয় ছিল সেই মেয়ের সঙ্গে ?

ফখরুজ্জামান : জি-না জি-না। ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন!

প্রশ্ন শুধু শুধু একটা মেয়ে রাত ন'টার সময় আপনাকে বাসায় ডেকে নিয়ে যাবে ?

ফখরুজ্জামান : আমার গায়ে সাদা চাদর ছিল তো এইজন্যে।

প্রশ্ন সাদা চাদর গায়ে থাকলেই মেয়েরা ডেকে নিয়ে যায় তা তো জানতাম না।

[সবাই হেসে উঠবে।]

ফখরুজ্জামান জি-না জনাব, উনি মনে করলেন আমি একজন মহাপুরুষ।

প্রশ্ন আবোলতাবোল কথা বলছেন কেন ? আপনি কি পাগল সাজার চেষ্টা করছেন ?

ফখরুজ্জামান জি-না জনাব। আমাদের বংশের মধ্যে কোনো পাগল নাই। আমার এক বড় বোনের হ্যাজবেন্ড আছে পাগল। সে তো আমাদের বংশের না...। সে যে পাগল এটা আমরা আগে বুঝতে পারি নাই। আগে বুঝতে পারলে বিয়ে দিতাম না।

প্রশ্ন ফখরুজ্জামান সাহেব।

ফখরুজ্জামান জি!

প্রশ্ন আমি যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার উত্তর দেবেন। বাড়তি কথা বলবেন না।

ফখরুজ্জামান : জি আচ্ছা।

প্রশ্ন যেহেতু আপনার গায়ে সাদা চাদর ছিল সেই হেতু মেয়েটি আপনাকে ডেকে নিয়ে গেল। এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা গল্পগুজব করল।

ফখরুজ্জামান : জি।

প্রশ্ন মেয়েটি কেমন ?

ফখরুজ্জামান : বড় ভালো মেয়ে। এরকম ভালো মেয়ে আমি দেখি নাই। সাংঘাতিক বুদ্ধি। আর খুব সুন্দর। মনের মধ্যে কোনো অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন একজন অজানা অচেনা মানুষকে ডেকে নিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ে এত রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করবে এটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

ফখরুজ্জামান : আমি পানি খাব। আমি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাব।

[তাকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি দেওয়া হবে।]

ইয়া রাহমানু। ইয়া রাহিমু। ইয়া কুদ্দুসু।

প্রশ্ন আপনি কি কোনো কারণে ভয় পাচ্ছেন ?

ফখরুজ্জামান : জি-না। আমি কোনো পাপ করি নাই। ভয় করব কেন ? একটা মানুষকে খামকা কেন মারব ?

প্রশ্ন খামকা হবে কেন ? আপনি একজন দরিদ্র মানুষ। আপনাকে যথেষ্ট টাকা দিলে আপনি একটা অন্যায় করতে রাজি হতে পারেন। বড় বড় অন্যায়গুলি সাধারণত অভাবী মানুষদের দিয়েই করানো হয়। এবং ভবিষ্যতেও হবে।

ফখরুজ্জামান : জনাব আমি অভাবী মানুষ না। প্রতি মাসে আমি এক হাজার টাকার উপরে পাই টিউশনি করে। দেশের বাড়িতে কিছু পাঠাই, তার পরেও কিছু থাকে। পোস্টাফিসে আমার একটা পাশবই আছে।

প্রশ্ন কত টাকা আছে সেই পাশবইয়ে ?

ফখরুজ্জামান : চারশ তিহাত্তর টাকা। এই মাসে পাঁচশ' হতো, কিন্তু এই মাসে জমা দিতে পারি নাই।

প্রশ্ন এই মাসে খুব টানাটানি গেছে, তাই না ?

ফখরুজ্জামান : জি।

প্রশ্ন এই মাসেই আপনার টাকার খুব দরকার ছিল ?

ফখরুজ্জামান : জি।

[সবাই হেসে উঠবে।]

ফখরুজ্জামান : জনাব আমি খুন করি নাই। খুন করতে সাহস লাগে। আমার কোনো সাহস নাই।

প্রশ্ন সাহসী মানুষরা গুপ্তহত্যা করে না। গুপ্তহত্যা সব কাপুরুষদের কাজ।

ফখরুজ্জামান বড় তিয়াস লাগছে। এক গ্লাস পানি খাব।

[পানি দেওয়া হবে।]

প্রশ্ন হত্যার সময়টাতে আপনি কোথায় ছিলেন সেটা বলতে পারছেন না। আপনি বলছেন রমিজ সাহেবদের বাসায় ছিলেন যা কিনা ঠিক না। তারচেয়েও বড় কথা যে ছোরাটি পেটে বিঁধে ছিল তাতে আপনার হাতের ছাপ আছে। আপনি ডেডবডির ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছেন তাতে ছোরার হাতলে আপনার হাতের ছাপ থাকার কথা না।

ফখরুজ্জামান আমি ছোরাটা বার করবার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করলাম বেঁচে আছে।

প্রশ্ন বের করতে পারলেন না।

লোক জি-না। ভয় লাগল, হাত কাঁপতে লাগল।

প্রশ্ন ছোরা ঢোকানো সহজ, বের করা তো কঠিন।

[হাসির শব্দ]

লোক পানি, পানি, আমারে এক গ্লাস পানি দেন। বড় তিয়াস লাগছে। ওফ বড় তিয়াস।

[ঢুকবে লীনা। একটি স্বপ্নদৃশ্য। কিংবা সমস্ত ব্যাপারটাই ফখরুজ্জামানের কল্পনা।]

ফখরুজ্জামান : ওহ্! আপনি আসছেন। দেখেন না কী ঝামেলা হয়ে গেছে। আমাকে আটকে ফেলেছে। আমি কিছুই করি নাই। আল্লাহর কসম। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন।

লীনা বিশ্বাস করছি। আমি বিশ্বাস করছি।

ফখরুজ্জামান : আহ্, একটা শান্তি পাইলাম। খুব শান্তি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন বড় ভালো লাগল। আমার মা'কেও একটা খবর দেওয়া দরকার। সে খবর পেলে হার্টফেল করে মরে যাবে। মূর্খ মেয়েছেলে। বেশি বেশি ভয় পায়।

লীনা আপনি ভয় পান না ?

ফখরুজ্জামান : জি আমিও পাই। তবে বিনা অপরাধে তো আর শাস্তি হয় না, কী বলেন ? ঠিক না ? তারপর আপনার মনে মনে খতমে জালালি পড়তেছি। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়তে হয়। খুব শক্ত দোয়া। ঐটা পড়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে যা চাওয়া যায় তা-ই পাওয়া যায়।

লীনা তাই নাকি ?

ফখরুজ্জামান জি। আল্লাহর পাক কালাম। এর মরতবাই অন্যরকম। সারা রাত জেগে পড়ি।

লীনা ঘুমান না ?

ফখরুজ্জামান : ঘুম আসে না। বড় ভয় লাগে। আপনি আসছেন বড় ভালো লাগতেছে। চলে যাবেন না আবার। একটু থাকবেন। আপনি আসায় খুব সাহস আসছে মনে। পানির তিয়াস লেগেছিল। ওটা চলে গেছে।

লীনা আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন।

ফখরুজ্জামান ভয়ে ভয়ে রোগা হয়ে গেছি। কিছু খেতে পারি না। অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নাই। নির্দোষ মানুষেরে তো আর ফাঁসি দিবে না। কী

বলেন ? ঠিক না ? আর আপনি আসায় বড় শান্তি লাগছে। পানির তিয়াসটা চলে গেছে।

আচ্ছা এটা কি স্বপ্ন ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? আপনি এখানে কীভাবে আসলেন ? কিছুই বুঝতে পারছি না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

৮

বাবা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। তাঁর চেহারা ভয়কাতর।

বাবা — সোমা সোমা।

[সোমা ঢুকবে।]

কে কাঁদছে ?

সোমা — কেউ কাঁদছে না। কে আবার কাঁদবে ?

বাবা — আমি স্পষ্ট শুনেছি। মেয়েমানুষের কান্না। জামিলের মা কাঁদছে। আমাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

সোমা — উনি কেন শুধু শুধু আমাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদবেন ? তুমি স্বপ্ন দেখেছ। দুঃস্বপ্ন।

বাবা — ঠিক ঠিক দুঃস্বপ্ন। কেন জামিলের মা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদবে ? তার কোনো রাইট নেই। ওটা দুঃস্বপ্নই। সোমা, তুই আমার কাছে বসে থাক। শক্ত করে আমার হাত ধরে বসে থাক।

সোমা — তোমার শরীর কি বেশি খারাপ বাবা ?

বাবা — হুঁ বেশি খারাপ। খুবই খারাপ। ঘুমুতে পারি না। চোখ লাগলেই দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। কী দেখি জানিস ? আমি দেখি...।

সোমা — বাবা তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো তো, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

বাবা — না না, এখন আমি ঘুমুব না, তুই স্বপ্নটা শোন। খুব মন দিয়ে শোন। আমি দেখি বিরাট একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শিরীষ গাছ। সেই গাছে একটা দড়ি ঝুলছে। আর সবাই ধরাধরি করে ঐ বোকা মাস্টারকে দড়িতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দড়িটা খুব দুলছে আর ঐ বোকা মাস্টার চিৎকার করছে, আমাকে ছেড়ে দিন। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। তারপর...

সোমা — বাবা তুমি চুপ করো তো।

বাবা আমাকে স্বপ্নটা শেষ করতে দে। তারপর দেখি ঐ বোকা মাস্টারের জিভ বের হয়ে এসেছে। সে খুব দুলছে। তখন সেই মাঠ ভর্তি হয়ে গেল মানুষে, আর সবাই হা হা করে খুব হাসতে লাগল। আমি একটা দা নিয়ে ছুটে গেলাম দড়ি কেটে ওকে নামাতে, কিন্তু সবাই আমাকে চেপে ধরে রাখল।

সোমা বাবা, তোমার পায়ে পড়ছি তুমি চুপ করো তো।

বাবা ওরা আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি দড়িতে যে দুলছে সে মাস্টার না, সে আমাদের ফরিদ। ফরিদ চেঁচাচ্ছে—বাবা, আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও।

[মা ঢুকবেন।]

মা কী হয়েছে ?

সোমা কিছু না, মা। বাবা একটা স্বপ্ন দেখেছে। বাবা তুমি কি এক গ্লাস পানি খাবে ? ঠান্ডা পানি।

বাবা খাব।

[সোমা চলে যাবে।]

সুরমা, তুমি আমার পাশে একটু বসো তো।

মা তোমার কি শরীর বেশি খারাপ ?

বাবা হ্যাঁ খারাপ, খুবই খারাপ। রাতে ঘুমুতে পারি না সুরমা, দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

সুরমা, তুমি কি কোনো কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছ ? মেয়েমানুষের কান্না ?

মা না। তুমি শুয়ে থাকো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

[সোমা পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকবে। বাবা তৃষ্ণার্তের মতো পানি পান করবেন।]

বাবা ফরিদ কি বাসায় আছে ?

মা আছে।

বাবা ঘুমুচ্ছে ?

মা হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে।

বাবা সুরমা, ওকে একটু ডেকে তুলো তো।

মা এখন ওকে এত রাতে ডেকে তুলব কেন ?

বাবা ওর সঙ্গে আমার কথা আছে, খুব জরুরি কথা। আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় জামিলের মৃত্যুর সঙ্গে ফরিদের একটা সম্পর্ক আছে।

মা পাগলের মতো কী যা-তা বলছ!

বাবা আছে আছে, নিশ্চয়ই আছে। থাকতেই হবে। নয়তো জামিলের মা বাসার সামনে এসে কাঁদে কেন ?

সোমা বাবা, এসব তোমার মনগড়া কথা। কেউ কাঁদে না।

[লীনা ঢুকবে।]

লীনা কী হয়েছে ?

বাবা আমার শরীরটা খুব খারাপ মা। খুবই খারাপ। তুই একটু আমার পাশে বস। আমার হাত ধরে থাক।

লীনা তোমার গা তো খুব গরম। অনেক জ্বর তোমার গায়ে।

বাবা হুঁ অনেক জ্বর। জ্বরে মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু আজেবাজে চিন্তা আসে। বোকাসোকা ঐ প্রাইভেট মাস্টার ঐ ডেড বডির গায়ে পড়ে গেল। ফরিদ মহাউৎসাহে ওকে এই বাড়িতে ধরে নিয়ে এল। ওর এত উৎসাহ কেন ? লীনা, ফরিদকে ডাক তো। ওর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

মা ওর সঙ্গে তোমার কোনো কথা নেই।

বাবা আমার মনে যে সব সন্দেহ আসছে তোমাদের কারও মনেই কি তা আসছে না ? লীনা, তুই বল। তোর মুখ থেকে শুনি।

লীনা বাবা, তুমি বলেছিলে আমাদের সবাইকে নিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। বলেছিলে না ?

বাবা হুঁ বলেছিলাম।

লীনা আমরা নতুন করে জীবন শুরু করব, বাবা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে আপার মিটমাট হয়ে যাবে। ওদের একটা ফুটফুটে ছেলে হবে। ফরিদ ভাইয়া আবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে এবং এবার সে পাস করবে। তার আমরা বিয়ে দেব। নতুন ভাবির সঙ্গে আমি খুব ঝগড়া করব। আবার ঝগড়া মিটে যাবে। আমরা দু'জনে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখতে যাব।

বাবা আমার সঙ্গে একজন মহাপুরুষের দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমি মিথ্যা কথা বলব না। আমি কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না।

লীনা স্বপ্ন দেখা তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই কি আমরা স্বপ্নও দেখতে পারব না ?

তুমি মহাপুরুষের দেখা পেয়েছ বলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। ভাইয়া এখন কত শান্ত দেখছ না ? সে ঘরেই থাকছে। সবই হচ্ছে মহাপুরুষের জন্যে। তিনি আমাদের নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বাবা নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?

লীনা হ্যাঁ দিচ্ছেন। সাভারে তুমি যে জমি কিনেছ সেটাতে আমরা একটা চমৎকার বাড়ি করব। বাড়ির সামনে বাগান থাকবে। ভারি সুন্দর বাগান। এখন থেকে আর আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। মহাপুরুষের কল্যাণে আমরা নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি এই সাধারণ সত্যটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন ? কেন তুমি এত বোকা হয়ে যাচ্ছ ?

বাবা বোকা হয়ে যাচ্ছি ?

লীনা হ্যাঁ যাচ্ছ। কিন্তু আমরা কেউ তোমাকে আর কোনো বোকামি করতে দেব না। কিছুতেই না।

বাবা কিন্তু আমার শরীরটা এত খারাপ লাগছে কেন ? নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। বড় কষ্ট হচ্ছে সুরমা। ফরিদ! ফরিদ!

[ফরিদ ঢুকবে।]

শরীরটা বড় খারাপ। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। ও ফরিদ, তুই আমার পাশে বস।

ফরিদ আরে, এ তো অনেক জ্বর গায়ে। তোমরা সবাই চুপচাপ। ব্যাপারটা কী ?

বাবা জ্বর ছিল না। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জ্বর উঠে গেল। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

ফরিদ কী দুঃস্বপ্ন ?

সোমা বাবা, তোমাকে এখন কোনো দুঃস্বপ্ন বলতে হবে না। ফরিদ তুই যা একজন ডাক্তার ডেনে নিয়ে আয়।

বাবা না না ফরিদ থাকুক। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। খুব জরুরি কথা।

মা ওর সঙ্গে তোমার কোনো কথা নেই।

বাবা লীনা বলছিল তুই আবার বি.এ. পরীক্ষা দিবি।

ফরিদ হ্যাঁ দেব। তুমি চাইলে দেব। কথা দিচ্ছি তোমাকে দেব।

বাবা ভালো ভালো, খুব ভালো।

ফরিদ কোথায় যেন আমাদের নিয়ে যাবে বলছিলে, বাবা ? আমরা সেখানেও যাব। খুব আনন্দ করব।

বাবা হুঁ করব। খুব আনন্দ করব। একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বুঝলি—তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি সুন্দর একটি সুখী জীবন শুরু করতে পারব। A fresh start.

ফরিদ তাই হবে বাবা।

বাবা ভালো লাগছে, আমার বড় ভালো লাগছে। কিন্তু ফরিদ একটা কথা।

ফরিদ বলো।

বাবা জামিলের মা রোজ রাতে আমার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদে কেন বাবা ?

মা কী আবোল-তাবোল বকছ ? চুপ করো তো।

বাবা আমি ফরিদকে বলছি—সে কিছু বলছে না কেন ? সে চুপ করে আছে কেন ? ফরিদ!

ফরিদ বলো।

বাবা ক'টা বাজে ?

ফরিদ বেশি না দশটার মতো বাজে।

বাবা তুই একটা কাজ করতে পারবি—মহাপুরুষকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবি ? ডাকলেই তিনি আসবেন। তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। খুব জরুরি কথা। very urgent.

ফরিদ কী কথা ?

বাবা ঐ বোকা মাস্টারটা, ওর কী যেন নাম ? ফখরুজ্জামান না ? হ্যাঁ ফখরুজ্জামান। ও থাকবে জেলে। কিংবা সবাই মিলে ওকে হয়তো ফাঁসিতেই ঝুলিয়ে দেবে। ওকে ঐভাবে রেখে আমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা সেটা মহাপুরুষকে জিজ্ঞেস করতাম। বাবা তাকে নিয়ে আসবি ?

[ফরিদ উঠে দাঁড়াবে।]

শরীরটা খারাপ লাগছে ফরিদ। খুব খারাপ। তোমরা আমাকে বাতাস কর। আমাকে বাতাস করো। ঠান্ডা পানি দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দাও! মহাপুরুষ এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

সোমা ফরিদ, তুই এখানেই থাক। বাবার অবস্থা ভালো না। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কাদের গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে আসবে।

ফরিদ আহ, ছাড় তো আমাকে। কেউ হাত ধরলে আমার ভালো লাগে না।

[ফরিদ বের হয়ে যাবে।]

বাবা চুপ কর। সবাই চুপ।

[জামিলের মা কাঁদছে।]

শুনুন আপনি কাঁদবেন না। মহাপুরুষকে আনতে গেছে। তিনি এলে আপনার আর কোনো দুঃখ থাকবে না। আহ চুপ চুপ।

৯

মঞ্চের একপ্রান্তে ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধ কী কথা বইলা ছিল মা আমিনায় ?

কন্যা সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায়।

অন্ধ কী কথা বইলা ছিল বিবি হাজেরায় ?

কন্যা সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায় ?

অন্ধ কী কথা বইলা ছিল বিবি ফাতেমায় ?

ফরিদ এই শোন।

[ওরা থমকে দাঁড়াবে।]

কোথায় তোমাদের মহাপুরুষ ?

অন্ধ বা'জান আমারে কিছু কইছেন ?

ফরিদ তিনি কোথায় ?

অন্ধ কার কথা কন ?

ফরিদ সাদা চাদর গায়ে একটা লোক—বড় বড় কথা বলে।

অন্ধ কইতে পারি না বা'জান। আমি অন্ধ মানুষ। আল্লাহতালা আমারে নয়ন দেয় নাই। যার নয়ন নাই তার কিছুই নাই গো বা'জান। একটা টেকা দিবেন ? একদিনের না খাওয়া।

কন্যা আমরা একদিনের না খাওয়া।

ফরিদ যাও যাও চলে যাও।

কন্যা ধমক দেন কেন ?

ফরিদ ভাগো। ভাগো।

অন্ধ আয়রে মনু যাই গা। চিল্লাইয়েন না বাজান।

[গান গাইতে গাইতে ওরা মঞ্চ ছেড়ে যাবে।]

ফরিদ কোথায় মহাপুরুষ ? কোথায় তুমি ? তোমার যদি সাহস থাকে এগিয়ে আস। কথা বলো আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। কে কে ? কে ওখানে ?

[মৌলানাকে ঢুকতে দেখা যাবে।]

মৌলানা স্লামালিকুম ফরিদ ভাই ? কার সঙ্গে কথা কন ?

ফরিদ কারও সঙ্গে কথা বলি না। একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। যান আপনি চলে যান।

মৌলানা খুন খারাবি হয় এই সময় একা একা থাকন ঠিক না। ফরিদ ভাই। সময়টা খারাপ।

ফরিদ আপনাকে চলে যেতে বলছি চলে যান। কেন বাজে কথা বলছেন ?

মৌলানা আপনের বাবার শরীরটা শুনলাম খুব খারাপ। কাদেরের সঙ্গে দেখা। সে ডাক্তারের খুঁজে গেছে। এত রাতে কাউকে পাওয়া মুশকিল।

ফরিদ আপনি শুধু শুধু কথা বলছেন। চুপ করেন।

মৌলানা জি আচ্ছা। ফরিদ ভাই, রাতটা মসজিদেই কাটাব আমি। ইবাদত বন্দেগি করব। যদি কোনো দরকার হয় বলবেন। আপনের বিপদ আমারও বিপদ। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন, হে বান্দা সকল...।

ফরিদ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। কেন কথা বাড়াচ্ছেন ? আমার মেজাজ এখন ভালো না মৌলানা সাহেব।

মৌলানা তাহলে যাই ফরিদ ভাই। আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহ্।

[মৌলানা চলে যাবেন।]

ফরিদ মহাপুরুষ, আমি তোমার কথা শুনতে এসেছি। কথা বলো।

[হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ শোনা যেতে থাকবে।]

ফরিদ স্টপ ইট। স্টপ ইট।

এসব বহু শুনেছি। অনেকবার শুনেছি। আর শুনতে চাই না। হাজার হাজার বছর ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই জিনিস অসংখ্যবার শুনেছি। আমাদের কান পচে গেছে। আর না। আর না। বন্ধ করুন এসব।

[শব্দ থেমে যাবে। কাদের ঢুকবে।]

কাদের ভাইজান।

[ফরিদ চমকে তাকাবে]

বাসায় চলেন ভাইজান।

ফরিদ তুই যা।

কাদের একটা খারাপ সংবাদ আছে ভাইজান। বাসায় চলেন।

ফরিদ তোকে যেতে বলছি কানে যাচ্ছে না ?

কাদের খুব একটা খারাপ সংবাদ আছে ভাইজান!

ফরিদ গেট আউট। গেট আউট।

মহাপুরুষ তুমি কোথায় ? এস দেখা দাও।

[মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন।]

মহাপুরুষ ভালো আছ ফরিদ ?

ফরিদ কে কে ?

মহাপুরুষ আমি। আমাকেই তো খুঁজছিলে।

ফরিদ তুমিই সেই ব্যক্তি ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ আমিই সেই।

ফরিদ জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছ ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ।

ফরিদ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে এসেছ ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ।

ফরিদ পাপ দূর করবার জন্যে এসেছ ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ।

ফরিদ পাপ ব্যাপারটা কী জানতে পারি ?

মহাপুরুষ পাপ এমন একটি কর্ম যা আত্মাকে অশুচি করে।

ফরিদ আত্মা, আত্মা আবার কী ?

মহাপুরুষ আত্মা হচ্ছে সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। তুমি চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাবে, এই আকাঙ্ক্ষাই তোমার আত্মা।

ফরিদ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আর যাওয়া হচ্ছে না মহাপুরুষ। আমার বাবা মারা গেছেন সেটা কি জান ?

মহাপুরুষ [চুপ করে থাকবেন।]

ফরিদ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তিনি বেঁচে থাকতেন। এবং আমরা হয়তোবা যেতাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের জটিল কর্মপদ্ধতি বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। মানুষ ক্ষুদ্র। তার জ্ঞান ও বুদ্ধি সীমিত।

ফরিদ তুমি এর মধ্যে ঈশ্বরও নিয়ে এসেছ ? ভালো ভালো। তা তোমার এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন ? এদেশের ত্রিশ লাখ লোক যখন মারা গেল তখন তো তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

মহাপুরুষ অপরাধীর জন্যে অপেক্ষা করছে অনন্ত অগ্নি।

ফরিদ অগ্নি তো শুধু অপেক্ষাই করে। কাউকে স্পর্শ করে না কখনো। যুগে যুগে দলে দলে মহাপুরুষ আসেন। অনন্ত অগ্নির কথা বলেন। যত ভণ্ডের দল।

[পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটা ছোরা বের করবে।]

মহাপুরুষ তুমি কি আমাকে মারতে চাও ?

ফরিদ হ্যাঁ চাই। আমার কাছ থেকে ঠিক এই জিনিসটি বোধহয় তুমি আশা করোনি। কী, খুব অবাক হয়েছ ?

মহাপুরুষ না, অবাক হইনি। সর্বযুগে মহাপুরুষরা আততাতীয় হাতে প্রাণ দিয়েছেন এটা নতুন কিছু নয়।

[গির্জার ঘণ্টার মতো ধ্বনি হতে থাকবে। মহাপুরুষের সাদা চাদর রক্তে লাল হয়ে যেতে থাকবে। ফরিদ মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।]

ফরিদ আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। কিন্তু আমি, আমি এখন কোথায় যাব—কার কাছে যাব ?

[মঞ্চে ঢুকবে সোমা।]

সোমা বাসায় চল ফরিদ।

[ফরিদ ছোরাটা ফেলে দেবে, দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠবে।]

ফরিদ বাসায় তুমি যাও, আপা। তারপর যাও চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দূরের সমুদ্র দেখো। বাবার খুব শখ ছিল। আমি ফখরুজ্জামানকে ফেলে কোথাও যাব না। এ জীবনে আমার আর চন্দ্রনাথ দেখা হবে না। বাবা, বাবা, আমার বাবা।

[তার চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। সোমা এসে জড়িয়ে ধরবে ভাইকে।]

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

১। **একা একা**

হুমায়ূন আহমেদের একাদশ উপন্যাস। পরিণত বয়সে একজন মানুষের আসন্ন মৃত্যুকে ঘিরে পারিবারিক ঘাতপ্রতিগাতের নিখুঁত চিত্র।

প্রথম প্রকাশ— ১৯৮৪, প্রকাশক বিউটি বুক হাউস। প্রচ্ছদ : খালেদ আহসান। অন্যপ্রকাশ-এর নতুন সংস্করণ চালু রয়েছে। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। দাম একশ' টাকা।

উৎসর্গ
আসাদুজ্জামান খান
কোহিনুর খান
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

২। **প্রথম প্রহর**

দ্বাদশ উপন্যাস। জটিল অস্ত্রোপচারের জন্যে হাসপাতাল-যাত্রী এক তরুণ ও তার হাসপাতাল বাসের অভিজ্ঞতার মনোরম ছবি। চারপাশের সহমর্মিতা যাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক বিউটি বুক হাউস। প্রচ্ছদ কাজী হাসান হাবিব। ২০০৩ সাল থেকে চালু রয়েছে অন্যপ্রকাশ-এর নতুন সংস্করণ। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। দাম আশি টাকা।

উৎসর্গ
নওয়াজীশ আলী খান
যিনি আমাকে নাটক লিখতে বাধ্য করেছেন।

৩। **আমার আছে জল**

ত্রয়োদশ উপন্যাস। অস্ফুট ভালোবাসা আর মর্মভেদী আবেগের সমাবেশে মনকাড়া উপাখ্যান। উপন্যাসটি পরিচ্ছন্ন ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে, অনিন্দ্য প্রকাশনী থেকে। ১৯৯১ সালে শিখা

প্রকাশনী বইটি পুনর্মুদ্রণ করে। বর্তমানে ১৮তম মুদ্রণ চলছে। প্রচ্ছদ সমর মজুমদার। দাম ষাট টাকা মাত্র।

বইয়ের শুরুতে লেখক লোকগীতির এ বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন—'উইড়া যায়রে পঙ্খী তার পইড়া থাকে ছায়া।'

উৎসর্গ

নির্মলেন্দু গুণ

প্রিয় মানুষ ও প্রিয় কবি।

৪। **১৯৭১**

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস। একটি গ্রামে পাক-হানাদার বাহিনীর আগ্রাসী আচরণই উপজীব্য। ১৯৭১ পরে মঞ্চনাটকে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, অনিন্দ্য প্রকাশনী। প্রচ্ছদ খালেদ আহসান। ১৯৯৬ সাল থেকে আফসার ব্রাদার্স-এর নতুন সংস্করণ চলছে। দাম পঞ্চাশ টাকা।

উৎসর্গ

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

৫। **ফেরা**

লেখকের প্রথম গ্রামভিত্তিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশের পর মুক্তধারার *সাহিত্য সাময়িকী*তে প্রকাশিত আলোচনায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *ফেরা*কে হুমায়ূনের এযাবত প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সেরা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

প্রকাশক আফসার ব্রাদার্স। দশম মুদ্রণের প্রকাশ ২০০৬। প্রচ্ছদ আফসারুল হুদা। দাম পঞ্চাশ টাকা।

উৎসর্গ

খালেকুজ্জামান ইলিয়াস

প্রিয়বরেষু।

এতে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে :

'ফেরা'র গল্প ভাটি অঞ্চল নিয়ে।

আমার নানার বাড়ির দেশ, যেখানে শৈশবের বর্ণাঢ্য দিনগুলি কাটিয়েছি।

গল্পের মূল চরিত্রের কেউ আর বেঁচে নেই। তাদের কথা আজ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করছি।

গল্পে বেশকিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছি। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে অপ্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের একটি নির্ঘণ্ট বইয়ের শেষে জুড়ে দিয়েছি। ভাটি অঞ্চলের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে সাহায্য করেছেন আমার মা এবং আমার ছোট মামা মাহবুবুন্নবী শেখ। তথ্যগত ভুল কিছু থাকলে তার দায়-দায়িত্ব তাঁদের।

ফেরা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ঈদসংখ্যা *উত্তরাধিকারে* (১৯৮৩)। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় *উত্তরাধিকারের* সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হুমায়ূন আহমেদ
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬। **শীত ও অন্যান্য গল্প**

ছোটগল্পের সংকলন। গল্প সংখ্যা এগারো। অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'জলিল সাবের পিটিশন' এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। নসাস। পঞ্চম মুদ্রণ এবং প্রথম জ্ঞানকোষ সংস্করণ বের হয় ১৯৯৪ সালে। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। দাম : চল্লিশ টাকা।

উৎসর্গ
প্রণব কান্তি বোস
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

৭। **ইরিনা**

কল্পবিজ্ঞানের দ্বিতীয় উপন্যাস। মানবিক আহ্বানে সমুজ্জ্বল।

প্রকাশক : প্রতীক। লেখা ও প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮। ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৮। প্রচ্ছদ : ব্রাডবারি থমসনের পোস্টার অবলম্বনে সৈয়দ লুৎফুল হক ও অলকেশ ঘোষ। দাম আশি টাকা মাত্র।

উৎসর্গ
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

নামপত্রের আগে এই কবিতাংশটি সংযুক্ত আছে :

'কেউ কেউ হাত বাড়ালেই
হাতের মুঠোয় আনতে পারেন
আকাশের চাঁদ
তবু
হাত বাড়ান না কখনো'

৮। **ময়ূরাক্ষী**

হিমু উপন্যাসমালার প্রথম বই। বলার অপেক্ষা রাখে না *ময়ূরাক্ষী* থেকেই হিমুর বিজয়যাত্রার শুরু।

প্রকাশক অনন্যা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯০। একাদশ মুদ্রণ : ২০০৫। প্রচ্ছদ : খালিদ আহসান। দাম পঞ্চাশ টাকা।

উৎসর্গ

অন্ধভক্ত (!) সোমাকে
যার সঙ্গে বৎসরে একবার মাত্র আমার দেখা হয়।

বইয়ের শুরুতে উদ্ধৃত রয়েছে এই আট ছত্র কবিতা :

'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা
যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা।।
সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরু প্রান্তরে।।
ফুরায় বেলা, ফুরায় বেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে—
কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে।।'

৯। **মহাপুরুষ**

প্রথম মঞ্চনাটক। ১৯৮৬-র সেপ্টেম্বরে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় অনিন্দ্য প্রকাশনী থেকে। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ শিল্পী খালেদ আহসান। চতুর্থ সংস্করণ থেকে (১৯৯২) প্রকাশক

জ্ঞানকোষ। ২০০৩-এ বের হয় সপ্তম সংস্করণ। প্রচ্ছদ সমর মজুমদার। অলংকরণ : ধ্রুব এষ। দাম পঁয়ত্রিশ টাকা।

উৎসর্গ

তবিবুল ইসলাম বাবু।

মহাপুরুষ নাটকের ভূমিকা নিম্নরূপ :

এই মঞ্চনাটকটি কীভাবে লেখা হলো সেই গল্পটি বলি।

একদিন সকালে অপরিচিত এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তার হাতে এক কার্টুন বিদেশি সিগারেট, চারটে চমৎকার খাতা, ছ'টা বলপয়েন্ট। তিনি বললেন, আপনাকে একটা নাটক লিখতে হবে। আপনার জন্যে সিগারেট, খাতা-কলম নিয়ে এসেছি। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি বিদায় হলেন। এবং এক সপ্তাহ পর আবার এক গাদা সিগারেট নিয়ে উপস্থিত। কী মুশকিল! আমি বিদেশি সিগারেটের ধোঁয়া টানি এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভাবি কী করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। শেষপর্যন্ত আমার বিপদত্রাতা হিসেবে টেনে আনলাম 'মহাপুরুষ'কে। মহাপুরুষেরা মানুষকে উদ্ধার করেন। আমাকেই বা উদ্ধার করবেন না কেন ? এই হচ্ছে মহাপুরুষের জন্মকথা।

যারা আমার এই নাটকটা মঞ্চে আনতে চান তাঁদের বলছি— মঞ্চায়নের জন্যে আমার কোনো পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন নেই। সংলাপ বদলানো যাবে না এবং নাটক শেষ করতে হবে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এই গানটি দিয়ে (গীতবিতান ২১২) এই দুটি মাত্র শর্ত। খুব কঠিন শর্ত নিশ্চয়ই নয়।

হুমায়ূন আহমেদ

বইপোকাবিডি
সবার জন্য বই.....
.কম

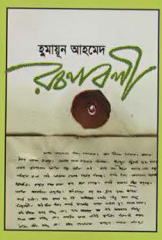

Humayun Ahmed
Rachanabali [Vol. III]

price Bdt 700.00
US $ 35.00
cover design :: Masum Rahman
anyaprokash<< dhaka<< bangladesh
www.anyaprokash.net

an ANYAPROKASH publication

ISBN 984 868 587 1

security
hologram